১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা
মাঘ ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ" ও তাহার সমালোচনা

(১)

রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসিকমাত্রেই নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে "চতুরঙ্গের" রূপ একটু স্বতন্ত্র। উপন্যাসগুলির শ্রেণীবিভাগ করিলে "চতুরঙ্গ"কে কোন বিশেষ শ্রেণীতে ফেলা যতখানি শক্ত হইবে অন্য কোন উপন্যাসকে ফেলা ততখানি শক্ত হইবে না। হয়ত ইহার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সাহিত্য-সমালোচকদের ভিতর মতভেদের একটা কারণ ইহার স্বাতন্ত্র্য। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার সুলিখিত "রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা"য় বলিয়াছেন, ' চতুরঙ্গ" লইয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিক মহলে একেবারে উল্টারকমের মতামত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে "চতুরঙ্গ" শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। আবার কাহারও কাহারও মতে রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের উপন্যাসসমূহের মধ্যে "চতুরঙ্গ" সর্ব্বাপেক্ষা কাঁচা ও আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary)। শেষের মতটি শ্রীকুমার বাবুর।'

শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "চতুরঙ্গ" উপন্যাসটীকে শুধু "কাঁচা ও আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত" বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহার মতে 'ইহার (অর্থাৎ "চতুরঙ্গের") অন্তর্নিহিত সমস্যাটী ভাব-গভীরতার পরিবর্ত্তে লঘু ও দ্রুতসঞ্চারী চটুলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। সাধারণ ঔপন্যাসিক যেরূপ গভীর দায়িত্ববোধ ও সর্ব্বতোমুখী সতর্কতার সহিত তাহার সৃষ্ট

চরিত্রদের পরস্পর সম্পর্ক ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ করেন এখানে তদনুরূপ কিছু নাই। শচীশ-দামিনীর সম্পর্কের অতর্কিত পরিবর্ত্তন উচ্ছৃঙ্খল গিরিনির্ঝরের অকারণ বক্রগতি বা খেয়ালী শিশুর লীলাচাপল্যের মতই ঠেকে।' শচীশ ও দামিনীর দ্রুতপরিবর্ত্তনের মধ্যে তিনি 'যেন অনেকটা নিয়মহীন উদ্দাম খেয়ালেরই অনুবর্ত্তন' দেখিয়াছেন। 'যেন একটা পাগলা হাওয়া যদৃচ্ছাক্রমে চরিত্রগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও তাহাদের পরস্পর সম্পর্কটীকে অস্থির পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণাবর্ত্তে সর্ব্বদা বিবর্ত্তিত করিতেছে। উদ্দেশ্য-গভীরতার অভাব সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট।' নীহারবাবু তাঁহার গ্রন্থে শ্রীকুমার বাবুর এই মত সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ ভাবে খণ্ডন না করিলেও "চতুরঙ্গকে" 'সুন্দর ও সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি' বলিয়াছেন এবং তাঁহার নিজস্ব সুললিত ভাষায় ইহার সৌন্দর্য্য এবং সার্থকতার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য এবং সার্থকতা সত্ত্বেও "চতুরঙ্গ" তাঁহার মতে 'মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি নয়; ইহাতে বস্তুভূমির গভীরতা আছে কিন্তু প্রসার নাই; মানব-সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন তরঙ্গ-লীলার সঙ্গে ইহার যোগ নাই, ইহার জীবন-দর্শন খণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপন্যাসে নাই।' যদিও "চতুরঙ্গের" বিশদ্ আলোচনা করিয়া তাহার যে রস ও সৌন্দর্য্য নীহারবাবু দেখাইয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত তথাপি "চতুরঙ্গ" 'মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি নয়' তাঁহার এই মন্তব্য স্বীকার করিতে পারিলাম না, তাঁহার এই মন্তব্য এবং শ্রীকুমার বাবুর মতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "চতুরঙ্গ" উপন্যাসের আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

(২)

শ্রীকুমার বাবু "চতুরঙ্গ"কে 'আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary) বলিয়াছেন। এক হিসাবে সাহিত্যই আংশিক, জীবনের অংশ লইয়াই তাহার কারবার, গোটা, সম্পূর্ণ জীবনের হুবহু চিত্র সাহিত্যে সম্ভবও নয় প্রয়োজনও নয়, কেন না সাহিত্য আর যাহাই হউক না কেন, ফটোগ্রাফী নয়। বিচ্ছিন্ন অংশকে গাঁথিয়া তাহাকে একটা সমগ্রের রূপ দেওয়াই সাহিত্যিকের কাজ,

এই অংশগুলি বাছিয়া লওয়াতেই সাহিত্যিকের কৃতিত্ব, কোনগুলি রাখিতে হইবে এবং কোন অংশ বর্জ্জন করিতে হইবে তাহা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ নির্ভর করে লেখকের বিষয় বস্তুর (theme) উপর এবং তারপর তাঁহার রুচি ও রসবোধের উপর। তখনই "চতুরঙ্গ"কে আংশিকত্ব দোষদুষ্ট বলিব যখন দেখিব যে-অংশ "চতুরঙ্গে"র বিষয়-বস্তুকে সার্থকভাবে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিবার পথে পরম প্রয়োজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাহা বর্জ্জন করিয়াছেন। অতএব ইহা 'আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত' কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে ইহার বিষয় বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বোধহয় মতভেদের অবকাশ নাই যে যে-বিশেষ সত্যটী "চতুরঙ্গে"র বিষয় বস্তু তাহা মানবজীবনের বাহিরের দিক নয়, অন্তরের দিক। যুগে যুগে মানুষের আত্মা তাহার সার্থকতা খুঁজিয়াছে, সেই 'আত্মানুসন্ধানের' আকাঙ্ক্ষা সকলের জীবনে একান্ত হইয়া, একাগ্র হইয়া দেখা দেয় না। মানবাত্মার গোড়ার প্রশ্নের উত্তর তাই সকলের এক হয় না; কিন্তু এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এমন জীবনও আসে যাহাদের কোন দেশের বা কালের সীমানায় বাঁধিয়া রাখা যায় না, যাহাদের আত্মানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা আর সকল আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়াইয়া এবং ছাপাইয়া যায়। এই বিচিত্র পৃথিবীর পটভূমিকায় আত্মানুসন্ধানের এই বিরাট অপার্থিব আকুলতাই "চতুরঙ্গের" বিষয়-বস্তু।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী সমাজের এক অংশের উপর রবীন্দ্রনাথ এই আলোকপাত করিলেন। সেই অংশের বিস্তার উপন্যাসের পৃষ্ঠাসমষ্টি দিয়া মাপিলে একটু ভুল করার সম্ভাবনা। তাই "চতুরঙ্গের" "বস্তুভূমির প্রসার নাই" নীহার বাবুর এই কথায় সায় দিতে আমি কুণ্ঠিত।

একটা সমগ্র দেশের বিচিত্র এবং বিভিন্ন, অগণিত নরনারী ইহাতে ভিড় করিয়া দাঁড়ায় নাই সত্য কিন্তু বিষয় বস্তুর দিক দিয়া বিচার করিলে এবং এই উপন্যাসে সমস্ত আলোচনা সংক্ষেপধর্ম্মী, বিক্ষেপধর্ম্মী নয় একথা স্মরণ রাখিলে এখানে বিচিত্র মানুষের প্রাচুর্য্যই চোখে পড়িবে, অভাব অনুভূত হইবে না। শুধু পৃষ্ঠার তুলনায় নয়, চরিত্র সম্পদে ও সংখ্যায় এবং সামাজিক বিষয়বস্তু এবং সংঘাতের ইঙ্গিতের দিক দিয়া বিচার করিলেও ইহার বস্তুভূমির প্রসার "চোখের

বালি"র চেয়ে বেশী এবং বোধহয় "গোরা"র চেয়েও খুব কম হইবে না। "চতুরঙ্গে"র "জ্যাঠামশায়" অংশে শচীশ এবং শ্রীবিলাসকে বাদ দিলেও জ্যাঠামশায়, হরিমোহন, পুরন্দর, পুরন্দরের স্ত্রী, ননীবালা এবং এমন কি চামারগুলা পর্য্যন্ত রহিয়াছে। ইহারা আপনাপন ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে জীবন্ত, সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ইহাদের কালের এবং সমাজের বিভিন্ন type-এর প্রতিনিধি। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসে ইহাদের প্রত্যেকেরই স্থান আছে।

বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মধ্যবিত্ত সমাজের যে চিত্র ইহাতে রহিয়াছে তাহাতে আর্টিষ্টের সমগ্রতা এবং সৌষাম্য-বোধ ক্ষুণ্ণ হয় নাই তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইয়াই আছে। মানবাত্মার আত্মানুসন্ধানের ব্যাকুলতা ইহার মূলকথা হইলেও এবং এই মূলকথাটি উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে থাকিলেও ইহাতে আগাগোড়া সমাজের একাংশের জীবনের সমগ্র প্রতিচ্ছবি মিলে। ননীবালা-পুরন্দরের কাহিনীতে কি সমাজের ছবি পাই না ? জগমোহন, হরিমোহন, পুরন্দর, শচীশের পরস্পরের কার্য্যে এবং প্রকৃতিতে তাদের দেশের সমাজ এবং শিক্ষা কি কোন ছাপ রাখিয়া যায় নাই ? উইলকিন্সের অধ্যাপকতা এবং তাহার শ্লেষ কি বাংলাদেশের উনবিংশ-শতাব্দীর ইতিহাসে অবাস্তব ? নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যায় কি বাংলা দেশের সমাজ-জীবনের একটা প্রচ্ছন্ন অসুস্থতার সন্ধান মিলে না ? জগমোহনের নাস্তিকতা এবং লীলানন্দ স্বামীর কীর্ত্তন-রস-বিলাস, ইহাদের স্থান কি বাংলা-দেশে, এই সমাজে ছিল না ? একটা বিশেষ কালের এবং সমাজের যে জীবন 'চতুরঙ্গে" পাই তাহা শুধু বিচিত্র নয় তাহাতে প্রাচুর্য্যের এবং সমগ্রতার ছাপ রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ "চতুরঙ্গে" অনেক ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মাটীর পৃথিবীকে ভুলিয়া যান নাই, আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন বলিয়া সামাজিক জীবনের নিম্নভূমি তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায় নাই ; বিস্তৃত আলোচনা না থাকা সত্ত্বেও "চতুরঙ্গের" বস্তুভূমি একটা সমাজ এবং একপুরুষেরও বেশী লইয়া বিস্তৃত একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। "মানব সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন তরঙ্গলীলার সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই"— এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাই যদি হইবে তবে জ্যাঠামশায়ের জীবনে

"প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধনের" কি অর্থ হয়, চামারগুলির কি অর্থ থাকে, ননীবালা "নষ্ট" হয় কেমন করিয়া, শচীশের ননীবালাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবে হরিমোহন ক্রোধে 'পাগল' হন কেন? কাপুরুষ পুরন্দর আত্মহত্যার ভয় দেখায় কেন এবং পুরন্দরের স্ত্রী তাহার জবাবে 'তাহা হইলে তো আমার হাড় জুড়ায়' এই দাম্পত্য সত্য তারস্বরে ঘোষণা করে কেন? ইংরাজের আইন আদালত, জেলা কোর্টের মুনসেফ, জগমোহনের আদালতে কবুল এই সমস্তই বা গল্পে স্থান পায় কেমন করিয়া? ননীবালার আত্মহত্যায় বা শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের জীবন-নাট্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ঔদাসীন্য-ঈর্ষায়ও কি 'মানব সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন তরঙ্গলীলার' সন্ধান পাওয়া যায় না? আসল কথা তরঙ্গলীলা যে বিচিত্র এবং বহুমুখীন তাহার আভাষ আছে কিন্তু তাহার বিস্তৃত আলোচনা নাই, কাজেই "চতুরঙ্গের" বস্তুভূমির প্রসার নাই একথা সত্য নহে, বস্তুতঃ "চতুরঙ্গে" যে সাংসারিক জীবনের বিস্তৃত সামাজিক বা রাজনৈতিক আলোচনা নাই তাহা নীহারবাবু এবং অন্যান্য সমালোচকগণও লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এই পুস্তক যে সঙ্কেতময় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এতখানি সংহতির ও সংবরণক্ষমতার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ বোধহয় আর কোনও পুস্তকে দেন নাই। তুলিকার স্বল্প কয়েকটী আঁচড়ে এতগুলি প্রাণীর জীবন্ত ছবি তিনি এই উপন্যাসে আঁকিয়াছেন। হয়ত আঁচড় অনেকগুলি পড়িলে "শেষের কবিতা"র মত চতুরঙ্গ" সম্বন্ধেও বঙ্গদেশের সাহিত্যিক মহলে কোন মতদ্বৈধ থাকিত না। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে "চতুরঙ্গের" স্বাতন্ত্র্য এবং উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে এই সংহত রূপের মূল্য জানিতে হইবে। বুঝিতে হইবে চরিত্রগুলি ফুটাইয়া তুলিতে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই বহুবাক্যব্যয় করেন নাই, বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ এবং ঘাতপ্রতিঘাতের চিত্র দেখান নাই, এবং বিস্তৃতভাবে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণও বর্জ্জন করিয়াছেন। ইহাতে একদিকে যেমন স্বল্পকথায় অনেক কিছু প্রকাশ করিয়াছেন ও এই হিসাবে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তাঁহার "গভীর দায়িত্ব বোধ" ও "সর্ব্বতোমুখী সতর্কতা" তাঁহাকে মূল বিষয়-বস্তুর দিকে সজাগ রাখিবার অবকাশ দিয়াছে। তাই উপন্যাসের যে জায়গাটা কেন্দ্রস্থল সেখানে বহু জনপ্রাণীর ভিড় নাই। তাই "জ্যাঠামশায়" অংশে যে পরিমাণ নরনারী আসিয়া

ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে "শচীশ", "দামিনী", "শ্রীবিলাস" অংশে তাহার অর্দ্ধেকও নাই, তাই "জ্যাঠামশায়" অংশে যে শক্তি একটা সমাজ এবং পরিবেশ সৃষ্টি করিতে নিয়োজিত হইল তাহা অন্য তিন অংশে শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের পরস্পরের জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া মানব জীবনের একটা পরম সত্য আবিষ্কারের সাধনায় প্রয়োগ করা হইয়াছে। "জ্যাঠামশায়" অংশ বিচার করিতে হইলে প্রথমেই মনে করিতে হইবে যে এই অংশ সমগ্র উপন্যাসের পটভূমিকা। এইখানে উপন্যাসের নায়কের আরম্ভ, তাহার প্রকৃতি এবং তাহার সমাজিক পরিবেশের চিত্র এইখানে নাই।

তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ, বাংলাদেশের যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা বিদ্বান, যাঁরা মনীষী তাঁরা নূতন শিক্ষার প্রেরণায় কর্ম্মযোগে উদ্বুদ্ধ, positivist-দের বিরাট ঐকান্তিকতা তাঁদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। যাহা কিছু স্পষ্ট, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই তাঁহারা স্বীকার করিয়া নিয়াছেন, অস্পষ্ট ধোঁয়ার পিছনে ছুটিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিতে তাঁহারা বিশ্বাসী নহেন। "প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধনই" তাঁহাদের ব্রত। Positivism-এর এই স্পষ্ট, জাগ্রত বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত জগমোহন এই সমাজের পুরস্থিত ব্যক্তি। তাঁহার বীর্য্য এবং নিষ্ঠা এই সমাজের আকাশে জ্যোতিষ্কের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সমাজে শুধু বলিষ্ঠ জগমোহনের বাস বলিলে ভুল হইবে, তাঁহার 'উল্টা প্রকৃতির' ভাই নির্বিরোধ, প্রবলের ভক্ত, স্নেহকাতর, ভীরুস্বভাব হরিমোহনও তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া 'দিব্য বাঁচিয়া' আছেন; অতিরিক্ত আদরে নষ্ট কোপনস্বভাব, চরিত্রহীন, দুলাল পুরন্দরও এই সমাজে বাস করিয়াই বিবাহের চতুঃসীমানার বাহিরে অভিযান চালান এবং ইঁহারই বিরুদ্ধে তাহার স্ত্রী অধ্যবসায় সহকারে প্রতিবাদ জানাইতে কসুর করে না। বিধবা ননীবালাও আপনার নারীহৃদয়ের দুর্লভ ধন এক অপদার্থের চরণে সমর্পণ করিয়া দেউলিয়া হইয়া এই সমাজেই বাঁচিয়াছিল। ভালয় মন্দে, শক্তিতে দুর্ব্বলতায় ভরা এই যে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ ইহার কোলেই শচীশের জন্ম এবং এই সমাজেই জ্যাঠামশায়ের শিষ্য-সাহচর্য্যে সে মানুষ হইয়াছে। আত্মানুসন্ধানী শচীশকে বুঝিতে হইলে তাহার জীবনে এই জ্যাঠামশায়ের স্থান এবং প্রভাব স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক। মূল বিষয়বস্তু বুঝিবার জন্য

'জ্যাঠামশায়' অংশে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলা হইয়াছে। কোন কিছু বাদ পড়িয়া যায় নাই যাহাতে ইহাকে fragmentary বলা যাইতে পারে। এখানে একটি আপত্তির উল্লেখ করি। কিছুকাল পূর্ব্বে কথাপ্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক "চতুরঙ্গে"র কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন যে বইখানিতে ত্রুটি রহিয়াছে এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিলেন যে ননীবালা আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে যে চিঠিখানা রাখিয়া যায় তাহাতে লেখা আছে "...কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই।......" এই তাঁকে ভুলিতে না পারার জন্যই ননীবালা শচীশকে বিবাহ করিতে সক্ষম হয় নাই। এই "তাঁকে" কাহাকে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে সম্বন্ধে উপরোক্ত লেখক মহাশয়ের মনে সংশয় আছে। আমার ধারণা ছিল এই "তাঁকে" যে পুরন্দরের উদ্দেশ্যে লেখা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না ; সে কথা বলিলে তিনি বলিলেন যে ননীবালা 'বিধবা' ছিল, সে তাহার স্বামীরও তো উল্লেখ করিতে পারে।

যে পুরন্দর তাহাকে লাথি মারিয়া অর্দ্ধরাত্রে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল সে পুরন্দরের প্রতি এত প্রেমে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতে-ছিলেন না, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে সে পুরন্দরকে ভালবাসিয়াছে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্ট নন এবং আমাদের সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে এবং হইয়াছে, অতএব তাঁহার এখানে একটু ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। এ কথার উত্তর আছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এ বিষয়ে অনেকের সংশয় উপস্থিত হইতে পারে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের ত্রুটী নাও হইতে পারে। প্রথমতঃ, ননীবালার স্বামীর সঙ্গে "চতুরঙ্গ" উপন্যাসের কোন সম্পর্ক নাই, তাহার কথা আমরা জানিনা, তাহার সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল জন্মিতে পারে এমন কোন ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দেন নাই। ননীবালার মৃত স্বামী উপন্যাসের পক্ষেও মৃত। দ্বিতীয়তঃ, যদি কাহারও মনে কিছু সংশয় থাকে তবে শচীশের 'ডায়ারী'র উল্লেখ করিলেই তাহার নিরসন হইবে : "ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি,—অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল...।" ননীবালা পুরন্দরের সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিল এবং পুরন্দর 'অপবিত্র' এবং 'পাপিষ্ঠ এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, ননীবালার স্বামী পাপিষ্ঠ কি

পুণ্যাত্মা তাহা "চতুরঙ্গ" পাঠকের জানিবার উপায় নাই। যে পুরুষকে একবার হৃদয় দান করিয়াছে, তাহার বর্ব্বর অত্যাচারে ভীত হইয়াছে কিন্তু তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, ঘৃণা করিতে অক্ষম হইয়াছে, এমন নারীর দৃষ্টান্ত কি বাঙ্গালী সাহিত্যে এবং সমাজে বিরল? রবীন্দ্রনাথেরই "বিচারক" গল্পেই কি এমন নারীর দৃষ্টান্ত মিলে না? রবীন্দ্রনাথ নিজেও "চতুরঙ্গে"ই এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে মেয়েরাই এমন পশুর জন্য আপনার বরণমালা গাঁথে যে-লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে। ইহা অন্ততঃ মনস্তত্ত্ব বিরোধী নয় এবং অস্বাভাবিক নয়। জীবনে ইহা অহরহই ঘটিয়া থাকে।

(৩)

"চতুরঙ্গে"র চারি অংশ সবুজপত্রের চারিটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। চারি অংশ একত্র ভাবে পুথির আকারে যখন দেখা দিল তখন কতক অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই পরিত্যক্ত অংশগুলিসহ "চতুরঙ্গে"র সম্পূর্ণ কোনও সংস্করণ আজও বাহির হয় নাই। এই পরিত্যাগ সর্ব্বত্রই উপন্যাসের পক্ষে ভাল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। লীলানন্দ স্বামীর চিত্রটা উপন্যাসে অত্যন্ত ছায়াময়, অবশ্য শচীশের প্রয়োজনেই লীলানন্দ স্বামীর সৃষ্টি, এই হিসাবে লীলানন্দ স্বামী অপ্রধান চরিত্র, তথাপি লীলানন্দ স্বামী উপন্যাসের পৃষ্ঠার অনেকগুলি পাতা জুড়িয়া আছেন, পরিত্যক্ত অংশে লীলানন্দ স্বামীর চেহারার যে বর্ণনা আছে তাহা পরিত্যাগ না করিলেই বোধহয় ভাল হইত, অন্তত তাঁহার চিত্রটা আরও একটু স্পষ্ট হইত। সবুজপত্রে যে আকারে উপন্যাসখানা বাহির হইয়াছিল সেই আকারে চতুরঙ্গের একটা সংস্করণ বাহির করার বোধহয় প্রয়োজন রহিয়াছে। মাসিক কাগজে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য "চতুরঙ্গে"র প্রথম অংশে বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান। "জ্যাঠামশায়" অংশ পড়িলে মনে হইবে ইহা স্বয়ং-সম্পূর্ণ; এবং শুধু এইটুকু লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহাকে একটি ছোট গল্প বলিয়া চালাইলে ইহা আংশিকত্বদোষহীন একটি আদর্শ ছোটগল্প হইত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও "জ্যাঠামশায়" হইতে "শচীশে" যাইতে কোন বেগ পাইতে হয় না

তথাপি "শচীশের" সাহায্য ছাড়াই "জ্যাঠামশায়" দাঁড়াইতে এবং স্থিতি লাভ করিতে পারে। "শচীশ" "দামিনী" "শ্রীবিলাস" এই তিন অংশ আরও অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত। উপন্যাসটি সমগ্রভাবে বিচার করিতে গেলে বলিতে হইবে "জ্যাঠামশায়" অংশ উপক্রমণিকা, "শচীশ" "দামিনী" অংশ মূল উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল,"শ্রীবিলাসে" উপন্যাসের সমাপ্তি। এই হিসাবে "চতুরঙ্গ" নামও যেমন সার্থক তাহার কলাকৌশলও সার্থক। "জ্যাঠামশায়" অংশ শেষ হইয়া "শচীশ" আরম্ভ হইল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর শচীশের অবস্থা হইল, 'হাল ভাঙ্গা নৌকার মত।' 'জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু পাইয়াছে এবং তার মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু দিয়াছে।' তাঁহার মৃত্যু প্রথমটা যেন শচীশেরও পরম মৃত্যু বহন করিয়া আনিল।

'একভাবে যাহা "না" আর একভাবে তাহা যদি "হাঁ" না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে'। মনে হইল শচীশের সমস্ত জগৎও যেন জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুরূপ ছিদ্র দিয়া গলিয়া গেল। সে অদৃশ্য হইল এবং দুই বৎসর পর সংবাদ আসিল যে লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে 'কীর্ত্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।' শ্রীবিলাস ইহাতে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, আহত অনুভব করিল এবং শচীশের সঙ্গে দেখা করিবার উদ্দেশ্যে লীলানন্দ স্বামীর কাছে পৌঁছিল এবং ক্রমে সেও শচীশের সঙ্গে লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইখানে শচীশের সঙ্গে শ্রীবিলাসের পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলিয়াছেন, "শচীশের জীবনের কোন এক অংশের বিস্তৃত আলোচনা বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নাই, কারণ শচীশ কোনও একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্র নহে, সে মানবের রসানুসন্ধিৎসার প্রতীক্।" বিস্তৃত আলোচনা বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ "চতুরঙ্গে" বিরল। সুবোধবাবু এই গ্রন্থের যাহাদিগকে "রক্তমাংসের গড়ামানুষ" বলিয়াছেন তাহারা অর্থাৎ ননীবালা, দামিনী, লীলানন্দস্বামী, শ্রীবিলাস এদের সম্বন্ধেও শচীশের চেয়ে বিস্তৃত আলোচনা নাই। বিস্তৃত আলোচনা বা বিশ্লেষণ অভাবে ইহারাও যেমন রক্তমাংসে গড়া মানুষ শচীশও তেমনি। শচীশের কাছে অক্ষেরা 'আইডিয়া'

মাত্র হইতে পারে কিন্তু "চতুরঙ্গ" উপন্যাসের শচীশ শুধু 'আইডিয়া' নয়, শুধু 'প্রতীক' নয়। শচীশের একটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে, তবে সে বৈশিষ্ট্য তাহার নিজস্ব। সে অরূপের দাবী স্বীকার করিয়া নিয়াছে কিন্তু রূপকে অগ্রাহ্য করে নাই, অন্যান্য দশজন সামাজিক জীবের যে বৈশিষ্ট্য তাহা তাহার চরিত্রেও পাই। তাহাকে শুধু 'প্রতীক' বলিলে তাহার প্রতি এবং উপন্যাস-স্রষ্টার প্রতি অবিচার করা হয় বলিয়া আমার মনে হয়।

সুবোধবাবু যদিও শচীশকে "রসানুসন্ধিৎস্যার প্রতীক" বলিয়াছেন তবু ইহা যে সম্পূর্ণ রূপক নয় তাহা অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন: "কবির এই চিত্রে রূপ ও অরূপের সংঘর্ষ অপরূপ অভিব্যক্তি পাইয়াছে, ইহা নিছক রূপক নহে, আবার শুধু কাহিনীমাত্র নহে।" আমাদের কাছে কিন্তু "চতুরঙ্গ" মোটেই 'রূপক' মনে হয় নাই। শচীশ শ্রীবিলাসের মত বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, জ্যাঠামশায়ের মত বুদ্ধি এবং কর্ম্মযোগে বিশ্বাসী নয়, তাই তাহার সূক্ষ্ম সত্তা সাধারণ পাঠকের কাছে ততটা স্থূলভাবে স্পষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ শচীশকে কখনই শুধু একটা প্রতীক্ বলিয়া কল্পনা করেন নাই। তিনি শচীশকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন শ্রীবিলাসের সঙ্গে তুলনায় বৈপরীত্যে। শচীশ 'না'-এর শূন্য ভরাইবার জন্য 'হাঁ' খুঁজিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে লীলানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ পায় এবং যে নিষ্ঠা সহকারে বা সে জ্যাঠা-মশায়ের শিষ্যত্বে আপনার সার্থকতা খুঁজিয়াছিল সেই নিষ্ঠা লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্বেও সে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

নিজেকে একটা সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাহার আত্মার শান্তি মিলিতেছিল না। সে বন্ধুর খোঁজে আসিয়া বন্ধুবাৎসল্যের টানে লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নাই। নিজেকে রাখিয়া ঢাকিয়া ভাগ করিয়া সে এই নূতন সত্যে আত্ম-সমর্পণ করিতে চেষ্টা করে নাই। শ্রীবিলাস সাদা চোখে বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখিয়া রসের সাগরে ডুব দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইহার মধ্যে আপনাকে হারাইতে চায় নাই। শ্রীবিলাসের সঙ্গে শচীশের এই বৈপরীত্য দ্বারা শচীশের আত্মানুসন্ধানের বিপুল ব্যাকুলতা আমরা বুঝিতে পারি। শ্রীবিলাস চরিত্র সমস্ত উপন্যাস বুঝিবার পক্ষে যেমন প্রয়োজন তেমনি বিশেষ করিয়া শচীশকে বুঝিবার পক্ষেও অত্যাবশ্যক। বুদ্ধিতে

শচীশ শ্রীবিলাসের চেয়ে ন্যূন ছিল না, তথাপি শচীশের যুক্তির অসারতা বুঝিতে শ্রীবিলাসের বিলম্ব হয় নাই। সে বুঝিয়াছিল "তর্কের কর্ম্ম নয়"। কেন না শচীশ বুদ্ধিকে জাগ্রত, স্বতন্ত্র রাখিয়া রসের সাগরে ডুব দেয় নাই।

তাহার জীবনে শ্রীবিলাসের মত বুদ্ধিই তখন প্রধান নয়। বলাবাহুল্য শচীশ তখন ও ভয়াবহ পরধর্ম্মে চলিয়া ভুলই করিতেছে। হয়ত সত্যের কঠিন পথ ভুলের কণ্টকেই ভরা থাকে বলিয়া। কিন্তু 'পরধর্ম্মো ভয়াবহ' এই সত্য বুঝিবার পূর্ব্বেই দামিনী আসিয়া রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইল। এই দামিনী ননীবালা নয়, অর্থাৎ নূতন শিক্ষার আলোক তাহার দ্বারে আসিয়াছে, তাহাকে আত্মসম্মানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ এবং সাহস দিয়াছে, অন্যায়কে অস্বীকার করিয়া তাহাকে আঘাত করিয়া প্রতিশোধ লইতে শিখিয়াছে। ননীবালা এবং দামিনী যে তাহাদের প্রতি অন্যায়কে যথাক্রমে স্বীকার এবং অস্বীকার করিতে প্রস্তুত ইহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের বিভিন্নতাই যে শুধু প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের দুই পুরুষে নারীত্বের বিভিন্ন আদর্শও ব্যক্ত করা হইয়াছে। দামিনী স্থূল অত্যাচারী প্রণয়ীকে আজও ভুলিতে পারে নাই বলিয়া অন্য পুরুষকে বিবাহে অনিচ্ছুক হইত কি না সন্দেহ। "ভক্তির দস্যুবৃত্তি" দামিনীকে বিদ্রোহী হইতে শিখাইয়াছে। এই বিদ্রোহী দামিনীকে লইয়া লীলানন্দ স্বামী বিপদে পড়িলেন। তাঁহার আদর্শে, কথায় এবং কার্য্যে অবজ্ঞা দেখানোই যেন বিধবা জীবনে দামিনীর একমাত্র কর্ত্তব্য। এমন সময় শচীশ এবং শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর দেখা হইল। তারপরই "অঘটন" ঘটিতে সুরু হইল। এই অঘটনের ইতিহাস তিনটি অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম শচীশের প্রতি দামিনীর আকর্ষণ এবং শচীশের সেই দিকে লক্ষ্যহীনতা। গুহার দৃশ্যে দামিনীর ব্যর্থতায় এই অংশে ছেদ পড়িল। দ্বিতীয় অংশে দামিনীর শচীশকে ভুলিবার চেষ্টা, শচীশের প্রতি উদাসীনতার এবং শ্রীবিলাসের প্রতি আকর্ষণের ভান, শচীশের দামিনীর প্রতি আকর্ষণ এবং চিত্তচঞ্চলতা। তৃতীয় অংশে শচীশের সমুদ্রতীরে গমন, কিছুকাল পর গৃহে প্রত্যাগমন, দামিনীর সঙ্গে মিটমাট, দামিনীর স্বাভাবিক ভাবে চলিতে

প্রতিশ্রুতি দান। কিন্তু ইহাতেও শচীশের আত্মা শান্তি পাইল না। এতদিন দামিনীর মাধুর্য্য সে দেখিয়াছে, দামিনীকে দেখে নাই, তাহার "প্রণতি টুকু আপনার রস সাধনার মসলার মত ব্যবহার করিয়া ছিল"। এবার দামিনীকে এত বেশী করিয়া দেখিতে লাগিল যে "তাকে কোন মতেই একটা ভাবরসের রূপকমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না," এমন সময় নবীনের স্ত্রী বিষ খাইয়া মরিল। এই মৃত্যু শচীশ এবং দামিনীর এই গতদিনগুলির সম্পর্কের পরিণতির মূর্ত্তিটি দামিনীর সামনে স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া দিল। দামিনী বুঝিতে পারিল, যে-পথে সে চলিয়াছে সে পথ কল্যাণ আনিবে না, এই রসের পথে চলিতে বিমুখ হইয়া শচীশের কাছে সে শিষ্যত্ব যাচ্ঞা করিল, বলিল, "তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিষ যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না"।

বোধহয় নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শচীশ দামিনীর সম্পর্কের ভিতরে সমালোচকের সংশয় ঢুকে নাই। কিন্তু শচীশ যেই দামিনীর আকুল প্রার্থনায় তাহার গুরু হইতে রাজী হইল তখনই সমালোচক প্রশ্ন তুলিয়াছেন। আমার মনে হয় শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের পরস্পরের আকর্ষণ বিকর্ষণে জীবনের এই যে তরঙ্গ লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল, সেই তরঙ্গ আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে যে জীবন কাব্য রচনা করিলেন তাহার তুলনা মিলে না। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই জায়গাটায়ই বিশিষ্ট সমালোচকেরা বাধা পাইয়াছেন। শ্রীকুমার বাবু শচীশ-দামিনীর সম্পর্কের পরিবর্ত্তনের অতর্কিততায় একটা নিয়মহীন উদ্দাম খেয়ালের সন্ধান পাইয়াছেন। শুধু শ্রীকুমার বাবু নন, পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট লেখকও শচীশের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ দেওয়া চলিল না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্তব্যে প্রথমটা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং শ্রীকুমার বাবু যদিও এই কথা বলেন নাই তবু মনে হইয়াছে শচীশ দামিনীর বিবাহ হইলে হয়ত তিনিও তাহাদের সম্পর্কে অতর্কিত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া নালিশ জানিতেন না। যেখানে নর-নারীর অব্যক্ত আকর্ষণ, উদাসীনতার ভান, ঈর্ষ্যার ভ্রুকুটী সেখানে যদি ব্যাপারটা শেষ

যেখানে বিরাট শক্তির (greatness of power) প্রকাশ সেখানেই sublimity। হিমালয় পর্ব্বতে বিরাট শক্তির প্রকাশ আছে বলিয়াই তাহা sublime, টুর্গনিভের গল্পের চড়ুই পাখী * ক্ষুদ্র হইলেও সন্তানকে রক্ষা করিতে গিয়া কুকুরের সঙ্গে লড়াই করিয়া প্রাণ দিয়া যে বিরাট মাতৃশক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সে sublime হইয়াছে। "চতুরঙ্গে" শচীশের যে বিরাট ব্যাকুলতা, তাহার যে নিদারুণ অন্তঃর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে মানুষের কি বিশালতা, মানবাত্মার কি বিপুল গভীর শক্তি, প্রকাশ পাইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিলে "চতুরঙ্গ"কে great বলিতে কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নয়। শ্রীবিলাস তাহার অতিশয় সংযত ভাষায় যে দ্বন্দ্বের চেহারা আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলে ব্যাপারটা বোঝা হয়ত কঠিন হইবে না। "যাই বল আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। এক দিন তো এ জিনিষটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন, আর যাই হোক, হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুণ। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চ্যালাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন অদ্ভুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কি হইবে—স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর এক দিক পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল।" (১১৪ পৃঃ) "এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।" (১১৫ পৃঃ) "শচীশের খাওয়া নাই, শোওয়া নাই, কখন কোথায় থাকে হুঁস থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি শান দেওয়া ছুরির মত সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত, আর সহিবে না। তবু আমি তাকে

---

* The sublimity of the sparrow, then, no less than that of the sky or sea, depends on exceeding or overwhelming greatness—a greatness, howevea, not of extension but rather of strength, or power, and in this case, of spiritual power.

ঘাঁটাইতে সাহস করিতাম না"। ('১১৬—১১৭ পৃঃ) "সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া খাওয়ার ঠিক ঠিকানা রহিল না, কখন যে তাহার মনের ঢেউ আলোর দিকে ওঠে, কখন যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মত বেশ খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন"। (১২৫ পৃঃ) অবশেষে ঝড়ের রাত্রে নদীর ধারে যখন দামিনী শচীশের কাছে কাঁদিয়া কহিল, তুমি ঘরে চল তখন "শচীশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল—যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।" (১২৯ পৃঃ)

এই কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া যে শচীশের ছবি শ্রীবিলাস আঁকিয়াছে তাহাকে আমি sublime বলি, যে-ভাষা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন 'লঘু চটুলতা' বলিতে যাহা বুঝি তাহার বিপরীত বলিয়া মনে করি : এখানে 'চতুরঙ্গের" ভাষা মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ কাব্যের বাহন হইয়াছে। নীলকুঠির বর্ণনায় শ্রীকুমার বাবু "আশ্চর্য্য রকমের কবিত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনা শক্তির সন্ধান" পাইয়াছেন। তার চেয়েও মহত্তর, গভীরতর কাব্যের সন্ধান শচীশের অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং তাহার বিরাট উপলব্ধির গভীর ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যে পাইয়াছি ; তাহা poetry of nature নয়, তাহা poetry of the human soul। নীলকুঠি বর্ণনার কাব্য গৌণ, "চতুরঙ্গের" কথা শচীশের জীবনের বৃহত্তর, মহত্তর এবং গভীরতর কাব্য।

শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী

কিন্তু আমার তো মনে হয় এইরূপ লঘুতা দ্বারাই সে যে অন্য দশটা সাধারণ মানুষের মত নয়, সাধারণের অনেক উপরের তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। অন্ততঃ আমার এই মতের সমর্থন শ্রীকুমার বাবু না করিলেও দামিনী করিয়াছে। উত্তরে সে বলিয়াছে, "তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।" বাস্তবিক দামিনী যে শ্রীবিলাসকে সত্যরূপে শেষ পর্য্যন্ত চিনিতে পারিল, তাহাকে পাইবার প্রার্থনা জানাইল ইহাতে রসবোদ্ধা পাঠকের কাছে তাহার মূল্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। রবীন্দ্রনাথ কাহারও প্রতি অবিচার করেন নাই। একটি পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে শচীশ দামিনী শ্রীবিলাসের জীবন সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

(৪)

'তবু "চতুরঙ্গ"কে আমি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি মনে করি না……' চতুরঙ্গ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পর এই বলিয়া নীহার বাবু শেষ প্যারাগ্রাফ আরম্ভ করিয়াছেন। নীহার বাবু সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু বলিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি, কেন না তাঁহার সদ্য প্রকাশিত "রবীন্দ্র সাহিত্য ভূমিকা"য় তিনি যে রসবোধ এবং রসবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুগভীর। বিশেষতঃ "চতুরঙ্গের" সমালোচনায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার শেষ প্যারাগ্রাফ ছাড়া প্রায় সমস্ত স্থানেই আমি তার সঙ্গে একমত। এবং শুধু একমত বলিয়া নয়, এজন্যও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি যে তাঁহার মত তিনি অতিশয় সুন্দর ভাবে, সার্থক ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিস্মিত হইয়াছি "চতুরঙ্গে"র সৌন্দর্য্য এমন নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াও তিনি ইহাকে 'মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি' মনে করিতে পারেন নাই। 'মহৎ' শব্দটা এখানে কি অর্থে নীহার বাবু ব্যবহার করিয়াছেন সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। যদি ইংরেজি noble শব্দ ইহার প্রতিশব্দ হিসাবে ধরা যায় তবে একথা বলা চলে যে "চতুরঙ্গ" আর যাহাই হউক না কেন, ইহার সম্বন্ধে 'মহৎ' শব্দটা নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা যায়। শচীশের আত্মানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষাকে মহৎ ছাড়া আর কি বলিব? যদি নীহার বাবুর মতে "চতুরঙ্গ", 'সুন্দর ও

সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি' হইয়া থাকে এবং যদি এই সাহিত্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে ইহাকে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি মনে না করার কি হেতু রহিয়াছে? কিন্তু হয়ত noble অর্থে 'মহৎ' শব্দটা এখানে নীহার বাবু ব্যবহার করেন নাই। পরের লাইনেই তিনি বলিতেছেন, 'ইহার বস্তু-ভূমির গভীরতা আছে প্রসার নাই, মানব সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন তরঙ্গ-লীলার সঙ্গে ইহার যোগ নাই। ইহার জীবন-দর্শন খণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপন্যাসে লাগে নাই"। 'গভীরতা আছে প্রসার নাই'—ইহা হইতে মনে হয় তিনি মহৎ শব্দটা বৃহৎ বা great অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা সুদূর-প্রসারী তাহা মহৎ না হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ হইতে বাধ্য, হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতাকে বা বিস্তারকে noble না বলিলেও হয়ত চলিতে পারে কিন্তু বিরাট বা great বলিতেই হইবে। আমার মনে হয় আয়তন বুঝাইতে গিয়াই এইখানে নীহার বাবু 'মহৎ' শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছেন। যে কথা নীহার বাবু বলিতে চাহিয়াছেন তাহা হয়ত এই যে চতুরঙ্গের epic greatness নাই। বলা বাহুল্য ইহাই যদি তাঁহার বক্তব্য হইয়া থাকে তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। চতুরঙ্গে বাস্তবিকই epic qualityর প্রকাশ নাই, পুর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে ইহা সংক্ষেপধর্ম্মী, বিক্ষেপধর্ম্মী নয়, সঙ্কেতধর্ম্মী বিশ্লেষণধর্ম্মী নয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ "চতুরঙ্গে" epic quality প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, তাঁহার রচিত "গোরা" এবং "যোগাযোগ" উপন্যাসে বরং epic quality'র একটা আভাষ মিলে কিন্তু "চতুরঙ্গে" তাহা মেলে না। কিন্তু epic নয় বলিয়া ইহা great বা মহৎ নয় একথা বলিলে তাহা যুক্তিসহ স্বীকার করিতে পারি না। কেন না greatness বা মহৎ শুধু epic গুণসম্বলিত সাহিত্যেই বর্ত্তমান অন্য কোন গুণবিশিষ্ট সাহিত্যে নাই একথা সত্য নয়, স্বীকৃতও নয়। নিজেদের ভাল লাগা মন্দ লাগার চেয়ে ও বিদেশী authority'র মূল্য আমাদের দেশে এখনও বেশী, তাই একটি বিশিষ্ট বিদেশী সমালোচকের সাহায্য গ্রহণ করিতেছি। Prof. A. C. Bradley তাঁহার Oxford Lecture on Poetry গ্রন্থে "The Sublime" প্রবন্ধে টুর্গেনিভের একটি গদ্য কাব্য উল্লেখ করিয়া তাহাকে sublime আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন শুধু বিস্তৃতি বা আয়তনে greatness বা sublimity বোঝায় না,

কিন্তু আমার তো মনে হয় এইরূপ লঘুতা দ্বারাই সে যে অন্য দশটা সাধারণ মানুষের মত নয়, সাধারণের অনেক উপরের তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। অন্ততঃ আমার এই মতের সমর্থন শ্রীকুমার বাবু না করিলেও দামিনী করিয়াছে। উত্তরে সে বলিয়াছে, "তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।" বাস্তবিক দামিনী যে শ্রীবিলাসকে সত্যরূপে শেষ পর্য্যন্ত চিনিতে পারিল, তাহাকে পাইবার প্রার্থনা জানাইল ইহাতে রসবোদ্ধা পাঠকের কাছে তাহার মূল্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। রবীন্দ্রনাথ কাহারও প্রতি অবিচার করেন নাই। একটি পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে শচীশ দামিনী শ্রীবিলাসের জীবন সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

(৪)

'তবু "চতুরঙ্গ"কে আমি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি মনে করি না……' চতুরঙ্গ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পর এই বলিয়া নীহার বাবু শেষ প্যারাগ্রাফ আরম্ভ করিয়াছেন। নীহার বাবু সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু বলিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি, কেন না তাঁহার সদ্য প্রকাশিত "রবীন্দ্র সাহিত্য ভূমিকা"য় তিনি যে রসবোধ এবং রসবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুগভীর। বিশেষতঃ "চতুরঙ্গের" সমালোচনায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার শেষ প্যারাগ্রাফ ছাড়া প্রায় সমস্ত স্থানেই আমি তার সঙ্গে একমত। এবং শুধু একমত বলিয়া নয়, এজন্যও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি যে তাঁহার মত তিনি অতিশয় সুন্দর ভাবে, সার্থক ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিস্মিত হইয়াছি "চতুরঙ্গে"র সৌন্দর্য্য এমন নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াও তিনি ইহাকে 'মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি' মনে করিতে পারেন নাই। 'মহৎ' শব্দটী এখানে কি অর্থে নীহার বাবু ব্যবহার করিয়াছেন সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। যদি ইংরেজি noble শব্দ ইহার প্রতিশব্দ হিসাবে ধরা যায় তবে একথা বলা চলে যে "চতুরঙ্গ" আর যাহাই হউক না কেন, ইহার সম্বন্ধে 'মহৎ' শব্দটী নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা যায়। শচীশের আত্মানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষাকে মহৎ ছাড়া আর কি বলিব? যদি নীহার বাবুর মতে "চতুরঙ্গ", 'সুন্দর ও

সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি' হইয়া থাকে এবং যদি এই সাহিত্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে ইহাকে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি মনে না করার কি হেতু রহিয়াছে? কিন্তু হয়ত noble অর্থে 'মহৎ' শব্দটী এখানে নীহার বাবু ব্যবহার করেন নাই। পরের লাইনেই তিনি বলিতেছেন, 'ইহার বস্তু-ভূমির গভীরতা আছে প্রসার নাই, মানব সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন তরঙ্গ-লীলার সঙ্গে ইহার যোগ নাই। ইহার জীবন-দর্শন খণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপন্যাসে লাগে নাই"। 'গভীরতা আছে প্রসার নাই'—ইহা হইতে মনে হয় তিনি মহৎ শব্দটী বৃহৎ বা great অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা সুদূর-প্রসারী তাহা মহৎ না হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ হইতে বাধ্য, হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতাকে বা বিস্তারকে noble না বলিলেও হয়ত চলিতে পারে কিন্তু বিরাট বা great বলিতেই হইবে। আমার মনে হয় আয়তন বুঝাইতে গিয়াই এইখানে নীহার বাবু 'মহৎ' শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন। যে কথা নীহার বাবু বলিতে চাহিয়াছেন তাহা হয়ত এই যে চতুরঙ্গের epic greatness নাই। বলা বাহুল্য ইহাই যদি তাঁহার বক্তব্য হইয়া থাকে তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। চতুরঙ্গে বাস্তবিকই epic qualityর প্রকাশ নাই, পুর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে ইহা সংক্ষেপধর্ম্মী, বিক্ষেপধর্ম্মী নয়, সঙ্কেতধর্ম্মী বিশ্লেষণধর্ম্মী নয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ "চতুরঙ্গে" epic quality প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, তাঁহার রচিত "গোরা" এবং "যোগাযোগ" উপন্যাসে বরং epic quality'র একটা আভাষ মিলে কিন্তু "চতুরঙ্গে" তাহা মিলে না। কিন্তু epic নয় বলিয়া ইহা great বা মহৎ নয় একথা বলিলে তাহা যুক্তিসহ স্বীকার করিতে পারি না। কেন না greatness বা মহৎ সুধু epic গুণসম্বলিত সাহিত্যেই বর্ত্তমান অন্য কোন গুণবিশিষ্ট সাহিত্যে নাই একথা সত্য নয়, স্বীকৃতও নয়। নিজেদের ভাল লাগা মন্দ লাগার চেয়ে ও বিদেশী authority'র মূল্য আমাদের দেশে এখনও বেশী, তাই একটি বিশিষ্ট বিদেশী সমালোচকের সাহায্য গ্রহণ করিতেছি। Prof. A. C. Bradley তাঁহার Oxford Lecture on Poetry গ্রন্থে "The Sublime" প্রবন্ধে টুর্গেনিভের একটি গদ্য কাব্য উল্লেখ করিয়া তাহাকে sublime আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন শুধু বিস্তৃতি বা আয়তনে greatness বা sublimity বোঝায় না,

যেখানে বিরাট শক্তির (greatness of power) প্রকাশ সেখানেই sublimity। হিমালয় পর্ব্বতে বিরাট শক্তির প্রকাশ আছে বলিয়াই তাহা sublime, টুর্গনিভের গল্পের চড়ুই পাখী * ক্ষুদ্র হইলেও সন্তানকে রক্ষা করিতে গিয়া কুকুরের সঙ্গে লড়াই করিয়া প্রাণ দিয়া যে বিরাট মাতৃশক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সে sublime হইয়াছে। "চতুরঙ্গে" শচীশের যে বিরাট ব্যাকুলতা, তাহার যে নিদারুণ অন্তঃর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে মানুষের কি বিশালতা, মানবাত্মার কি বিপুল গভীর শক্তি, প্রকাশ পাইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিলে "চতুরঙ্গ"কে great বলিতে কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নয়। শ্রীবিলাস তাহার অতিশয় সংযত ভাষায় যে দ্বন্দ্বের চেহারা আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলে ব্যাপারটা বোঝা হয়ত কঠিন হইবে না। "যাই বল আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। এক দিন তো এ জিনিষটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন, আর যাই হোক, হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুণ। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চ্যালাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন অদ্ভুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কি হইবে—স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর এক দিক পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল।" (১১৪ পৃঃ) "এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।" (১১৫ পৃঃ) "শচীশের খাওয়া নাই, শোওয়া নাই, কখন কোথায় থাকে হুঁস থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি শান দেওয়া ছুরির মত সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত, আর সহিবে না। তবু আমি তাকে

* The sublimity of the sparrow, then, no less than that of the sky or sea, depends on exceeding or overwhelming greatness—a greatness, howevea, not of extension but rather of strength, or power, and in this case, of spiritual power.

ঘাঁটাইতে সাহস করিতাম না"। (১১৬—১১৭ পৃঃ) "সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া খাওয়ার ঠিক ঠিকানা রহিল না, কখন যে তাহার মনের ঢেউ আলোর দি:কে ওঠে, কখন যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মত বেশ খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন"। (১২৫ পৃঃ) অবশেষে ঝড়ের রাত্রে নদীর ধারে যখন দামিনী শচীশের কাছে কাঁদিয়া কহিল, তুমি ঘরে চল তখন "শচীশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল—যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।" (১২৯ পৃঃ)

এই কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া যে শচীশের ছবি শ্রীবিলাস আঁকিয়াছে তাহাকে আমি sublime বলি, যে-ভাষা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন 'লঘু চটুলতা' বলিতে যাহা বুঝি তাহার বিপরীত বলিয়া মনে করি: এখানে "চতুরঙ্গের" ভাষা মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ কাব্যের বাহন হইয়াছে। নীলকুঠির বর্ণনায় শ্রীকুমার বাবু "আশ্চর্য্য রকমের কবিত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনা শক্তির সন্ধান" পাইয়াছেন। তার চেয়েও মহত্তর, গভীরতর কাব্যের সন্ধান শচীশের অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং তাহার বিরাট উপলব্ধির গভীর ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যে পাইয়াছি; তাহা poetry of nature নয়, তাহা poetry of the human soul। নীলকুঠি বর্ণনার কাব্য গৌণ, "চতুরঙ্গের" কথা শচীশের জীবনের বৃহত্তর, মহত্তর এবং গভীরতর কাব্য।

শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৫)

আরব ও তুরষ্ক আক্রমণের সময়ে দেশের পতিতের দল কেন বিদেশীকে সাহায্য করিল তাহার মনস্তত্ত্বের অনুধাবন প্রয়োজন। আজকালকার স্বদেশ-প্রেমিকতার মাপকাঠিতে আমরা তাহাদের "দেশদ্রোহী," 'বিভীষণের দল,' 'বিশ্বাসঘাতক' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা অভিযুক্ত করিতে পারি বটে, কিন্তু কেন এই অনুষ্ঠান সংঘটিত হইল তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিন কাসেমের কাছে জাঠ ও মেডেরা যে মনোবেদনা (Lane-Poole—History of Mediaeval India; Kanungo—History of the Jats দ্রষ্টব্য) জ্ঞাপন করিয়াছিল তাহার বহু পরে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক কবিতাতে আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি পাই! দেশের একদল লোক শাসকশ্রেণীর দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছিল,—ইহাই ছিল মূল কথা। বর্ণাশ্রম সমাজপদ্ধতি তাহাদের নিপীড়ন করিতেছিল, কাজেই এই যন্ত্রকে যাহারা পর্য্যুদস্ত করিতে পারে তাহাদের কাছেই পতিত ও নির্য্যাতিতেরা দৌড়াইয়াছিল! তাহারা বর্ণাশ্রম পদ্ধতিকে নিজেদের অনুকূল বা নিজেদের জিনিষ মনে করে নাই; কাজেই তাহার জন্য প্রাণত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আজকাল একদল শিক্ষিত লোক বলিতেছেন যে বর্ণাশ্রম সমাজ-পদ্ধতি শ্রেণী-বৈষম্য ও বর্ণ-বৈষম্য প্রভৃতির সমাধান করিয়া দেয়; এইজন্যই ভারতে কখন শ্রেণী-সংঘর্ষ হয় নাই। এই হেতু দেখাইয়া তাঁহারা অন্য সমাজ-পদ্ধতি অপেক্ষা বর্ণাশ্রম পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করিয়া বেড়ান। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় সমাজে শ্রেণী-সংঘর্ষ নানা আকারে চলিতেছে। যদি এই পদ্ধতি সমস্ত অসামঞ্জস্যের সমাধান করিয়া দেয়, তাহা হইলে প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাদ কেন হইয়াছিল? কেনই বা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের

আশ্রয় নেয়, কেনই বা পরে পতিতেরা বিদেশীয় ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করে? কেনই বা খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম সংস্কারক সম্প্রদায়সমূহ উত্থিত হয়?...কেনই বা দক্ষিণ ভারতে পতিতদের মধ্যে খৃষ্টান-ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিতেছে? বর্ণাশ্রম পদ্ধতি মানুষে মানুষে সামঞ্জস্য আনয়ন করিতে একান্ত অসমর্থ বলিয়াই এই সকল সামাজিক সংস্কার ও অনুষ্ঠান সংঘটিত হইতেছে। ইতিহাসের প্রতি নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টিপাত না করিয়া গোঁড়ামি করিয়া নিজের জিনিষের বড়াই করাকে শ্রেণী-স্বার্থ প্রণোদিত কার্য্য বলা যাইতে পারে।

এই প্রকারে কর্ণাটি সেনবংশের বাঙ্গলায় একচ্ছত্র রাজত্বের অবসান হয়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে আর এক শতাব্দী তাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেশব ও বিশ্বরূপ নামক লক্ষ্মণসেনের পুত্রদ্বয় যে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের তাম্রশাসন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় (১)।

সেন বংশের শেষ সংবাদ আমরা দনুজমাধবে প্রাপ্ত হই। ইনি দিল্লীর বাদশাহকে বাঙ্গলার বিদ্রোহী গভর্ণর টোগ্রলকে ধরিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি লইয়া বাদশাহের নিকট লোক পাঠাইবার সময় তিনি বলিয়া পাঠান যে তিনি সম্মান প্রদর্শনার্থ আগমন করিলে বাদশাহ যেন দণ্ডায়মান হন। গরজ বড় বালাই দেখিয়া বাদশাহও প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছিলেন (The Tarikh-i-Mubarakshahi—translated by K. K. Basu, Pp. 39-40)। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে ভোজ রায়, দানুজ, নৌজা প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন: কিন্তু বাঙ্গলার বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা ইঁহাকেও দনুজমাধব বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। ইনি মুসলমানের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিয়াও ব্রাহ্মণদের একবার সমীকরণ করেন ও তাহাদের জমি প্রদান করেন।

সেন বংশের শেষ সময়ে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিশেষ ভাবে প্রবল হইয়াছিল, কৃত্তিবাস পাঠেই তাহা বোঝা যায়—

> "পূর্ব্বেতে আছিল শ্রীদনুজ (বেদানুজ) মহারাজা
> তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।

১। বাঙ্গলার ইতিহাস—৩২৩ পৃঃ; Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, N. S. vol. X, P 102 দ্রষ্টব্য।

দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গ ভোগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার।"

এই বিষয়ে নগেনবাবু বলিয়াছেন—"যতদিন পূর্ব্ববঙ্গ সেন রাজবংশের শাসনাধীন ছিল, ততদিন পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল। প্রাচীন হিন্দু প্রথানুসারে অধিকাংশ গ্রামেই ব্রাহ্মণ গ্রামপতি ছিলেন; এক প্রকার তাঁহারাই দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, দেশের অধিপতি পর্য্যন্ত তাঁহাদের কথায় উঠিতেন বসিতেন" .(ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ; ৫৪ পৃঃ)। প্রাচীন প্রথানুসারে এই ব্রাহ্মণ গ্রামপতিরা (গ্রামাণী) নিম্নবর্ণের ও অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের লোকদের উপর যে অত্যাচার করিত না তাহা কে বলিল? হিন্দু ভারতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পর্টুগিস পর্য্যটক বার্বোসার উক্তি—যে বাঙ্গালীরা প্রতিনিয়ত মুসলমান হইতেছে তাহার কারণই এইস্থলে পাওয়া যাইবে।

•

মুসলমান যুগ

দ্বাদশ শতাব্দীতে তুরস্ক-মুসলমানের পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানকালের অনুসন্ধানের ফলে আমরা এই তথ্য পাই যে সমগ্র বাঙ্গলায় আধিপত্য বিস্তার করিতে তাহাদের তিন শতাব্দী লাগে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সম্রাট হুসেন সাহ উত্তর বঙ্গের কামাটপুর রাজ্য জয় করেন। আবার মধ্য-ভাগে রাজা গণেশ স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। পুনরায় এই সময়কার রাজা দনুজমর্দ্দন দেব ও তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রের টাকা (মুদ্রা) বাঙ্গলার চারিদিক হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে। তৎপর আমরা বাঙ্গলায় সামন্ততন্ত্রীয় বারভূঁঞাদের অভ্যুদয় নিরীক্ষণ করি। ইহারা মোগলাধিপত্যের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু মোগল আধিপত্যের কালে কেন্দ্রীভূত শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গলার সামন্ত-তান্ত্রিক যুগের অবসান করায়।

ইহা হইল রাজনীতিক সংবাদ। এক্ষণে জন ও গণের সংবাদ অনুসন্ধান করা যাউক। গৌড়ের সুলতানদের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতেরা

সমস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করিতেন। সুলতান ইলিয়াস সাহের জন্য হিন্দু ও মুসলমান সমানভাবে রণক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়াছে। একডালার যুদ্ধের সেনাপতি ছিল ব্রাহ্মণ জমিদার সহদেব যিনি রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন (২)। পরে মহারাজ যদু (৩) যখন তাঁহার সভাসদগণকে বলিয়াছিলেন যে তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন এবং সর্দ্দারদের এতদ্রূপে তাঁহার সিংহাসন আরোহন করিতে আপত্তি থাকিলে, তিনি সিংহাসন তাঁহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন, তখন হিন্দু ও মুসলমান সভাসদেরা একবাক্যে বলে যে তিনি যে ধর্ম্মেই বিশ্বাসবান হউন, তাহারা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিবে (ফেরিস্তা দ্রষ্টব্য)। বাদসাহ হুসেনসাহ হিন্দুর বাড়ীতে মানুষ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরা হিন্দু ছিলেন। ইনি চৈতন্যদেবকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। ইঁহার পরের বাদসাহ, বীরভদ্র গোস্বামীকে 'তুমি বড় ফকীর' বলিয়া সম্মান করেন (প্রেম বিলাস)। মুসলমান অভিজাতদের প্রচেষ্টায় রামায়ণ প্রভৃতি বাঙ্গলায় ভাষান্তরিত হয় এবং বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন হয়। হিন্দু ও মুসলমানের ভাবের আদান প্রদানের সম্পূর্ণ সংবাদ এখনও সংগৃহীত হয় নাই।

অন্যপক্ষে, গণ সাধারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উচ্চশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীয় লোক ও মুসলমানগণ একত্রিত হইয়া গণ সমূহের নিপীড়ন ও শোষণ করিতেছে। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন—"এই সময়ের রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের কুলগ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হইবে যে, তৎকালে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও মুসলমান রাজপুরুষগণের প্রচেষ্টায় রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমি হইতে বৌদ্ধ শ্রমণেরা সম্যক বিতাড়িত বা উৎসাদিত হইয়াছিলেন" (৪)।

মুসলমান শাসনের কাল হইতেই আমরা বৌদ্ধদের আর কোন সংবাদ পাই না। তাঁহারা এখন গেলেন কোথায়? ইউরোপীয় ভাষায় একটা কথা

২। নগেন্দ্রনাথ বসু—'ব্রাহ্মণকাণ্ড'; Tarikh-i-Mubarakshahi দ্রষ্টব্য।

৩। T. W. Arnold—'Preaching of Islam'—Spread of Islam in Bengal, P 228.

৪। নগেন্দ্রনাথ বসু—রাজন্যকাণ্ড, ১ম খণ্ড; ৩৬০ পৃঃ।

আছে—Religion follows the flag. (ধর্ম্ম রাজশক্তির অনুগমন করে)। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে গৌড় ও মগধে ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনরুত্থান করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীয় রাজাদের সময়ে অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মসমূহ পদদলিত বা সংখ্যাহীন হইতেছিল। তৎপর মুসলমান শাসনকালে গণস হ নানা-কারণ বশতঃ দলে দলে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে (৫)। কৃষকেরা খাজনার দায় হইতে রেহাই পাইবে বলিয়া নিজেদের মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এই প্রভাব বিদ্যমান থাকে (৬)। নাথ ধর্ম্মী ও বৌদ্ধদের একদল যেমন ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল, অপর একদল তেমন ব্রাহ্মণ্য সমাজের দিকে ঝুঁকিতে লাগি। লামা তারানাথের ইতিহাসেই তাহার ইঙ্গিত আছে। তিনি বলেন যে তুরস্ক আক্রমণের পর গোরক্ষনাথের সম্প্রদায় তীর্থিকদের সহিত মেশামেশি করিতে থাকে। তাহারা এই কারণ দেখায় যে এতদ্বারা তাহারা তুরস্কের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিবে। আসল কথা হইল এই যে, রাজশক্তির আশ্রয়ের অভাবে অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিদেশী মুসল-মানদের সাহায্য করার অপরাধ যেমন বৌদ্ধদের হয়, তদ্রূপ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ তাহারাই কিন্তু হয়! প্রাচীন কালের 'ব্রাত্য'প্রধান স্থানগুলি পরে বৌদ্ধ প্রধান হয় এবং এই প্রদেশগুলিই পরে মুসলমানপ্রধান হয়।

বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনকালের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান হইতেছে—চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থান। মুসলমান বিজয়ের পর, চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে উভয় ধর্ম্মের ভাবের সম্মিলনে নব-বৈষ্ণবধর্ম্মের ও সংস্কারক সম্প্রদায়-গুলির উত্থান হয়। বাঙ্গলায় সেই তরঙ্গের প্রতিধ্বনি আসিয়া গৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মরূপে বিস্তৃতি লাভ করে। এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হিন্দু মুসলমানকে এক প্রেমধর্ম্মে একত্রিত করা ("ব্রাহ্মণে যবনে মিলি করিতেছে কোলাকুলি, পরতেকে দেখ একবার"—দীন কৃষ্ণদাস)। পুনঃ এই ধর্ম্মে বর্ণ-বিভেদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করে ("জাতি বিচার নেই বৈষ্ণব বর্ণনে"— দেবকী নন্দন,

৫। T. W. Arnold—Preaching of Islam পৃঃ ২২৯

৬। Price—Settlement Report of Midnapur দ্রষ্টব্য।

'বৈষ্ণব বন্দনা)। বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রথম যুগে মুসলমান ভক্তদের গ্রহণ করা হয় এবং তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় লোক ঝড়ু ঠাকুর সকলের সম্মান পান।

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ফলে বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ আবার দুইভাগে বিভক্ত হয়; বেশীর ভাগ অভিজাতগণ পুরাতন তান্ত্রিকধর্ম্ম আঁকড়াইয়া রহিলেন। এইজন্য বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য আজও শাক্ত বা তান্ত্রিক আর অধিকাংশ অন্য জাতীয় লোকেরা গৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ফলে বাঙ্গলার বেশীর ভাগ লোক আজ মুসলমান, তার পরেই স্থান হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের। অনুসন্ধান করিয়া তুলনামূলক ভাবে দেখিলে ইহা প্রতীত হইবে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্ব বিষয়ে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়; সামাজিক যে সুবিধার জন্য লোকে মুসলমান হইতে চায় বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই সকল সুবিধাই ইহার ভক্তকে প্রদান করে। বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দু সমাজে এক বিরাট বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল।

এই প্রকারে মুসলমান ধর্ম্ম ও নব-বৈষ্ণব ধর্ম্মের শরীর মধ্যে বৌদ্ধ ও অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়সমূহ বিলীন হয়। যখন বাঙ্গলার সমাজ এই প্রকারে রূপান্তরিত হইতেছে তখন বুনিয়াদি স্বার্থকে (vested interest) বাঁচাইবার জন্য যে সব ধর্ম্ম কর্ম্ম বা অনুষ্ঠান সংঘটিত হইল তন্মধ্যে কুল্লুক ভট্ট ও রঘুনন্দনের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনুসংহিতার টীকা করিবার সময় কুল্লুক ভট্ট "অনার্য্য" শব্দের অর্থ করিলেন "শূদ্র" (৭)। এবং সুর আরও চড়াইয়া রঘুনন্দন বলিলেন বাঙ্গলায় কেবল দুই বর্ণ আছে—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। এই উক্তি দ্বারা এক কথায় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বাহিরের সমুদয় লোককে ইঁহারা "শূদ্র" বলিয়া অভিশপ্ত করিলেন। ইহার অর্থ—ব্রাহ্মণই একমাত্র আর্য্য, অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার অধিকারী; আর ঐ জাতির বাহিরের সকলেই 'অনার্য্য ও শূদ্র,' অর্থাৎ তাহারা বৈদিক সভ্যতার অধিকার ও সুবিধাভোগের বাহিরে। এতদ্বারা ইঁহারা ব্রাহ্মণপ্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত মনুকেও হার মানাইলেন (৮)। অথচ তখন বাঙ্গলায় ক্ষত্রিয়ত্ব

৭। বঙ্গবাসী সংস্করণ—কুল্লুকভট্টের সটীক 'মনুসংহিতা', ১০ম অধ্যায়; ৬৭, ৭৩ শ্লোক।

৮। 'বল্লাল চরিত', 'সেখ শুভোদয়া' পুস্তকদ্বয়ে বাঙালায় রাজপুত্র অথবা ক্ষত্রিয়

দাবী করিবার লোকসমূহও যে ছিল তাহা আমরা সাহিত্যপাঠে অবগত হই। পুনঃ গৌড়ের মুসলমান শাসনের যুগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে জাতি-মারামারি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়। মুসলমানের খানার গন্ধ শুঁকিলে বা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলে জাতি যাইত। (নগেন্দ্রনাথ বসু—ব্রাহ্মণকাণ্ড দ্রষ্টব্য)। ভারতের অন্য প্রদেশে এইরূপ ভয়াবহ শুচিবায়ু আবির্ভূত হয় নাই। ইহার কারণ কি? ইহা কি কেবল ব্রাহ্মণ্যবাদাভিমানী শুচিবায়ু রোগগ্রস্ত মনের বিকার মাত্র, অথবা পরাজিত ও ভীত হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষণ প্রচেষ্টা মাত্র। ভারতের অন্যত্র কুত্রাপি জাত মারামারির নজির নাই। এই অনুষ্ঠানের কোন অর্থনৈতিক কারণ নিশ্চয়ই লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকায়িত আছে। লেখককে গোস্বামী বংশোদ্ভব এক প্রাচীন ধর্ম্মগুরু বলিয়াছেন যে, এইযুগে অনেক ব্রাহ্মণ মুসলমান রাজাদের নিকট অর্থ পাইয়া লোকের জাতি মারিয়া বেড়াইত। ইহারই ফলে এই যুগে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এত জাতমারামারির প্রাদুর্ভাব হয়। লেখক ইহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তদুত্তরে বলেন যে এই বিষয়ে কাগজে লিখিত কাগজ পত্রাদি লেখককে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু লিখিত ঐসকল প্রমাণ সম্পর্কিত কাগজপত্র এখনও লেখকের হস্তগত হয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম এস্থলে উল্লেখ করা হইল না। লেখক ইহাও শুনিয়াছেন যে গৌড়ের সুলতানেরা অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর জমি প্রদান করিয়াছেন। এই বিষয়ে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। মহম্মদ বিন্-কাসেম হইতে বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণ পর্য্যন্ত একদল ব্রাহ্মণ মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। মোগল যুগেও একদল ব্রাহ্মণ মোগল আক্রমণকারীদের সহিত ভিড়িয়া যায় এবং স্বাধীনতা প্রয়াসী হিন্দু সামন্ত রাজাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। অবশ্য এই সব বিষয়ে সঠিক ঐতিহাসিক অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

এই যুগের আরও একটি অনুষ্ঠান জিমুতবাহন কর্ত্তৃক "দায়ভাগ" আইন প্রণয়ন। এতদ্বারা বাঙ্গলার হিন্দু আইনতঃ গোষ্ঠিগত কম্যুনিসমের (Family Communism) স্তর হইতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির (Individual right in

শ্রেণীর অস্তিত্বেরই উল্লেখ আছে। 'প্রেমবিলাস'-এ সপ্তদশ শতাব্দীতে 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়' জাতির উল্লেখ আছে।

property) স্তরে উপনীত হয়। এই আইন দ্বারা হিন্দু বিধবাগণও স্ত্রীধন ও স্বামীর বিষয়ে অধিকার অথবা জীবনব্যাপী গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এতদ্বারা বনিয়াদী স্বার্থের ক্ষতি হয়। এই জন্যই কি রঘুনন্দন এই সব স্বার্থের ধাক্কায় বেদের শ্লোক জাল করিয়া "সতীদাহ" ব্যবস্থা প্রদান করেন ?

সংরক্ষণকারীদল বলেন, রঘুনন্দন বাঙ্গলার হিন্দুকে বাঁচাইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধান করিলে ইহার বিপরীতই প্রতীত হইবে। রঘুনন্দন কর্তৃক বনিয়াদী স্বার্থের জনকতকের সুবিধা হয়ত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুসাধারণ ও বেশীর ভাগ অংশ অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-বীরভদ্র গোস্বামীদের দ্বারাই উপকৃত হইয়াছেন। রঘুনন্দন বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ্যাভিমানী সংরক্ষণ-কারীদের নিকট একটি Idol of the market (বাজারের সম্মানপ্রাপ্ত দেবতা) বটে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে তিনি একজন False idol (মিথ্যা দেবতা)। নিরপেক্ষ ইতিহাস ইহাও স্বীকার করিবে যে বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ চৈতন্যের শিষ্যদের নিকটই বিশেষভাবে ঋণী।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

মোহানা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিজন চলে যাবার পর খগেন বাবু ঘরে এসে একটা বই নিয়ে বসলেন। রমলা পশম বোনার কাটি তুলে খগেন বাবুর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মাথার পিছনটা চ্যাপ্টা একটু বেশী, মা বোধ হয় সরষের বালিশে না শুইয়ে তুলোর তাকিয়ায় শুইয়েছিল, মাসীমাও নজর দেন নি, নাক লম্বা কিন্তু ডগা ভোঁতা, টিপে ঠিক করা যেত, ঘাড়ে রোঁয়া এত গজায় কেন, চোয়াল চওড়া, ঠোঁট একটু ঝুলে পড়েছে, দুর্ব্বল, দুর্ব্বল নিতান্ত, চেষ্টাকৃত কাঠিন্য, তাই গোঁড়ামিই প্রকট হয়, বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগের নীতি দ্বিতীয় ভাগের কৃত্রিম ভাষায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। নতুন মানুষ হবার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। সফীক হল আদর্শ, প্রগতিতে বিশ্বাস হল ধর্ম্ম! ঝুঁকি মানুষ, একরোখা লোক, তবু দুর্ব্বল, কারণ পারম্পর্য্যবিহীন, যত দুর্ব্বল তত পরিণতির অনিবার্য্যতায় বিশ্বাসী। তার চেয়ে সুজনের মাথা অনেক ঠাণ্ডা, দোরোখা জামিয়ার। সে ধর্ম্ম মানল না, তবু তার স্বভাব সুসম্বদ্ধ। এদের ভগবানের নামে আপত্তি, কিন্তু সুজন হলে গুছিয়ে বলত, ইতিহাস তার চেয়ে ভীষণ ভগবান, দয়াহীন, মায়াহীন, অ-মানুষিক, নৈর্ব্যক্তিক। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যের, জেসুইটদেরও হৃদয় আছে, কিন্তু এই ঐতিহাসিক কৈবল্য সাধনায় মানুষ যায় শুকিয়ে। তাই সফীকের মুখ-চোখ রুক্ষ, সেই রুক্ষতার তাপ পড়েছে খগেন বাবুর মুখে। বিজনের আন্তরিক আর্দ্রতা তাকে রক্ষা করবে, কিন্তু এ যাবে জ্বালানি কাঠ হয়ে। নচেৎ সাবিত্রী মরে! রমলার ভয় হয়, জয় করতে কথা কয়।

'মেয়েদের একটা সমিতি আছে এখানে শুনছিলাম।' 'বেশ তা সেখানে যাও না, সময় কাটবে। হয় কি?' 'এই সেলাই বোনা সেখান থেকে···'

'কত লোককে সেলাই শেখাবে!' রমলা সাবিত্রীকে সেলাই শিখিয়েছিল, এটা কি তারই ইঙ্গিত।

'যে শিখতে চায়।'

'আগ্রহ কাদের হয় ?'

'জানি না ! অন্য কথা কইতে পার ত কও ।'

'কি কথা সম্ভব ?'

রমলার হাত থেকে বোনার কাটি পড়ে গেল। খগেন বাবু একবার দেখে বইএ মনোনিবেশ করলেন। অনর্থক এই বোনা আর বোনা, কেবল ফাঁকভরা, তাও আবার যন্ত্রের মতন, মনের বালাই নেই, অন্য দিকে চেয়ে আঙ্গুল চালাও, মাসীমার মালাজপার মতন, যখন ভ্রূ কুঁচকে ঘর গুণতে হয় তখনকার একাগ্রতা একেবারে যৌগিক ! নিজকে ঠকান, পরোপকারের অজুহাতে, যার দশটা পশমের জামা তার জন্য পিসীমা একাদশ জামা বুনছেন। জর্জ্জেট পরে চোখে সুর্ম্মা টেনে, অনাবশ্যক ফার্-কোট চাপিয়ে, উঁচু জুতো পরে, মোটর চড়ে সেলাই পার্টি, হঠাৎ বড়লোক পাঞ্জাবী ভাটিয়া মেয়েরা চুলে সোনালি রূপালি গুঁড়া মাখিয়ে সমবেত হয়েছেন জনসেবায়, আর মেম সাহেবদের মুখ থেকে ডাক-নাম শুনে কৃতকৃতার্থ হওয়া। সাম্যবোধ ! মেয়েদের সাম্যবোধ আসে না, মাতৃত্বেও নয়, ননদের ছেলে আর ভাজের মেয়ে হল, আসুক দেখি সাম্যজ্ঞান ! দিল্লীতে মহিলাদের আচরণ দেখলে রমলা বুঝবে বৈষম্য কারা চিরস্থায়ী করে রেখেছে। তার ওপর এই ব্যবসায়ী সহর, নতুন বুর্জ্জোয়ার লীলাক্ষেত্র এখানে জনসেবা অচল। বড় শক্ত এখানে মনুষ্যত্ব রাখা···

'বড় শক্ত'। রমা চাইল। খগেন বাবু বল্লেন,

'আমি জানি শক্ত, এই বিজন ধর, বড় শক্ত···বুদ্ধির প্রয়োগ। কেউ পারে, কেউ পারে না। চরিত্র মানে অন্য কিছু নয়, যে বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে জীবনে প্রয়োগ করতে পারে তারই চরিত্র আছে, অন্যরা জড়, খায় দায় ঘুমোয় মরে, তারা মানুষ নয়, অথচ এই জড় নিয়েই কারবার। ছাখ, রমলা, সাহিত্য সর্ব্বনাশ করেছে মানুষকে জড় ভেবে, কিনা 'স্বাভাবিক' হওয়া চাই। এটা কি জান ? বুদ্ধিকে ভয়, তাই বুদ্ধির প্রয়োগকে জীবন থেকে পরিত্যাগ করাই স্বাভাবিকতা, অর্থাৎ ভদ্রতা,···বিজন খুব ভদ্র। আর তোমাদের বাঙলা সাহিত্যের চাহিদা 'স্বাভাবিক' মানুষের চরিত্রাঙ্কন, 'স্বাভাবিক' মনোভাবের কবিতা, প্রকৃতির 'প্রকৃত' বর্ণনা, আরো কত কি। আমি অ-স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী।' রমলা চুপ করে বসেই রইল।

'প্রয়োগ কথাটা হয়ত ঠিক নয়, কি বলব ? প্রদীপ্ত, জীবনের প্রতি আচার ব্যবহার কর্ম্ম ইচ্ছা প্রেরণা পদ্ধতিতে বুদ্ধির আলো পড়ুক, হাঁ, ভাবগুলোরও ওপর, প্রবৃত্তিগুলোও অন্ধকারের বাদুড় হয়ে থাকবে কেন ? একবার উদ্ভাসিত হোক, তখন দেখবে কত মজা! লোকে ভাবে বুদ্ধি বিশ্লেষণ করতেই জানে, এবং বিশ্লিষ্ট হলেই নাকি সৌন্দর্য্য কর্পূরের মতন উবে যায়। আমি মানি না, বিশ্লেষণের ফলে আনন্দ বাড়ে, কমে না। তবে সেটা এতই নতুন ধরণের যে দুঃখ, হাঁ, দুঃখ ব'লে ভুল হয়। এই ধর···তুমি···'

'তুমি থাম, থাম, অনুরোধ করছি থাম, জোড় হাত করব আরো!' 'এই ধর তুমি...তোমার বসার ভঙ্গীটা, যদি হাত দুটো উবুড় করে উরুর ওপর সোজা শুইয়ে রাখতে তবে মনে হত মিশরী প্রতিমা, মনের মুকুরে প্রতিফলিত হত চিরন্তনের শান্ত গভীর ভাবমূর্ত্তি ; কিন্তু, হাত দুটো কোলের ওপর গুটিয়ে রাখতে,···' রমলা হাত সরিয়ে নিলে।···

'হাত নড়ালে কেন ? এবার কিন্তু অন্যরূপ···নেমে এলে কেন পাথর থেকে রক্ত মাংসের মানুষে ? যেন নেহাৎ সাধারণ মেয়ের মতন বিরক্তিভরে উঠতে যাচ্ছ, পায়ের জোরে নয়, শির দাঁড়ার জোরেও নয়, কেবল কনুইএর ভরে, অর্থাৎ, কৃত্রিম রোষে, এমন কবি বাঙলা দেশে আছেন যাঁরা এই ভঙ্গি-মাত্রেই সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু আমি···'

রমলা উঠছে, এমন সময় খগেন বাবু হ্যাঁচকা দিয়ে তাকে টানলেন, টাল সামলাতে না পেরে রমলা খগেন বাবুর চেয়ারে বসে পড়ল। 'ছিঃ রাগ করতে নেই। তুমি জান যে তুমি আমাকে ভরে দিয়েছ। শুনলে ত বিজনের মতটা।' বরফের চাঙ্গড়ের মতন রমলা বসে রইল।

'তোমার এখনকার ব্যবহারকে ডাক্তারে বলবে 'ফ্রিজিড'···অথচ, তা নও। ঢাকাই পোরো না, খস্ খস্ করে না ? জাপানে স্ত্রী পুরুষে একত্রে স্নান করে, অথচ জাপানী মহিলাদের পোষাক স্ত্রীত্বের 'কফণ।'

'তোমার কি হল বল ত। কেবল মেয়েদের দেহ আর পোষাকের কথা মাথায় ঘুরছে!' রমলা চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের ঘরে গেল, সঙ্গে খগেন বাবুও গেলেন।

আবার কেন বন্যা এল ? জোয়ার-ভাটার মত দেহের ক্ষুধায় যে ছন্দ

আছে তাকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাত্রায় ধরা যায় না। নববধূর লজ্জা রমলার কখনই ছিল না, সাবিত্রী দৈহিক সম্বন্ধকে ঘৃণা করত, রমলার যে ঘৃণা নেই তা সে খুঁটিনাটি ব্যবহারে প্রমাণ দিয়েছে। অথচ স্বামীর ব্যবহারে ঘৃণাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। সেই ব্যাকুলভাবে চেয়েছিল, কিন্তু হতাশ হল যখন তখন থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে আরম্ভ করলে। সিষ্টিন চ্যাপেলের মোছা ছবি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনের দূরত্ব যত বেড়ে চলে ততই দেহের সংযোগের প্রয়োজন হয়—ক্ষতিপূরণ হিসেবে। যত বেশী ক্ষতি ততই পূরণের আগ্রহ। কিন্তু কিছুতেই শান্তি আসে না। মধ্যেকার ব্যবধান দুর্ভেদ্য। ফ্রিজিডিটি—ওটা ত নাম, পরের ঘাড়ে দোষ চাপান। মানসিক সুরের পার্থক্য? সেটা চিরন্তন, এক হবার সময় বুদ্ধি লোপ পায়। মানুষ চিত্ত শূন্য হলে দৈহিক আনন্দে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু ক্ষণিক সুখের লোভে, স্নায়ুর ক্ষণিক শান্তির জন্য মানুষ পশু হবে! বিরোধ থাকবেই থাকবে। প্রেমের চরমক্ষণে দ্বন্দ্ব, সন্তান হবার পর দিন কয়েকের জন্য শান্তি এল। আবার দ্বন্দ্ব এল। কিন্তু পুনরাবৃত্তিটা সমাধান নয়। যারা নূতন আগ্রহের সন্ধান পেলে, কজনই বা পায়, তাদের কিছুদিনের জন্য আরাম মেলে। এই চলল চিরটা কাল, শাঁখের রেখার মতন, ঘুরপাক খেতে খেতে ওপরে ওঠা-নামা। শেষে? শেষ-টেশ নেই, যার আদি নেই, তার অন্তও নেই। এই যদি সত্য হয় স্ত্রী-পুরুষের নিতান্ত ব্যক্তিগত ও অন্তরতম সম্বন্ধের বেলা, তবে ডায়েলেকটিক্‌স্‌ অপ্রয়োজ্য কোথায়? মন গোলোযোগ বাধায়, কিন্তু সেই ভয়ে তাকে বলি দেওয়া কাপুরুষতা, অমানুষিকতা। তন্ত্র-সাধনার একটি স্তরে সাধকদের দৈহিক সম্বন্ধের সময়ে মন্ত্র জপ করবার আদেশ থাকে। মোটেই অ-স্বাভাবিক নয়, পুরুষের পক্ষে সেইটাই সহজ। মেয়েদের মনের বালাই নেই। রমার কথা স্বতন্ত্র···কি যেন একটা ভাবে···পদ্মের ওপর লক্ষ্মীর মতন মন তার ভাসে।

সন্দেহ ওঠে হয়ত বা মনের অধিকারিত্বটাই শেষ কথা নয়। সক্রিয় হওয়াটাই দরকারি, সেটাও যথেষ্ট নয়, সমন্বয় চাই, সেখানেও থামা চলে না, সমন্বয়ের পর ওপরে ওঠা। এক-একটি ধাপে আটকে গিয়ে এক-একটি ধরণের মানুষ হল। বিজন সক্রিয়, সুজন সমন্বয়ী, সুজন পরের স্তরের।

কেউ কাউকে বুঝবে না—বাদুড় কখনও চিলকে বোঝে? বিজন ভাবছে সফীক বড় ঠাণ্ডা, খাদ পুড়ে যাবার পর খাঁটি সোনা ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে। অবশ্য স্বভাব-শীতলকে বুকে ধরে গরম করা শক্ত। কোনটাই বা সহজ! অঙ্ক সহজ? ব্যতিরেক-বর্জ্জিত সাধারণ বিশেষকে প্রাণবন্ত করতে ব্যগ্র হবে কেন? ধরাই যাক, কাজটা ক্ষমতার বাইরে, তাই বলে সেটা অগ্রাহ্য? যেটা অসহজ সেটাই নাস্তি? যন্ত্র-সঙ্গীতের আলাপ যখন দ্রুত তখন রাগিণীকে চেনা কঠিন, কিন্তু আনন্দ দিতে সে কি অক্ষম? আরাবেস্ক, য্যাবষ্ট্র্যাক্ট্ ছবি ও মূর্ত্তিতে মানুষের ছোঁয়াচ নেই, কিন্তু তারা কিছু রসোৎপাদনে অকৃতকার্য্য নয়। সভ্য অভ্যাসের দোষে খাদ্যে বাজে জিনিষ এসে গেছে, ও-গুলো মসলা, তরকারীর প্রকৃত স্বাদ নষ্ট করাই তাদের কাজ, শেষে রুচি এমন বিকৃত হল যে মশলা না হলে চলে না, কেবল তাই নয়, যে সিদ্ধ তরকারী চাইবে তার নাম হবে বুদ্ধি-সর্ব্বস্ব, কোল্ড্, আরো কত কি! সফীকের মধ্যে শুদ্ধির তাগিদ আছে, সে চলিষ্ণু, তার বিবর্ত্তনের ক্রিয়ায় মূল্যহীন বিশেষ খসেছে। উখোর গুঁড়ো উড়ে যাক, চুলোয় যাক, অন্যেরা পোড়াক গে, যতক্ষণ কাঠের টুকরো ঝকঝকে তকতকে হয়ে আন্তরিক নির্ম্মাণবিন্যাস উদ্ঘাটিত করছে।

'চল রমা বেড়াতে যাই, একটু হাওয়া লাগিয়ে আসি, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।' 'মাথা ছাড়ল না?'

'ছেড়েছে, এখনও একটু টিপটিপ করছে।'

'চল, বেশী রাত হল না?'

'তা হোক্ গে, চল যাই। ভাল সাড়ি পর একটা, যেটা দেহের হুকুম মানে, তাঁবেদার-সাড়ি।' রমলা হেসে কাপড় বদলে এল।

খগেন বাবু রমলাকে নিয়ে পার্কের কোণে একটা লোহার বেঞ্চে বসলেন। আরেকটা বেঞ্চে একজন লোক মুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে। চৌকীদার হবে। মোটরের হেড্লাইট মুখে পড়তে রমলা দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকল—পাংশুবরণ, রঙ আর পাউডার মিশ খায় নি, যেন ননদবৃন্দ ভাগ্যবতী এয়ো-জার মৃতদেহ সাজিয়েছে—খগেন বাবু বলেন, 'ভাবি কখন তোমাকে ভাল দেখায় বেশী, সকালে স্নানের পর দেখেছি গরদের সাড়ি প'রে, সন্ধ্যায় দেখেছি বিজলী বাত্তির নীচে, এখন দেখছি আবছায়া অন্ধকারে, ঠিক বুঝি না…' রমলা খগেন

বাবুর হাতটা টিপে দিলে। নিজের মনে লজ্জা হয় মিথ্যা আচরণে, রমলা পাশের লোকটার বিপক্ষে সাবধান করে দিচ্ছে ভাবেন, 'বসে থাক্ না।' রমলা আরেকটু জোরে হাত টিপলো 'কেন ?'

'কিছু না, চুপ করে বসে থাক, আমার খুব ভাল লাগছে।' আবার একটা মোটর গেল পার্কের পাশ দিয়ে হেড্-লাইট জ্বেলে, ফ্যাকাশে রঙ হলদে হয়ে গেছে, 'চল, রমলা, এখান থেকে উঠে যাই।'

'এইখানেই বোসো।'

'যা বলেছ, সভ্যতার বেশী দূরে থাকতে পারি না, অথচ কাছে থাকলে তার কুৎসিত রূপটাই চোখে পড়ে। তবু আমি ভালবাসি, সত্যি বলছি, রমলা, ভালবাসি।'

'তবে কেন আপত্তি করছ ?'

'কিসে ?'

'এই বিজন যা বলছিল……'

'ওতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধতি।' রমলা চুপ করে রইল। খগেন বাবু বল্লেন 'ও ঐ কথাটা। সত্যি তুমি ওদের সমিতিতে যোগ দিতে চাও ?'

'কি করব বল একা বসে থেকে ? তা ছাড়া…'

'তা ছাড়া কি ?'

'না, কিছু না।'

'কেন, আমি ত সর্ব্বদাই রয়েছি তোমার, সঙ্গে না হোক, আশে পাশে। এতদিন কানপুরে রয়েছি, এক মিনিটের জন্য…তা ছাড়া বিজন ত প্রায়ই আসছে আজকাল। আচ্ছা, বিজনের মনে কি একটা হয়েছে বলত ? যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে।'

'জানি না।'

'সকলেরই জীবনে একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন সহজ বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে চোখে পড়ে। তখনই আতঙ্ক হয় বুঝি বা মাথার ওপরকার আকাশটাই খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে ঘাড়ে পড়ল। কিন্তু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে যাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম সেটা ছিল নিজেরই কামনা মাত্র। বিশ্বাসের প্রকৃতি হল ইচ্ছাপূরণ। আমাদের ইচ্ছাগুলোও আবার ভীষণ কাঁচা, আকাশের দোষ

কি। না যাচিয়ে আদর্শ খাড়া করা আমার ধাতে নেই, তাই, রমলা, সহজে আমি হতাশ হই না, আশ্চর্য্যও লাগে না। বিজন সফীককে মহাপুরুষ ঠাউরেছিল, লোক মন্দ নয়, ভালই, বেশই ভাল, যতটুকু দেখেছি, মাথা পাকা, তাই বলে আদর্শ ব্যক্তি নয়। তুমি যেন, রমলা, আমাকে উঁচু চাতালে বসিও না, নিজেই বিপদে পড়বে·· তখন ভীষণ কষ্ট পাবে, সাবধান করে দিলাম আগে থাকতে।'

কোথায় যেন সততার অভাব রয়েছে সন্দেহ হয়···ও সাবধানের অর্থ নেই···ও চায় উঁচু চাতালেই বসতে—কচি খোকার মতন নিজেকে ঠকাচ্ছে··· আত্মম্ভরি ধার্ম্মিক···ইংরেজীতে কি একটা নাম আছে···প্রীগ্···রূঢ় বিচারে রমলার মনে কষ্ট হয়, ধীরে ধীরে আল্‌গোছে খগেন বাবুর উরুতে হাত রাখে।

কি বলতে চায় রমলা, যে সে বিপদে পড়বে না, যে তার বিশ্বাস টুনকো নয়, ভিত পাকা, বেদী অটল, গগনচুম্বী তার শিখর? 'আচ্ছা, রমলা, তুমি আজকাল কথা কও না কেন, কানপুরে এসে কি বোবা হয়ে গেলে, কি ভাব বসে বসে? একটা বিষয় নিয়ে তুমি চিন্তা কর না জানি, মেয়েরা পারে না, একত্রে একাধিক ব্যাপার তাদের চোখে পড়ে, তোমাদের সময় আমাদের নয়, সেলাই করছ কথা কইছ খোকার খেলা দেখছ উনুনের দুধ উথলে উঠল কিনা ভাবছ—ঐ একই ক্ষণের ছকে নিজের চেহারা ভয় ভাবনা স্মৃতি আশা ভরসা এসে জুটছে—এই যে আজকালকার ছবি সাহিত্যের টেলিসকোপিক দৃষ্টি, সব তোমাদেরই আশ্রয়ভুক্ত, মেয়েলী। এককালীনতা আর ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য—দুটো পরস্পরের বিরোধী নয় কি? মেয়েলী আর পুরুষালী প্রত্যয় দুটো—সেই পুরানো চীন, কেবল চীন কেন, আদিম সভ্যতা মাত্রেই এই দুটিকে প্রাথমিক হিসেবে ধরেছে। নতুন সভ্যতা সুরু হল সেদিন যেদিন পারম্পর্য্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে মানুষ বুদ্ধিমান হল, তারই ফলে বিজ্ঞান, সেটা পরীক্ষাগারে, তার বাইরে বুদ্ধির পরিচয় আর প্রয়োগ পাচ্ছি সোশিয়ালিজমে। অবশ্য, সাধারণতঃ যাকে চিন্তা বলে সেটা স্নায়ুর চাঞ্চল্য মাত্র, তাই এনার্কিজম্ আসতে পারে জোর, তার উদ্দেশ্য নেই, গড়ন নেই, জেলীর মতন থক্‌থকে, কাদার স্রোত, হাঁ চলছে, কিন্তু সে চলার ছন্দ নেই, রীতি নেই, গন্তব্য নেই—চলাটাই সর্ব্বস্ব নয়—খানার জলও চলে, তাকে হরিদ্বারের গঙ্গা

ভাবা ভুল। খানিকটা তুলে এনে জালায় ভর, ফটকিরি দাও, তলায় কাদা রইল, কেবল ওপরের জল ছেঁকে খাও···এই হল জীবনযাত্রার উপযোগী দর্শন···এ জল বরফ-গলা পাহাড়-খোঁড়া পানীয় নয়···এই ময়লা স্রোত নিয়েই কারবার চালাচ্ছে সকলে, কে আর চূড়ো থেকে বরফ আনছে বল?···কি ভাব?···আমি এ ব্যবসায় যোগ দিতে নারাজ···অন্যে পারে চালাক, এই থেকে অন্নসংস্থান করুক···আমি পারি না এইটুকু জানি···কথা কইছ না যে! পার্কে বসেও চুপ?'

রমলা নীরবে বসে রইল; অন্ধকারের মোটা তুলিতে স্থূল হয়ে দেহের পরিচিত রেখাগুলো মুছে গেল; দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে মনে হয় কষ্টিপাথরের অসম্পূর্ণ মূর্তি; আরেকবার, বহু পূর্ব্বে রমলা স্মরণ করিয়েছিল আরেক মূর্ত্তির কথা···তার রূপ ছিল সুনিবদ্ধ, সম্পূর্ণতার অভিমুখী, কিন্তু এ যেন ভাঁটি পাথর আনাই সার, বাটালির দাগ রয়েছে মাত্র··· তাই কি! নিশ্চয়ই এর রূপ আছে। খগেন বাবু চোখ কুঁচকে রমলাকে দেখেন। 'তোমার ঈজিপ্টে জন্মান উচিত ছিল, রমলা, কেন জানি না, কেবল তাই ভাবছি। মুখটা ফেরাও, এইবার স্পষ্ট হচ্ছে রাস্তার আলো প'ড়ে, না, গ্রীক টাইপ নয়, ইতালীয়ান নয়, বাঙালী মুখ নয়, অমন তুলতুলে আদুরী মুখ নয়···এইবার ধরেছি, মিশরী···কিন্তু কোন যুগের, আমেন হোটেপ—তুতেন খামেন যুগের? না; তখন পচ ধরেছে পূবে হাওয়ায় পরশ লেগে···তারও আগেকার, থীবান যুগের...মিশরী থীবান। ভারি মজা, রমলা, মিশরীরা বাঁচত মৃত্যুর জন্য, তাদের জীবনের প্রধান বৃত্তি ছিল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া, মৃত্যুর পর দেহ কি খাবে, কোথায় শোবে, কোথায় যাবে তার খুঁটি নাটি বন্দোবস্ত করা, কবরে জল, খাবার, কাপড়, মায় নীল নদের নীচে স্বর্গে যাবার বাধা খাগড়া কাটার কুড়ুলটা পর্য্যন্ত....অথচ মিশরী পোট্রেট নিতান্ত জীবনধর্ম্মী, মাংসপেশীর প্রতি অংশটা পর্য্যন্ত স্পষ্ট ফোটান। তুমি তার আগেকার জানি···। অথচ, গ্রীকরা মৃত্যুর পরে কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাত না, এই জীবনই তাদের আদি, মধ্য, অন্ত, ব্যয়াম, দৈহিক ও মানসিক পরিণত সৌন্দর্য্যের পাটই তাদের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু তাদের ভাস্কর্য্য দেখলে মনে হয় যে তারা নর-নারীর ওপর দেব-দেবীর অবিশেষত্ব আরোপ করবেই করবে···আরোপ করা আমার ভাল লাগে না···তুমি বলবে

আমি আরোপই করি···ওটা ভুল, একদম ভুল···একটা গ্রীক মূর্ত্তিকে বলতে পার না যে এটা অমুক মানুষের প্রতিকৃতি। মিশরী ভাস্কর আত্মাকে দেহ দেয়, গ্রীক ভাস্কর দেহকে আত্মিক করে। আমি মিশরী ভঙ্গী পছন্দ করি, এতে দেহ আছে, যেমন এক একটা মদের 'দেহ' থাকে ··আদর্শবাদী আমি নই, বিজন আদর্শবাদী, তাই সে সফীককে হিরো বানিয়েছে। তোমার···ঠিক বলা যায় না, নয় রমলা ?'

রমলা হাত সরিয়ে রাখলে। 'খুব বক্তৃতা দিলাম'—নয় রমলা ? কেনই বা দেব না ? আচ্ছা, বিজন কি তোমাকে ক্লাবে ভর্ত্তি করে দিতে পারবে ?'

'ওর সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে।'

'থাকাই স্বাভাবিক। বড় লোকের ছেলেরাই কমরেড হয়।'

'ওকে না ভালবেসে কেউ থাকতে পারে ?'

'তা বটে···দেখো, যেন···'

'থাক, অনেক রসিকতা হয়েছে, মাষ্টার মশাইএর। কিন্তু, কি করে ক্লাবে যাব ভাবছি।'

'টঙ্গায় যাওয়া হবেনা বলে দিলাম।'

'ওগো তা যাব না, তোমার খাতির আমি রাখব।' রমলা খগেন বাবুর কাছে এল। হাত টিপে বল্লে, 'তারও বন্দোবস্ত হয়েছে। বিজনকে অত্যন্ত ঘোরাঘুরি করতে হয়, ও একটা টু-সীটার কিনবে, স্পোর্টস্ মডেল, একেবারে নতুন, অথচ সস্তা।'

'ও কিনলে তোমার কি ?'

'ওই আমাকে পৌঁছে দেবে মধ্যে মধ্যে, আমি ত আর রোজ হাজরে দিচ্ছি না তোমার মতন !' খগেন বাবু খানিক পরে বল্লেন, 'যাবে না কি ?'

'বোসো না, বাড়ি গিয়ে কি হবে ! যা ছিরি ফ্ল্যাটের !'

'বিজনকে বল না নতুন ফ্ল্যাট দেখতে।'

'ফ্ল্যাটে আমি যাব না।'

'ভালই ত বাড়ি পেলে।'

'একটা বুঝি ছোট বাঙলো আছে, নাম মাত্র ভাড়া, সামনে লন্ আর ফুলের

ছোট বাগান। খোলা জায়গায় তোমারও ভাল লাগবে। তবে নীজ চায় ছ-মাসের। বিজন ধরে বসেছে এখনই নিতে, আমি বলেছি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তার পর কথা দেব। চল না কাল দেখে আসি। বিজন কাল এলে কি বলব?'

'ফুলের বাগান, বেশ ত, তোমারও ভাল লাগবে, সেই ভাল। আমার কাজ আছে, তুমি আর বিজন গিয়ে দেখে এস, পছন্দ হয় কথা দিও—আমাকে এর মধ্যে কেন? কাল আবার কাজ আছে, ওদের কী হল জানতে পেলাম না···চল তোমাকে পৌঁছে দিই।'

'বোসো না একটু আমার পাশে। উস্‌খুস্ করছ কেন? ওটা দারোয়ান। আমার কি ইচ্ছে হয় না, আমি কি বুঝি না তোমার কষ্ট হচ্ছে, চাই না কি তোমাকে ভাল রাখতে? এখানে এসে পর্য্যন্ত তুমি যেন কেমন ধারা হয়েছ··· অত কেবল নিজের দিকে দেখতে নেই গো দেখতে নেই, লোকে স্বার্থপর বলবে। সত্যি কথা কও···আমিও কি তোমার জন্য কিছু করিনি, খোঁটা দিচ্ছিনা···কি নিয়ে থাকি বল? বিজন আমাকে কি দিতে পারে যা আমি চাই, যা তুমি একবার আমাকে দিয়েছিলে, যা পেয়েছি? তুমি কি চিরটা কাল ছেলে মানুষই থাকবে?' রমলা হঠাৎ খগেন বাবুর মুখ বুকের মধ্যে চেপে ধরলে। 'আঃ কি করছ! চল বাড়ি যাই।'

'না, যাব না, এইখানে বসে থাকব সারারাত, তুমি যেতে চাও যাওগে ঐ ফ্ল্যাটে, দারোয়ান আমাকে পাহারা দেবে।' খগেন বাবু হাত ছাড়িয়ে দূরে বসলেন। কেমন যেন ঘিন ঘিন করে···ছলাকলা এই মান অভিমান, হিসেব-নিকেশ এই দান-প্রতিদান, মিথ্যা আচরণ বক্তব্যের এই মুখ ফিরিয়ে দেওয়া, এই আদর-আপ্যায়ন, এই স্ত্রীত্ব থেকে মাতৃত্বে দ্রুত পরিবর্ত্তন। সত্যি কথা, রমলা পারছেনা ফ্ল্যাটে থাকতে, মোটর না চড়ে, স্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে না মিশে। কেন এই জুয়াচুরি! জবরদস্তীতে সে আপন হবে না। 'সেই ভাল, বিজনের সঙ্গে ক্লাবে যেও, তার দিদি হিসেবে খাতিরও হবে।' রমলা বিদ্রূপ বুঝলে না, সম্মতি আদায় করে উল্লসিত হল দেখে মন বিষিয়ে ওঠে। রমলার বোঝা না-বোঝা অ-বোঝা ইচ্ছাধীন, উদ্দেশ্যাধীন, স্বার্থাধীন, ইচ্ছা উদ্দেশ্য স্বার্থ নিজের নয়, যে পংক্তিতে বসে এসেছে তারই। কিছু পরে খগেন বাবু আর

রমলা বাড়ি ফিরল। সে-রাত্রের ব্যবহারে মনে হল রমলা নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে।

পরের দিন বিকেলে বিজনের সঙ্গে রমলা নতুন বাঙলো দেখতে গেল। খগেন বাবু একলা বাড়িতে রইলেন। সফীক চেয়েছে চাঁদার হিসেব, হরতালীদের নামধাম, কাজের সূচীপত্র। ভাল লাগে না, কুড়েমি আসে। এককাল ছিল যখন বাড়ি নিয়ে মন খুঁতখুঁত করত, তখন বাড়ি ছিল সম্পত্তি। সাবিত্রীর মৃত্যু হল, দেশ-বিদেশে ঘুরলেন, বাড়ির মোহ কেটে গেল। খগেন বাবু মার্ক্সের চিঠিপত্রের বই নিয়ে বসলেন। কি আশ্চর্য্য! মাত্র একখানি চিঠিতে, ৫ই মার্চ্চ ১৮৫২ সালে, হ্বীডেমেয়ারকে, মার্ক্স মজুরদের একাধিপত্যের উল্লেখ করেছেন। এর পূর্ব্বে আছে ১৮৫০ সালের "ফ্রান্সের শ্রেণীবিরোধের" তৃতীয় অধ্যায়ে, এর পরে, ১৮৭৫ সালের "গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনায়।" মাত্র এই তিনবার-এর বেশী ব্যাখ্যা কার্ল মার্ক্স করেন নি। এঙ্গেল্‌স্ মাত্র দুবার করেছেন, তাও স্পষ্ট সাধারণতন্ত্র হিসেবে। তা হোক, শ্রেণী রয়েছে, শ্রেণী বিরোধ চলছে, সেটা একটা মস্ত শক্তি, যার প্রয়োগ হবে সময় বুঝে, তবেই যাবে সংঘাত, এবং ইতিমধ্যে এই সংঘাতের অজানা ভয়ে কেউ যাবে ওপরতলার আশ্রয়ে, কেউ ভাসবে নিচের স্রোতে। আজ না হয় মজুর হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা নাই হল, কিন্তু এই চেষ্টায় একটা বড় ফাঁকি ধরা পড়ল—এটাই কি কম লাভ!

হাতের বই হাতেই থাকে। বিজন ঠিক ধরেছে প্রত্যেক চিন্তায় রম[illegible] এসে পড়ে। সফীক হয়ত ভাবে যে কানপুরের আবহাওয়ায় এই বদল ঘটেছে। তা নয়, গোড়ার তাগিদ ঐ রমলা, সোশিয়ালিজমটা বুদ্ধি দিয়ে মনকে চোখঠারা মাত্র। খগেন বাবু খাতাপত্র কলম নিয়ে বসেন। বই তুলে রাখতে দুঃখ হয়। বইএর সঙ্গে সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ছাপা পৃষ্ঠা, বাঁধান হলেই চলত, ভাল বাঁধাই হলে ত' কথাই নেই, তার ওপর যদি নতুন বক্তব্য, নতুন তথ্য, নতুন ঢঙ, নতুন অভিজ্ঞতা থাকত তবে পোয়া বারো... নবাব-বাহাদুরের প্রতিদিন কুমারী চাই। এখন যাতে তাতে মন বসে না, মনের সে হ্যাংলামি নেই, এখন বইএর কাছে মন তার নিজের দের নিয়ে উপস্থিত হয়, যদি লেখকে গ্রহণ করে তবে আগ্রহ জাগে, নচেৎ সময় নষ্ট

করতে মন নারাজ হয়। আধুনিক হবার মোহ এবং সময় কাটাবার নেশা, এই ছিল তখনকার উৎসাহের রাসায়নিক রচনা। এখনও ছোঁক ছোঁক যে করে না তা নয়, কিন্তু সামলান যায়। এখনও বই পড়ে সময় কাটাবার প্রয়োজন ওঠে, ওঠে বৈ কি! মজুর সভার জন্য নোট লেখার পরেও, সফীকের সঙ্গে তর্ক করার পরেও, ওঠে বৈ কি! একটা ফাঁক থেকেই যায়, রমলা ভরাতে পারলে না, দূরত্ব বেড়েই চলল। অবশ্য, রমলা কি বইএর প্রতিভূ? তাই কখনও সম্ভব! জ্যান্ত মানুষ মরা কেতাব হতে চাইবে কেন! নতুন নতুন বিয়ের পর সকলেই বৌকে জীবন্ত পুস্তক ভাবে, বেশ আঁটসাঁট পরিপাটি গেট্-আপ্, চমৎকার জ্যাকেট, ওপরে মজাদার ছবি আর বৌএর বাপের বাড়ির ঝি আর ঠাকুমার বিজ্ঞপ্তিতে ভরা, আর ভেতরে নায়িকা, সুন্দরী, প্রেমিকা, রসিকা, অর্থাৎ অরিজিন্যাল কবিতায় ঠাসা। সাবিত্রীকেও হয়ত তাই ভাবা হয়েছিল, রমলার কাছেও কি সেই প্রত্যাশা! কেবল কবিতার রূপটাই আধুনিক! আবার রমলা মাথার মধ্যে জুড়ে বসে···সে বলে হাতে তার কাজ নেই, তাই পার্কে অনুযোগ করলে, কিন্তু সেটা তার অবসর মাত্র, ভরাক না সংসারের চিন্তায়। তাও পারবে না, মা নয় যে! তাই রাজবালা বিরহবিধুরা, সাবিত্রীও তাই, পার্থক্য নেই। আবার সাবিত্রীর কথা মনে ওঠে কেন? কোথায় গিয়ে মন হাজির হয় কে জানে! দূরে চলে যায়, সহরের ঘুঁড়ি পাড়া-গেঁয়ে, সহরের ছোকরা লাটাইএ সুতো গোটায়, গ্রামের ছেলে ইঁটে সুতো বেঁধে ঘুঁড়ি ধরে···কিন্তু ভো কাঁটা!

রমলা সরে গেল। হয়ত অন্যায় হয়েছে তার দিকটা না দেখে। কি বল্লে, আত্মসর্ব্বস্ব না আত্মকেন্দ্রিক? তবে নিশ্চয় এটা স্বার্থপরতা নয়, অন্তর্মুখিতা মাত্র, সেটা মজ্জাগত, বহির্মুখীরাই সুখ দিতে জানে, যেমন বিজন। সুজনের মধ্যে দুইই আছে? কাজের মধ্যে এলেই অন্তঃশীলতা ঘুচবে। ধর্ম্ম-ঘটের খবর পাননি সারাদিন।

রমলা ও বিজন ফিরল।

'খগেন বাবু, বাঙলোটা কিন্তু আমার আবিষ্কার, মাত্র আশী টাকা, গ্যারাজ পর্য্যন্ত পাওয়া যাবে, স্যানিটারি ফিটিঙ্ চমৎকার।'

'গাড়ি কেনা হয় নি?

'সেটা অবশ্য আপনারা বুঝবেন। রমাদি বলছিলেন যে টু-সীটারের বদলে...'

'নিশ্চয়ই, কিনতে যদি হয় সীডান্ বডি কেনাই ভাল।'

'অবশ্য আমারও তাই মত, এ অঞ্চলে যেমন ধুলো তেমনই গরম, যেমনই শীত তেমনই ধোঁয়া। অবশ্য খরচ একটু বেশী পড়ে। তবে কমান যায় অতি সহজে, একটু নজর রাখলে।

'সে তোমরা যা হয় কোরো। যা দিতে হবে আমাকে বোলো।'

'রমাদি কিন্তু...ও-বিষয় তোমরা বোঝাপড়া করগে, আমি সহজেই দফায় দফায় শোধ দেবার বন্দোবস্ত করছি, কোম্পানীর মালিকের ছেলে যে আবার ক্লাবের মেম্বর!'

'মজুর, মালিক, মেয়ে, ভাগ্যবান, তার ওপর সবার সেরা রমাদি। একটা অফিসের ঘর পাওয়া যাবে? ছোট? তা হোক! তাই চাই। ওপরতলায়? চমৎকার! এখানে নোটিশ দিতে হবে না কি?, তাও সহজে হবে? তবে আর কি! গুছিয়ে নাও তোমরা। ওস্তাদের খবর কি হে! রমলা, সুজনের ঘর হবে বাংলোতে?'

'ভারি মজার কথা কিন্তু! বাড়ি খুঁজে বের করলাম আমি, আর এসে থাকবেন সুজন দা! অর্থাৎ বিজন নয়!'

রমলা নিজের ঘরে গিয়ে টেবিল খুঁজলে, সুজনের চিঠি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। বাইরে এসে দেখে বিজন নেই, খগেন বাবুও নেই।

ক্রমশঃ

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নভঙ্গ

নেহাৎ যে ভাতের অভাব ঘটিয়াছিল এমন নয়, তবু—বেকারত্বের যন্ত্রণা দুঃসহ হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই উপার্জ্জনের চেষ্টায় একদিন মগের মুলুকে আসিয়া হাজির হইলাম।

বলা বাহুল্য আমার এই বীরত্বব্যঞ্জক প্রচেষ্টায় বাড়ীতে কাহারও তিলমাত্রও সহানুভূতি ছিল না; একে তো—মায়ের কোলের ছেলে হইয়া জন্মানোর অপরাধে চিরকাল সকলে আমার বয়সটাকে হাসিয়া উড়ায়, আজ পর্য্যন্ত সাবালক বলিয়া স্বীকার করে না, তাহার উপর একেবারে সমুদ্র-পাড়ি।

সম্মতি থাকার কথা নয়। .

আমি কিন্তু—উপার্জ্জনের জন্য যত না হোক নিজের নাবালকত্ব ঘুচানোর জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলাম। বন্ধু সুরেশ থাকে বর্ম্মায়—বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র বছর দুই আগে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী"র অনুপ্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, ঈশ্বর জানেন কি করে—চিঠিপত্রের আঁচে মনে হয় যেন 'কাজ' হইতে সুরু করিয়াছে। লুকাইয়া তাহাকেই অনুরোধ করিয়াছিলাম আমার 'আখেরে'র চিন্তা করিতে। সে চালা হুকুম দিয়াছে, "চলে আয়—যা হয় একটা হবেই।"

.. অতএব 'কোন বাধা আমি মানিনা' গোছের মনোভাব লইয়া জাহাজে চড়িয়া বসিলাম।

• মার অশ্রুসজল অভিযোগ, দাদাদের অভিমানব্যঞ্জক গম্ভীর মুখ, এবং বৌদিদিদের সস্নেহ অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়াও অটল ছিলাম, টলিলাম জাহাজে উঠিয়া। প্রথমে মাথা টলিল, তাহার পর পা, অতঃপর সর্ব্বাঙ্গ, এবং অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীণ ভাবে জড়িত যে হৃদয় সেও রীতিমত টলিতে লাগিল।

প্রথমে ভাবিলাম—কাজটা ভালো হইল কি? পরে ভাবিলাম—কাজটা ভালো হয় নাই, শেষ পর্য্যন্ত ভাবিলাম কাজটা গর্হিত হইয়াছে। মিথ্যা

বলিব না—ফেরত ডাকেই ফিরিয়া আসিব এমন সাধু সঙ্কল্পেরও উদয় হইয়াছিল।

তবে কথায় বলে 'জলে পড়া'। সেই জলে পড়া অবস্থায় মনের ভাব যতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল ডাঙ্গায় পা ফেলিতে অনেকটা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সুরেশের হাস্যোজ্জ্বল মুখ চোখে পড়ায় সমুদ্রপীড়ার গভীর পীড়া ভুলিয়া মুখে হাসি ফুটি:।

—কি রে এমন 'ডাইনে খাওয়া' চেহারা কেন? সুরেশ সবিস্ময় প্রশ্ন করে —খুব বুঝি ভুগেছিস 'সী-সিক্‌নেসে'?

—আর বলিস কেন—পাঁচ দিন জল নেই পেটে। তুই এসেছিস তা' হ'লে? এমন ভাবনা ধরেছিল—

—আসব না মানে? কথার ভূমিকাস্বরূপ চিরপরিচিত থাপ্পড়টির যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া সুরেশ উত্তর দেয়—জ্যান্ত থেকে আসব না? মরে গেলে প্রেতাত্মা হয়েও আসতাম তোকে রিসিভ করতে।

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে অতদূর করতে হ'ল না তোমায়, এখন দেখ আমার জিনিসপত্রগুলো—

—সব ঠিক হয়ে যাবে, তার জন্যে ভাবনা নেই, তোর জন্যে কাজে গেলাম না আজ। আয় দেখি—

দেখিলাম সুরেশ ইতিমধ্যে বেশ লায়েক হইয়া উঠিয়াছে। না হইবে কেন—মায়ের কোলের ছেলে তো নয়!

বাসায় যাইবার পথেই সুরেশ জানাইল—এসে পড়েছিস ভালোই হয়েছে —আমাদের বড় সাহেবের আলাপী একটা সাহেব—বাস্মিজ সাহেব অবশ্য, খোঁজ করছিল একটা লোকের। ইনসিয়োর আফিস—মাইনেটা মনে হয় খুব খারাপ নয়, কালই একবার 'ইনটারভিউ' দিয়ে আয় না।

আসিতে আসিতেই যাই হোক একটা চাকরীর বার্ত্তা পাইয়া মনটা কিঞ্চিৎ খুসী হইল। জ্ঞাতব্য বিষয় দুই চারিটা জানিয়া লইতে লইতে বলি—তুই সঙ্গে যাবি তো?

—আমি? আমি—আমার কি করে যাওয়া সম্ভব হয়? আজ কামাই করলাম—কেন ভয় পাচ্ছিস না কি? তুই দেখছি সেই রকম নার্ভাস আছিস

এখনো। কিছু ভাববার নেই, এখান থেকে বড় সাহেব ফোন্ করবে অখন—সব ঠিক হয়ে যাবে। বিকেলের দিকে যাস বরং, কাজের ভীড় কম থাকে, কথাবার্ত্তার সুবিধে করতে পারবি। সার্টিফিকেটগুলো এনেছিস তো? হ্যাঁ—জায়গাটা একটু ঘিঞ্জিগোছের বটে, তা' ছাড়া পথঘাট তোর অজানা। আমি বলি কি একটা ট্যাক্সিই নিস্, ঠিকানা বলে দিলে ঠিক পৌঁছে দেবে। বুকে বল আনো 'নওজোয়ান'।

পেটেণ্ট থাপ্পড়ের জোরে সুরেশ আমায় চাঙ্গা করিয়া তোলে।

পরদিন সুরেশের উপদেশ ও বরাভয় সম্বল করিয়া বাহির হই—মংফু টুংফু কি গ্যাং-কো—ঈশ্বর জানেন কাহার উদ্দেশে—একেই তো অজানায় আমার বড় ভয়, তার উপর সারাদিন মেঘ করিয়া থাকার দরুণ মনটাও যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

জায়গাটা—সুরেশ নিতান্ত বিনয় করিয়া "একটু ঘিঞ্জি গোছের" বলিয়াছে—একটু নয়, যৎপরোনাস্তি। 'রাজরাস্তা' বলিতে সরল একটা পথই নাই, মনে হয়—যে যেখানে পাইয়াছে যথেচ্ছভাবে দোকান গাড়িয়া বসিয়া আছে, রাস্তাই তাহাদের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে ঘুরিয়া বাঁকিয়া যেন তেন প্রকারে নিজের একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। সেই সঙ্কীর্ণ গলি সঙ্কীর্ণতর হইবার মুখে একটা মোড়ের মাথায় গাড়ী থামাইয়া চালক মহাপ্রভু সসম্ভ্রমে জানাইলেন গাড়ীর আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই অতএব নামা দরকার। বেশী হাঁটিতে হইবে না—ডানহাতি গলিটা পার হইয়া বাঁহাতি আর একটা ধরিলেই খান চারেক বাড়ীর পরেই দোতলা বাড়ী, কাঠের সিঁড়ি দিয়া সটান উপরে উঠিয়া গেলেই গন্তব্য স্থান মিলিবে। লোকটা ইংরাজি জানে, ভদ্র-গোছের চেহারা, ভাড়া মিটাইয়া দিয়াও তাহাকে সেখানেই অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া দুরু দুরু হৃদয়ে অগ্রসর হইলাম। কি জানি বাবা গাড়ীটা ছাড়িয়া দিলে ফিরিতে পারিব কি না।

পরবর্ত্তী ঘটনার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, এইটুকু বলিলেই বোধ করি যথেষ্ঠ হইবে যে—নিজে নিজেই স্বীকার করিলাম যে সাবালক হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে আমার। পূর্ব্ব দক্ষিণ ঈশাণ নৈঋত কোন পথেই অভীষ্ট স্থান খুঁজিয়া পাই নাই শেষ পর্য্যন্ত—একই পথে পাঁচবার ঘোরাঘুরি করিয়া

অন্যের সন্দেহভাজন হইবার ভয়ে পূর্ব্ব পরিচিত মোড়ে ফিরিয়া আসিলাম, দেখি ট্যাক্সির কোনো চিহ্ন নাই। কেন গেল—কোথায় গেল—সেই জানে। আবার—এটা যে সেই মোড়টাই কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া গেল। সব দোকানগুলাই এক ধরণের, সব মুখগুলাই এক ছাঁচের।

ঠিক এই সময়—সারাদিনের বর্ষণোন্মুখ আকাশ বর্ষণমুখর হইয়া উঠিল। কথাটা শুনিতে কবিত্বের মত কিন্তু সত্য বলিতে কি আসলে মনের অবস্থা যা দাঁড়াইল তাহাকে ঠিক কবিত্বের কোঠায় ফেলা চলে না।

কোনো রকমে মাথাটা বাঁচাইয়া একটা জুতার দোকানের শেডের নীচে দাঁড়াইলাম……—বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নাই। পড়ন্তবেলা মেঘের ছুতায় অসময়ে নোটিশ দিয়া গেল, কাজেই সন্ধ্যাদেবী আসিয়া চার্জ্জ বুঝিয়া লইলেন। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেই লাগিলাম।

দোকানদারটার সঙ্গে ইংরাজীতে একটু আলাপ জমাইতে চেষ্টা করিয়া করিয়া ব্যর্থ হইতে হয়, লোকটা—নীরেট ব্রহ্ম।

পাশেই একটা রুমালের দোকান হইতে—ওয়ালা নয়—ওয়ালী বোধহয় আমার দুরবস্থায় দয়াপরবশ হইয়া ভিতরে গিয়া বসিতে অনুরোধ জানায়, ভাষা না বুঝিলেও ভাব বুঝি—কিন্তু মার সনির্ব্বন্ধ সাবধান বাণী মনে পড়িল, কাজেই সবিনয়ে তাহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া ভিজিতেই থাকি।

একেই বলে সুখে থাকিতে ভূতের কীল খাওয়া! কি এত প্রয়োজন পড়িয়াছিল সুখের কলিকাতা ছাড়িয়া এই ভাগাড়ে আসিয়া মরিতে? ভদ্র-লোকের জায়গা নাকি? সুরেশ চিরকেলে ডাকাবুকো, ওর এসব হতচ্ছাড়া জায়গা পোষায়··আমি? নমস্কার বাবা! আপাত দৃষ্টিতে এই জলেজলময় নোংরা ঘিঞ্জি পাড়াটাকেই সারা ব্রহ্মদেশের প্রতীক বলিয়া মনে হয়।

বৃষ্টি যখন ধরিল তখন রীতিমত অন্ধকার। অনেক অনুসন্ধানে একখানী অশ্বযান সংগ্রহ করিয়া চড়িয়া বসি, গাড়োয়ানটার মুখে দুই একটা বোধগম্য হিন্দি শুনিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল। সুরেশের ঠিকানাটা বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া গুছাইয়া বসিলাম। তখনো টিপ্‌টিপি বৃষ্টির বিরাম নাই, ভিজে পোষাকের উপর জোলো হাওয়া লাগায় দস্তুরমত শীত করিতেছিল।

গাড়ী চলিতেছে···আমি ঢুলিতেছি···পথ ফুরাইবার লক্ষণ মাত্র নাই। প্রথমে ভাবি—হাজার হো'ক ঘোড়ার গাড়ী, চল্লিশ মাইল স্পীড্ আশা করাই অন্যায়, ন্যায্য সময়ে পৌঁছাইয়া দিবেই। গাড়োয়ানী করিয়া খায়, ঠিকানা দিলে পথ চিনিবে না?

হায়—মূঢ় হৃদয়! কি ভুলই করিয়াছ! এই বিশাল জগতে কোটি কোটি লোক পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, আর—এতো তুচ্ছ একটা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান।

ভুল যখন ভাঙিল তখন রাত্রি দশটা, হঠাৎ চমক ভাঙা হইয়া মনে হইল সারারাতই বুঝি চলিতেছি···হয়তো বা ব্রহ্মদেশ হইতে বঙ্গদেশেই আসিয়া পড়িলাম। অগত্যা গাড়ীর জানালা খুলিয়া তারস্বরে চেঁচাই, বুদ্ধিমান মহাপুরুষটি আমায় হয়তো মাতাল ঠাওরাইয়া যথেচ্ছা চরিয়া বেড়াইতেছিল, সাড়া পাইয়া গাড়ী থামাইল এবং নামিয়া ভাড়া চাহিল।

বলা নিষ্প্রয়োজন সুরেশের বাড়ীর চিহ্নমাত্র সেখানে নাই।

কাতর আমি, দীন ভাষায় করুণ ভঙ্গীতে বারবার নিজের গন্তব্য স্থানের বিষয় প্রশ্ন করি···উত্তরে হতভাগা যাহা জানাইল তাহার তাৎপর্য্য এই—ভুল-ক্রমে উল্টাপথে আসা হইয়া গিয়াছে। অতএব এই রাত্রে—এই দুর্য্যোগের রাত্রে ফিরিয়া সে পথ খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব! অসঙ্গত বলিলেও নাকি অন্যায় হয় না। ঘোড়া রীতিমত 'টায়ার্ড' হইয়া পড়িয়াছে—কাজেই সে বাধ্য হইয়া আমাকে এই অনাথ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া নিজের আস্তানায় যাইতে চায়, শুধু তা'র আগে—চায় তাহার প্রাপ্য ভাড়া—নগদ তিন টাকা বারো-আনা মাত্র।

সেই অবর্ণনীয় মানসিক অবস্থাতেও ধৈর্য্য অবলম্বন করি, চুপ করিয়া থাকি, গালাগাল দিয়া গাত্রদাহ মিটাইব সে সাহস নাই। সরু গলির ঝাপসা মিটমিটে আলোয় সেই বাঘমুখো মগ গুণ্ডাটার পানে চাহিয়া আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হইবার জোগাড়। গালমন্দ তো দূরের কথা।

আহাম্মুকির উপর আহাম্মুকি—পকেটে বাড়তি কতকগুলা টাকা। খরচের সুবিধা করিতে গোটা পঁচিশ টাকা এক টাকার নোটে চেঞ্জ করিয়া লইয়াছিলাম, সেটা পকেটেই রহিয়া গিয়াছে। যদিও কোটের ইন্‌সাইড্ পকেটে লুকানো

আছে তবু ভরসা বলিতে কিছুই নাই। লোকটা যদি একবার আমার হাতটা চাপিয়া ধরে—টাকাতো টাকা হাতে বাঁধা ঘড়িটা হইতে চোখের চশমাখানা পর্য্যন্ত খুলিয়া উহার অপর হাতে তুলিয়া দিব এ বিশ্বাস রাখি।

অতএব তাহার বোকামীর জন্য কৈফিয়ত চাহিবার পরিবর্ত্তে নিজের বোকামীর খেসারত ধরিয়া দিই। পার্স খুলিয়া নগদ কর্‌করে আস্ত টাকাই চারটে দিই। চার আনা কাটিয়া লইবার কথা মুখেও আনি না।

গুণ্ডাকৃতি হইলেও বোধ হয় নেহাৎ গুণ্ডা নয় লোকটা, আমার বদান্যতায় খুসীই হইল। বাঘ মুখে নেকড়ের হাসি হাসিয়া দিব্য আপ্যায়িতের ভঙ্গীতে সেলাম ঠুকিয়া জানাইল—ভাবনার কারণ কিছুই নাই, যৎসামান্য মূল্যের বিনিময়ে রাত্রিটুকুর মত আশ্রয় এখানে না কি বিস্তর মেলে, চাই কি আহারও জুটিতে পারে।

অনির্দ্দিষ্ট ভাবে একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লোকটা খোস্ মেজাজে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। মিথ্যা বলিব না—চারিদিক চাহিয়া হঠাৎ মনে হইল সারা পৃথিবী কেবলমাত্র সরিষার ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে।

নোংরা অপরিসর গলি, দু'ধারে ইতর বস্তি, বাঁকাচোরা জোড়াতালি দেওয়া কুশ্রী ঘরগুলা যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িতে চায়। গাড়ী ইহার ভিতর আসিল কেমন করিয়া এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

এখন উপায়?

ও তো বলিয়া গেল রাত্রির মত আহার ও আশ্রয় মেলে—কোথায় সে? কেমন আশ্রয়? নিশ্চয় হোটেল—সস্তার হোটেল। আহার চুলায় যাক্, আশ্রয় একটা অবশ্যই চাই। এইতো—আবার বৃষ্টি নামিল, সারারাত দাঁড়াইয়া কিছু আর ভেজা চলে না। তবে হাঁ, তেমন সন্দেহজনক ভাবে পথের কোণে দাঁড়াইয়া থাকিলে রীতিমত আশ্রয় মিলিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়; রাজার অতিথিশালা। সরকারি আশ্রয়। কিন্তু আপাততঃ তাহাতে তেমন উৎসাহ বোধ করি না।

'যা থাকে কপালে' গোছ ভাবে সামনের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকি। দুর্য্যোগের রাত—তাই ইতিমধ্যেই পাড়াটা নিঃঝুম মারিয়া গিয়াছে, ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ। আমি? মনে মনে কল্পনা করি···আমি—একা এই মধ্যরাত্রির

নিস্তব্ধ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া একটা কুৎসিত পল্লীর গোপন পথে বেড়াইয়া বেড়াইতেছি ? অসম্ভব ব্যাপার ঘটিতে পারে সহজে, কল্পনা করাই শক্ত।

কিন্তু এই অনির্দ্দিষ্ট যাত্রার সমাপ্তি ঘটে···সহসা অনুভব করি, পথ অনির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, অসীম নয়। বিনা নোটিশে এক জায়গায় থামিয়া বসিয়াছে। ব্লাইণ্ড গলি।

হতভাগা গাড়োয়ানটা যে ইচ্ছা করিয়াই এখানে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ভূতগ্রস্তের মত আবার উল্টামুখ ধরিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে সুরু করিয়াছি, সহসা পিছনে—নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না—পরিস্কার বাঙলায় প্রশ্ন হয়—আপনি কি বাঙালী ?

কণ্ঠস্বর মধুর না হইতে পারে—তলাইয়া দেখি নাই, কিন্তু—পথভ্রান্ত নবকুমারের কানে—"পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছো ?" এর চাইতে বেশী মধু বর্ষণ করিয়াছিল কি ?

চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতেই যেন ধাক্কা খাইলাম।···অথচ—এ ছাড়া—এর চাইতে ভালো কি আশা করিবার ছিল—এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ?

তবে হাঁ—আশা করিবার মত নয়—বাঙ্গালীর মেয়ে—সমুদ্র ডিঙাইয়া এই শত শত মাইল দূরে আসিয়া চোখে কাজল, আর মুখে খড়ি মাখিয়া কুৎসিত জীবন যাপন করিতেছে—এ দৃশ্য যে কতটা অসহ্য সে বোধকরি চোখে না দেখিলে বোধগম্য হয় না।

বয়স হয়ত বেশী নয়—হয়তো বেশী, মুখ দেখিয়া সহসা অনুমান করা শক্ত, লালিত্য বর্জ্জিত মুখে অনেক অনাচারের ছাপ সুস্পষ্ট। একটা মোমবাতি উঁচু করিয়া ধরিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।··

গাটা কেমন ঘিন্‌ঘিন্ করিয়া ওঠে···তবু—বাঙলা কথার মোহ। আর এই বিশ্রী বেঘোর বেপোট অবস্থা। নিতান্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রশ্ন করি—এখানে হোটেল আছে কোথাও ?

হোটেল ? কেমন বিমূঢ়ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্তু সেখানে ? সেখানে কি আপনি থাকতে পারেন ? ভদ্রলোক—বাঙালী।

উপায় কি—রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো সারারাত কাটাতে পারি না? আবার তো জোরে বৃষ্টি আসছে—

যে রকম বীর বিক্রমে কথাটা উচ্চারণ করি যেন আমার এই নিরতিশয় দুরবস্থাও আসন্ন বৃষ্টির জন্য সেই সম্পূর্ণ দায়ী।

সে কিন্তু নিজের দোষই স্বীকার করিয়া লয় যেন—কুণ্ঠিত ব্যাকুল ভঙ্গিতে বলে—সত্যি বড্ড বিষ্টি আসছে যে—কি হবে বলুন তো? সে তো ঠিক হোটেল নয়—বরং ভাঁটিখানা বলতে পারেন, খালি মাতাল গুণ্ডা আর ছোট লোকের আড্ডা—গেলে হয়তো বিপদে পড়ে যাবেন। হয়তো কেন নিশ্চয়ই—

বিরক্তভাবে বলি—এই বা কি সম্পদে পড়েছি? দুর্ভোগ যখন রয়েছে কপালে—

তাইতো—কিন্তু আপনি—আপনি এদিকে এ সময় কেনই বা এলেন?

ইচ্ছে করে মোটেই আসিনি, হতভাগা গাড়োয়ানটা পথ ভুল করে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেল। রাস্তা ফাস্তা কিছুই চিনি না—সবে কাল নেমেছি জাহাজ থেকে—

কাল এসেছেন? কলকাতা থেকে?

বাতির আলোয় ওর খড়ি মাখা পাণ্ডাশ মুখখানা যেন উজ্জ্বল দেখায় হঠাৎ।

হাঁ।

বিরক্ত ভাব বজায় রাখিয়াই উত্তর দিই। দাঁড়াইয়া ইহার সঙ্গে কথা কহিতেছি—মনে করিতেই প্রেষ্টিজে রীতিমত আঘাত লাগে।

কল্‌কাতায়—কোথায়? কোন রাস্তায় বাড়ী আপনার? শ্যামবাজারের দিকে?

কথাটা উচ্চারণ করে কেমন বোকা বোকা সরল মেয়ের মত। রাগ করিবার কথা নয়, তবু এই গায়ে পড়া আলাপে গা জ্বালা করিয়া উঠে। ভাবি যে—পা চালাইয়া চলি—আর কথার উত্তর দিব না।

কিন্তু মধুসূদন নাকি দর্পহারী। ঠিক এই সময় এমন মুষলধারে বৃষ্টি নামে, যে—চোখে কানে দেখিতে দেয় না, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই ঘৃণ্য জীবটার পিছন পিছন তাহারই কোটরে গিয়া ঢুকি।

হাঁ। কোটর ছাড়া তাহার আর বিশেষণ নাই। ঘর বলিলে ঘর কথাটার অবমাননা করা হয়।

জীবনে কোনদিন—জীবনে কেন—ক্ষণপূর্ব্বেও কি ভাবিয়াছি—এরকম আস্তানায়, রাত্রি কাটানো তো দূরের কথা, পা দিব?

মেয়েটা হয়তো তা' বোঝে, আমি যে ভদ্রলোক এবং ওর ঘরটা যে নিতান্তই ভদ্রলোকের অনুপযুক্ত সে জ্ঞানটা ওর আছে।

অথচ—এই দূর নির্ব্বাসনে অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঙালীকে—কলিকাতার লোককে—কাছে পাইয়া যেন হাতে চাঁদ পায়। কোথায় বসাইবে কি, করিবে ভাবিয়া দিশাহারা হইয়া ওঠে।

খাতির জিনিষটার এমনি গুণ অতি বিরূপ চিত্তকেও ঈষৎ নরম করিয়া আনে, কাজেই অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবে বলি—

থাক্ থাক্ ব্যস্ত হতে হবে না। এই যে এই চেয়ারটায় বসছি।

গৌরব করিয়া—অথবা অন্য নামের অভাবে—চেয়ারই বলি, হয় তো—এক সময় ছিলই তাই, এখন টুল বলিলেও অন্যায় হয় না।

তাহার উপরই বসি, তা' ছাড়া আছেই বা কি ঘরে? আসবাবের মধ্যে তো এই ময়ূর সিংহাসন, আর তিনপদ বিশিষ্ট একখানি চৌকী, যাহার চতুর্থ চরণের স্থান অধিকার করিয়াছে একটা উপুড় করা প্যাকিং বাক্স্।

চৌকির উপর বিছানা পাতা, তাকাইলে ঘৃণা হয়, যেমনি ময়লা তেমনি ছেঁড়া। মেয়েটার শরীরে সাধারণ জ্ঞান কিছু আছে, আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তাড়াতাড়ি সেই দৃষ্টিকটু জিনিষটা গুটাইয়া চৌকির পিছনে ফেলিয়া দেয়; চৌকির তলা হইতে টানিয়া বাহির করে একখানা ক্যাম্প চেয়ার। ধূলায় ভর্ত্তি হইলেও জিনিষটা আস্ত। আঁচলে ধূলা ঝাড়িয়া সেটা পাতিয়া বসিতে অনুরোধ করে।

ওরই যেন মাথা কিনিয়া লইতেছি এইভাবেই গিয়া বসি। অথচ না বসিয়াও উপায় ছিল না। পিঠ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। একে গত ক'দিনের সমুদ্রপীড়ার দুর্ব্বলতা তাহার উপর এই দুর্ভোগ।

মেয়েটা নিরুপায় ম্লান মুখে প্রশ্ন করে—আপনার তো খাবার দরকার ছিল?

এখানে খাওয়া ? ভাবতেই গা কেমন করিয়া আসে, তাড়াতাড়ি বলি—না না খাবার দরকার কিছু মাত্র নেই।

থাকলেই বা কি করতাম—কণ্ঠস্বরে করুণ একটা হতাশভাব ফুটিয়া ওঠে—এখানে এক গ্লাস জল খাবারও প্রবৃত্তি হ'বে না আপনার, কোনো ভদ্র-লোকেরই হবে না।

হঠাৎ একটু করুণার সঞ্চার হয়, আহা বেচারা, নামিয়াছে বটে—জাহান্নমের তলায় তলাইয়া গিয়াছে হয়তো—তবু—কতখানি নামিয়াছে সে জ্ঞানটাই এখনো হারায় নাই।

একটু লঘুভাবে বলি—ভিজে পোষাক গায়ে দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জলের দরকার কিন্তু সত্যই হয় না।

ও মলিন ভাবে একটু হাসে,—কিন্তু চা পেলে তো ভালো হ'ত ? কোনো ভালো জায়গায় যদি উঠতেন ভিজে পোষাকও বদলাতে পেতেন, গরম খাবারও খেতে পেতেন।

কি আর করা যাবে ভাগ্যে নেই যখন ?

অগত্যাই একটু হাসিতে হয়।

বাতিটা আমারই মুখের সামনে বসানো আছে। ওর মুখটা অন্ধকারে অস্পষ্ট। মুখের সেই কুশ্রী লালিত্যহীনতা, খড়ি কাজলের বিকৃতি, কিছুই আর চোখে পড়ে না।

হয়তো কথা কওয়া সহজ হইয়া আসে সেই জন্যই।

নিতান্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই বা কেমন লাগে ? ঘুম—আসিবে না—আসা সম্ভব নয়, সারারাত্রি এই অদ্ভুত অস্বস্তিকর অবস্থায় প্রায়ান্ধকার ঘরে এক অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তির সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়া থাকাই বা সম্ভব হয় কেমন করিয়া—চুপচাপ ? কথা কওয়াই সহজ বরং। অরুচিকর হইলেও অশান্তি-কর নয়, মন্দের ভালো।

নিজেই কথা পাড়ি—আমি যে বাঙালী, জানলে কি করে ?

কথা শুনে।

কথা শুনে ? অবাক হইতে হয়—কথা আবার কখন কইলাম ? কার সঙ্গে ?

নিজের সঙ্গেই, সেই যে যখন পথ বন্ধ দেখে ফিরলেন? বললেন "কি সর্ব্বনাশ"।

অসম্ভব নয়, অজ্ঞাতসারেই বলিয়া থাকিব। বলি—রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলে না কি?

রাস্তায় নয়, জানালায়। এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম—বিষ্টি দেখছিলাম, দেখলাম আপনি যাচ্ছেন—এ পাড়ায় এ রকম সুট্ পরা ভালো ভদ্রলোকের তো আনাগোনা বিশেষ দেখি না, বস্তি গুণ্ডা, আর মুসলমান খালাসীর আড্ডা। কৌতূহল হ'ল, বাতি জ্বেলে দরজাটা খুলেছি—দেখি ফিরে আসছেন তাড়াতাড়ি। থাকতে পারলাম না ডেকে ফেললাম। আপনার গলা শুনে—বাঙলা কথা শুনে—ইচ্ছে হ'ল পুজো করি।

হাসিয়া ফেলি—কেন বাঙলা কথার এত দুর্ভিক্ষ না কি? বাঙালী তো এখানে অজস্র আছে?

আছে তো কিন্তু এদিকে আসবে কেন তারা? মানুষে কি আসে এখানে? পিশাচ পুরী। কারা আসে জানেন? শয়তান আর রাক্ষসের দল। নরকের কীট, আর আমাদের মত আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা।

ওর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শেষের দিকটা হতাশায় ভাঙিয়া পড়ে।

কেমন যেন একটু মমতা জন্মায় মেয়েটার ওপর। ঈষৎ কোমল সুরে প্রশ্ন করি—তা' তুমি এখানে আছ কেন? এত দূরে এসে পড়লেই বা কি করে?

সে অনেক ইতিহাস। শুনলে হয়তো আপনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আজ সাত বছর ধরে যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি তা' মনে করলে নিজেই শিউরে উঠি, আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে এত লাঞ্ছনাতেও বেঁচে আছি কি করে! তবু—বেঁচেও রয়েছি। আশা হয়, হয়তো—আবার কখনো মানুষের মতন করে বাঁচবো। এই হীন জঘন্য জীবনই যে আমার একমাত্র জীবন এ আমি এখনো ভাবতে পারিনে।

আহা বেচারা! হয়তো ভালো ঘরেরই মেয়ে ছিল। কে জানে কি ওর ইতিহাস।

শ্যামবাজারে তোমার কেউ আছে বুঝি? প্রশ্ন করি।

কেউ? সব সব সব্বাই আছে আমার সেখানে। আমাদেরই বাড়ী

যে—দেখেননি আপনি? বাজারের দিকে যেতে ডান হাতি গোলাপী রঙের বাড়ী? পাশের দিকে দেওয়ালে একটু একটু শ্যাওলা পড়া? রঙ চটা সবুজ জানালা দরজা? মেরামত করা আর হয়ে ওঠে না—দেখেছেন তো সে বাড়ী?

নিত্য পথের দুই ধারে ও রকম বাড়ী অজস্র দেখিয়াছি, আলাদা করিয়া মনে রাখার কথা নয়, তবু ওর আগ্রহব্যাকুল ভাবটা দমাইতে ইচ্ছা হয় না, অল্প চিন্তার ভান করিয়া বলি—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে যেন—দেওয়ালের বালি টালিও কতক খসে গেছে, শ্যাওলা তো বিলক্ষণ।

ঠিক্ ঠিক ধরেছেন আপনি—উৎসাহে আর উত্তেজনায় ওর গলার স্বর যেন বুজিয়া আসে,—সেই বাড়ী। হ্যাঁ খারাপ হয়ে তো যাবেই আরো, তারপর থেকে সাত বছর হয়ে গেল। বাবার কি আর বাড়ী মেরামত করবার সখ আছে? মুখে চুণ কালি পড়ে গেছে। উঃ।

আচ্ছা জ্ঞানপাপী বটে। আপক্ষাকৃত কঠিন সুরে প্রশ্ন করি—যাতে চুণ কালি পড়ে এমন কাজ করলে কেন?

নিয়তি আমার। বয়স ছিল কম, বুদ্ধি বিবেচনা আরো কম। চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়া মানেই যে আগুণে ঝাঁপ দেওয়া এ যদি জানতাম তখন।

গম্ভীর একটা নিশ্বাস ঘরের রুদ্ধ বাতাসকে আরো মন্থর করিয়া তোলে।

নিস্তব্ধতা ভাঙে ওই আগে—আপনি রাগ করছেন, কিন্তু যদি শুনতেন আমার দুঃখের জীবনের কাহিনী, বুঝতেন কত অসহায় আমরা। ভেবে দেখুন দিকিন, মাত্র পনের ষোলো বছরের একটা মেয়ে—জ্ঞান-বুদ্ধিহীন, বিদ্যে যার ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত—

—ইস্কুলে পড়েছিলে নাকি? কোন ইস্কুলে?

বাধা দিয়া প্রশ্ন করি।

—পড়েছি বীণাপাণি স্কুলে। আমার নিজের নামটাও আবার বীণাপাণি ছিল—মেয়েরা এত ক্ষেপাতো—

আমার ভাইঝিটাও বীণাপাণিতে পড়ে, ক্লাশ নাইনেই পড়ে। মনে পড়িতেই—বিদ্বেষবিমুখ চিত্ত অজ্ঞাতসারেই কেমন যেন স্নেহকোমল হইয়া আসে।

মমতার সঙ্গে শুনিতে থাকি—ওর উৎপীড়িত জীবনের শোচনীয় ইতিবৃত্ত। ...ক্ষুধিত বর্ব্বরতার নৃশংস কাহিনী...হয়তো এমনিই হয়, এমনিই ঘটে, এ কাহিনীতে মৌলিকত্ব কিছুই নাই। তবু বড় ভয়ঙ্কর, বড় করুণ।

প্রচ্ছন্ন প্রেমের বেদনায় মধুর সুন্দর যে হৃদয় অম্লান ফুলের মত পাতার অন্তরালে নিঃশঙ্কে ফুটিয়া থাকিতে পারিত, পশুর দুর্দ্দান্ত লালসা তাহাকে ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দিয়াছে ধূলিধূসর রাজপথে, টানিয়া লইয়া গিয়াছে কঙ্করাকীর্ণ কঠিন প্রান্তরে, ঠেলিয়া দিয়াছে কাঁটার জঙ্গলে। সেখানে কত সংগ্রাম, কত ঝড়।

ঝড়ের ঝাপটে তুচ্ছ তৃণ খণ্ড কোথা হইতে কোথায় উড়িয়া পড়ে কে তাহার হিসাব রাখে?

একদা যাহার নাম ছিল বীণাপাণি, অতি সাধারণ এক গৃহস্থ ঘরের চারিখানি দেওয়ালের অন্তরালে কল্যাণী মূর্ত্তিতে বেড়াইত, আজ আর তাহাকে মনে রাখিবার দায়িত্ব কাহারও নাই।

জানিতে চাহিলে হয়তো বলিবে—বীণাপাণি বলিয়া কেহ ছিল না। বীণাপাণি বলিয়া যে ছিল—মরিয়াছে।

পুরুষ মানুষ হইলেও ঘরের বাহিরের যথার্থ পরিচয়টা কি, ছদ্মবেশী দুনিয়াখানার আসল চেহারা কত ভীষণ সে সম্বন্ধে সত্যই কোনো বোধ ছিল না, মানুষের মুখে উপন্যাসের ঘটনা শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়ি। উপন্যাস বটে—অক্ষম লেখকের কুলিখিত উপন্যাস। কিন্তু ফিরাইয়া লেখা চলে না? ফিরাইয়া দেওয়া যায় না ওকে—সুন্দর না হো'ক—সরল জীবন? নিশ্চিন্ত জীবন?

আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করি—তুমি পালাতে চেষ্টা করো না কেন?

—পালাতে? কি ক্ষমতা আমার? এরা যদি জানতে পারে—কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে। এদের তো জানেন না আপনি? কথায় কথায় ছোরা দেখিয়ে শাসায়, এতটুকু অবাধ্য হলে লোহা তাতিয়ে ছ্যাঁকা দেয়। মানুষের চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় পিশাচ, রাক্ষস, শয়তান, নরকের কীট। এখন যার অধীনে আছি আমি—বুড়ো চীনেম্যান একটা, ও রকম জঘন্য প্রকৃতির লোক পৃথিবীতে আর আছে কিনা ঈশ্বর বলতে পারেন।

শুধু—অর্দ্ধেক দিন নেশায় বেহুঁস্ হয়ে পড়ে থাকে এই সুবিধে। একটা মগ গুণ্ডার কাছে তিরিশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল আমায়, সে লোকটাই কি কম সাংঘাতিক ছিল? তিনটে খুন করেছিল সে। এই যে আপনি বসে আছেন তা'দের চোখে পড়লে আস্ত রাখতো?

অজ্ঞাতসারে কাঁপিয়া উঠি···সভয়ে পিছনের অন্ধকার পানে তাকাই··· কি জানি কেহ ছোরা উঁচাইয়া নাইতো?

বীণাপাণি আমার অবস্থা বুঝিয়া অল্প হাসে, বলে—নাঃ আজ আর ভয়ের কিছু নেই। আজ ওরা ডাকাতি করতে যাবে এক জায়গায়, কাল সন্ধ্যার আগে আসবে বলে মনে হয় না।

আশ্বাসের কথা শুনিয়া হাতে পায়ে খিল ধরিয়া আসে।···কি সব ভয়ঙ্কর কথাবার্ত্তা! দুই হাত ব্যবধানের মধ্যে স্বচ্ছন্দে সহজ ভাষায় যাহার সঙ্গে গল্প করিতেছি সেই মেয়ে ডাকাতের ঘর করে! ঘরের যাহারা বাসিন্দা, হয়তো এই ঘরে বসিয়া ছোরা শানাইয়াছে মানুষের বুকে বসাইতে। এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ভিতরটা ছট্‌ফট্ করিয়া ওঠে। কিন্তু সকালের এখনো অনেক বাকী, তবু তো ঘরে আছি, পথে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে কেহ এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিবে কিনা তাহারই বা নিশ্চয়তা কি।

হতাশ ভাবে বলি—তা'হলে তোমার দেখছি কোন আশাই নেই।

ত্রস্তভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া বীণাপাণি চুপি চুপি বলে—চুপ্, দেওয়ালের কাণ আছে জানেন তো? আশা ছিল না—একটু হয়েছে, আপনার কাছে অবশ্য বলতে বাধা নেই, বাঙালী—ভদ্রলোক, এক রকম বন্ধুই আমার। উপায়টা কি জানেন—স্কুলে যখন পড়তাম, সেলাই শেখাতেন মিশনরি মেম একজন, মিসেস উড্। বিপন্ন মেয়েদের উদ্ধার করা বা তা'দের সৎপথে চলবার সুযোগ দেওয়াই তাঁর জীবনের ব্রত। অনেক চেষ্টায় তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সব কথা অবশ্য খুলে বলতে পারিনি, মানুষে পারেও না, বলেছি বিধবা—নিরাশ্রয়। তিনি আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছেন, লিখেছেন—তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলেই, আমার ভার নেবেন। তা'— পৌঁছতে হ'লে চাই টাকা—আর সুযোগ। পালাবার সুযোগ। মনে করেছি শেষ চেষ্টা একদিন করবোই—প্রাণপণ করে করবো। কথায় বলে—"মরার

বাড়ী গাল নেই"—তা' মরেই তো আছি এক রকম। মনে করেছি সরে পড়বো, বাঁচি বাঁচবো, মরি মরবো। চীনে বুড়োকে জলের সঙ্গে ঘুমের ওযুধ দিয়ে—দিনের বেলাই পালাতে হয় বুঝলেন? রাত্রে বেরোলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশী। এখানকার লোকগুলো নিশাচর কিনা। আঃ একবার যদি যেতে পারি। মিসেস উডের আশ্রয়ে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়, যেখানে অন্ততঃ পুরুষ মানুষ নেই। পৃথিবীর বাইরেও যদি এমন কোনো দেশ থাকতো—যেখানে পুরুষের মুখ দেখতে হয় না।

ঈষৎ আহত ভাবে বলি—সব পুরুষ মানুষই কি সমান?

—বেশীর ভাগ। বিষাদম্লান কণ্ঠে উত্তর দেয় বীণা—আপনার মতন মহৎ আর ক'জন আছে বলুন?

—মহত্ব তো কত? বিনয় করিয়া বলি।

—আছে, আপনি বুঝবেন না। বয়সে বড় হ'লেও অনেক ছেলেমানুষ আছেন এখনো। সে যাক্ কিন্তু একটুও ঘুম হ'লোনা আপনার, অসুখ করবে।

হঠাৎ খেয়াল হয় সত্যই ভারী ঘুম পাইতেছে। কিন্তু ঘুমোনো চলে না, তবে—শুধু ক্লান্তি দূর করিতে চোখের পাতা দুইটা বুজিয়া চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলেও একটু আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু একে কিছু সাহায্য করিতেই হয়, টাকা সঙ্গে যখন আছেও কিছু।

একটু চুপ করিয়া বলি—টাকার কি করেছ?

—টাকা?

হঠাৎ ও চৌকি হইতে উঠিয়া আমার একান্ত কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, অস্বাভাবিক ভীত কণ্ঠে প্রায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে—আপনাকে যখন সবই বললাম—তখন বলি, টাকার জোগাড় কতকটা হয়েছে। দু' আনা এক আনা করে আস্তে আস্তে কিছু জমিয়ে ফেলেছি। বস্তির কারো কারো জামা টামা সেলাই ক'রে দিয়ে, ছেঁড়া রিফু ক'রে, মাঝে মাঝে দু'চার পয়সা পাই; ওখানে একটা বুলো মেয়েমানুষ আছে, কিছু করতে পারে না—তা'র রান্না করে দিয়ে আসি লুকিয়ে, সেও মাসে মাসে কিছু দেয়, তা' ছাড়া—চীনেটার যেদিন মন ভালো থাকে—

একটু ঢোক গিলিয়া চুপ করিয়া যায়।

আবার কিছুক্ষণ পরে পুর্ব্বকথার জের টানিয়া বলে—তবু এখনও আরও পাঁচ সাত টাকা হ'লে ভালো হয়, প'রে যাবার মত একটা ভদ্র কাপড় জামাও নেই। কিন্তু কতদিনে যে হবে ভগবানই জানেন, যদি একবার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে ওরা টাকার কথা, ঠিক কেড়ে নেবে, খুন করে কেড়ে নেবে। এক একটি পয়সা আমার এক এক ফোঁটা রক্ত। প্রত্যেকটি টাকা আমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এও তবু এক রকম আছি—চীনেটা কি বলে জানেন? একটা খালাসির কাছে নাকি বেচে দেবে! জাহাজের খালাসি—চাটগেঁয়ে মুসলমান। কী ভয়ঙ্কর চেহারা, দেখলে আপনি পুরুষমানুষ—হয়তো মূর্চ্ছা যেতেন। এসেছিল একদিন—দরে বনল না। ওর হাতে পড়ে গেলে আর কোন ভরসা দেখি না—আগেই যাতে পালাতে পারি এই দিন রাত্তিরের প্রার্থনা। ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন? যখন ভাবি—আবার কলকাতায় যেতে পাবো, ভদ্রলোকের মতন দিন কাটাতে পাবো এত যন্ত্রণাও যেন সহ্য হয়ে আসে। স্বর্গের আশায় নরকযন্ত্রণা ভোঁলা আর কি? আচ্ছা এততেও কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নি আমার?

উত্তর দিবার কথা খুঁজিয়া পাই না বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি বাকী টাকাটা আমিই রাখিয়া যাইব—কাছেই তো আছে। ওর ব্যাকুলতা ও আসন্ন বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া মনে হয় এখনি এই দণ্ডেই যদি উহাকে এই ক্লেদাক্ত সংস্রব হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইতে পারিতাম?

নিতান্তই অসম্ভব কি? মনকে প্রশ্ন করি—উত্তর পাই না। আমার নাবালকত্বই বিবেককে মূক করিয়া রাখে।

সাহস কোথায়? সমাজের ভয়! সুনামের ভয়—সংস্কারের ভয়—নামহীন অজানা ভয়।

•

চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখি রীতিমত সূর্য্যালোক। মেঘমুক্ত আকাশ যেন গতরাত্রের সমস্ত দুর্য্যোগকে ব্যঙ্গ করিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে। হঠাৎ, ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

দিনের আলোয় চারিদিকে চাহিয়া ঘৃণায় সর্ব্ব শরীর সঙ্কুচিত হইয়া আসে। ময়লা দুর্গন্ধ জামা কাপড়ের রাশি, ছেঁড়া জুতার পাটি, ভাঙা সোরাই, ফুটা এনামেলের গ্লাস, ধূমপানের সরঞ্জাম ইতঃস্তত ছড়ানো। মেঝের ধূলা যে কতদিন ঝাড়া হয় নাই ঈশ্বর জানেন। পোড়া দেশলাই কাঠির স্তূপ তাহার নীরব সাক্ষী।

একটা ইতর ব্যক্তির রাত্রিবাসের চিহ্ন সম্বলিত এই কুৎসিত ঘর খানায় রাত্রি যাপন করিয়াছি মনে করিতেই যেন বমি আসে।

বীণাপাণি ঘরে নাই।

না বলিয়া চলিয়া যাওয়া যায় না, অথচ তিলার্দ্ধ সময় এখানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে রুচি হয় না। অধৈর্য্য ভাবে মিনিট দুই পায়চারি করি। ডাকিবারই বা সুবিধা কই? কোথায় গেল পাত্তাই নাই।

দূর ছাই টাকাটা এইখানে রাখিয়া সরিয়া পড়ি। আসিলেই যাহাতে চোখে পড়ে এমন ভাবে রাখিতে হইবে। গোটা দশ? না আরো কিছু বেশী?

ভিজা কোটটা খুলিয়া চেয়ারের পিঠে রাখিয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি গায়ে দিয়া ভিতরের পকেটে হাত দিই।.........

টাকা নাই।.........

পঁচিশ খানা নোট, একখানাও নাই, চিহ্নমাত্র নাই। অথচ—পাশের পকেটে পার্স টা ঠিক আছে। ইহাকেই বলে ধূর্ত্তামি! সহজে যাহাতে ধরা পড়িতে না হয়।......

প্রভাত সূর্য্যের নির্ম্মল আলো...যেন নিবিড় অন্ধকারে পরিণত হয়...মাথা ঝিমঝিম্ করে...মনে হয় পড়িয়া যাইব বুঝি।

ভাবি—বীণাপাণি। মানুষ যে কত শয়তান হইতে পারে, সে কথা শুধু গল্প করিয়াই ক্ষান্ত হও নাই, প্রকৃষ্ট উদাহরণও দেখাইলে।

আর একবার নিজের নাবালকত্বকে ধিক্কার দিই। কত সহজেই অভিভূত হইয়া পড়ি? দুইটা করুণ কথা—দুই বিন্দু চোখের জল।

অথচ আজীবন শুনিয়া আসিতেছি—উহারা ছলনাময়ী, অভিনেত্রীর জাত।

কিন্তু এমনি একটা বাজে মেয়ে—অনায়াসে জিতিয়া যাইবে?

টাকাটা এমন কিছু অগাধ নয়, পকেট মারা গেলে সহিত, কিন্তু—এ ক্ষতিটা যেন অসহ্য।

নাঃ টাকা আমি বাহির করিবই—করিতে হইবেই—দেখি চোরের উপর বাটপাড়ি চলে কি না। ঘৃণা বিসর্জ্জন দিয়া ঘরের জিনিষ পত্র ওলট পালট করিয়া খুঁজি—রাখিবে কোথায় ? বাক্স ফাক্সর বালাই তো ঘরে নাই।

অবিশ্বাস্য কথা সত্য হইলেও নাকি গোপন রাখাই রীতি, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের তাই মত, তবু— না বলিয়া পারি না হারানিধি ফিরিয়া- পাইলাম। সহসা—যেন দৈব নির্দ্দেশেই চোখে পড়িয়া যায়।

দেওয়ালের গায়ে মহাত্মা গান্ধীর একখানা ধূলি ধুসরিত বিবর্ণ ছবি টাঙানো—তাহারই পিছনে পুরোনো খবরের কাগজে মোড়া একটা ছোট বাণ্ডিল উঁকি মারিতেছে।

সন্দেহ থাকে না—পাড়িয়া লই। দ্বিধা করিবার আছেই বা কি ? একটী একটী করিয়া গণিয়া লই পঁচিশ খানি নোট। এক টাকার।

নাঃ, একটা কম—বোধকরি এখনি খরচ করিতে লইয়া গিয়াছে। এইবার আসিয়া বুঝিও বীণাপাণি, বুদ্ধি তোমার একচেটে সম্পত্তি নয়।

বিনাবাক্যে চুলগুলা হাত চালাইয়া পাট করিয়া টুপিটা মাথায় চাপাই, ট্রাউজারের পা দুইটা টানিয়া চোস্ত করি, রুমাল ঘসিয়া মুখের যতটা উন্নতি সাধন সম্ভব সারিয়া গম্ভীর চালে বাহির হইয়া পড়ি।

ভগবানের কাছে একমাত্র কামনা, যেন পরিচিত কাহারও চোখে পড়িতে না হয়।

কিন্তু পড়িতে হয়—ক্ষণকাল পূর্ব্বে যাহার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম—সেই বীণাপাণির চোখে। দুই হাতে দুইটা জল ভরা বালতি ; কোন চুলা হইতে ভরিয়া আনিয়াছে কে জানে।

আমাকে দেখিয়া রীতিমত থতমত খাইয়া যায়। যাইবারই কথা !

বলে—আপনি চলে যাচ্ছেন ? মুখ ধোবার জন্যে ভাল জল আনলাম।

যাক্ যথেষ্ঠ হয়েছে—ব্যঙ্গ হাস্যে ঠোঁট বাঁকাই—এর পর ক্রোধ হয় চায়ের লোভ দেখাবে ? কিন্তু নিজেকে সব সময় অত চালাক ভাবতে নেই, বলেবু

বীণাপাণি ! হ্যাঁ ভালো কথা, তোমাদের ঘরে রাত্রির কাটালে দাম দিতে হয়, না ? এই নাও—

পার্স খুলিয়া দুইটা টাকা অবহেলা ভরে ফেলিয়া দিয়া 'গট্‌গট্‌' করিয়া পথ চলিতে থাকি।

পিছনে চাহিবার প্রয়োজন অনুভব করি না।.........

কোন পথ দিয়া কত পথ ঘুরিয়া কেমন ভাবে যে সুরেশের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইলাম, স্মরণ করিবার ক্ষমতা নাই। শুধু মনে আছে মাথা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, বোধহয় জ্বর আসিতেছে।

আসা বিচিত্র নয়। স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত শরীর।

সুরেশ বোধ করি আমারই প্রতীক্ষায় চিন্তিত মুখে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। আমাকে পায়ে হাঁটিয়া সশরীরে আসিতে দেখিয়া বিদ্রূপ বিরক্তি স্বরে বলিয়া ওঠে—কি হে ছোকরা, রাত বেড়ানো অভ্যাস্ টভ্যাস্ ছিল না কি ? না এখানে এসেই হঠাৎ—

ব্যস্ত ভাবে বলি—ভেতরে চলো সুরেশ, বোধ হয় জ্বর আসছে।

জ্বর আসছে ? বলিস্ কি ? চল্—চল্—

মুহূর্ত্তে ওর মুখের চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটে, উদ্বিগ্ন স্বরে বলে—ব্যাপার কি বল্‌তো ? কাল সারারাত ভোগান্তির একশেষ, খুঁজে হায়রাণ। চেহারা দেখে যে ভয় করছে, হল কি ?

বলছি ভাই সব, আগে জল খাবো একগ্লাস।

সত্য মিথ্যায় মিশাইয়া গত রাত্রের কতকটা বিবরণ দিই সুরেশকে। বীণাপাণির কথা অবশ্য বাদ দিই, দিতেই হয়—মুখে আট্‌কায়।

সুরেশ আমার বিছানার ব্যবস্থা করিতে করিতে মৃদুহাস্যে বলে—ওহে বালক, মায়ের আঁচলটী ছেড়ে চলে আসা উচিত হয়নি তোমার। এই সহরে আজ ছ'বছর কাটালাম—গুণ্ডার টিকিও দেখলাম না, তুমি বাবা দেশে পা দিয়েছ আর তা'র কবলে পড়ে গেছ ? হোপ্‌লেস্। তাছাড়া—এত কেয়ার লেস্ তুই ? একরাশ টাকা সুদ্ধু কোটটা আলনায় ফেলে চলে গেছিস ?

টাকা সুদ্ধু কোট ?

বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকি।

কি এখনো হুস্ হচ্ছে না বাবুর ? যাই ভাগ্যিস্ চাকরটার চোখে পড়েনি, পয়লা নম্বরের চোর ওটা। দেখে আবার সরিয়ে রাখি—এই নে—

বিছানা উল্টাইয়া গদির তলা হইতে এক গোছা নোট বাহির করিয়া আমার হাতে দেয় সুরেশ।

পঁচিশ খানি নোট। এক টাকার। খরচের সুবিধার জন্য কাল যেগুলা ভাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম।…এতক্ষণে খেয়ালে আসে কাল বাহির হইবার আগে গত দুই দিনের ব্যবহৃত কোটটা বদলাইয়া একটা টাট্‌কা ইস্ত্রি করা কোট গায়ে দিয়াছিলাম। নূতন সাহেব। নূতন চাকরী।

সুরেশ আমার তদারকের জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে, হইবে বইকি—ঘর বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশ বিভূঁইয়ে আসিয়া পড়িয়াছি। আসন্ন জ্বরের আচ্ছন্নতায় হঠাৎ এক সময় মনে হয়…অন্ধকার গহ্বরের মুখে দাঁড়াইয়া কাহাকে যেন ঠেলিয়া দিলাম……

ভয়ার্ত্ত একখানা মুখ…বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি……মাথা তুলিয়া শ্বাস লইতে চেষ্টা করে—পারে না।

তলাইয়া যাইতে থাকে…নীচে—আরো নীচে…জাহান্নমের অতল তলায়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

সুবর্ণগ্রাম

কুয়াশা যখন কাটলো তখনি

ভাঙ্গলো রাতের ঘুম কি ?

ঘাসের শাড়ীতে তাই দেখলুম

শালুক ফুলের চুমকি !

ঝিলকিয়ে ওঠে শীর্ণ রেখায়

নতুন নদীর রদ্দুর।

গহন নীলের খুশি ওপচায়

দেখি চোখ যায় যদ্দূর।

লুটিয়েছে মুখ রবি-শস্যেরা,

নিরলস হাতে কাস্তে।

একা বলিভুক খঞ্জনা আসে

পৃথিবীকে ভালবাসতে।

অতলান্তিক উতলা এবং

গিরিশিখর যে ভাঙ্গছে,

সোনার খামারে পড়ে টিপ্-টিপ্

'এসিড' কয়েক চামচে।

হরপ্রসাদ মিত্র

আফিঙ্

নিঝুম রাত বাতাস হিম
ফুটছে সব ঘোড়ার ডিম
বাচ্ছা সব তুলছে রব
খুশী হয়ে বুড়ো খায় আফিঙ্

আফিঙ্ খায় আর ঝিমায়
বলে, কোথা যাস্ এদিকে আয়,
ঐ পাহাড় মেঘ-রাজার
শিরে জ্বল জ্বল লাল-পিদিম।

পিদিম নয় নীল গরুড়
মাথায় তা'র ধুম্র-চূড়
কাল্‌সাপের লাল-মাণিক
নখে চেপে ঠোঁটে করছে চুর।

আহা, অজস্র মণিগুঁড়ায়
ঝিক্‌মিক্ করে বন-চুড়ায়
সহে না ভার বাজে সেতার
ঝরে পড়ে ধূ ধূ শাদা ধুলায়।

এই বনে এই কুঞ্জছায়
রাতের পরীরা ধরেছে কায়,
বাজে নুপুর কী যে মধুর!
সুরেতে বাতাস মূর্চ্ছা যায়।

খুক্ খুক্ খুক্ ওঠে কাশি,
বুড়ো বলে, শোন ভালবাসি
সাত-রাজার সিংহদ্বার
কচি মুখের—আধো হাসি।

হোলো আওয়াজ ভারী পাখায়
ঝাপ্‌টিয়া ডানা উড়ে পালায়,
কার ও ডাক? বুড়ো অবাক,
বুড়ো মরে ব'কে কোন্ আশায়?

কা'র আশায় বুড়ো আকুল
কেউতো নেই? ভাঙা দু'কূল
বুড়ো ঝিমায় রাত্রি যায়
হিমে জড়ায় রাতের ভুল।

শ্রীঅমল ঘোষ

দুর্মদ

এখানে রয়েছে পড়ে পৃথিবীর নগ্ন রূপ যত ;
তারে আমি দেখিয়াছি, ভয়ে লাজে উঠিয়াছি কাঁপি ।
বিস্তীর্ণ উদার মেঘে বিদ্যুৎ আরতি করে কত ;
বজ্রের গম্ভীর কণ্ঠে বিদ্রোহের ধ্বনি ওঠে ছাপি ।
এখানে আসেনি কেহ ফাগুনের মহা উৎসবে,
এখানে পায়নি কেহ বসন্তের নব সমাচার ।
নির্জ্জন অরণ্য মাঝে দেখিয়াছি বিভীষিকা সবে ;
জীবন বীণার মাঝে বাজে নাই নব ঝঙ্কার ।

এখানে জীবন পরে দেখিয়াছি মরুভূমি ধূ ধূ,
হেথায় শুনেছি আমি রক্তের মহা কলরব ।
ঊষর প্রান্তরে তবু আমি একা ছুটিয়াছি শুধু ;
জীবনের বালুচরে শুনিয়াছি তরঙ্গের স্তব ।
মানুষের কামনায় শুনিয়াছি সমুদ্র গর্জ্জন,
দেখিয়াছি জীবনের জীবনেরে পেতে ব্যাকুলতা ।
জীবনের শেষপ্রান্তে জীবনেরে দিতে বিসর্জ্জন ;
কারো মুখে শুনি নাই ত্যাগদৃপ্ত এতটুকু কথা ।

এখানে দেখেছি আমি রক্ত মাখা ধূসর গোধূলি,
রাঙ্গা চোখে রক্ত স্বপ্ন, দেখিয়াছি জাগে বিস্ময় ।
প্রত্যহের রূঢ়তায় ম্লান দেহ মোর দিনগুলি ;
চলে গেছে ধীরে ধীরে যায় নাই রাখি সঞ্চয় ।
এখানে দেখেছি আমি মানুষের ভয়াবহ রূপ,
কঙ্কালের স্তূপ হেরি কাঁপিয়াছে সদা সৃষ্টি প্রাণ ।
স্তব্ধীভূত অন্ধকারে তারকারা করে বিদ্রূপ ;
এখানে নয়নে মোর কে করিবে নব দৃষ্টি দান ।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী

(৪)

গত বারের 'পরিচয়ে' আমরা বৈজ্ঞানিকদিগের মত সংগ্রহ করিয়া পরমাণু যে 'A-tom' নহে—প্রত্যুত যৌগিক পদার্থ—Element নহে, Compound—নিরবয়ব দ্রব্য নহে, সাবয়ব—তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি; এব পরমাণুর যে চরম অবয়ব বৈজ্ঞানিকের Electron বা পরম-পরমাণু—তাহারা কি ভাবে সংহত ও জ্যামিতিক আকারে সজ্জিত হইয়া অক্‌সিজেন, হাইড্রোজেন, পারদ, গন্ধক প্রভৃতি ৯২ প্রকার রাসায়নিক পরমাণু (Chemical Elements) রচনা করে, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছি। Electron বা পরমাণু যদি 'অণোরণীয়ান্' হয়, তবে সৌরমণ্ডলকে (আপেক্ষিক ভাবে) 'মহতো মহীয়ান্' বলা অসঙ্গত নহে। ঐ সৌরমণ্ডল ধ্যানীর দৃষ্টিতে কিরূপে এক অদ্ভুত সপ্তদল সরসিজরূপে প্রতিভাত হয় এবং ঐ সরসিজে কিরূপে বিশ্বনাথের বিচিত্র জ্যামিতিকীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহারও কিছু পরিচয় দিয়াছি।

আমরা দেখিয়াছি, এই যে বিবিধ বিচিত্র বিশাল বিশ্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই কোটিতে বিভক্ত। স্থাবর =Inorganic (নিরঙ্গ), জঙ্গম=Organic (সাঙ্গ)। স্থাবর পদার্থের বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে কোন স্থাবর—উহা ঐ ৯২ জাতীয় মূলভূত বা elements-এর জ্যামিতিক সংযোগ-সংহননে Molecule-দ্বারে ও ভৌতিক শক্তির ক্রিয়াপ্রভাবে রচিত। আর জঙ্গম—যাহার দ্বিবিধ ভেদ—পাদপ ও পশু (মনুষ্যও পশুর অন্তর্গত)—স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ—ঐ জঙ্গমের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রত্যেক জঙ্গম-শরীর কোষাণু বা cell-সমষ্টি দ্বারা গঠিত। যথাস্থানে আমরা জঙ্গমের আলোচনা করিব। প্রথমে স্থাবরের আলোচনা করি।

স্থাবরকে বিজ্ঞান Mineral Kingdom বলেন। আমরা বাংলায় বলি—খনিজ পদার্থ। এই খনিজ রাজ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর কি পরিচয় পাওয়া যায়?

সাগর, ভূধর, নদী, আকাশ, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, ধাতু, শিলা, ক্ষিতি, বাষ্প, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ—এ সমস্তই স্থাবরের অন্তর্গত। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নিচয় সকলই মণ্ডলাকার (spherical), অতএব geometrical। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া এই যে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্র এমন কি ধূমকেতু-(Comet)-গণ স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে—তাহার মধ্যেও জ্যামিতিকী। কারণ, ঐ সকল কক্ষা (orbit) অণ্ডাকৃতি (elliptical)। পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নাঙ্কিত চিত্রে অমৃতবাজার পত্রিকার অনুসরণে আমরা কয়েকটি গ্রহ ও ধূমকেতুর কক্ষা অঙ্কিত করিলাম—
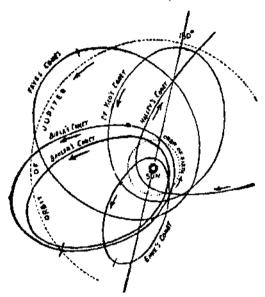
আরও লক্ষ্য করুন নদীর বীচিহিল্লোলে, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে, পর্বতের তুষারময় চূড়ায় এবং প্রান্তরের পুঞ্জীভূত বালুকায়—সর্বত্র Geometry।

কিন্তু এই জ্যামিতিকীর সবিশেষ পরিচয় কৃষ্ট্যালে (crystal)—যাহাকে আমরা স্ফাটিক বলি। এক জন বৈজ্ঞানিক crystal-এর এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

A crystal is an inorganic solid bounded by plain surfaces, arranged round imaginary lines known as axes:। এই লক্ষণের সম্প্রসারণ করিয়া The Modern Encyclopedia লিখিয়াছেন—

Crystal is any body which by the mutual attraction of its particles has assumed the form of some one of the regular *geometrical* solids, being bounded by a certain number of plane surfaces.

কৃষ্ট্যাল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-প্রবর হেকেলের (Haeckel) উক্তি এই :—

The crystal is the most perfect form of inorganic individuality. It has a definite internal structure and outward form, and obtains these by a regular growth. The external form of crystal is prismatic, and bounded by straight surfaces which cut each other at certain angles.

এই স্ফাটিক রাজ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী দেদীপ্যমান। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিক বয়েল (Boyle) এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

As regards crystals, it is as if nature had at once affected variety in their figuration and yet confined herself to geometrize. —Boyle (1680) Prouduct Chem, Princ 1 p. 49.

ঐ জ্যামিতিক আকারের নিদর্শন স্বরূপ 'Modern Encyclopedia'এর লেখক কয়েকটি কৃষ্ট্যালের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন—নিম্নে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম।
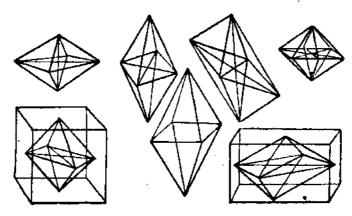
এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস বলিয়াছেন—

Who that has looked at minerals has not noted how crystals carry out *geometrical* design to perfection? The precision of

their angles is often more perfect than can be achieved by the most accurate of man-made measuring tools * * Each mineral carries out God's plan for it, and the crystal-world is a mirror of those *geometrical* laws of the Divine Mind, which the artist senses and the mathematician deduces.

—First Principles of Theosophy pp 358-9.

এই যে জ্যামিতিক প্রকল্প (geometrical design)—অধ্যাপক ডল্‌-বেয়ার কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নাঙ্কিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠকের তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।
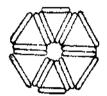
যাহাকে Quartz বা বালু-স্ফাটিক (Rock-crystal) বলে, ঐ অতি সাধারণ কৃষ্টালের মধ্যেও ঐরূপ জ্যামিতিকীর প্রমাণ পাওয়া যায়।

খুব পরিচিত আর একটা স্ফাটিকের কথা ধরুন—ফিটকিরি (Alum)। এ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ লেখকের উক্তি এই :—

If we examine alum, which is normally solid, it will be found to be a regular *geometrical* solid, a crystal of definite octohedral form. Chemists tell us that such a crystal is formed by the laying down of matter on flat faces or planes, determined by certain 'imaginary' lines of equal lengths called axes. Three such axes intersect in the centre of the alum crystal, in directions determined by an 'imaginary' cube—each axis piercing the centre of two sides of the cube—transfixing the cube so that the three cross at the centre of the cube.

এই সুপরিচিত ফিট্‌কিরির মধ্যেই কি অদ্ভুত জ্যামিতিকী দেখা গেল না? 'Scientific Recreation'-এর গ্রন্থকার গন্ধক-স্ফাটিক (Sulpher crystal) ও স্বর্ণ স্ফাটিক (Gold crystal)-এর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা নিম্নে সেই জ্যামিতিকীর নিদর্শন মুদ্রিত করিয়া দিলাম।
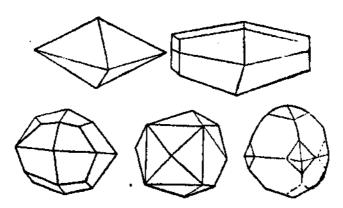
গ্রীষ্মের সময় আমরা সকলেই বরফ জল খাই, কিন্তু অনেকে হয়ত জানেন না—বরফ (Ice) একটা ক্রিষ্ট্যাল। আমার শিশুকালে বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া বরফ আসিত। এখন আমরা কারখানায় বরফ প্রস্তুত করি—এমন কি, অনেকে হয়ত হিমালয়-ভ্রমণ উপলক্ষে বরফের উপর পা দিয়া চলিয়াছেন। বরফ আমাদের এতই পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু জল জমাট বাঁধিয়া যখন বরফ হয় তাহার মধ্যে যে অদ্ভুত জ্যামিতিকীর নিদর্শন আছে, আমরা কি কখনও তাহা ভাবিয়া দেখি? এ সম্বন্ধে অধ্যাপক টিণ্ডেলের (Tyndall) একটা উক্তি শুনুন। তিনি উজ্জ্বল আলোক ও একটা প্রখর অণুবীক্ষণের সাহায্যে জমাট জলের ঐ জ্যামিতিকী দেখাইতে ভালবাসিতেন।

Tyndall was fond of showing with the help of a powerful microscope and intense light, the wonderful processes of crystallisation,—"expanding" flowers, each with six petals, growing larger and larger and assuming, as they do so, beautifully crimped borders, shewing, if I *might* use such terms, the pains, and skill and exquisite sense of the beautiful, displayed by nature in the formation of a common block of ice." * * Other crystals "grow before you like spouting ferns, exhibiting forms as wonderful as if they had been produced by the play of vitality itself. I have seen these things hundreds of times, but I never look at them without wonder." It runs, as if alive, into the most beautiful forms.

কিন্তু যাহাকে snow-crystal বা তুহিন-স্ফাটিক বলে, তাহার অদ্ভুত

জ্যামিতিকী আরও বিচিত্র। আমরা জানি ঐ তুহিন-স্ফাটিক বাষ্পের ঘনীভূত অবস্থা—are vapours crystalised—'flakes of snow are ice-crytals'। নিম্নে একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হইতে আমরা কয়েকটি Snow crytstal বা তুহিন-স্ফাটিকের চিত্র তুলিয়া দিলাম।
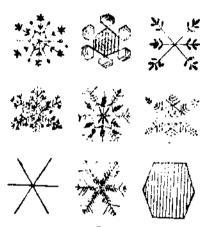
লেখক ঐ তুহিন-স্ফাটিক সম্বন্ধে বলিতেছেন—

Snow flakes are regular six-sided prisms, grouped around a centre forming angles of 60° and 120°.

জ্যামিতিকীর প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয় কি? এ সম্পর্কে অধ্যাপক টিন্‌ডেল অনেক সমীক্ষা-পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগকে তুষার-পুষ্প (ice-flowers) ও shower of frozen flowers বলিতেন। * তাঁহার এ সম্পর্কে বিস্ময়োক্তি শুনুন—

"Atom is thus added to atom, and molecule to molecule, not boisterously or fortuitiously, but silently and symmetrically, and in accordance with laws more rigid than those which guide a human builder when he places his bricks and stones together." He speaks playfully, but more truly than he dreamed of, on the work of the 'atomic architect'.

—Manchester Science Lectures. 6th series, p. 148.

* When snow is produced in calm air, the icy particles weild themselves into stellar shape, each star possessing six rays.—Tyndall.

বৈজ্ঞানিকবর টিন্‌ডেল যাহাকে রহস্যচ্ছলে atomic architect (আণবিক স্থপতি) বলিলেন এবং যাঁহার কারুকৌশলে বিস্মিত হইয়া এত সাধুবাদ করিলেন—তিনি বাস্তবিক অচিৎ জড় নহেন, কিন্তু ভাগবতী শক্তির প্রকাশের একবিধ কেন্দ্র। তাঁহার রচিত কৃষ্ট্যাল বা স্ফাটিক কেবল beautiful নহে—উহারা symmetrical and geometrical—একাধারে সজীবতা, সুন্দরতা ও জ্যামিতিকতার নিদর্শন। টিণ্ডেল্ যে বলিলেন—*as if* they had been produced by the play of vitality itself—যেন জীবনীশক্তির কলা-কৌশলে রচিত, আমরা ইহার উপর টীকা করিয়া বলিতে চাই—'যেন' নয়—সত্য সত্যই। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডল্‌বেয়ার্ লিখিয়াছেন—

Some of the phenomena exhibited by bodies called inorganic, such as minerals of many kinds, possess properties that are very like those supposed to belong solely to livings things.

—Matter, Ether and Motion, p. 283.

এবং নিজ বাক্যের সমর্থন জন্য প্রচ্ছদ-পত্রে পাত্রস্থ জলের স্ফাটিকিত হওয়া কালীন, ঐ জল কিরূপ পালকের আকার ধারণ করে তাহার আলোক-চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে আমরা ঐ চিত্রের প্রতিলিপি দিলাম।

ঐ চিত্রের সম্বন্ধে ডল্‌বেয়ার লিখিতেছেন—

The above picture is copied from a photograph. It represents the plumelike forms assumed by water when orystallised in a basin. The similarity it presents to vegetable forms is very striking. One may often see on frosty window panes fantastic imitations of organic things which forcibly suggest vitality. They are too common to be considered coincidences.

আকাশে যখন তুষার বৃষ্টি হয় সেই সময় জানালার কাঁচে এমন সকল হিমচিত্র আপনা আপনি অঙ্কিত হইয়া যায় যে, তাহার বিচিত্রতায় ও জ্যামিতিকতায় বিস্ময়বিমুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। আমি একবার সিকিম ভ্রমণকালে জানালার কাঁচে ঐরূপ বিচিত্র চিত্র দেখিয়াছিলাম। নভেম্বর মাস —খুব শীত। আমি চঙ্গু হ্রদের তীরে একটা ডাক বাংলায় অবস্থিতি করিতে-ছিলাম। রাত্রে তুষার বৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাতে রৌদ্র উঠিলে কামরার বাহিরে আসিয়া দেখি জানালার কাঁচের উপর কে সমঞ্জস সৌষ্ঠবময় বিবিধ বিচিত্র গাছ পাতা চিত্রিত করিয়াছে। এখানেও বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী।*

কৃষ্টাল বা স্ফাটিকের চরম মণি (Jewels)—হীরা, পান্না, চুনী, পোখরাজ প্রভৃতি রত্ন। এ সকল মণিই কৃষ্টাল। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকের উক্তি শুনুন—

Carbon when crystallised is the diamond. Alumina makes saphires and ruby with silica. Alumina and earth give us spars, tourmaline and garnets.

এই সকল মণির মধ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক বয়েল (Boyle) বলিয়াছেন :—

As to the exquisite uniformity of shape, which is so admired in gems, it is thought to demonstrate their being formed by a *geometrizing* principle.—Boyle - Ess. Gems, 71.

* বৈজ্ঞানিকেরা Compound crystal groups বা কৃষ্টাল-সমবায়ের কথা বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে অধ্যাপক টমাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

As to compound crystal groups, these are formed by the association of a numbet of crystals. In Volvox (classed with protozoa by zoologists but claimed as a green alga by botanists) we find a colony of individuals connected by fine protoplasmic bridges, and embedded in a gelatinous matrix, from which their flagella project, *the whole forming a hollow, spherical, actively mobile colony*. In Volvox globator, the number of individuals is about 10,000.—J. Arthur Thomson, M. A., L. L. D.

এখানেও spherical অর্থাৎ geometrical আকার—বিশ্বনাথের সেই জ্যামিতিকী।

নিম্নাঙ্কিত চিত্রে কয়েকটি মণির প্রতি লক্ষ্য করুন—অদ্ভুত জ্যামিতিকীর পরিচয় পাইবেন।
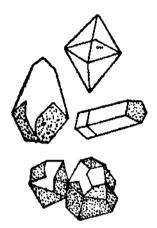
বিশেষতঃ একটি Rose-diamond কিম্বা যাহাকে 'Brilliant' বলে (a diamond of the finest cut)—তাহাদের facets বা মুখাবয়বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন—বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া যাইবেন
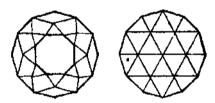
এ সম্পর্কে আর অধিক বিস্তার করিতে চাহি না—কেবল শ্রীযুক্ত জিনরাজদাসের একটি সুচিন্তিত বাণী উদ্ধৃত করিতে চাই :—

The One Life, enduring the limitations of mineral matter—there learns to express itself in the building of *geometrical* forms through crystallisation.—অর্থাৎ, মহাপ্রাণ স্থাবররাজ্যে খনিজের সঙ্কীর্ণতার বাধা সহন করিয়া স্ফাটিক দ্বারে জ্যামিতিক আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে অভ্যাস করে।

স্থাবর রাজ্যে জ্যামিতিকীর অনেক পরিচয়ই দিবার চেষ্টা করিলাম——আগামী বারে জঙ্গম রাজ্যে প্রবেশ করিব এবং ঐ রাজ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর নিদর্শন অন্বেষণ করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

হেমন্ত-গোধূলি—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

"হেমন্ত-গোধূলি" শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার-এর চতুর্থ কবিতা-সংগ্রহ। কবিতা-সংগ্রহ ও কাব্য-গ্রন্থের ভিতর একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে এবং সেই মানদণ্ডে বিচার করলে এই কবিতা-সংগ্রহ কাব্য-গ্রন্থের কোঠায় পৌঁছতে পারেনি। পুষ্পচয়ন করলেই মালা গাঁথা হয় না, এবং তার দায়িত্ব চয়নিকার পুষ্পের নয়। যে সব কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে—তার একমাত্র যোগ-সূত্র লেখক নিজে। সময় বা মর্জি দিয়ে এই কবিতা-সংগ্রহ এক গ্রন্থে সন্নিবেশ করা যায় না—কারণ ঐক্যের অভাব প্রতি পদে ধরা পড়ে। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এই কবিতা-সংগ্রহের একমাত্র কৈফিয়ৎ—একালের অনুরক্ত পাঠকবর্গকে তৃপ্তিদান ও পরবর্তীকালের অনাগত পাঠকবর্গের চিত্ত-জয়ের আশা। একই মলাটে ও একই বাঁধনে বেঁধে দিলে কবিতা-সংগ্রহ কাব্য-গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে না। এবং তা করে না বলেই রস উপভোগ করতে গিয়ে নানা বাধা পাওয়া যায়। মোহিতলাল-এর কবিতায় রূপ ও রস আছে। কল্পনার বীর্য ও ভাষার সতীত্ব তাঁর কাব্য-সাহিত্যে এক অভিনব বাসনা সৃষ্টি করে, এবং তাঁর কাব্যের ধ্বনি অত্যন্ত পরিচিত ও সুসঙ্গত। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলার কাব্য-সাহিত্যে মোহিতলাল-এর সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। তাঁর কাব্য-প্রিয়ার গতি ক্ষিপ্র নয়—তিনি "অলসগমনা"। ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য তাঁর কবি-প্রিয়াকে যেমন প্রাণ দেয়—তেমনি তাঁর গতিকে মন্থর করে দেয়। মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের গতিবেগকে অনুসরণ করেন নি—তিনি অনুধাবন করেছেন রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মকে। মোহিতলালের কবি-প্রিয়ার দৃষ্টি অঙ্গসজ্জায়—পথ চলার আনন্দের দিকে নয়। তাই তাঁর কাব্য মনকে তৃপ্তি দিলেও চিত্তকে জয় করে না। কিন্তু মনকে রসাপ্লুত করবার শক্তি মোহিতলাল-এর কবিতায় আছে। অঙ্গসজ্জার দিকে অত্যন্ত ঝোঁক—

কারণ মোহিতলাল কবি হলেও তাঁর ভিতর এক সমালোচক বাস করেন। সেই সমালোচকের প্রেরণায় তিনি কতকগুলি আদর্শ অনুসরণীয় মনে করেন এবং সেই সব অনুসরণীয় আদর্শের প্রচারণকে বড় স্থান দেন। কাব্যের চেয়ে জীবন বড় এবং জীবনের চেয়ে আদর্শ বড়—মোহিতলাল এ সব বিশ্বাস করেন এবং তারই ফলে তিনি কবি হয়েও কাব্য ধর্মকে বড় স্থান দেননি। ফলে, কাব্যের ক্ষেত্র অনুর্বর হয়ে উঠে। তাই তাঁর সম্বন্ধে—"He is a doer, a maker, a revealer, a creator" বলা চলে না। তাঁর আত্মনিমগ্নতা আছে কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা নেই।

মোহিতলাল-এর কাব্য-গ্রন্থের ভিতর এই "হেমন্ত-গোধূলি" আপেক্ষিক-ভাবে দুর্ব্বল। গ্রন্থের নাম কেন "হেমন্ত-গোধূলি" হ'ল—তা জানি না। কবির "যাত্রা শেষে" তিনি বলেন—

> "আজ আমি থেমে গেছি,জগং থেমেছে মোর সাথে।
> নাহি আর উদয়াস্ত, আলো-ছায়া, ঋতু-আবর্ত্তন ;
> থামিয়াছে কাল-চক্র—কেন্দ্র যার আছিল আমাতে,
> নিজে ঘুরি' এক ঠাঁই ঘুরায়েছি যারে সারাক্ষণ ;
> কালের মুখোস খুলি' মহাকাল দাঁড়াল সাক্ষাতে,
> আজ বুঝি—কার নাম গতি, আর অগতি কেমন।"

তাই তিনি "তুহিন-মোহিনী হৈমবতীর বেশে" "রোদনের দিনশেষে" তাঁর "সুন্দরীকে" আসতে বলছেন। কবি জানেন—

> "আলোর বন্যা নিঃশেষ হ'ল—কেটে গেছে কোজাগরী,
> কুঞ্জে আমার শরতের শেষ শেফালি পড়িছে ঝরি'।
>
> ওগো অকরুণা মোহিনী চতুরা।
> এখনো অধরে ধরিবে কি সুরা ?
>
> শিশিরের ঘাসে ফুটাইবে কোন্ কামনার মঞ্জরী ?
> কুঞ্জে এখন শরতের শেষ শেফালি পড়িছে ঝরি'।"

কবি যদিও বলছেন যে—

"দেহের যে-ঠাঁই সব চেয়ে সুন্দর,
সেইখানে, সখা, অধার চুমাটি দিয়ো।"

তবুও তিনি "অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি" প্রার্থনা করেছেন। এইভাবে নানা বিরুদ্ধভাবের আদান-প্রদান নানা কবিতায় ছড়িয়ে আছে—তার প্রথম কারণ—বিভিন্ন কবিতা বিভিন্ন সময়ের লেখা এবং কোন কবিতা কোন সময়ের লেখা, তার নির্দেশ নেই। তাই কবির মনের গতি তাঁর কবিতা-সংগ্রহ থেকে বোঝা যায় না। তাঁর কাব্য-সাহিত্যে কোন নিবিড় যোগসূত্র পাওয়া যায় না—খণ্ড খণ্ড কবিতায় খণ্ডিত দৃষ্টি—মৌলিকতা, নিপুণতা ও আন্তরিকতা আছে কিন্তু কোন কাব্যলোক সৃষ্টি হয় নি।

"বালুকা-বাসর" কবিতাটিতে গোধূলির অস্পষ্টতা নেই কিন্তু হেমন্তের আমেজ আছে—আমার বেশ লাগল। সেই নদীর চরে দেখা, সেই জোয়ারে চাঁদের হাসি, সেই বাঁশির উদাস সুর,—সেখানে দেখা হওয়া ও মায়া রচনা করা—এমন নিবিড় ও মুগ্ধকর শুভক্ষণের ছবি আঁকা পাকা শিল্পীর গুণের পরিচায়ক। দৃষ্টিভঙ্গী সেকালের হলেও এই মায়া লোক মানুষের চিরকালের সম্পদ—অনাধুনিক ব'লে আমি এই রস হতে বঞ্চিত হতে সম্মত নই। আবার এই কবিই "অশান্ত" কবিতা লিখেছেন, যা পাঠকবর্গকে অশান্ত করে তুলবে—অত্যন্ত দুর্বল ও খেলো।

উক্ত গ্রন্থে কয়েকটি প্রণয়-কবিতা, কয়েকটি বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক কবিতা, কয়েকটি সংযত সনেট, এবং মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও ফেরদৌসীর স্মরণে কবিতা আছে। গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে বিদেশী কবিতার অনুবাদ। বাংলা সাহিত্যে এই অনুবাদের সার্থকতা আছে—কারণ অনূদিত কবিতায় কাব্যাংশকে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখা কৃতিত্বের পরিচায়ক। এতো পাঁচমেশালী হওয়াতে কোন সুর পাওয়া যায় না তাই কাব্য-গ্রন্থ হিসাবে বিচার করবার বাধা অনেক।

গ্রন্থকার জানিয়াছেন যে, তাঁর কবিতা-সংগ্রহে আধুনিক বাংলা কবিতা নেই। তাঁর গ্রন্থে বাংলা কবিতা আছে কিন্তু তা আধুনিক সমাজের মর্জির সঙ্গে সংযুক্ত নয় একথা প্রমাণ বা স্বীকার করলেই তাঁর কাব্য আহত হবে না।

আধুনিক কবিতা না হলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর কাব্যের স্থান আছে—পাঠক-বর্গের চিত্তে অমরতার দাবি থাকতে পারে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থ মোহিতলাল-এর কবি-প্রতিষ্ঠাকে বাড়াবে বলে আমার মনে হয় না—যদিও মোহিতলালের কবি-কল্পনার বলিষ্ঠতা, ভাষার শুচিতা ও ছন্দের বৈচিত্র্য প্রশংসা দাবি করে। নারীর রূপ চিরস্থায়ী নয় বলে ক্ষণস্থায়ী মাদকতা আনতে সে অক্ষম তার কোন প্রমাণ নেই। মোহিতলাল-এর কবিতা আধুনিক নয় বলে তাঁর কাব্য-প্রতিষ্ঠা অস্বীকৃত হবে—তার কোন কারণ নেই। তবে আধুনিক চিত্ত যদি তাঁর কবিতা-প্রেয়সীর অনাধুনিক ঢঙে মাতাল না হয়—অভিযোগ করবার হেতু নেই। যাঁরা রসিক, তাঁরা ঢঙের বেড়াজাল অতিক্রম করে নিছক গুণকে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কাব্য-লক্ষ্মীর সম্পদ থাকা প্রয়োজন।

এই গ্রন্থেই কি কবির কাব্য-যাত্রা শেষ? কবি লিখেছেন—"আজও বুঝি নাই, আমি শুধু গান গেয়ে যাই"—কিন্তু কবি কি সত্যই হেমন্ত-গোধূলির পর রূপহীন, মধুহীন শীতকে অতিক্রম করে আবার ফাল্গুনের নব মায়া ও ছায়ার দোলায় জেগে উঠবেন? অথবা হেমন্ত-গোধূলির হিম-নিষিক্ত ধরণী শীতের নিরাভরণ শূন্যতায় পরিণত হবে? এই কাব্য-গ্রন্থ পড়ে, সে-প্রশ্নই প্রথম মনে জাগে।

শচীন সেন।

দুই নৌকা—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

পশুপতি বাবুর 'দুই নৌকা' গ্রন্থখানি শেষ করলে প্রথমেই এর সুসঙ্গত নামটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। এক্ষেত্রে কথাটা অনেকটা চিত্রসমালোচনার পূর্ব্বে তার বহিরাবরণ ফ্রেমের উৎকর্ষালোচনার মত শোনালেও,—একথা, উল্লেখ না ক'রে পারলাম না এই কারণে যে, বর্ত্তমানে বহু খ্যাতনামা লেখকেরও এমন অনেক লেখা আমরা পড়ে থাকি, বহু ক্ষেত্রেই যার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার নামের কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

সাধারণত দুই নৌকায় পদক্ষেপ বিপর্য্যয়ের পরিচায়ক—যেমন, চলতি কথায় আমরা বলে থাকি দোটানার মধ্যে পড়া। দু'জন দু'দিক থেকে টানছে, কোনটাকেই সম্পূর্ণ অবলম্বন করা যাচ্ছে না বা একটাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ক'রে অন্যটাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করার সুবিধা নেই—এটা নিঃসন্দেহে বিপর্য্যয়ের অবস্থা। আমাদের 'দুই নৌকা' গ্রন্থের নায়ক ডাঃ মুখার্জ্জির জীবনেও ঘটেছিল এমনি এক বিপর্য্যয়ের পরিস্থিতি। প্রেমের দোটানা বা একটু গভীর ও ব্যাপকভাবে ধরে এ.ক আদর্শের সংঘাতও বলা চলতে পারে। একদিকে তাঁর স্ত্রী একান্ত নৈষ্ঠিক বাঙালীঘরের স্বামীসোহাগী, সন্দিগ্ধমনা, ঔদার্য্যহীন ও মান-অভিমানের প্রতীক পাঞ্চালী; অপরদিকে উদার, বুদ্ধিমতী, আধুনিক রুচিস্নিগ্ধ শিক্ষাদীক্ষায় পটিয়সী ও সেবাপরায়ণা পাশ্চাত্যদেশীয় জনৈকা নার্স তাঁর প্রণয়নী শ্রীমতী আইরিণ। মূলতঃ এই গ্রন্থের কেন্দ্র-ভূমিতে এই তিনটি প্রাণীরই রাগ-বিরাগ প্রকট দেখা যায়। এ ছাড়া আর একটি চরিত্র যা উপর্য্যুক্ত তিনটি চরিত্রের পারিপার্শ্বিককে বিশেষভাবে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে তিনি হচ্ছেন ডাঃ গাঙ্গুলী। এই গ্রন্থের মধ্যে এঁকেও পাঠক তাঁর স্মরণ থেকে সহজে মুছে ফেলতে পারবেন বলে মনে হয় না। ব্যক্তিগত ভাবে আমার ত' এই মানুষটির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখা দিয়েছে, এবং একভাবে এই চরিত্রটিকেই এই গ্রন্থের রিলিফ্ বলা যায়। ইট্, ড্রিঙ্ক এণ্ড বি মেরি যা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ, তার চরম প্রমাণ মৃত্যুর সঙ্গেও তিনি ঠাট্টা করে দেখিয়ে গেছেন। মুখ দিয়ে যখন তাঁর তাজা রক্ত উঠছে, তখনও তিনি বলছেন, প্রায় হাসতে হাসতেই: 'আমাদেরই ত' কেতাবে আছে ব্লীডার্স ডু বেষ্ট।' পশুপতি বাবুর এই টাইপ সৃষ্টিকে তারিফ করি। তবে একস্থানে ডাঃ গাঙ্গুলির মুখ থেকে শরীরে টি. বি. থাকা প্রতিভার লক্ষণ শুনে, আমরা সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হ'তে পারলাম না। যদিও এর সমর্থনে তিনি এইচ. জি. ওয়েলস, সোমারসেট মম ও টমাস ম্যানের নামোল্লেখ করেছেন বটে, এবং হয়ত প্রয়োজন হ'লে আরও দু'চার জনের নাম করা যায়, কিন্তু সাইকোলজিকেলি ও ফিযিয়গ্নমিকেলি টি. বি-র সঙ্গে প্রতিভার কোন সম্বন্ধ কি সত্যই নির্ণীত হয়েছে?

মোটের উপর ডাক্তারি জীবনের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও একটি ডাক্তারের

বৈচিত্র্যপূর্ণ রোম্যান্টিক জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বিশদভাবে এবং বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে—যদিও এটিকে জীবন-বৃত্তান্ত হিসাবে আখ্যাত করা হয় নি। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঙ্গে মানুষের মন, শুধু মন কেন আদর্শও যে কেমন ভাবে ক্রমপরিবর্ত্তন লাভ করে এই গ্রন্থে ডাঃ মুখার্জ্জির চরিত্রে সেটি একটি লক্ষণীয় বিষয়। তাঁর উন্মুক্ত নির্ভীক ও বিশ্লেষণী মনের প্রশংসা করতেই হয় এবং সেই সঙ্গে তারিফ করতে হয় লেখকের সন্ধানীদৃষ্টি ও ভাষার প্রাঞ্জলতার। দুই নৌকায় পা দিয়েও ডাঃ মুখার্জ্জি যেমন বিপর্য্যয়কে সামলে উঠে শেষ পর্য্যন্ত বলতে সাহসী হয়েছেন, 'সেও থাকবে, পাঞ্চালীও থাকবে। একটি আমার জীবনের সান্ত্বনা,—আর একটি মমতা।' এক্ষেত্রে পশুপতিবাবুও তাঁর ঐ সন্ধানী দৃষ্টি ও ভাষার প্রাঞ্জলতায় বহু বিপর্য্যয়কে উত্তরে উঠে গ্রন্থখানিকে শেষ পর্য্যন্ত উচ্চাঙ্গের না হলেও উল্লেখযোগ্য ক'রে তুলে আমাদের যথেষ্ট সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং পাঞ্চালীর প্রতি না হোক, নিঃসন্দেহে ডাক্তারের প্রতি আমাদের মমতাবোধ বাড়িয়েছেন।

ত্রুটির দিক থেকে উপন্যাস হিসাবে পশুপতিবাবুর গল্প বলার টেক্‌নিক আমি সমর্থন করি না। তাছাড়া কথোপকথনের মধ্যে কোথাও কোথাও বেশি বলার প্রচেষ্টায় গ্রন্থের গতিমাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করি। এটি কোন ডাক্তারের একটানা বলে যাওয়া জীবনবৃত্তান্ত হ'লে এই টেক্‌নিক্যাল ত্রুটি সম্বন্ধে বলবার কিছু ছিল না।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

পৃথ্বী-পরিচয়—প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। } বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা।
প্রাণতত্ত্ব—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। } মূল্য—বারো আনা।

দুরূহ সাধনা ও জটিল গবেষণার ফলে পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল সহজবোধ্য ভাষায় তা প্রকাশ করা জনশিক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ইংরাজীতে ও অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষায় এই জাতীয় বহু অতি সুন্দর বই আছে, বাঙলাতেও কিছু কিছু এই জাতীয় বই লেখা হয়েছে,

কিন্তু ব্যাপকভাবে ও সুনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে এই জাতীয় বই রচনার চেষ্টা বাঙলা ভাষায় হয় নি। এই অভাব মোচনের জন্যই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী-লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার প্রবর্তন করেন। 'পৃথ্বী-পরিচয়' ও 'প্রাণতত্ত্ব' এই গ্রন্থমালার দুটি বিশেষ মূল্যবান বই। প্রথমটির বিষয় ব্যাপক, পৃথিবী কি ভাবে হ'ল, ভূতত্ত্ব, পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন এই তিন শাস্ত্র ঘেঁটে লেখক তা সহজ ভাষায় পাঠকদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসের (মানুষের নয়) যে ছবি এতে আছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও অত্যন্ত সরল। 'প্রাণতত্ত্ব' বইটিতে আছে কী করে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব, জীবদেহের বিকাশ ও জীব-সমাজের উদ্বর্তন হ'ল তার কথা—অর্থাৎ জীবতত্ত্বের সম্যক পরিচয়। বইখানির ভাষা এত মনোগ্রাহী যে পড়তে পড়তে মনে হয় না যে এই সব তত্ত্ব আবিষ্কার করতে বৈজ্ঞানিকরা কী অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন। লেখকের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাষার গুণে 'প্রাণতত্ত্ব' বিজ্ঞানের বই হ'লেও সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

মনোবিজ্ঞান ও শিশুশিক্ষা—রচনা: ৺রেণুকা বসু, এম. এ., কলিকাতা করপোরেশন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা। অনুবাদ ও **সঙ্কলন:** অধ্যক্ষ যতীন্দ্রনাথ বসু, এম্. এ., পি. আর. এস্.। প্রকাশক: গণদীপায়ন, শ্রীকাইল, কুমিল্লা। মূল্য—এক টাকা।

৺রেণুকা বসুর অকাল মৃত্যু বাঙলা দেশের রাজনৈতিক কর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্র উভয়তই বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়েছে। বাঙলাদেশের এক বিখ্যাত নারী-প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন প্রধান কর্মী ছিলেন ও এই সূত্রে তিনি যেমন কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তেমনি ভোগ করেছিলেন লাঞ্ছনা—সরকারী তরফ থেকে। তাঁর জীবনের সব 'চাইতে বড় কাজ ছিল শিক্ষাদান। এই কাজ যে তিনি শুধু জীবিকার জন্য করতেন না, শিক্ষা কার্যকে যে তিনি জীবনের আদর্শ হিসাবে নিয়েছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্বামী অধ্যক্ষ যতীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত এই বইটি থেকে। বইটি তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগে আছে আধুনিক শিক্ষা-সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির পরিচয় ও ব্যাখ্যা। শিশু পালন ও শিশু শিক্ষায় এই মূল সূত্রগুলির প্রয়োগ কী ভাবে করা উচিত দ্বিতীয় অংশে তা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। সব শেষে আছে কয়েকটি আদর্শ পাঠ (সচিত্র)। বইটির পরিশিষ্টে যতীন্দ্র বাবু 'অভ্যাস-গঠন' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা বিশেষ শিক্ষা-প্রদ। এই মূল্যবান বইটির আদর শুধু পেশাদারী শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে নয়, সাধারণ শিক্ষিত লোকদের কাছেও হবে আশা করি, কেননা আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে আলোচনা এই বইটিতে আছে তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি প্রয়োজনীয়। সহজ ও সাবলীল বাঙলায় বিষয়টির আলোচনা করে লেখক ও লেখিকা পারিভাষিক বাঙলা সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করেছেন।

হিরণকুমার সান্যাল

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

গত ক'মাসের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় প্রতি পত্রিকারই অন্তত একটি রবীন্দ্র-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে এমন সংখ্যা যদিও কম তবু প্রায় সবগুলিতেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাবে।

দুঃখের বিষয় সেই সঙ্গে এমন অনেক রচনা বা খবরও বেরোচ্ছে যা শুধু রচয়িতাদের বা প্রকাশকদের দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক। বিশেষ ক'রে এই কথা বলা চলে রবীন্দ্রনাথের যে সব প্রতিকৃতি বেরোচ্ছে সেগুলির পরিচয় সম্বন্ধে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বসুমতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের দুটি ফটোর উল্লেখ করা যেতে পারে—একটির তলায় ছাপার হরফে লেখা রয়েছে 'বিলাতে রবীন্দ্র-নাথ,' আর একটির তলায় লেখা 'আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ'। এই দুটি ফটোর একটিও বিলাতে বা আমেরিকায় তোলা নয়। 'বিলাতে রবীন্দ্রনাথ' নামে প্রকাশিত ফটোটি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ কলকাতাতে তুলেছিলেন ও ইতিপূর্বে এই ছবিটি তাঁর নামে এত প্রচারিত হয়েছে যে 'বসুমতী'র এ রকম ভুল বাহাদুরি বলতে হবে।

বাংলাদেশের একটি সু-পরিচিত নারী-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার রবীন্দ্র-সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ফটোর বিষয়—প্রকাশকদের মতে—অধ্যাপনা কার্যে রত রবীন্দ্রনাথ। আসলে ছবিটি বৃক্ষরোপণ উৎসবের—রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে গাছের চারায় জল ঢালছেন ছবিতে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এই রকম হাস্যকর ও দায়িত্বহীন ব্যাপার মাঝে মাঝে চোখে পড়লেও রবীন্দ্র-সংখ্যাগুলির মধ্যে ভালো জিনিষ যথেষ্ট আছে সন্দেহ নাই। বিশদ-ভাবে সেগুলির পরিচয় দিতে হ'লে এক বা একাধিক বৃহৎ প্রবন্ধ লেখা ছাড়া উপায় নাই। তবে পাঠকদের সামনে এই প্রসঙ্গে তিনটি পত্রিকা আমি উপস্থাপিত করতে চাই। তিনটিই ইংরেজী ভাষায় লেখা। একটি—'দ্য বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'। দ্বিতীয়টি—'কারেন্ট থট'। তৃতীয়টি—'দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'।

'দ্য বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'র ও 'কারেন্ট থট'-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের আশী বছরের জন্মোৎসব উপলক্ষে। 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এরও ঐ উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় ইতিপূর্বেই তা আলোচিত হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট্'-এর ঐ সংখ্যাটির আর একটি বহুল পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

'দ্য বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'-র সম্পাদক এক সময়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের মতন এই পত্রিকাটিও যথার্থ আন্তর্জাতিক। এই রকম উঁচু দরের পত্রিকা আমাদের দেশে বিরল। বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানি এই পত্রিকাটির মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। এই মর্যাদার পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যাবে এর রবীন্দ্র-সংখ্যায়—আকারে, গঠন-সৌষ্ঠবে, রচনার বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে, চিত্রে, সম্পাদকীয় মন্তব্যে। এমন মর্যাদাবান রবীন্দ্র-সংখ্যা আর কোনো পত্রিকার আমাদের চোখে পড়েনি।

'দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর রবীন্দ্র স্মৃতি-সংখ্যার বৈশিষ্ট্য তার উপকরণের প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য ও সমারোহ। পত্রিকা-প্রকাশে এই সমারোহ অমল হোমের একচেটে। রবীন্দ্র-জন্ম সংখ্যায় এই সমারোহের যে-পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম তারই সমৃদ্ধতর প্রকাশ দেখলাম রবীন্দ্র-স্মৃতি-সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত তথ্য ও এত ছবি ইতিপূর্ব্বে আর কোনো পত্রিকা দূরের কথা কোনো বইতে প্রকাশিত হয়েছে ব'লে জানি না।

'কারেন্ট থট' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। আকারে ছোট হলেও উৎকর্ষে এই পত্রিকাটি বাংলাদেশে যে-সকল ইংরেজী বা বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাদের কোনোটির চাইতে কম উল্লেখযোগ্য নয়। এর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রবীন্দ্র-সংখ্যায় পুরোপুরি পাওয়া যাবে।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩৪৮

পরিচয়

বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা

১

১৩৪৭ সালের পৌষ মাসের 'কবিতা'-য় শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'পদাতিক' নামক কাব্য-গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচনা করেন শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু মহাশয়। সমালোচনা-প্রসঙ্গে একস্থলে তিনি বলেছেন, "আমি ছান্দসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই"। কিন্তু ওই লেখাটি আমার চোখে পড়েনি এবং পড়বার সম্ভাবনাও ছিল না। কিছু দিন হ'লো 'নিরুক্ত' সম্পাদক শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য ও-দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আমার অনুরোধক্রমে ঐ সংখ্যার এক কপি 'কবিতা'ও আমাকে পাঠিয়ে দেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বুদ্ধদেবের আলোচনাটি আমি যথোচিত মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছি। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দের কান নিখুঁত, ছন্দ নিয়ে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে নানা রকম দুঃসাহসী পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন; নতুন ধ্বনি অন্বেষণের দিকে তাঁর ঝোঁক যদি বরাবর বজায় থাকে, তা-হ'লে বাংলা ছন্দের বড়ো রকমের কোনো পরিণতি তাঁর মারফৎ আশা করা অন্যায় হয় না"। এই অকুণ্ঠ প্রশংসা যে-কোনো কবির পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়। আরেক স্থলে তিনি বলেছেন, "এই তরুণ কবি পয়ারের এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছেন"। প'ড়ে মনে দুর্নিবার কৌতূহল উপস্থিত হ'লো।

অবিলম্বে একখণ্ড 'পদাতিক' সংগ্রহ ক'রে উৎসুকচিত্তে আগাগোড়া প'ড়ে ফেল্‌লাম। এই পুস্তকখানির কাব্যমূল্য-বিচার উপলক্ষ্যে বুদ্ধদেব যা বলেছেন, তৎসম্পর্কে কিছু বলা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই কাব্যখানির ছন্দোমূল্য বিচার প্রসঙ্গে তিনি যে-সব মন্তব্য করেছেন, তার পুনর্বিচার ক'রে দেখা সঙ্গত মনে করি।

২

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা ছন্দ নিয়ে "নানা রকম দুঃসাহসী পরীক্ষায়" বা "নতুন ধ্বনি অন্বেষণের দিকে" সচেতন ভাবে অগ্রসর হয়েছেন কি না জানি না; তবে তাঁর স্বাভাবিক ধ্বনিরস-বোধ ও ছন্দ-রচনার প্রতিভা আছে, এবং সচেতন ভাবে ও-পথে অগ্রসর হ'লে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারবেন, এ-কথা আমি অসঙ্কোচেই স্বীকার করি। আলোচ্য পুস্তকখানিতেই তাঁর বিকাশোন্মুখ ছন্দ প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। কিন্তু বইখানিতে ছন্দ-রচনার দক্ষতা থাক্‌লেও ছন্দোবৈচিত্র্যের অভাব চোখে পড়ে। এটিতে সবশুদ্ধ আটাশটি কবিতা আছে। তার মধ্যে উনিশটি মাত্রাবৃত্ত এবং ন'টি যৌগিক বা 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দে রচিত; স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত ছন্দের কবিতা একটিও নেই, এটা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। উনিশটি মাত্রাবৃত্তের মধ্যেও একটি মাত্র ('সে-দিনের কবিতা') চতুর্মাত্র-পর্বিক, আর একটি ('বধূ') পঞ্চমাত্র-পর্বিক, আর বাকী সতেরোটিই ষণ্মাত্র-পর্বিক। ন'টি যৌগিক ছন্দের মধ্যেও বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায় না, সবগুলিই মোটামুটি একই ধরণের; প্রবহমান বা মুক্তক ভঙ্গির দৃষ্টান্ত একটিও নেই। কিন্তু নিজের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে ছন্দ-রচনার চাতুর্য অনেক স্থলেই ফুটে বেরিয়েছে। একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের কথা এখানেই বলি। বইখানি আগাগোড়া চল্‌তি বাংলায় লিখিত, কোথাও সাধু বাংলার প্রয়োগ নেই। বাংলা ছন্দের সঙ্গে ভাষারীতির একটা সম্পর্ক প্রথা হিসাবে স্বীকৃত হ'য়ে আস্‌ছে। প্রাকৃত বা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক বাহন হচ্ছে চল্‌তি বাংলা। ও-ছন্দে এখানে সেখানে কদাচিৎ এক আধটা সাধু ক্রিয়াপদ দেখা যায় বটে, কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রম। সাধারণ রীতি হিসাবে ও-ছন্দে সাধু

ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয় না, বোধ করি তা সম্ভবও নয়। কারণ চল্‌তি বাংলার বাক্‌-ভঙ্গি বা উচ্চারণ-রীতি থেকেই ও-ছন্দের উদ্ভব হয়েছে। 'পদাতিক' বইখানি সর্ব্বতোভাবে চল্‌তি বাংলায় রচিত, অথচ চল্‌তি বাংলার পক্ষে সব চেয়ে স্বাভাবিক যে স্বরবৃত্ত ছন্দ, এ-পুস্তকে সেই ছন্দেরই ব্যবহার নেই। পক্ষান্তরে মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দের স্বাভাবিক বাহন হচ্ছে সাধু বাংলা ; এ-দুই ছন্দে চল্‌তি ক্রিয়াপদের প্রচুর প্রয়োগ দেখা গেলেও চল্‌ছে, কর্‌বো, পড়্‌ছো, থাকলে ইত্যাদি রকম হলন্ত-মধ্য চল্‌তি ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধারণতঃ দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ 'পরিশেষে' গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় যৌগিক ছন্দে হসন্ত-মধ্য চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু আর কোথাও করেন নি (এ-প্রসঙ্গ যথাস্থানে পুনরুত্থাপন করা যাবে) ; রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো কবি এ-কাজ করেছেন বলে জানিনে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও রবীন্দ্রনাথ অল্প কয়েকটি কবিতা ছাড়া অন্য সর্বত্রই হসন্ত-মধ্য ক্রিয়াপদ বর্জন ক'রে ওসব স্থলে সাধু ভাষাই ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রানুবর্তীদের মধ্যে অপরাজিতা দেবী মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সকল রকম চলতি ক্রিয়াপদের অতি চমৎকার প্রয়োগ করেছেন। তাঁর সব বইতেই এর প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলবে ; বস্তুত তিনি সর্বত্রই উক্তপ্রকার ক্রিয়াপদের ব্যবহার চালিয়েছেন অতি সুষ্ঠুভাবে। বহুকাল পূর্বে আমি এ-বিষয়ে কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলাম। অপরাজিতা দেবী ছাড়া অপর কোনো কবি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সার্থক ভাবে চল্‌তি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করেছেন ব'লে মনে পড়ছে না। যাহোক একথা ঠিক্ যে যৌগিক ও মাত্রাবৃত্ত উভয়প্রকার ছন্দেই সাধু ভাষা অর্থাৎ সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহারই সাধারণ রীতি।* অথচ সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পদাতিক' গ্রন্থে উক্ত উভয়প্রকার ছন্দেই অবলীলা-ক্রমে এবং সর্বত্র সমভাবে চলতি বাংলা ব্যবহার করেছেন। এটা তাঁর পক্ষে কম কৃতিত্ব নয়। আর, এই ভাষা-বৈশিষ্ট্যের জন্যও তাঁর ছন্দের ধ্বনি নূতন ব'লে বোধ হয় ; চলতি বাংলার অনভ্যস্ত ধ্বনি ওই উভয়প্রকার ছন্দেই একটি নূতনত্বের আভাস এনে দিয়েছে।

* বুদ্ধদেব 'পদাতিক'-এর [illegible] মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক এই দুইরকম

ছন্দের দু'একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের বিষয় আলোচনা করেছেন। আমরাও তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। বুদ্ধদেবের মন্তব্যের সার্থকতা কতখানি তাই নির্ণয় করতে চেষ্টা করব। বলা প্রয়োজন যে, আমি যাকে বলেছি ষণ্মাত্রপর্বিক তাকেই তিনি (রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ ক'রে) 'তিন-মাত্রার ছন্দ' ব'লে অভিহিত করেছেন এবং আমি যাকে বলি 'যৌগিক' তাকে তিনি বলেছেন 'পয়ার'। এ-স্থলে পারিভাষিক শব্দের সার্থকতা আমাদের বিচার্য নয়। আমাদের আলোচ্য 'পদাতিক'-এর ছন্দোবৈশিষ্ট্য।

প্রথমে মাত্রাবৃত্তের কথা ধরা যাক। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছেন, "নিখুঁত কারিগরি ধরা পড়েছে তিন-মাত্রায় যুক্তাক্ষরের ব্যবহারে, তা-ছাড়া পংক্তিগুলির শেষে স্বরবর্ণ-যোজনায়, যার জোরে তিনি মিল পর্যন্ত বর্জন করতে পেরেছেন, অথচ পাঠককে তা প্রায় বুঝতেই দেন নি"। তিন মাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরের ব্যবহারে কি নিখুঁত কারিগরি ধরা পড়ল তা তিনি বুঝিয়ে বলেন নি, আমিও বুঝতে পারি নি ; পংক্তিগুলির শেষে স্বরবর্ণ-যোজনা সম্বন্ধে তিনি কি বলতে চেয়েছেন তা-ই আমার বোধগম্য হ'লো না—বস্তুত এ-কথাটি আমার কাছে অর্থহীন ব'লেই বোধ হয়েছে। তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মিল-বর্জনের কথা যা বলেছেন, তার সার্থকতা আছে। অ-মিল মাত্রাবৃত্ত-রচনায় সুভাষের দক্ষতা অবশ্য স্বীকার্য। অর্থাৎ তিনি যে এ-জাতীয় ছন্দে মিল না দিয়েও শ্রুতিমাধুর্য অব্যাহত রাখতে পেরেছেন, সেটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। মিল দেবার অপটুতা-বশেই যে অমিল কবিতা রচনা করেছেন, তাও নয়। কারণ মোট আটাশটি কবিতার মধ্যে ষোলোটিতেই মিল রয়েছে, এবং অনেক জায়গায় মিলের মধ্যে চমৎকার মুন্সিয়ানাও আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'আদর্শ' ও 'বানপ্রস্থ' এ-দুটি কবিতার নাম বিশেষ ভাবে করা যেতে পারে। এই মিলের প্রসঙ্গে তাঁর সনেট-জাতীয় রচনাগুলি (তার মধ্যে একটি মাত্র চোদ্দ লাইনের, আর বাকি চারিটিই তের লাইনের) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তেরো লাইনের সনেটগুলির মিল ও রচনাভঙ্গি, এই দুই ক্ষেত্রেই বিশিষ্টতা আছে। তারি মধ্যে 'অতঃপর'-নামক কবিতাটির গদ্যভঙ্গি বেশ উপভোগ্য। সুতরাং এ-কথা বলা চলে যে, মিল দেবার যথেষ্ট পটুতা থাকা সত্ত্বেও সুভাষ বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জন্যে ইচ্ছাপূর্বক অমিল কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর এ

প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি ; সুতরাং এ-বিষয়ে বুদ্ধদেবের মন্তব্য সর্বতোভাবে স্বীকার্য। অবশ্য এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, যৌগিক (বা অক্ষরবৃত্ত) ছন্দে মিলবর্জনে অভিনবত্ব কিছুই নেই ; কেন না, মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকেই এ-কাজ করেছেন। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মিল-বর্জনে এখনও যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। এ-ছন্দের উদ্‌ভাবয়িতা রবীন্দ্রনাথ ; তিনি কখনও এ-ছন্দে মিল ত্যাগ ক'রে কবিতা রচনা করেছেন ব'লে মনে হয় না। যতদূর মনে পড়ে এ-কাজ প্রথম করেন সত্যেন্দ্রনাথ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটিমাত্র কবিতায় তিনি মিল বর্জন করেছিলেন ব'লে মনে হচ্ছে। হাতের কাছে বই না থাকাতে দৃষ্টান্ত দিতে পারলাম না। তার পরেই এ-কাজ করেছেন সজনীকান্ত দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য-প্রমুখ কবিরা। সজনীকান্তের 'রাজহংস' এবং সঞ্জয় বাবুর 'সাগর' নামক কবিতা-পুস্তকের মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দে রচিত সমস্ত কবিতাই অমিল। আধুনিক কালে আর কোনো কাব্য-গ্রন্থ এ-বিশিষ্টতা অর্জন করেছে কি না জানি না। আর, অপরাজিতা দেবীর কবিতার বৈশিষ্ট্য হ'লো মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও চলতি ভাষার ব্যবহার। সুভাষের গ্রন্থে এই উভয় বিশিষ্টতারই সমাবেশ ঘটেছে ; অর্থাৎ তাঁর মাত্রাবৃত্ত ছন্দের রচনায় ভাষা সর্বত্রই চলতি এবং অনেক স্থলে মিলও বর্জিত রয়েছে। রাজহংসের অমিল মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে পদাতিকের অমিল মাত্রাবৃত্তের আরও দুটি পার্থক্য আছে। এক, রাজহংসের কবিতাগুলি অসমপংক্তিক, কিন্তু পদাতিকে সমপংক্তিক। এ-ক্ষেত্রে রাজহংসেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করতে হয় ; কারণ পংক্তিগুলি সমায়তন না হওয়াতে কবিরও স্বাধীনতার পরিসর বেড়ে গিয়েছে এবং ধ্বনিও একঘেয়ে না হ'য়ে বিচিত্ররূপে ফুটে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। দুই, রাজহংসে প্রতিপংক্তিরই শেষ পর্বের মাত্রাপরিমাণ সর্বত্রই দুই ; সুভাষ কিন্তু এ-বিষয়ে অধিকতর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। অন্তিমপর্বে তিন বা পাঁচ মাত্রা রেখেও অমিল ছন্দ রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন। যথা—

(১)　ভয় করি তায়, । বিস্ময় মনে । জাগে,
　　　মহিমা বিরাট । শ্রদ্ধায় করি । মস্তক অব । নত—
　　　ভালোবাসিবারে । যত চাই তত । সভয়ে ফিরিয়া । আসি ।

—রাজহংস, সজনীকান্ত

(২) ঘড়ির কাঁটায়। কত যে মিনিট। মরছে,
মনে অনন্ত। সময়ের অধি।—রাজ্য ;
ভুলেছি, জ্যোৎস্না। হারায়ে হরিৎ। ধান্য
এখানে বন্দী। আনা-তিনেকের। বালুবে।

—পদাতিক, রোম্যান্টিক

(৩) দূরে সিমুল গাছ,। ধান ক্ষেত তার। কিনার ঘেঁসে।
কিছু নয়, তারা। তবু কী স্বপ্ন। রচনা করে।
নগরের সেই। নীড় ছেড়ে এসে। এখানে ভাবি,
সিনেমা-ছায়ায়। রাজধানীতেই। ছিলাম ভালো।

—ঐ, এখানে

রাজহংসে পংক্তি-প্রান্তে দুই মাত্রারই একাধিপত্য। পদাতিকে সমপংক্তিক কবিতায় লাইনের শেষে দুই মাত্রা স্থাপনের রীতিও দেখা যায়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে অমিল বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস নেই। আরও একটি বিষয়ে রাজহংসের সঙ্গে পদাতিকের ছন্দোগত সাদৃশ্য আছে। দুইখানি বইতেই একটি ক'রে অমিল পঞ্চমাত্র-পর্বিক ছন্দের কবিতা আছে। আর কেউ এ রকম ছন্দ রচনা করেছেন কি না জানিনে। রাজহংসের 'সরস্বতী' এবং পদাতিকের 'বধূ' পরস্পর তুলনীয়।—

(১) পথের জনতায়
হারিয়ে ফেলে কখনো আপনারে
আপন মনে চলিয়া এনু সারাটা পথ ধরি'—
কলহ-কোলাহলে
কখনো মনে জমেছে বিষ, কখনো ধূলি জালে
হয়েছে কালো আমার দশ দিশ

(২) বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা, তাই
কাছেই পথে জলের কলে সখা,
কলসি কাঁখে চল্‌ছি মৃদু চালে,
গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো।

এ-দুটির পার্থক্যও লক্ষণীয়। 'সরস্বতী'-র ভাষা সাধু ও পংক্তি অসমান ও প্রবহমান, 'বধূ'-র ভাষা চল্‌তি, কিন্তু পংক্তি সমান ও অপ্রবহমান। স্বীকার করতে হবে 'সরস্বতী' কবিতার ভাবপ্রকাশের পরিসর বেশি এবং তার ছন্দের গতিভঙ্গিও অধিকতর সাবলীল।

পদাতিকের 'কিংবদন্তী' কবিতাটির ছন্দের প্রতি বুদ্ধদেব ছান্দসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন, "এ-ছন্দের জাতি অবশ্য নতুন নয়, এগারো মাত্রাও অভিনব নয়;...হসন্ত শব্দের আধিক্যের জন্যই 'কিংবদন্তী'র সুরটা হয়েছে আলাদা"। তাঁর একথা খুবই সত্যি। এই এগারো মাত্রার ছন্দ বাংলা কাব্যে অন্তত ভারতচন্দ্রের আমল থেকেই সুপরিচিত এবং তার সাবেক নাম হচ্ছে 'একাবলি'। দৃষ্টান্ত তুলে প্রবন্ধের ভার বৃদ্ধি করতে চাইনে। হসন্ত ধ্বনির বাহুল্য, বিশেষত হসন্ত-মধ্য চল্‌তি বাংলা শব্দের প্রয়োগে 'কিংবদন্তী'র ধ্বনিটা একটু বেশি দুলে উঠেছে, একথা সহজেই বোঝা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের বহু রচনায় এ কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। পদাতিকের 'এখানে' কবিতাটিতেও এ ভঙ্গি সুস্পষ্ট। 'এখানে' এবং 'কিংবদন্তী'-র ছন্দ পরস্পর তুলনীয়।—

(১) উর্মিল ভূঁই। হাঁটে বনহীন তেপান্তরে;
সরু সরু ঘাস। শিরে বুঝি তার। শিশির জলে।
দুই দিকে দূর। বালুদের দেশ। মধ্যে নদী
শ্বাস টেনে টেনে। পায়ে পায়ে রাখে। চিকণ রেখা।

(২) চল্‌ছিলো এত।-কাল বেসাতি
নিরাপদে বেশ। এ দাস-দেশে।
আজকে ঢেউয়ের। অলিগলিতে
যমদূত দেয়। ডুব-সাঁতার।

'এখানে'-র প্রতি পংক্তির প্রথম থেকে একটি ক'রে পর্ব বাদ দিলেই অবিকল 'কিংবদন্তী'-র ছন্দ পাওয়া যায়। তুলনায় এ-দুটি কবিতার মধ্যে 'এখানে'-র ছন্দ অনেক বেশি সুন্দর, মুন্সিয়ানাও আছে। তা-ছাড়া, 'কিংবদন্তী'-র ছন্দকে সম্পূর্ণ 'নিখুঁত'ও বলা যায় না। দুটি জায়গায় বাংলা ভাষার স্বাভাবিক

প্রাস্বরিক (accentual) রীতি বা বাক্‌ভঙ্গি লঙ্ঘিত হয়েছে, এরকম লঙ্ঘন ছন্দের উৎকর্ষ-সাধনের অনুকূল নয়। "চল্‌ছিলো এতকাল বেসাতি" এ-কথাটার স্বাভাবিক প্রস্বর-বিভাগ (accent-group) হচ্ছে এ-রকম—

´চল্‌ছিলো। ´এত কাল'। ´বেসাতি।

অর্থাৎ চ, এ এবং বে এই তিনটি ধ্বনির উপর স্বভাবতই প্রস্বর পড়ে। কিন্তু ছন্দের খাতিরে যদি তাকে এ-ভাবে বিভক্ত করা যায়—

´চল্‌ছিলো এত। ´কাল বেসাতি

তা'হলে এ এবং বে ধ্বনি-দুটি তাদের স্বাভাবিক প্রাস্বরিক মর্যাদা হারায়। পক্ষান্তরে 'কাল' শব্দের আদি ধ্বনিটি এ-স্থলে স্বভাবত অ-প্রস্বরিত হ'লেও ছন্দের খাতিরে কৃত্রিমভাবে প্রস্বরিত হ'য়ে ভুঁই ফোঁড়ের মতো মাথা খাড়া ক'রে উঠেছে। ছন্দের পক্ষে স্বাভাবিক বাক্-রীতির অল্প-স্বল্প লঙ্ঘন মারাত্মক নয় এবং অনেক স্থলে অনিবার্যও বটে। কিন্তু এস্থলে ওই প্রাস্বরিক রীতি-লঙ্ঘন আমার কানে একটু খুঁতের মতোই বোধ হয়েছে। 'জাহাজের হালচাল কিছুই'—এস্থলেও পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য।

খুঁত ধরতে গেলে পদাতিকের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আরও দুয়েক জায়গায় কিছু ত্রুটি পাওয়া যায়। যথা, 'চীন' কবিতাটিতে প্রতি পংক্তির শেষ পর্বে যদি পুরো ছয় মাত্রা না রেখে এক মাত্রার ফাঁক রাখা হ'তো, তাহ'লে অনেক বেশি শ্রুতিমধুর হ'তো। যেমন—

লাল নিশানের। নিচে উল্লাসী। মুক্তির ডাক
রাইফেল আজ। শত্রুপাতের। সম্মান পা'ক।

এখানে 'মুক্তির ডাক' ও 'সম্মান পা'ক' পর্ব-দুটিতে পুরো ছয় মাত্রা দিয়ে ও-দুটিকে নিরেট ভাবে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ও-ভাবে ভরাট ক'রে দিলে অনেক স্থলে আমাদের কানে ধ্বনি-প্রসারের অবকাশ থাকে না, ফলে শ্রুতিমাধুর্য ব্যাহত হয়। যদি উপরের পংক্তি দুটীর শেষ পর্ব থেকে একটি মাত্র মাত্রা কমিয়ে দেওয়া যায়—

লাল নিশানের। নিচে উল্লাসী। মুক্তি ডাক
রাইফেল আজ। শত্রুপাতের। সে মান পা'ক,

তাহ'লেই ধ্বনি-সৌন্দর্য ফুটে ওঠ্‌বার অনেকখানি অবকাশ ঘটে। বস্তুত সুভাষের স্বাভাবিক প্রখর-ধ্বনিরসিক কান যে এ কৌশলটি অনুভব করেনি, তা নয়। কেননা, দেখতে পাচ্ছি পদাতিকের সাতটি রচনাতেই এ কৌশল অবলম্বিত হয়েছে।

আরেকটি খুঁতের কথা ব'লেই মাত্রাবৃত্তের প্রসঙ্গ শেষ করব। 'পদাতিক'-নামক কবিতাটির তৃতীয়াংশের ছন্দটির কথা বল্‌ছি। ওটির প্রথম ক'টি লাইন এ-রকম—

শ্রীমতী, আমার অরণ্য স্বাদ
মেটে এখানেই। লেকে সন্ধ্যায়
গোচারণ ঘাসে প্রার্থী যুবক।
কমণ্ডলুতে কারণ, তাই তো
ওঁ তৎসৎ,—প্রলাপ ম্লানেই। ইত্যাদি।—

এখানে ষন্মাত্র-পর্বিক ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভঙ্গিতে প্রবহমান করার প্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত-যোগে প্রমাণ ক'রে বলেছেন, মাত্রাবৃন্দ ছন্দে "অমিত্রাক্ষর রীতিকে…গদ্য-জাতীয় স্বাধীনতা" দেওয়া চলে না (ছন্দ, পৃঃ ৭১-৭৩ দ্রষ্টব্য)। ঠিক উপরের রচনাটির ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের রচিত দৃষ্টান্তটি আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করছি।—

বিরহী গগন ধরণীর কাছে
পাঠাল লিপিকা। দিকের প্রান্তে
নামে তাই মেঘ, বহিয়া সজল
বেদনা; বহিয়া তড়িৎ-চকিত
ব্যাকুল আকুতি। ইত্যাদি—

এ ছন্দ অমিত্রাক্ষরের গদ্য-জাতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে ব'লে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। সে হিসাবে এটি ব্যর্থ। সুভাষের রচিত ছন্দটিও তাই।

উপরের দৃষ্টান্তের 'ওঁ' ধ্বনিটা লক্ষ্য করার যোগ্য। সাধারণ দৃষ্টিতে ওটিকে একমাত্রিক ব'লে মনে হ'লেও আসলে এটি দ্বিমাত্রিক। এ-ধ্বনিটা

'হাঁ' শব্দের মতো অযুগ্ম নয়। ওর আসল উচ্চারণ-রূপ হচ্ছে ওং বা ওম্। অর্থাৎ ওটি দৃশ্যত অযুগ্ম হ'লেও কার্যত যুগ্ম-প্রকৃতি। কাজেই তার মাত্রামূল্যও দ্বিগুণ। হাঁ কথার উচ্চারণ-রূপ হাং বা হাম্ নয়; কাজেই ওটি অযুগ্ম ও এক-মাত্রিক। এস্থলে একটি কথা বলা দরকার। কোনো অযুগ্ম ধ্বনিও যদি বাংলায় একক অর্থাৎ অন্য কোনো ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত না হ'য়ে বিচ্ছিন্ন বা আল্‌গাভাবে উচ্চারিত হয়, তাহ'লে ওই অযুগ্ম ধ্বনিও স্বভাবতই দীর্ঘ হ'য়ে দুই মাত্রার স্থান অধিকার করে। ও-রকম আল্‌গা ভাবে উচ্চারিত হ'লে হাঁ, না, মা, কি, ছি প্রভৃতি সমস্ত অযুগ্মধ্বনিই দ্বিমাত্রিক ব'লে গণ্য হবে। সুখের বিষয় পদাতিক গ্রন্থেই ও-রকম একটি দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

> যেখানে আকাশ। চিকণ শাখায়। চেরা
> চলো না উধাও। কালেরে সেখানে। ডাকি,
> হা। হতোস্মি।। সড়কে বেঁধেছি। ডেরা,
> মরীচিকা চায়। বালুচারী আ-। খা কি? (পৃঃ ১৭)

এখানে 'হা' এই অযুগ্ম ধ্বনিটির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। তাই ওই স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা রক্ষা ক'রে তাকে দ্বিগুণ মাত্রামূল্য দেওয়া হয়েছে। এস্থলে সুভাষ যে সূক্ষ্ম শ্রুতি-বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

৪

এবার সুভাষের যৌগিক ছন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যে মন্তব্য করেছেন তার আলোচনা করা যাক্। তিনি বলেছেন, "পয়ারে (অর্থাৎ যৌগিকে) হসন্ত শব্দের (=ধ্বনির) ব্যবহার আমার রীতিমতো আশ্চর্য লেগেছে"। এই আশ্চর্য লাগার কারণটিও তিনি ঠিক্ ধরতে পেরেছেন। সে কারণটি হচ্ছে, "ছন্দ পড়বার সময় আমাদের চোখের অভ্যাসকে ভুলতে পারিনে"। এই স্বীকারোক্তি ক'রে বুদ্ধদেব সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন—সকলের যদি সে সাহস থাক্‌তো, তা-হ'লে বাংলা ছন্দের 'নতুন সম্ভাবনার দরজা' অনেক আগেই খুলে যেত এবং বাংলা ছন্দের আলোচনায় আমাকে যে অন্ধ বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে সে বিড়ম্বনা থেকে আমি নিষ্কৃতি পেতাম। বাংলা লিপি তথা চোখের অভ্যাসের জন্যেই বাংলা ছন্দ আলোচনার ক্ষেত্রে এক রকম

পারিভাষিক Babel-এর সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত যথার্থ ভাবে আলোচনা করতে হ'লে চোখের অন্ধ অভ্যাসের পরিবর্তে একটি সদা-জাগ্রত কানের অভ্যাস গ'ড়ে তোলা চাই। তাহ'লেই বোঝা যাবে ছন্দের আলোচনায় অক্ষর ব'লে কোনো জিনিষ নেই, আছে কতকগুলি ধ্বনি: যুক্তাক্ষর-অযুক্তাক্ষরের পরিবর্তে পাওয়া যাবে যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনি; 'শ্রুতিগম্য যুক্তাক্ষর' ব'লেও কোনো পদার্থ হ'তে পারে না—ওটা কানকে চোখঠারা মাত্র। বস্তুত ছন্দের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো চাই, তাহ'লে পরিভাষায় এবং ছন্দের বিশ্লেষণ রীতিতেও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটবে। আর রীতিমতো ব্যাবেলের পরিবর্তে পরস্পরের বোধগম্য ছন্দ-শাস্ত্র গ'ড়ে উঠবে। বস্তুত কানের কাজ চোখে সারার অভ্যাস হবার দরুনই ছান্দসিকের কথা অন্যেরা বুঝতে পারে না। কিন্তু বাংলা লিপি-রীতির পরিবর্তন না ঘটলে চোখের অভ্যাস দোষ দূর হবারও আশু সম্ভাবনা দেখিনে। তবে ছন্দ-জিজ্ঞাসুদের আমি বলি, বাংলা কবিতাকে ইংরেজি লিপিতে রূপান্তরিত ক'রে ছন্দ-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হ'লে চোখের অভ্যাসের বাধাটা কেটে যেতে পারে। বাংলা ভাষাকে ইংরেজি হরফে লিপিবদ্ধ করলে বাংলা ভাষা ও তার ধ্বনি-রূপের বিকার ঘটে না, অথচ আমাদের দৃষ্টিগত ও লিপিগত চিরন্তন অভ্যাসের আবরণটা স'রে যায়; তার ফলে অভ্যাস-মুক্ত মন নিয়ে ছন্দ-বিশ্লেষণের যথার্থ সুযোগ ঘটে। একথা তথা-কথিত 'অক্ষর'-বৃত্ত অর্থাৎ যৌগিক ছন্দের আলোচনায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেননা, ও-ছন্দই বিশেষভাবে লিপি-রীতির জালে জড়িয়ে গেছে। তথাকথিত চোদ্দ 'অক্ষরের' পয়ার ছন্দের যে-কোনো একটি 'যুক্তাক্ষর'-বহুল পংক্তিকে রোমান্ হরফে লিপ্যন্তরিত ক'রে তার ছন্দ-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হ'লেই কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। আমি পূর্বে অনেকবার দৃষ্টান্ত-যোগে এ-বিষয়টা বোঝাতে চেষ্টা করেছি। এই বিষয়ের পুনরবতারণা ক'রে প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি করতে চাইনে। তবে একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিলেই আমার কথা স্পষ্ট হবে আশা করি। যেমন, 'ছন্দ' শব্দটি; 'অক্ষর'-বৃত্ত পয়ার ছন্দে ও-শব্দটিতে দুই 'অক্ষর' ধরা হয় এবং সে দুটি অক্ষর হচ্ছে ছ আর ন্দ। কিন্তু এ বিভাগ হচ্ছে নিছক চাক্ষুষ এবং লিপিগত। কান দিয়ে শুনলে ও-কথাটিতে ছ এবং ন্দ পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে ছন্ এবং দ। অর্থাৎ 'ছন্দ'

কথাটির চাক্ষুষ রূপ হচ্ছে ছ-ন্দ, কিন্তু তার শ্রৌত রূপ হচ্ছে ছন্-দ। চাক্ষুষ পরিভাষায় ও-কথাটির প্রথমাংশে আছে একটি 'অযুক্ত' (ছ) এবং দ্বিতীয়াংশে একটি 'যুক্ত অক্ষর' (ন্দ)—এটা নেহাৎই লিপিরূপের কথা। কিন্তু শ্রৌত রূপের পরিভাষায় ও-কথাটির প্রথমেই আছে একটি 'যুগ্ম ধ্বনি' (ছন্) এবং দ্বিতীয়াংশে একটি 'অযুগ্ম ধ্বনি' (দ)। ইংরেজি হরফে ওটিকে chhanda রূপে লিখলে যুক্তাক্ষর না থাকাতে তার শ্রুতিরূপটি (ছন্-দ বা chhan-da) ধরা সহজ হয়। মনে রাখা চাই, ভাষার শ্রুতিরূপই হচ্ছে তার ধ্বনিরূপের অবিকল প্রতিচ্ছবি ; পক্ষান্তরে লিপিরূপ হচ্ছে ভাষার ধ্বনি বা শ্রুতিকে দৃষ্টিগোচর করার অসম্পূর্ণ কৌশলমাত্র। বাংলা লিপিরূপের প্রভাবে আমরা 'পুণ্যবান' ও 'পুণ্যবতী' এই উভয় শব্দেই চার অক্ষর গণনা করতে অভ্যস্ত হয়েছি ; কিন্তু ওদের ধ্বনি-তথা-শ্রুতিরূপ হচ্ছে যথাক্রমে পুন্-ন-বান্ এবং পুন্-ন-ব-তী ; প্রথমটিতে একটি অযুগ্ম ও ছুটি যুগ্ম সবশুদ্ধ তিনটি ধ্বনি আছে, আর দ্বিতীয়টিতে আছে চারটি—প্রথমটি যুগ্ম ও বাকি তিনটি অযুগ্ম। এ ভাবে বিশ্লেষণ করলেই ছন্দের ধ্বনিরূপের যথার্থ বিশ্লেষণ হয়। কিন্তু লিপিরূপ 'দেখে' বিশ্লেষণ করলে যথাযথ ভাবে ধ্বনিরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। চোখ অনেক সময়ই কানকে ফাঁকি দেয়। গোড়াতেই এই গলদ থাকাতে আমাদের ছন্দ-বিচার প্রণালী দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারছে না। বুদ্ধদেব চোখের অভ্যাসের কথা স্বীকার করাতেই এতগুলি কথা বলার সুযোগ হ'লো। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এবার মূল প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা যাক্। ছন্দের বিশ্লেষণে আমাদের বাক্-রীতির প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা চাই। কেননা, বাক্-রীতিকে গুরুতর ভাবে লঙ্ঘন ক'রে ছন্দ-রচনা অসম্ভব। বস্তুত শিল্পিত বাক্-রীতির নামই ছন্দ। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আমাদের বাক্-রীতির বহু বিচিত্র রূপ ধরা পড়ে। এস্থলে ছুটি মাত্র রূপের কথা সংক্ষেপে বলব। প্রথমত, আমাদের বাক্যের স্বাভাবিক প্রস্বর-ব্যবস্থাকে ছন্দেও মোটামুটি অব্যাহত রাখতে হয় ; ছন্দের খাতিরে তাকে একটু-আধটু পরিবর্তন করা গেলেও তাতে গুরুতর পরিবর্তন

ঘটানো যায় না, ঘটালে কানে খট্‌কা লাগে অর্থাৎ ছন্দ-পতন ঘটে। বস্তুত ছন্দ-পতন বা কানে খটকা লাগার মানেই হ'লো স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির লঙ্ঘন। দ্বিতীয়ত, যুগ্ম-ধ্বনির ব্যবহার-কৌশলই হ'লো ছন্দোবৈচিত্র্যের প্রাণ। আর, আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ-ভঙ্গিতেই যুগ্মধ্বনির দু-রকম প্রয়োগ দেখা যায়। (১) যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট বা সংকুচিত প্রয়োগ এবং (২) তার বিশ্লিষ্ট বা সম্প্রসারিত প্রয়োগ। যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে সর্বদাই সম্প্রসারিত ক'রে দুই মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয় তাকেই বলি মাত্রাবৃত্ত। আর, যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনির ওই উভয় প্রকার প্রয়োগেরই ব্যবহার দেখা যায় তাকেই বলি যৌগিক; প্রচলিত পরিভাষায় এই ছন্দই 'অক্ষরবৃত্ত' নামে পরিচিত। মজার কথা এই যে, প্রায় কুড়ি বছর আগে আমিই ওই নামটি বাংলা সাহিত্যে চালিয়েছিলাম। এতদিনে এটা অনেকের মনে এমন ভাবে শেকড় গেড়ে বসেছে যে, বহু চেষ্টা ক'রেও আমি এখন আর তাকে নাড়তে পারছি নে। অক্ষরবৃত্ত নামটা ওই ছন্দের প্রচলিত অক্ষরগোনা হিসাবের দিক থেকে সাধারণের মনে খুব লেগেছে। কিন্তু ওই নামটা অবৈজ্ঞানিক। যৌগিক (composite) নামটা বৈজ্ঞানিক ধ্বনি-বিশ্লেষণ-জ্ঞাপক। তাই তার অর্থগ্রহণ সাধারণের পক্ষে একটু কঠিন। যাহোক, যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি কোথায় বিশ্লিষ্ট হবে এবং কোথায় সংশ্লিষ্ট হবে সে এক জটিল প্রশ্ন। এ-সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধে বহু আলোচনা করেছি। আর আলোচনা করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবু সংক্ষেপে মাত্র চারটি নিয়মের কথা বলছি। (১) শব্দান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি সর্বদাই বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রিক হ'য়ে থাকে—এ-নিয়মের ব্যতিক্রম এত কম যে নেই বললেই হয়। (২) সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক হ'য়ে যাচ্ছে—এ-নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় বটে, কিন্তু খুব বিরল। (৩) সমাসের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনি বিকল্পে সংশ্লিষ্ট হয়। শব্দ মধ্যবর্তী যে-সব যুগ্মধ্বনি (যে কারণেই হোক) সাধারণত যুক্তাক্ষরের সাহায্যে লেখা হয় না সেগুলি প্রায়শ বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রিক ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে, কিন্তু ছন্দের প্রয়োজন-মতো সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক করতেও বাধা নেই। আসলে আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতিকে বজায় রেখে সব যুগ্মধ্বনিকেই সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট করা যায়। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র ছন্দের রাজা ছিলেন বটে,

কিন্তু যৌগিক ছন্দকে অক্ষর-সংখ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার রীতি তিনিই প্রবর্তন করেন। এই আক্ষরিক রীতি শতাধিক বৎসর কাল বাংলা সাহিত্যে অনুসৃত হ'য়ে আসছে। কিন্তু ধ্বনি-প্রতিষ্ঠ ছন্দকে লিপি-প্রতিষ্ঠ করার এ প্রয়াস বিজ্ঞান-সম্মত নয়। তাই তার ব্যর্থতা অনিবার্য। সূক্ষ্ম ধ্বনিরসিক রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে এ ছন্দের অক্ষর-সংখ্যার শৃঙ্খলকে কতকাংশে শিথিল করেন। কিন্তু এ-পথে তিনিও বেশি অগ্রসর হয়েছেন ব'লে মনে করিনে। বেশি অগ্রসর হবার বিপদও আছে। যাহোক, যৌগিক ছন্দকে অক্ষরের ডোরে বাঁধার প্রয়াসে আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতিকে অনেক স্থলেই কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত করতে হয়। কিন্তু তবু খটকা লাগে না দুই কারণে। এক, এই কৃত্রিম উচ্চারণই দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে আমাদের কাছে স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে। দুই, আমাদের উচ্চারণের মধ্যেই কতক পরিমাণে সংকোচন-সম্প্রসারণের স্বাধীনতা রয়েছে; এই স্বাধীনতা যদি না থাকত, তাহ'লে দীর্ঘ দিনের অভ্যাসেও অস্বাভাবিক জিনিষ স্বাভাবিক হ'য়ে উঠতে পারত না। তা ছাড়া, সব ছন্দেই কিছু না কিছু পরিমাণে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়, তার উপর ভিত্তি ক'রেই শিল্প রচনা করতে হয়। সে হিসাবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও অনেকখানি কৃত্রিমতা রয়েছে। যাহোক, আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণকে অবলম্বন ক'রে যদি যৌগিক ছন্দের অক্ষর-সংখ্যার কৃত্রিম বন্ধনকে শিথিল করা যায়, তবে কিছুমাত্র অন্যায় তো হবেই না, বরং ছন্দকে কৃত্রিমতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার গৌরব অর্জন করাই হবে। সুভাষ এ-পথে অগ্রসর হয়েছেন, সে-জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু সুভাষের পূর্ববর্তীরাই এ-কার্যে পথ প্রদর্শন করেছেন।

সে কথা বলার পূর্বে বুদ্ধদেবের একটি উক্তির আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, "আমি আবিষ্কার করি যে পয়ারে 'কলকাতা' অনায়াসেই তিন মাত্রার জায়গা পায়"। দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

আসিলো কলকাতায়। আরো এক কাল।

কিন্তু এখানে 'কলকাতা'য় তিনি কি ক'রে তিন মাত্রা 'আবিষ্কার' করলেন তা বুঝতে পারলাম না। আমি তো দেখতে পাচ্ছি ও-শব্দ স্পষ্টতই চার মাত্রার

জায়গা জুড়ে রয়েছে। বরং সুভাষই কৃতিত্বের সঙ্গে ও-কার্যে সফল হয়েছেন। যথা—

(১) ইতিমধ্যে কলকাতায় ; একুত্রিশে চৈত্রেই চম্পট···
(২) বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশ বিদ্যা কল্‌কাতায়।

উভত্রই 'কলকাতা' শব্দ তিন মাত্রার বেশি জায়গা জোড়েনি। তারপর বুদ্ধদেব বলেছেন,—

"আসিলো কলকাতায় আরো এক সকাল

এ-ও পয়ারে চ'লে যায়"। আমার কিন্তু মনে হয় এটা চালানো উচিত নয়, কারণ তাতে বাংলা বাক-রীতির উপর জুলুম হবে। কারণ 'এক সকালকে' 'এক্ককাল' রূপে গণ্য করলে বাংলা প্রাস্বরিক রীতি ব্যাহত হয়। কারণ 'সকাল' কথার প্রথম ধ্বনিটির উপর একটি প্রস্বর আছে, কিন্তু উক্ত রূপে 'এক' কথার সঙ্গে জুড়ে দিলে ওই প্রস্বরটি মারা পড়ে এবং উচ্চারণে কৃত্রিমতা ও বিকার ঘটে। এরকম বিকার ছন্দে স্বীকার্য নয়। "এক শো কাল" হ'লে ওরকম সংশ্লেষণ স্বীকার্য হ'তো।

৬

যৌগিক ছন্দে সুভাষের যুগ্মধ্বনির ব্যবহার-কৌশলকে বুদ্ধদেব দুই শ্রেণীতে ফেলেছেন। (১) 'প্রথাবিরুদ্ধ' অর্থাৎ অনভ্যস্ত স্থলে যুগ্মধ্বনির সংশ্লেষ এবং (২) অনুরূপ অনভ্যস্ত ক্ষেত্রে ওই ধ্বনির বিশ্লেষ। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের বিচারটাই আগে করা যাক। বুদ্ধদেব তাঁর এই 'অকুণ্ঠিত আচরণে'র দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন :

(১) বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
(২) মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোঁরাতে মন্দ লাগবে না।

"এখানে 'প্রত্যহ' আর 'লাগবে না' চার মাত্রায় ছড়িয়ে আছে।" এই মাত্রা প্রসারণের নৈপুণ্য ও অভিনবত্বের খুব তারিফ করেছেন বুদ্ধদেব। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, 'প্রত্যহ' কথাটিকে টেনে দীর্ঘ ক'রে 'প্রৎ-ত্যহ'-রূপে

চার মাত্রার স্থান দিলে ও-শব্দটির স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির উপর জুলুম করা হয়। আমার বিশ্বাস এস্থলে প্রত্যেক বাঙালী পাঠকেরই খটকা লাগবে। কাজেই অভিনব হ'লেও এটিকে সুষ্ঠু বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এ-ক্ষেত্রে যৌগিক ছন্দের দ্বিতীয় নিয়মটি প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে 'লাগবে না' কথায় চার মাত্রা ধরতে বাধা নেই (পূর্বোক্ত চতুর্থ নিয়ম দ্রষ্টব্য); কিন্তু এক্ষেত্রে অভিনবত্বও কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' গ্রন্থের এরকম প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত আছে। একটি উদ্ধৃত করছি।—

সব কথা তার
কোনো কালে জানবে না কেউ
নিজেও জানে না কোনো লোক। (অগোচর)

এখানে 'জানবে না'-র মাত্রামূল্য চার। সুভাষের যৌগিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে যুগ্ম ধ্বনির অনভ্যস্ত বিশ্লেষণের দিকে তাঁর ঝোঁক নয়, তাঁর ঝোঁক হচ্ছে অনভ্যস্ত সংশ্লেষণের দিকে। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। কারণ, এ-ছন্দে অ-সংস্কৃত শব্দের অযুক্ত যুগ্ম ধ্বনিকে অক্ষর গোনার অভ্যাসের ফলে বিশ্লিষ্ট ব'লে গণনা করার দিকেই আমাদের সাধারণ প্রবণতা; কাজেই ওই বিশ্লেষণে কোনো কৃতিত্ব নেই এবং তাতে ছন্দও দুর্বল হয়। তা ছাড়া, ও-রকম বিশ্লেষণ অনেক স্থলেই আমাদের বাক্-রীতি-বিরোধী। কিন্তু বাক-রীতি বজায় রেখে যুগ্ম-ধ্বনির বিশ্লেষণে কৃতিত্ব আছে। সুভাষের রচনায় ওরকম বাক্‌রীতি-সঙ্গত অথচ অনভ্যস্ত বিশ্লেষণেরও একটি দৃষ্টান্ত আছে।—

(১) প্রজাপতি পায় নাকো। এরোপ্লেনের শব্দ। বাতাসের কানে।
—পলাতক

(২) বোমাত্মক এরোপ্লেন। গান গায়। দক্ষিণ সমীরে।
—পদাতিক (৪)

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'এরোপ্লেন' কথাটিতে চার মাত্রা, কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্তে পাঁচ মাত্রা। এরকম বিশ্লেষণ অনভ্যস্ত হ'লেও একেবারে অভিনব নয়। রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(১) যুগান্তরের ব্যথা। প্রত্যহের। ব্যথার মাঝারে···(অতীত কাল)

(২) যুগান্তর সাগরের। দ্বীপান্তর। হ'তে বহি আনে। (ঐ)

'যুগান্তর' কথাটি দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে সংশ্লিষ্ট এবং এটা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী; কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্তে বিশ্লিষ্ট, অথচ বাক্‌রীতি বিরোধী নয়। কেন নয়, সে কথা এখানে উত্থাপন করতে চাইনে। কিন্তু উক্ত প্রকার বিশ্লেষণ পদ্ধতির অনুসরণ ক'রে আমি যদি লিখি—

নীলোৎপলাঞ্জলি। দিয়া আমি। পূজিনু দেবীরে,

তাহ'লে আমার যৌগিক ছন্দে কি দোষ ঘটবে? ছন্দ-স্রষ্টা কবিদের আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করছি।

এবার সুভাষের অনভ্যস্ত সংশ্লেষণের বিষয় আলোচনা করা যাক্। তাঁর এ-রকম সংশ্লেষণকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। আমরা ওই শ্রেণী-বিভাগ অনুসারেই এ-বিষয়ের আলোচনা করব। প্রথমত, টুকরো, পাগড়ি, হাজরা, টাট্‌কা, খাজনা প্রভৃতি শব্দকে দুই মাত্রা এবং ডায়মণ্ড, হারবার, কমরেড, কসরৎ, দরকার, কলকাতা, মাসতুত, ঝুমঝুমি প্রভৃতিকে সুভাষ তিন মাত্রা ব'লে গণ্য করেছেন; আর, অধিকাংশ স্থলেই তার প্রয়োগও বেশ সুষ্ঠু হয়েছে।

(১) হাজরা পার্কে সভা কাল;। নিরপেক্ষ থেকে আর। চিত্তে নেই সুখ।

(২) অথচ বকেয়া খাজনা। প্রজারা দেয় নি গত। দুই তিন সনে।

(৩) কী দরকার এসে?

(৪) সংগ্রাম নিশ্চিত,/তবু। মাসতুতো ভায়েরা···

(৫) এসপ্ল্যানেডে আশ্চর্য্য জনতা।

কিন্তু এতে অভিনবত্ব নেই। যৌগিক ছন্দের চতুর্থ নিয়ম অনুসারেই এগুলি সুষ্ঠু ব'লে স্বীকার্য। তবে সুভাষের কৃতিত্ব এই যে সাধারণত কবিরা এসব স্থলে অক্ষর গোনার নিরাপদ পথে বিশ্লেষণের দিকেই ঝুঁকে থাকেন; কিন্তু সুভাষের প্রখর কান তাঁকে উচ্চারণ-রীতির পথেই চালনা করেছে, ছন্দ-

শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেয় নি ; তাই তাঁর চোখ তাঁকে আক্ষরিক হিসাবের নিরাপদ পথের দিকে চালনা করার সুযোগ পায় নি। যাহোক, তথাপি এই বিশিষ্টতা বাংলা কাব্যে অভিনব নয়, একথা স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' পুস্তকে (পৃঃ ১১৮-১৫৮) এ-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ঐ বই থেকে (পৃঃ ১৩০) একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ। লট্‌কানের ছাল,

এখানে টোট্‌কা ও লট্‌কান কথার ধ্বনি-সংশ্লেষণ লক্ষিতব্য।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যয় যোগেও অনেক সময়ে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির উৎপত্তি হয়। ও-সব স্থলেও যুগ্মধ্বনির সংশ্লেষণ হওয়া উচিত কি না, তাও তর্কের বিষয় হ'তে পারে। অর্থাৎ 'এক' শব্দে দুই মাত্রা, কিন্তু 'একটি' শব্দের দুই মাত্রা গণনা করা যায় কি ? পূর্বোক্ত চতুর্থ নিয়ম অনুসারেই বলতে হবে, যায়। দৃষ্টান্ত—

(১) একটি কথা শুনিবারে।' তিনটি রাত্রি মাটি। (ছন্দ, ১৩০)

(২) একেকটি ক'রে মোর। দিন রাত্রিগুলি

সুন্দর সুগন্ধ-তনু। একেকটি সম্পূর্ণ পুষ্প-সম।

—বন্দীর বন্দনা, কালস্রোত

(৩) আমরা কয়েকটি প্রাণী,। দুচোখে ঘুমের হরতাল।

—পদাতিক, পৃঃ ১৯

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'একেকটি' (মূলে আছে এক-একটি, বোঝার সুবিধার জন্যে আমি সংক্ষিপ্ত করেছি) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রণালীর দৃষ্টান্ত পাশাপাশিই রয়েছে।

তৃতীয়ত, অতঃপর প্রশ্ন আসে যৌগিক ছন্দে হসন্ত-মধ্য চলতি ক্রিয়াপদের যুগ্মধ্বনিগুলিকে সংশ্লিষ্ট করা চলে কি না। বহু দিন যাবৎ এ প্রশ্ন আমার মনকে দোলা দিয়েছে। কয়েক বছর আগে আমি প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি ও-সব ক্ষেত্রেও সংশ্লেষণ করা যায় কি না এবং এ-কথাও বলি যে, ও-রকম প্রয়োগ চালালে বাংলা ছন্দে নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে, এবং বাংলা কবিতার ভাবাও জোরালো হবে। এস্থলে ও-বিষয়ের বিস্তৃত আলো-

চনা করার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত রচনা ক'রে জবাব দেন যে, তাও করা চলে এবং তাতে ছন্দের কোনো ক্ষতি হয় না। যথা—

(১) 'সিট্‌কে' মুখ খাবি, জ্বর। 'আট্‌কে' যাবে কাল।
(২) টাট্‌কা মাছ 'জুট্‌ল' না তো,। শুট্‌কি দেখো চেখে।
(৩) ঘূর্ণী বেগে 'উড়্‌ল' ধুলো। রক্ত সন্ধ্যাকাশে।
(৪) 'টুট্‌ল' কেন উর্বশীর। মঞ্জীরের ডোর।

—ছন্দ, পৃঃ ১১৩, ১৫৩

এখানে সিট্‌কে, আট্‌কে, জুট্‌ল, উড়্‌ল, টুট্‌ল, এই ক'টি হসন্ত-মধ্য চল্‌তি ক্রিয়াপদে যুগ্মধ্বনির সংশ্লেষণ ঘটেছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এখানে 'ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয় নি"। এই আলোচনার পূর্বে তিনি যৌগিক ছন্দে কখনও হসন্ত-মধ্য চল্‌তি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন নি। অতঃপর সাক্ষাতেও তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। তার কিছু দিন পরেই তিনি যৌগিক ছন্দে হসন্ত-মধ্য চল্‌তি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। ওই কবিতা-গুলি 'পরিশেষ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ও-সব কবিতায় তিনি উক্ত-প্রকার ক্রিয়াপদের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট না ক'রে অক্ষর-হিসাবের রীতি অনুসারে বিশ্লিষ্টই করেছেন।—

সে না হ'লে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
'উঠ্‌ত' না শঙ্খধ্বনি,
'মিল্‌ত' না যাত্রী কোনো জন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হ'য়ে
'রইত' নীরব। (প্রাণ)

উঠ্‌ত, মিল্‌ত, রইত—তিন স্থলেই যুগ্মধ্বনি বিশ্লিষ্ট। সুতরাং ও-রকম ক্রিয়া-মধ্যস্থ যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে দেখা দেয় নি, "ছন্দ" গ্রন্থের কয়েকটি মাত্র উদাহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে আছে ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ছন্দ-পথের সাহসী 'পদাতিক' সাহিত্যেও ও-রকম প্রয়োগ আমদানি ক'রে সুধী জনের বিস্ময়ভাজন হয়েছেন। যথা—

(১) বসন্ত সত্যিই 'আসবে' ? কী দরকার এসে ? (বার্ষিক)
(২) আমাদের হাতে 'আস্‌বে' রাজ্যভার ? চমৎকার কিবা !
(অতঃপর)

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-রকম সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের এই দুটি-মাত্র দৃষ্টান্তই আছে তাঁর পুস্তকখানিতে। পক্ষান্তরে ও-রকম ধ্বনির বিশ্লিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে তিনটি। একটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। বাকি দুটি এখানে দিলাম।—

(১) ফাল্গুন অথবা চৈত্রে। বাতাসেরা। দিক্ 'বদ্‌লাবে',
—নির্বাচনিক

(২) এবার বিধ্বস্ত চীন। মন্দ 'লাগবে না'।

হসন্ত-মধ্য চল্‌তি ক্রিয়াপদের যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের আরও পরীক্ষা হওয়া উচিত।

এ-স্থলেও যৌগিক ছন্দের পূর্বোক্ত চতুর্থ নিয়ম স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গেই সুভাষের রচনা থেকে আরও তিনটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(১) মাংসের দুর্ভিক্ষ 'নইলে'। ঋষি মনে। হতো হাব ভাবে।
—নির্বাচনিক

(২) এতৎ সত্ত্বেও 'হয়তো'। গুরুভাগ্যে ঘুরে যাবে। অদৃষ্টের চাকা।
—অতঃপর

(৩) বিপদ একাকী 'নয়কো'।—ঐ

নইলে, হয়তো, নয়কো, এই কথা তিনটি—পূর্বোক্ত 'আস্‌বে' শব্দের মতো হসন্ত-মধ্য ক্রিয়াপদ না হ'লেও ক্রিয়াত্মক পদ বটে এবং 'আস্‌বে'-র মতো এদেরও যুগ্মধ্বনি বেশ সুষ্ঠুভাবেই সংশ্লিষ্ট হয়েছে। ঠিক্ এ-জাতীয় অন্য দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে না। তবে 'নইলে' শব্দের অনুরূপ প্রয়োগ প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে হইতে, হইল প্রভৃতি শব্দকে অবলীলাক্রমে দুই মাত্রা ব'লে গণ্য করা হ'তো। কিন্তু আধুনিক কালে 'অক্ষর' সংখ্যার প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও-সব সংশ্লিষ্ট শব্দ শিথিল হ'য়ে তিন মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক সাহিত্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

সেই মত নষ্ট হৈল বহু টিকি, বৈদিকী, তান্ত্রিকী,
টিকিমেধ যজ্ঞে তার, নষ্ট হৈল সর্পময় ঝুঁসি……
সাব্যস্ত হইল চুল, শশব্যস্ত টিকি অন্তর্ধান।

—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, টিকিমেধ যজ্ঞ

এখানে 'হইল' শব্দের সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট দু-রকম প্রয়োগই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রয়োগে অক্ষর-সংখ্যার সমতা-রক্ষার চেষ্টায় 'হৈল'-রূপে লেখা হয়েছে। এটা অক্ষর-সংখ্যার আধিপত্য এবং মানসিক দুর্বলতার ফল। সর্বত্র এ-রকম ভাবে অক্ষর-সংখ্যার সমতাও রক্ষা করা যায় না। যথা—

(১) 'শিউলি', কুন্দ, জুঁই কিংবা স্নিগ্ধ শান্ত শারদ জ্যোৎসনা—
বৌ যেন ঐ রূপে সবারেই করিছে ভর্ৎসনা।

—লেখক

(২) 'সাঁওতালী' যুবতী যত চলে সারি সারি
নিকষ-পাষাণে যেন গঠিত পুতলি।

—রাধারাণী দেবী

(৩) যায় আসে 'সাঁওতাল' মেয়ে
শিমুল গাছের তলে কাঁকর বিছানো পথ বেয়ে।

—রবীন্দ্রনাথ

'সাঁও' ধ্বনি তৃতীয় দৃষ্টান্তে বিশ্লিষ্ট; কিন্তু অন্যত্র সংশ্লিষ্ট; 'শিউ' ধ্বনিও সংশ্লিষ্ট। ও-সব স্থলে অক্ষর-সংখ্যার সমতা নেই, কিন্তু ছন্দের রীতি ঠিক আছে।

চতুর্থত, সমাসবদ্ধ শব্দের প্রথমাংশের যুগ্ম ধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট করার যে কৌশল সুভাষ দেখিয়েছেন তা অভিনব না হ'লেও, তাতে বাহাদুরি আছে। সাহিত্যে এখানে-সেখানে এরকম প্রয়োগের দৃষ্টান্ত থাকলেও সুভাষের মতো এমন ব্যাপক-ভাবে কেউ তা প্রয়োগ করেন নি। সুভাষ অবলীলাক্রমে গোল-দীঘি, একচেটিয়া, মন-দেয়া, হাত-পা, অনেক-দিন, খিদিরপুর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিটিকে সংশ্লিষ্ট করেছেন।—

(১) তবুও আড্ডায় চলে। 'মন-দেয়া'-নেয়ার হেঁয়ালি। (পৃঃ ২০)

(২) 'ভারতবর্ষে' বিপ্লবের। দেরী নেই আর।

এ-রকম চল্‌লে অন্তত ছন্দের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটতে দেরি হবে না, সেটা নিশ্চিত। কারণ, এ-রকম দৃষ্টান্ত বাংলা সাধু সাহিত্যে এখনও দেখা যায় নি। যে দুয়েকটি দেখা গিয়েছে তাও ব্যঙ্গ-রচনায়। যথা—

(১) কোনো দিকে বিন্দুমাত্র না করি' দৃক্‌পাত
'জাম-বাটি' উজাড় কৈল গাবু-গাবু রবে।
—সত্যেন্দ্রনাথ, হসন্তিকা, অম্বল-সম্বরা-কাব্য

(২) এর পরে ঝগড়া হবে, শেষে 'দাঁত কপাটি'।
—রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ, পৃঃ ১৩০

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-ভারতচন্দ্র বাংলা যৌগিক ছন্দকে অক্ষর-সংখ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং যাঁর আক্ষরিক মতবাদের প্রভাব থেকে বাংলার কবি-সমাজ আজও মুক্ত হ'তে পারেনি, তাঁরই রচনায় পাই—

এইরূপে 'নারদ মুনি' বীণা বাজাইয়া।
উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া॥

দেখা যাচ্ছে আক্ষরিক মতবাদের উদ্‌ভাবয়িতার অন্তরও সম্পূর্ণরূপে ওই মত-বাদের বশীভূত হয়নি; বাংলা ভাষার বাক্‌ভঙ্গি ও উচ্চারণ-রীতি তাঁর মত-বাদের প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর কানে। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। ভারতচন্দ্রের 'নারদমুনি' এবং সুভাষের 'ভারতবর্ষে' একই ধ্বনি-গোষ্ঠীভুক্ত, তা বলা বাহুল্য।

প্রথমে 'ঝগড়া,' তারপরে 'দাঁত কপাটি'-র দৃষ্টান্ত তুলেই মনে মনে আশঙ্কা জেগেছিল। তারপরে 'নারদমুনি'-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই রীতি-মতো ভয় হচ্ছে, ওই মুনিটি আবার হিমালয় ছেড়ে বাংলা ছন্দ-আলোচনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত না হন। ন'-বছর আগে (উত্তরা-১৩৩৯, ভাদ্র) এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম। তার একস্থানে বলেছিলাম—"প্রাণদণ্ড, মানদণ্ড

প্রভৃতি শব্দের 'প্রাণ্' 'মান্'-কেও সংক্ষিপ্ত করার অভ্যাস অতি অনায়াসেই হ'তে পারে। মৃৎপিণ্ড, মার্তণ্ড প্রভৃতি শব্দে যদি তিন unit ধরা যায় তা-হ'লে এদের analogy-তে প্রাণদণ্ড, মানদণ্ড প্রভৃতি শব্দেও তিন unit ধরা শক্ত হবে না, অর্থাৎ কানকে ওভাবে অভ্যস্ত করা কঠিন হবে না।—

প্রখর মার্তণ্ড-তাপে বিদগ্ধ ধরণী—

এই লাইনটার ধ্বনি যাদের কানে অভ্যস্ত, তাদের কানে

কঠোর প্রাণদণ্ড-বিধি করিল প্রচার

এই লাইনটাও খারাপ শোনাবে না।" তখন কেউ আমার বিরুদ্ধে দণ্ড উদ্যত করেন নি। এখন আশংকা হচ্ছে, এ-রকম বিপ্লবী ছান্দসিকের বিরুদ্ধে হয়তো অচিরেই প্রাণদণ্ড-বিধি প্রচারিত হ'তে পারে। তবে ভরসার বিষয় এই যে, কম্‌রেড সুভাষ এবং 'নারদমুনি' নিশ্চয় আমার পক্ষ সমর্থন করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

(১) তব ভাল উদ্‌ভাসিয়া এ ভাবনা 'তড়িৎপ্রভা' বৎ
এসেছিলো নামি'…

—রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, শিবাজী-উৎসব

(২) বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী নিত্য-বন্দনায়
বিতরে যে বিশ্বে বোধি, বিশ্ব বোধিসত্ত্ব 'জগৎ প্রিয়,'
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত-'চমৎকার,'—
নমস্কার, তারে নমস্কার।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলা শেষের গান, নমস্কার।

যদি 'জগৎ প্রিয়' বিশ্বকবির 'তড়িৎপ্রভা' সত্যই 'চমৎকার' বলে গণ্য হয়, তা-হ'লে সুভাষের 'ভারতবর্ষ' এবং কবি গুণাকর ভারতের 'নারদ মুনি'ও চমৎকার ব'লে স্বীকৃত হবে না কেন? (পূর্বোক্ত তৃতীয় নিয়ম স্মরণীয়।) "মেরীর তনয় যদি দোষের না হয়, ঘোষের তনয় তবে দোষের ত নয়।"

কিন্তু নারদ মুনির প্ররোচনায় অবশেষে আমাকে কম্‌রেড সুভাষের

পেছনেই লাগতে হ'লো। পদাতিকের ২০ পৃষ্ঠায় একটি কবিতা আছে। যথা—

অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায়
এক দ্বিতীয় বসন্ত। আর
গলিতনখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।
ততদিন আত্ম-রক্ষার প্রাচীর হোক্
প্রত্যেক শরীরের ভগ্নাংশ ;
জীবনকে পেয়েছি আমরা, বিদ্যুৎ জীবনকে।
উজ্জ্বল রৌদ্রের দিন কাটুক যৌথ কর্ষণায়
আর ক্ষুরধার প্রত্যঙ্গ তরঙ্গ তুলুক কারখানায়। ইত্যাদি

এটা কি ? এটা কি ছন্দোবদ্ধ কবিতা, না স্বচ্ছন্দ-বিহারী গদ্য-রচনা ? এতে ছন্দের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাকে হাল ছাড়তে হয়েছে। সব চেয়ে বিস্ময় লেগেছে, এ-বিষয়ে বুদ্ধদেব নীরব কেন ?

প্রবোধচন্দ্র সেন

ব্যালজাকের উপন্যাস *

সাধারণ পাঠাগারের পঠন-কক্ষে দু-দুটো সকাল কাটিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বইখানা বন্ধ ক'রলাম।

ব্যালজাকের একটা পুরাণো সংস্করণের ষাটটি খণ্ডের প্রত্যেকখানা একজন বৃদ্ধ, সহকারী গ্রন্থাগারিক আমার সামনে এনে দিয়েছিলেন। পণ্ডশ্রম। প্রথম দিকে ভদ্রলোক একটু যেন বিস্মিত হয়েছিলেন, পরে দস্তুরমত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কোনো কাজই হোলো না; যা খুঁজছিলাম তা' না পেয়েই শেষ খণ্ডটিকে সমান-গোছানো লম্বা দু'সারি বই-এর মধ্যে যথাস্থানে রেখে দিলাম: 'সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী'—সোণালি জলে মোটা অক্ষরে লেখা এই শব্দ দুটো যেন আমাকে, আমার সমস্ত প্রয়াসকে, বিদ্রূপ ক'রছিল। সামনের ষাট-খানি বইই—ঘুরে' ফিরে' দেখা হয়ে গিয়েছে।

এই বিরাট লেখকের সব বইগুলিই এর মধ্যে আছে তো? ভালো করে' জানতাম অন্ততঃ তাঁর কয়েকটা গল্পের আমরা হদিস্ হারিয়েছি। একটা দৈব উল্লাস—যাকে আমরা প্রেরণা বলি,—তার বশে, সেগুলো তিনি রচনা করেছিলেন—কখনও কখনও ছদ্মনামে—তারপর, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

সম্মুখে-বিছানো সংবাদ পত্রটার দিকে একবার চিন্তিতভাবে চেয়ে দেখলাম; বড় বড় অক্ষরে উপন্যাসটার নাম লেখা রয়েছে, 'লেখা চোর'। তার নীচেই তার চেয়ে একটু ছোট হরফে, গ্রন্থকারের নাম, অনোর-দ্য ব্যালজাক্। উপন্যাসখানার শেষ পঙ্‌ক্তির নীচে কোন্ ঘেঁসে আরো ছোট হরফে লেখা, 'ক. ম. কর্তৃক ফরাসী হইতে অনূদিত'।

অনুবাদকটি কে? ক. ম. আবার কার নাম? কোন্ পুরাণো বই-এ, কোন্ জীর্ণ, হ'ল্‌দেটে ফরাসী কাগজে, ব্যালজাকের ঐ উপন্যাসখানা তিনি পেয়েছেন? অনেকদিন কেউ এর সংবাদ পায়নি, হঠাৎ পুনর্প্রকাশিত হ'য়ে গেল। এটাও কি সম্ভব, দুনিয়ায় কেউ যার সম্বন্ধে জানতো না, এমনি একটা পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে এসে পড়েছিল? তাও কি হয়?

* কাউন্ট-ঠুন্-হোহেন্‌ষ্টাইন্

নাঃ, সেটা সম্ভব ব'লে মনে হয় না। হ'লে, লোকটি নিশ্চয় এমন মহামূল্য রত্নটিকে জার্ম্মাণির মফঃস্বল সহরের এই অখ্যাত কাগজে না ছাপিয়ে নগদ মূল্যেই বিক্রী ক'রতেন। বিশেষ দেখছি এ লেখাটার সঙ্গে কোনো রকম মুখবন্ধ বা ভূমিকা জোড়া নেই। হয়তো বইখানার ফরাসী নামটা এর জার্ম্মাণ নামের মোটেই অনুরূপ নয়। ক. ম. ভদ্রলোক হয়তো তার খুসীমত এ-নামটি পছন্দ করে নিয়েছেন।

এই রকম একটা ধারণার বশে, ব্যালজাকের যতগুলি উপন্যাসের এই উপন্যাসটির সঙ্গে সংযোগ থাকা সম্ভব মনে হয়েছে সে-সমস্তর প্রথম পঙক্তিগুলো তুলনা করে' দেখা গেল একটাও মেলে না। গবেষণার সুবিধার জন্যে এ-উপন্যাসের প্রথম বাক্যটি মনে মনে ফরাসী ভাষায় পুনরনুবাদ করেও দেখে নিলাম। প্রথম বাক্যের পর দ্বিতীয় বাক্য, দ্বিতীয়ের পর তৃতীয়, আপনা থেকেই অনুবাদ হয়ে চলে ; অনুবাদ করাটা আমার কাছে এতই সহজ বোধ হচ্ছিল যে, থামাটাই যেন দুরূহ হয়ে পড়েছিল। এ এক তাজ্জব ব্যাপার ; এথেকে বেশ বুঝতে পারছিলাম, এই জার্ম্মাণ অনুবাদটা সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে। যখনই জার্ম্মাণ বাক্যগুলোর ফাঁকে ফাঁকে মূল ভাষার আমেজ পাচ্ছিলাম তখনই পুনরনুবাদ করাটা দুরূহ বোধ হচ্ছিল। এ এক অদ্ভুত কারিগরী, ভাষাগত ব্যুৎপত্তির চরম নিদর্শন। লিখনভঙ্গীর বিশুদ্ধতার উপর এই একাগ্র দৃষ্টি মোটেই সামান্য কথা নয়। লিখনভঙ্গীর উপর কি সহজ সূক্ষ্মানুভূতি নিয়ে জার্ম্মাণ ভাষাটাকে কি রকম স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, এই অনুবাদক তাঁর কাজ করে গিয়েছেন। অথচ লেখকটি বিনয় বশে নিজের পরিচয় পর্য্যন্ত গোপন রেখেছেন।

যত ভাবি, প্রশ্নটা ততই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। সরকারী কাজে ফাঁকি দিয়ে দুটো সকাল এই সহরে বসে ইতিমধ্যে নষ্ট করেছি। স্থির ক'রলাম, দুপুরটাও যাক্। ব্যাপারটা জানতে হবে।

এর দু'ঘণ্টা পরে, আমি একটি ছোট্ট সম্পাদকীয় কক্ষে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সম্মুখে বসে'। কখন পকেট থেকে পাণ্ডুলিপি বা'র করি, এই ভয়ে তিনি সশঙ্কভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। আমি তাঁকে অবিলম্বে সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, তাঁদের যে-লেখকটি

আমার কৌতূহল উদ্রেক করেছেন তাঁর পরিচয়। শুনে তিনি বিস্মিত হলেন ; আমাকেও বেশ একটু বিস্মিত ক'রলেন, তাঁর নাম ব'লেঃ ক্যারোলিন মেয়ার।

ঠিকানা জিজ্ঞাসা ক'রে, জানলাম, এই সহরেই তিনি থাকেন ; তবে, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে কোনোই ফল হবে না। বৃদ্ধা এখন রোগ শয্যায়, শোথ-এ ভুগছেন, মৃত্যুর বড় দেরী নাই। সম্পাদক মশাই বেশ একটু সহানুভূতির স্বরে বলে চ'ললেন, বৃদ্ধা তাঁর কাগজের খুব নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। ভাবটা, যেন তিনি মরেই গিয়েছেন।······"আমাদের সাহিত্যের চিরবিস্মৃত রত্নগুলো পুনরুদ্ধার ক'রতে তাঁর আর জুড়ি ছিল না।"

"বুঝতেই পারছেন, আমাদের কাগজটা আন্তর্জ্জাতিক নয়, কাজেই, আমাদের রবিবাসরীয় সংখ্যা—ঐ যে আপনার হাতে যেটা রয়েছে—ওটা ভর্ত্তি ক'রতে হয়, এই সমস্ত লেখা দিয়ে। এর জন্যে আমাদের কোনো খরচ পড়ে না, অথচ পাঠকদের মধ্যে যাঁরা জহুরী তাঁদের মনস্তুষ্টি হয়। শ্রীযুক্তা মেয়ারের উপর এ বিষয়ে বরাবর নির্ভর ক'রে এসেছি। তাঁর বিরাট সাহিত্য-জ্ঞান এবং অপ্রকাশিত রচনাদির সম্বন্ধে সহজ দক্ষতার দৌলতে, আমরা তাঁর কাছ থেকে, অসংখ্য বিগতাত্মা লেখকের—এঁদের অনেকেই জগদ্বিখ্যাত—গদ্যরচনার নানা উদ্ধৃতি পেয়েছি। চমৎকার পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে, সেগুলি নকল ক'রে তিনি আমাদের অফিসে এনে দিয়েছেন। এইভাবে, আমরা পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছি কত উদ্ধৃতি, কত জ্ঞানগর্ভ বাক্য,—অল্প পরিচিত বিস্মৃত কত চমৎকার রচনা—ডিকেন্স্, ভলটেয়ার, ব্যালজাক, টুর্গেনিভের বই থেকে, কত বড় বড় লেখকের দিন-পঞ্জী থেকে, গ্যেটে, শিলার, ক্লাইষ্ট্, হেগেল প্রভৃতির পত্রাবলী থেকে। বড় বড় গ্রন্থকারের ছোট বড় কত সব জ্ঞান-সমৃদ্ধ বাক্য। শ্রীযুক্তা মেয়ারের অক্লান্ত কর্ম্মশক্তির শেষের ফল ঐটি—ঐ যেটিতে আপনি এত আকৃষ্ট হয়েছেন। এখানি তাঁর চাকরের হাত দিয়ে পাঠানো। এটির সঙ্গে এসেছিল—আমাকে লেখা কয়েক ছত্র একটি চিঠি। জানিয়েছিলেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ ; মৃত্যুর জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়েই আছেন। তাঁর দু'টি অন্তিম ইচ্ছা যেন আমি পূর্ণ করি।—পরের রবিবারেই যেন তাঁর শেষ অবদান, ব্যালজাকের এই 'লেখা-চোর'টা, প্রকাশ

করি। আর, শেষ পঙ্‌ক্তির নীচে, খুব ছোট হরফে এই কথা গুলো ছাপিয়ে দিই :—'ক. ম. কর্ত্তৃক ফরাসী হইতে অনূদিত'।"

ভদ্রলোক একটু আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলে চ'ললেন, "দেখছেন, আমি তাঁর দু'টি ইচ্ছাই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছি। শ্রীযুক্তা মেয়ারের আসন্ন মৃত্যুর জন্যে আমি সত্যই দুঃখিত। তাঁর স্থান পূরণ করবার মত আর কাউকে আমরা পাব বলে বিশ্বাস হয় না।"

এখানে এসে, তাঁর কণ্ঠস্বর বদলে গেল, নাকী-কান্না থাম্‌লো, ব্যবসায়ী সুর এল। শেল ফ্রেমের চশমার ভিতর থেকে তাঁর চোখ দু'টি আমার উপর তিনি ন্যস্ত ক'রলেন। ভাবটা, আমাকেই যেন 'তাঁর স্থানটা পূরণ ক'রবার ভার নিতে হবে।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে, শ্রীযুক্তা মেয়ারের ঠিকানাটা টুকে নিলাম; বিদায় নেবার সময় জিজ্ঞাসা ক'রলাম এই সম্মানিত মহিলাটি তাঁর শেষের লেখাটি ছাড়া অন্য কোনও লেখাতে তাঁর নামের আদ্যাক্ষরগুলোও প্রকাশ করেন নি কেন? লেখার জন্যে কোনও পারিশ্রমিকই বা নেননি কেন? সম্পাদকপ্রবর আমার প্রশ্ন শুনে আকাশ থেকে প'ড়লেন: "কোনো দিন ত' উনি তাঁর নাম প্রকাশ ক'রতে আমাদের বলেন নি।······লেখার জন্যে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করেন নি।"

বুঝলাম। ঠোঁটের আগায় একটা জবাব এসে পড়েছিল, সেটা চেপে গিয়ে, তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়লাম।

হোটেলের কামরায় ফিরে আবার ব্যালজাকের উপন্যাস নিয়ে বসলাম। ক'বছর আগে, ব্যালজাকের ক'একটা উপন্যাসের অনুবাদ করেছি পরম উৎসাহের সঙ্গে; এ-অনুবাদের লিখনভঙ্গী ও উৎকর্ষ বিচার ক'রবার সামর্থ কি আমার নাই? দ্বিতীয়বার সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা ক'রে, পূর্ব্বমত দৃঢ়তর হোলো—এ-অনুবাদের অতুলনীয় মূলানুগত্যের বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই; জার্ম্মাণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এরূপ প্রতিভা সত্যিই খুব বিরল। বড়ই দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্তা মেয়ার-এর অসুস্থতার জন্যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হলো না।

'ট্যাগ ব্লাট্' পত্রের প্রকাশক মশায়ের ধারণা :—প্রতিভার জন্ম, যত পারা

যায়, ছু'ইয়ে নেবার জন্যে। এই মহাপুরুষের পক্ষে মোটেই শুভ নয়, এমনি একটা নীরব সংকল্প করে, আমি আমার নিয়মিত কাজে মন দিলাম।

'কয়েকদিন পর, হাতের কাজ অনেকটা হাল্কা হয়ে আসায়, বাড়ী ফিরবার সময় হোলো। বাড়ী এসে, সঙ্গে-আনা কাগজ পত্র গুছিয়ে রাখতে গিয়ে, সেই পত্রিকাখানি আমার নজরে পড়ল। হঠাৎ স্মরণ হোলো, আমার কাগজ পত্রের মধ্যে কোথায় যেন ব্যালজাকের সমস্ত বই-এর একটা তালিকা আছে—শেষ বয়সের লেখাগুলোর পর্য্যন্ত। এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই যে, আমি ব্যালজাকের যে পুরানো সংস্করণটা দেখে এসেছি, এটা তা'র চেয়ে অধিক সম্পূর্ণ। একটু খুঁজতেই কাগজখানা পেলাম। এ-তালিকাটিতেও কিন্তু 'লেখা চোর' উপন্যাসের কোনো হদিস্ মিললো না।

অদ্ভুত!······শ্রীযুক্তা মেয়ার যদি এখনো বেঁচে থাকেন,—হয়তো তিনি কতকটা সেরে উঠেছেন, হয়তো 'টাগ ব্লাট্' পত্রে আবার লেখাও দিচ্ছেন···। তাঁকে একখানা চিঠি লিখবো স্থির ক'রলাম। হয়তো তিনি উত্তর দিতে পারবেন।······হয়তো আমার চিঠিটা তাঁর জীবনের শেষক্ষণটিকে একটু আনন্দোজ্জ্বল ক'রবে। এ-চিঠি যখন পৌঁছুবে, হয়তো তিনি তখন পরলোকে। সে-ক্ষেত্রে চিঠিটা ফেরৎ আসবে।—চিঠির পিছনে আমার নাম আর ঠিকানাটা লিখে দিলেই হোলো।

ডেস্ক্-এ বসে লিখ্তে সুরু ক'রলাম,—দীর্ঘপত্র— রোগীকে যে রকম পত্র লেখে, মৃতের কাছে যেমন করে লোকে মনোভাব নিবেদন ক'রবার চেষ্টা করে চিঠির মধ্যে দিয়ে। লিখলাম কেমন ক'রে তাঁর নাম ও পেশা আমি জানতে পেরেছি। অনেক ফরাসী লেককের, বিশেষ করে ব্যালজাকের অনুবাদক হিসাবে তাঁর সঙ্গে আমার যে একটা যোগসূত্র আছে এ কথাটার উপর বিশেষ জোর দিলাম। জানালাম, ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণ ভাষার বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে, তাঁর মত এমন অনুবাদ কারও দেখিনি; অথচ, অনুবাদ হচ্ছে এমনই একটা জিনিষ যাতে নাকি আনাড়ির ভাসা-ভাসা লেখাও নির্ব্বিবাদে গ্রাহ্য হয়ে যায়,—তার অগভীরতা প্রায়ই ধরা পড়ে না।

লিখলাম, "অত্যন্ত বিস্মিত হ'লাম যে, এমন অসাধারণ প্রতিভাসত্ত্বেও

আপনি পারিশ্রমিক হিসাবে কখনো কিছু পান নি, একটা মফঃস্বল সহরের নগণ্য পত্রে লেখা বার করার অধিক কোন খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি।"

চিঠির শেষ দিকে, শ্রীযুক্তা মেয়ারকে অনুরোধ জানালাম, স্বাস্থ্য প্রতিকূল না হ'লে, তিনি যেন আমায় জানান, ব্যালজাকের কোন্ গ্রন্থ থেকে, 'লেখা চোর' উপন্যাসটি গৃহীত হয়েছে। আমার এটি সম্পূর্ণ অজানা; জানতে পারলে, এতাবৎ কাল অপরিজ্ঞাত উপন্যাসখানির প্রতি আমি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো; যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে এই অনুবাদের উপর তাঁর নাম প্রকাশ করাটা আমার কর্ত্তব্য বিবেচনা ক'রব।

চিঠিটা একবার পড়ে' দেখলাম। বেশ সুস্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক হয়েছে। সহানুভূতি জানিয়ে, দ্রুত ব্যাধি-মুক্তি কামনা ক'রে চিঠি শেষ করা হোলো।

এক সপ্তাহের উপর কেটে গেল; চিঠির কোনো উত্তর এল না। সেটা ফেরৎও পেলাম না। বুঝলাম, শ্রীযুক্তা মেয়ার এখনও বেঁচে আছেন, সম্ভবতঃ উত্তর দেবার সামর্থ্য নেই। ব্যালজাকের মূল 'লেখাচোরের' কোনও পাত্তা পাওয়ার ভরসা এক রকম ছেড়ে দিয়েছি, এমন সময় একদিন—সম্ভবতঃ, সপ্তাহ চারেক পরে—একটা মোটা লেফাফা পেলাম। দেখলাম, সেটার পিছনে, ঈষৎ কম্পিত সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখিকার নাম দেওয়া রয়েছে: ক্যারোলিন মেয়ার। তার নীচে অন্যের হস্তাক্ষরে একটা ক্রুশ চিহ্ন আর চিঠিটা ডাকে দেওয়ার তারিখ। এ দেখে চিঠি খোলার আগেই বোঝা গেল, শ্রীযুক্তা মেয়ার নিজেই এই চিঠি লিখেছেন, আর তাঁর অনুরোধে, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, এটা ডাকে ছাড়া হয়েছে। ওই লম্বা ভারী চিঠিটায় লেখা ছিল:—

মহাশয়,

আপনি আমায় পত্র দিয়ে ঠিকই করেছেন, এখনও বেঁচে আছি, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এখনও বন্ধ হয়নি। তবে বেঁচে আছিই মাত্র: নিশ্বাস নিচ্ছি টেনে টেনে, অতি কষ্টে। তবু আপনাকে পত্রের উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য এখনও যায় নি। চিঠিটা শেষ ক'রতে হয়ত কয়েকদিন লাগবে। রোজ একটু একটু ক'রে লিখবো। শক্তি ফুরিয়ে এসেছে সত্যি, তবে আপনাকে চিঠি লিখে নিজের জীবন-কাহিনী শোনানো ছাড়া অন্য কাজও আমার এ জগতে নাই।

তার মধ্যেই আপনার সমস্যার সমাধান পাবেন ; আপনার পত্রের মধ্যে যে সব প্রশ্ন অনুক্ত রয়েছে সে-গুলিরও।

পত্রের প্রথমেই লিখেছি, আপনি আমায় পত্র দিয়ে ঠিকই করেছেন। এই সঙ্গে এ-কথাটাও যোগ ক'রতে চাই : আপনি ভালো করেছেন। হাঁ, দুনিয়া হ'তে বিদায় নেবার সময় জীবনে যেন এই প্রথম উপকার পেলাম।--···আপনার চিঠির মধ্য দিয়ে সমস্ত জগৎ যেন আমাকে সম্ভাষণ ক'রছে—যে-জগৎ জীবনভোর আমার চার পাশে পাষাণের মত মৌন হয়ে ছিল।

বহুদিন পূর্ব্বেকার কথা। বয়স তখন অল্প ছিল। মনে হোতো, আমার চার পাশের জগৎকে কত কথাই না শোনাতে পারি। বাবা শিক্ষকতা ক'রতেন ; অল্প বয়সেই তিনি মারা যান। তাঁর কাছ হ'তে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের গ্রন্থরাজি। আমার জন্মের সময় পর্য্যন্ত নূতন নূতন গ্রন্থ কিনে তিনি তাঁর গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করেছিলেন। গৃহ-কর্ম্ম সমাপ্ত হ'লে, রুগ্না মায়ের সেবা করার ফাঁকে, অবকাশ পেলেই আমি এই গ্রন্থরাজ্যে ছুটে আসতাম।

পঁচিশ বৎসর বয়সে মাকেও হারালাম। আমি একেবারে একা প'ড়ে গেলাম। মানুষের সঙ্গে মেশামেশি করার অভ্যাস না থাকায়, লাজুক প্রকৃতির জন্যে, আমার অতি প্রিয় গ্রন্থগুলির শরণ নিলাম ; সান্ত্বনাও পেলাম। প্রথম দিকটায় মধ্যে মাঝে গ্রন্থাগারটি কালোপযোগী ক'রবার জন্যে নূতন প্রকাশিত পুস্তকও কিন্‌বার চেষ্টা ক'রতাম। তার জন্যে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় হয়ে যেত। বৃথাই ! আমার উপর যে গ্রন্থ যত প্রাচীন তার প্রভাব তত বেশী হয়ে পড়েছিল এমনই যে, 'তখন" আর "এখন"-এর মধ্যে সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালে, যে ব্যবধান দেখা যায় সেটি পূর্ণ করার আমি কোনো উপায়ই উদ্‌ভাবন ক'রতে পারলাম না। এ-জ্ঞানটাও অবশ্য পরে হয়েছিল। আধুনিক সাহিত্য আমার কাছে অসহ্যবোধ হোতো ; স্বপ্নলোকের রহস্যের মধ্যে আরও গভীর ভাবে ডুব না দিয়ে আমি একেবারেই সোয়াস্তি পেতাম না।

কিন্তু এই সময় আমার মধ্যে নিজেই মানব সমাজকে সম্ভাষণ ক'রবার একটা দুরন্ত কামনা উদ্বেল হয়ে উঠলো। প্রথম প্রথম কবিতার মধ্য দিয়ে

অন্তরের এ-আকুলতা প্রকাশ ক'রতাম; তারপর কথিকা লিখবার চেষ্টা ক'রলাম; শেষ পর্য্যন্ত···একখানা উপন্যাস।

যা' লিখতাম, লেখনী হ'তে সহজেই উৎসারিত হোতো। নিজেকে এমনি ভাবে বিস্তার ক'রে দেওয়ার সে কি আনন্দ! জীবনে সবচেয়ে ভালো গিয়েছিল সেই দিনগুলি। এ ভাবটা বেশী দিন স্থায়ী হোলো না। এখন, নতুন একটা কামনা ঘাড়ে চেপে ব'সলো······রোখ চাপলো, দুরন্ত রোখ। মোদ্দা, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম প্রকাশ ক'রতে চাইলাম।

যাঁরা আমার আদর্শ ছিলেন তাঁদের পুষ্পিত কাননের বাছাই করা ফুল দিয়ে যখন এই সবল কামনাটিকে মাল্যভূষিত ক'রতাম, তখন এর কারণ বুঝিনি। আজ সে সব বোঝা অনেক সহজ হয়েছে। বিশেষ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন······আমাকেও সংক্ষিপ্ত ক'রে ব'লতে হবে। একজন পুস্তক বিক্রেতার কাছ হ'তে কয়েকজন প্রকাশকের ঠিকানা নিয়ে' আমার পাণ্ডুলিপিগুলোকে পাঠিয়ে দিলাম—বিরাট জগতে। ফল হলো মর্ম্মান্তিক। কয়েকটা ফেরৎ এল, সঙ্গে ছোট্ট একটু ক'রে চিঠি: "দুঃখিত, এটা আমাদের কাজে লাগবে না।" অন্যগুলো অনেক ঠোক্কর খেয়ে, কোনো উত্তর না নিয়েই ফিরে এল। একখানি পুস্তকও প্রকাশকদের মনোনীত হলো না।

আঘাত পেলাম, কিন্তু দমলাম না। অল্পকাল মধ্যেই সিদ্ধান্ত ক'রে নিলাম, আমার লিখনভঙ্গী একান্ত কাঁচা, পৃথিবীর বড় বড় লেখকরা যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন ক'রবার প্রয়াস ক'রে অমর হয়েছেন, মোটেই তার যোগ্য নয়। আবার আমার চির-প্রিয় পুরানো লেখকদের রচনার মধ্যে ডুব দিলাম তাঁদের দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার ক'রতে, তাঁদের লিখনভঙ্গী আয়ত্ব ক'রতে।

আবার আমার লেখনী হ'তে উৎসারিত হোলো, কথিকা, প্রবন্ধ, কাহিনী। একবার একখানা রীতিমত উপন্যাসও। দ্বিতীয় পৌষের প্রথম ফসলটা, প্রথম পৌষ-ফসলের অনুগামী হওয়ার পরেও এখানা বড় যত্নে, বড় বিশ্বাসেই রচনা করেছিলাম। প্রকাশকদের কাছে, সম্পাদকদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম······ আবার ফেরৎ এল।

এতদিনে আমার লেখাগুলো ছাপার-অক্ষরে দেখবার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে

একটা বদ্ধসঙ্কল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছুনিয়ার ভাব বুঝতে পারছিলাম না, কেন আমার প্রতি এই নির্ম্মম ঔদাসীন্য। মরিয়া হয়ে, কোনও বিশেষজ্ঞের মত নেওয়া স্থির ক'র্‌লাম। বাবার অনেক দিনের বন্ধু—কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্যের একজন অধ্যাপকের কথা মনে প'ড়ল। বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি মার কাছে একখানা সত্যিকার দরদ ভরা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাঁকেই লিখলাম; যখন লিখলাম জান্‌তাম না তিনি বেঁচে আছেন কিনা। তবু সাধারণ ভাবেই লিখলাম, যেন বেঁচে না থাকাটাই আশ্চর্য্য। বেঁচে তিনি সত্যিই ছিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁর কাছ হ'তে, আমার পাঠানো কাগজের মস্ত তাড়াটা ফিরে এল, সঙ্গে একখানা দীর্ঘ পত্র। সেখানি রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেললাম। পড়তে পড়তে, আমার বুক যেন ভেঙ্গে যাচ্ছিল।......বোধ হয়, হাজার বার প'ড়লাম। এরই যেন প্রতীক্ষা করছিলাম! এ যে আমার মৃত্যুদণ্ড! আজও, এতকাল পরেও, এ ছাড়া অন্য নামে সেটাকে অভিহিত ক'রতে পারি না। তিনি আমার স্বপ্ন-লোক ভেঙ্গে দিলেন। পরিবর্ত্তে কিছুই পেলাম না।

বৃদ্ধ অধ্যাপক পিতৃ-সুলভ স্নেহের ভাবে লিখেছিলেন, "তোমার জীবন-কাহিনী, রুচি-অরুচি প্রভৃতি থেকে আমার পুরানো বন্ধুর আত্মজাকে চিন্‌লাম। এই কারণে, অবশ্য তুমি বিশেষ ক'রে আমাকে অনুরোধ করেছ বলেও, তোমার লেখার সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট মতামত—পূর্ণ সত্যটা প্রকাশ ক'রব। অন্যভাবে বলা চলে না বলেই, এভাবে ব'লতে হচ্ছে:—তুমি তোমার জীবন-ধারার নাগপাশে বদ্ধ হয়েছ, পুরানো গ্রন্থকারদের মোহে একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছ। নিজে লিখতে গিয়ে তাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠা তোমার পক্ষে স্পষ্টই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অমর সাহিত্যকে মূল মন্ত্র বলে মেনে নেওয়া মোটেই ঠিক নয়। তোমার কি মনে হয় আইকেনডর্ফ-এর মত কোনো লেখক এই ১৮২৬ সালেও তাঁর 'অপদার্থে'র মত একখানা বই. লিখতেন,—ওই রকম ধাঁচে? কোনও অমর সাহিত্য-গ্রন্থের রস গ্রহণ করার অর্থ তো সেটার ভিন্নযুগীয়তা ভুলে যাওয়া নয়। বস্তুতঃ, কোনও মহৎ গ্রন্থই সেটার প্রথম প্রকাশের তারিখের সূচনা না দিয়ে প্রকাশিত হওয়াও উচিত নয়। যদি কোনও সমালোচক কোনও পুস্তককে, সেটা প্রকাশের ত্রিশ কি পঞ্চাশ বৎসর

পূর্ব্বেকার জন সাধারণের উপযুক্ত মনে ক'রতে একান্তই বাধ্য হয়, তাহ'লে সেখানিকে 'পণ্ডশ্রম' ছাড়া আর কি বলা চলে ? 'হায়রে হায়, এর মধ্যে যে দু'পুরুষ কেটে গিয়েছে !'—এমনি একটা নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে অধ্যাপক মশায়ের সমালোচনা শেষ হয়েছিল ; এর পরে দু'একটা সান্ত্বনার কথা বা শুভ কামনা যে না ছিল, তা' নয়।

প্রাচীন গ্রন্থকারদের উপর আমার যে প্রেম, সেটাকে পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রেখে, তাঁদের মধ্যে যে সাধনা ও সিদ্ধির পরিচয় রয়েছে সেটা লাভ ক'রবার সর্ব্ব প্রয়াস আমাকে ত্যাগ ক'রতে হবে। এক কথায় তাঁদের আদর্শলোকে আমায় আরো গভীর ভাবে, আরও অধিক বিনয়ের সঙ্গে প্রবেশ ক'রতে হবে, যাতে তাঁদের অন্তরতম আত্মা আমার নিকট উদ্ঘাটিত হ'তে পারে,···কিন্তু শুধু আমার কাছে।

'শুধু আমার কাছে !' অধ্যাপকের বক্তব্য বেশ বুঝলাম। আমায় লেখা বন্ধ ক'রতে হবে। সে যে অসম্ভব !

কিন্তু এইকি সত্যি ? নিশ্চয়ই নয়। আমি খুব ভাল করে জানতাম, আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, আমার মধ্যে দৈবী-প্রেরণা আছে, যার বলে আমি মানুষকে সম্ভাষণ ক'রতে পারি, তার অন্তরকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ ক'রতে পারি, মথিত ক'রতে পারি। একটা বিষয়ে অবশ্য অধ্যাপক ঠিকই বলেছিলেন : আমার অন্তরস্থ পবিত্র এষণাগ্নি বিগত কালের লেখকদের দুষ্ট প্রভাবে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। এই ছেলেবেলাকার অভ্যাস আর কাটিয়ে উঠতে পারবো না।·········সেটাও ভালো ক'রেই জানতাম।

সত্যিই কি তা হ'লে আমায় লেখা বন্ধ ক'রতে হবে ? অন্য ভঙ্গিতে লেখাতো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এ পর্য্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, তা একবার পড়ে দেখছি। অসুখ বৃদ্ধি পাওয়াতে সমস্ত সপ্তাহটা কিছুই লিখতে পারিনি। আজকে, হয়তো অল্প-ক্ষণের জন্যে, একটু ভালো বোধ হচ্ছে। সংক্ষেপে ব'লতে চেয়েছিলাম, অনেক বকে ফেলেছি। তবু বক্তব্য বিষয় খাপছাড়া ভাবেই নিবদ্ধ হোলো।

এর পর থেকে আমার দুরদৃষ্টের প্রারম্ভ। ঐ দিনের পর হ'তে আমার

জীবনের ধারা কোন্ প্রণালীতে বয়েছে, তার কোনো আভাষ এ পর্য্যন্ত দিইনি।···দীর্ঘ একটানা প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার প্রণালী ধরে।

সুরু হয়েছিল কৌতুকচ্ছলে। প্রাচীন কালের বড় বড় গ্রন্থকাদের বিরুদ্ধে সে যেন একটা ছেলেমানুষী বিদ্রোহ·········কেন তাঁরা আমার সর্ব্বনাশ ক'রলেন? অধ্যাপক মশাই আমার প্রতিখানি পাণ্ডুলিপির ওপর লাল পেন্সিলে লিখে দিয়েছিলেন, সেটা লিখবার সময় কোন্ বড় লেখকের ভূত তখন আমার হস্তে ভর করেছিলেন। কোনোটায় 'ব্যালজাক'···কোনোটায় 'টুর্গেনিভ···'গ্যেটে', 'ক্লাইষ্ট্'। লেখাগুলো ভালো ক'রে পড়ে, অস্বীকার ক'রতে পারলাম না, বুড়ো ভুল করেননি। কল্পনায় আমি পড়তে লাগলাম, আমার সমাপ্ত বা পরিকল্পিত কোন্ রচনার শীর্ষ দেশে কোন্ বড় লেখকের নাম থাকা উচিত। নিজের রচনায় ভাব ও ভঙ্গীতে এই সব বড় লেখকদের কত-খানি অনুকরণ ক'রতে পেরেছি, তা দেখে একটা তিক্ত আমোদ বোধ হোতো।

প্রায় ঐ সময়ে, আমাদের 'টাগব্লাট' কাগজের প্রথম সম্পাদক—এঁর সঙ্গে আমার একটু পরিচয় ছিল—তাঁর পরিকল্পিত রবিবারীয় সংখ্যার জন্যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য থেকে অল্প-পরিচিত বা বিস্তৃত কয়েকটি খণ্ড রচনা সংগ্রহ করে দিতে, আমায় অনুরোধ জানালেন। চয়নের ভার রইল আমার উপর, রাজনীতি ও ব্যবসা সম্পৃক্ত বড় বড় সমস্যার বিচারে ছিল তাঁর নিজের অভিরুচি। চট্ করে আমি মনঃস্থির ক'রে নিলাম। আমার ব্যগ্র সম্মতি দেখে তিনি সরল মনে খুসী হয়ে উঠলেন। আমরণ বেচারীর ভ্রান্তি ভাঙ্গে নাই।

একটা উপন্যাস লিখলাম,—"ব্যালজাক বিরচিত"। লেখাটা যখন দফায় দফায় পাঠিয়ে দিতাম, মনে হ'ত যাঁদের ভূত আমার পেয়ে বসেছে, পাশবদ্ধ করেছে, তাঁদের একজনের উপর খুব একচোট শোধ তুলে নিচ্ছি।

উপন্যাসটা বেরুবার আগে ক'টা দিন, অবশ্য, ছটফট ক'রে কাটাতে হয়েছে। বারে বারে ভেবেছি, পাণ্ডুলিপি ফেরৎ চেয়ে নিই। বারে বারে অভিমানে বেধেছে, ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমায় বিরত করেছে। নইলে যে আমার পূর্ব্বেকার সমস্ত রচনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

একদিন হঠাৎ সম্পাদকের অফিসে আমার ডাক প'ড়ল। ভয়ে আধমরা

হয়ে তাঁর কাছে গেলাম। ভেবেছিলাম, ধরা পড়ে গিয়েছি। নাঃ, তা নয়। প্রুফ্ রিডার আসে নি; কম্পোজিটার এক ফালি ভিজে কাগজ এনে দিল আমার হাতে; ব'ল্‌ল, ভুল থাকলে যেন শুধরে দিই। তখন আমার গর্ব্বই বোধ হ'ল। হাঁ গর্ব্বই, সাফল্যের প্রথম নিদর্শন—কম্পিত হস্তে ধ'রে নবিশের যে-গর্ব্ব জন্মায়, সেই গর্ব্ব। যত্ন ক'রে ভুল সংশোধন ক'রলাম। 'যা' হয় হোক্', ব'লে গা ঢেলে দিলাম।

মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি নেমে এল। এ পথে প্রথম পদক্ষেপেই যে-সমস্ত সম্ভাবনা চোখে প'ড়ল, ভাল ক'রে আলোচনা ক'রে নিলাম। অসংখ্য সম্ভাবনা। কাজ ক'রে চ'ল্‌লাম,—হাঁ, একথা বলবার আমার অধিকার আছে; এটা যে আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ—কাজ ক'রে চ'ললাম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, সযত্নে। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন: সৃষ্টির সঙ্গে যোগ ক'রলাম সার্থক চাতুর্য্য। এক একজন প্রাচীন লেখককে আদর্শ নিয়ে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতাম। মধ্যে মধ্যে মনে হ'ত, তিনিই যেন আমার টেবিলের উপর লিখে যাচ্ছেন, আর আমি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে তাই দেখছি, তাঁকে অনুপ্রাণিত ক'রছি।······সেগুলো আমার।

ডিকেন্স থেকে নিলাম—শুধু তাঁর নামটা নয় তাঁর জাঁকালো, দীর্ঘ-বাক্যী রচনাভঙ্গী। আমাদের রসরাজ গ্রিল প্রেজ্ঞার-এর হ'য়ে চাটিম্ চাটিম্ বুলি ভাঁজলাম। হেকেল যে-সব চিঠি লিখলেও লিখতে পারতেন, সেগুলিকে স্বকপোল হ'তে সযত্নে উদ্ধার ক'রলাম। এই সব বড়লোকদের মুখ দিয়ে বা'র ক'রলাম কত বক্তৃতা, অন্য প্রাচীন লেখকদের সম্বন্ধে তাঁদের রুচি অরুচির কথা, তখনকার বিবিধ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত। কিছুদিনের মধ্যেই পাকা হয়ে গেলাম; অনুত্তেজিত ভাবে, শান্ত হয়ে, নিজের কল্পনার ঊর্দ্ধ বিহার লক্ষ্য ক'রতে লাগলাম। আমাদের সহরের পাঠশালার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে, বুড়ো গ্যেটের মুখে আমি যে-উক্তি আরোপ করেছিলাম, সেটার সম্বন্ধে একটা রচনা লিখতে দেওয়া হোলো দেখলাম। এই পাঠশালা হ'তে উত্তীর্ণ হয়ে এক ছোকরা সাহিত্যিক ভল্‌টেয়ার-এর বহু উক্তি তুলে একটা প্রবন্ধ লিখে ফেললো—তার বেশীর ভাগই আমার উদ্ভাবিত।

আরও লিখতে পারতাম, কিন্তু সময় নাই।···আমার আয়ু ফুরিয়ে

এসেছে। পূর্ণ-সত্যের অনুরোধে আর একটি মাত্র কথা বলার প্রয়োজন। আমার স্বরূপ কেউ চেনেনি ; কখনও ধরা পড়িনি। ধরা পড়াটা যেন কতবার আমি নিজেই কামনা করেছি······তারই প্রতীক্ষা করেছি। ব্যক্তিগত-জীবন সম্বন্ধে কিছু ব্যক্ত ক'রতে চাই না। আমি যেন আর-কেউ হয়ে পড়েছিলাম : এক সঙ্গে শতটা জীবন-যাপন করেছি—কিন্তু একটাও আমার নিজস্ব ছিল না।

আপনি জানেন, লেখার জন্যে আমি কখনও কোনো দক্ষিণা গ্রহণ করিনি। তবু কেন লিখে গিয়েছি, সেকথা এখন আর পরিষ্কার ক'রে বলাটা বাহুল্য হবে। অবশ্যও আমার নামটা বরাবর অজ্ঞাত রেখেছিলাম। শেষের রচনাতে কেবল, নিজের নামের আদ্যাক্ষর প্রকাশ করেছিলাম। কেউ অবশ্য এটা টের পাবে না। নাম দেওয়াতে আমার কোনো অন্যায়ও হয় নাই। গল্পটা একাধিক অর্থে আমারই। এতক্ষণ যা' প'ড়লেন, তা' হ'তে বোধ হয় আপনি বুঝেছেন, 'লেখা চোর' খানা ব্যালজাক লেখেন নি—ওটা আমারই জীবনের নিরলঙ্কার বিবৃতি মাত্র······আমার এই প্রবঞ্চক জীবনের।

হাঁ, আমিই এই লেখাচোর। একথা সত্যি, বড় লেখককের এক নাম ছাড়া কখনো কিছুই চুরি করি নি ; যে-গর্ব্বোন্নত দৃষ্টিতে এই দুনিয়াকে দেখেছি, সেটা ছাড়া, তাঁদের কাছে আর কিছুর জন্যেই আমি ঋণী নই।

আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন করেছিলেন ব'লে, আপনাকে ধন্যবাদ। আমার জীবনের এই গোধূলি লগ্নে অন্ততঃ একজন মানুষকে এই জীবনটা বোঝাবার অবকাশ আমি পেয়েছি। প্রশ্নটা তুলে, সে-অবকাশ আপনি দিয়েছেন ; সেইজন্যেই ধন্যবাদ। 'লেখাচোর' বইখানার ব্যাপারে আপনি যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, আমার রচনাভঙ্গীর চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেছেন, তা'তে মনে হয়েছে, আপনি হয়তো আমার স্বরূপ বুঝবেন।

এখন আর সময় নাই। মৃত্যু আমাকে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দেবে না। এখন অবশ্য একটু ভালোর দিকেই আছি ; তাই এই পত্র সমাপ্ত করা সম্ভব হ'ল। তবু জানি, আমার এই ভালো-থাকা কত অনিশ্চিত। আমার বা আমার ডাক্তারের, এ বিষয়ে কোনো ভ্রান্তি নাই। দিন গোণাগুণতি হ'য়ে এসেছে। এবার চিঠি শেষ ক'রে, শিলমোহর-মেরে রাখতে হবে।

মৃত্যুর দিনের তারিখ দিয়ে, এটা ডাকে ফেলতে বলে রাখলাম। কাজেই বুঝছেন, এক মৃতা নারী আপনার সঙ্গে কথা কইছে। বেঁচে থাকতে, যে সুন্দর সহানুভূতি আমায় দিয়েছিলেন, এখনও তার কিঞ্চিৎ হতে যেন বঞ্চিত না হই······পারেন যদি, আমার মৃত্যুর পরে, সেটা নিবেদন ক'রবেন।

—ক্যারোলিন মেয়ার।

শ্রীশুভেন্দু দে।

লক্ষণ

সমস্ত দৃষ্টিকে যদি বলি শুক্ল সুর।
তারার রৌদ্দুর
তোলে চারা।
বহে রক্তে স্বর্ণধূলিধারা
চূর্ণ চূর্ণ প্রত্যক্ষ বিস্ময়।
অলীক হাওয়ায় লঘু লোকালয়।
আনত ঈষৎ ধ্যানতলে
জন্তু চলে ;
জীবনে পাথরে গাছে নদীতটে বাড়িতে বাজারে
ঘনিষ্ঠ বিস্মৃতিচক্র আদিম সংসারে।
তরল আবাসী মাছ ; মন পাখী
শূন্য বেয়ে ওঠে, মন আঁখি
দেখে,
কী দেখা সমস্ত মিলে বুঝিবে কে।
টুক্‌রো টুক্‌রো বস্তু রাখে গূঢ় তাল,
স্ফুরিত কঙ্কাল
হাসে হাড়ে হাড়ে পেয়ে মন্ত্র,
কোটি কোটি চৈতন্যে ষড়যন্ত্র।

(২)

প্রত্যক্ষের মানচিত্র। উঁচু নীচু, জলা জমি বালু,
মৃত্যুজন্মনৃত্যরঙা। সব নিয়ে বাঁচা
—নয়তো শুধুই রওয়া বেঁচে বা না বেঁচে।

সভ্যতা পাতিছে খুব জাঁক ক'রে লাল সালু
রক্তের, সভ্য হাঁটে তাতে নষ্ট বীর, নেচে নেচে ;
ধর্ম্ম ব'লে দেশ ব'লে চলে নাচা।
হঠাৎ উন্মাদী উপত্যকা বেয়ে ঢালু
ধ্বংস। হিংস্রতার। কাল ধীরে ধীরে ঘসে ঘসে
পরিষ্কার করে ঘাস, স্পষ্টগাছ, লোকালয় ফের বসে
সূর্য্যের রশ্মিতে আঁটা মাটিতে, তারার গ্রন্থি-লাগা।
ফিরে ফিরে এই জাগা।
ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণ, তীব্র, মধুর, মুখর, শান্ত, ক্ষীণা
যে-দৃষ্টি সকল সুর দেখে তাকে দৃষ্টি বলে কিনা॥

অমিয় চক্রবর্ত্তী

মোহানা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কয়েকদিন ধ'রে তর্ক বিতর্কের ফলে যখন করিম ও অন্যান্য মজদুর-সভার কর্ম্মী বিতাড়িত মজুরদের গৃহীত হবার আশা রইল না, তখন কিষণচাঁদ ছুটে এসে সফীককে বল্লে, 'ওস্তাদ, আমরা তৈরী। ওরা নতুন লোক নিয়ে মিল্ খুলবেই, এবং আমাদের বন্ধ করতেই হবে।' সফীক বর্ম্মা-চুরুট ফেলে দিয়ে ছুটল ডেপুটিপাড়ার দিকে। ভোর হতে তখনও দেরী রয়েছে। একটা দোকানের দরজায় টোকা মারতে একজন বৃদ্ধ মুখ বার করলে। 'আও, বেটা।' জন কয়েক লোক চা খাচ্ছিল। 'ওরা রাজি হয় নি শুনেছ?' 'সঠিক শুনিনি বটে, তবে কেই বা শোনবার জন্য কান পেতে বসেছিল!' 'অন্য বন্দোবস্ত?' 'রাত ন'টা থেকে ফাটকের সামনে লোক জমেছে।' 'ষ্টেশনে?' 'তৈরী।' 'ব্রীজে?' 'সেখানেও।' 'কিষণ, সাইকেল ক'রে দেখে এস ফাটকের সামনে এখনও লোক শুয়ে আছে কি না। ভোর বেলাতেই সিঁধেল ঢোকে।' আসবার সময় উধামজীর ওখানে ঢুঁ মেরে আসতে পার। হয়ত সারারাত তর্কবিতর্কের ফলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিংবা জয়োল্লাসে জাগ্রতই দেখবে।' কিষণ বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ দোকানদার বড় বাটিতে চা এনে দিলে, এনামেলের প্লেটে শিক্ কাবাব। সফীক খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বড় রাস্তায় তখনও নিয়ন-লাইট জ্বলছে। চৌরাহার ঘুন্টির বাইরে কনষ্টেবল্, কালোকোটের হাতে সাদা কাপড় জোড়া। 'কি খবর, জমাদার সায়েব। ভাই সাহেবের চাকরী হল?' 'কোথায় চাকরী ভেইয়া! বড় নখাড়া বাধিয়েছে, পঁচিশ রূপেয়া চাইছে।' 'ভাই সাহেবকে না হয় আমার কাছে পাঠিও, উধামজী বলছিলেন মুন্সীপালের দফ্তরে একটা নোকরী খালি আছে। ভাই সাহাব ত' ইংরেজী জানে?' 'তিন দরজা পাশ করেছে, ইংরেজী জানবে না! ডিউটি খতম হলেই পাঠিয়ে দেবো।' কনষ্টেবল্ সেলাম ক'রে সফীককে একটা সিগারেট দিলে। 'ভোরের দিকে শীত করে, তাই বিলেতী

চীজ পোড়াতে হয় ভেইয়া।' সফীক হেসে ফেল্লে। 'বিলেতী চীজের তারিফ করতেই হয়।' 'নিশ্চয়ই, রূপেয়া ত' বিলেতী!'

বড় রাস্তা ছেড়ে সফীক গলির মধ্যে ঢুকল। বেশ্যাপল্লী—একবার বিজন সঙ্গে আসছিল এই গলি দিয়ে, কি রাগ বুর্জ্জোয়া সভ্যতার ওপর, সব চেয়ে জঘন্য এই পাড়া তার মতে। বই পড়া রাগ, যেমন যুবকদের বই পড়া কাম। কিন্তু বেশী রাগ কেন? রাগই বা কেন? গোয়ালটুলী, জুহীর চেয়েও পচা? যে ব্যাপারটা বুঝেছে তার রাগ আসবে না। জ্ঞানের পর যে-ভাবটি থিতোয়, মানুষের সর্ব্বাঙ্গে, সকল ব্যবহারে যেটি ওতঃপ্রোত হয়, তার প্রকৃতি রাগের মতন উদ্বায়ী নয়। সেটা তৈলাক্ত ধাতুমলের মতন থকৃথকে, ঘন, ঘৃণার মতন স্থায়ী, গভীর আর ব্যাপক। ঘৃণা, সৌখীন দুঃখবাদ নয়, সদ্‌ভাব, মোড় ফেরান আদর্শবিলাস নয়, যার সক্রিয়তায় গোটান হাত পা খুলে যায়, শুখনো মাথা রসাল হয়। কাজের মূলে ব্যাপক অথচ শান্ত ঘৃণা না থাকলে সেটি অকাজ হয়ে ওঠে। যেমন পল্লী-সংস্কার, সেবা-ধর্ম্মের দুর্দ্দশা হয়েছে। কাজের ক্ষেত্র যখন ছোট এবং রীতিনীতির ভিত্তি যখন বড়, তখন কাজের ফল ধরবে রীতিনীতিরই প্রয়োগে। ওরা বলবে, কেউ কেউ বলছে, বোঝাপড়া হতে বাধ্য এই অবস্থায়।

অবস্থাটা কি? হরতাল সম্পূর্ণ, চাঁদা উঠছে, যদিও আশানুরূপ নয়, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধে নি, বাধবার সম্ভাবনাও নেই, কিষণচাঁদ ও আরো অনেকে খবর দিয়েছে যে ফাটকের সামনে হরতালীরা জমায়েৎ হয়েছে। হয়ত মাত্র ভিড় করে আছে, একবার দেখলে হয় নিজে। মজুরদের বিরোধজ্ঞানে ভাঁটা পড়ে নি, নিশ্চয়। তবু বোঝা-পড়া হবে কেন? এই সঙ্কটে মিটমাট হলে সর্ব্বনাশ হবে। এগিয়ে চলুক বিরোধ, বেঁচে থাক জীদ্, তাকে জুড়ুতে দেওয়া ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। খগেন বাবুও যেন ঐ কথাই বলছিলেন সে-রাত্রে, বিরোধ চিরন্তন, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কথাগুলি ফুটেছিল, লোকটির সততা আছে, যা সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থাকে না, কত ছুতোনাতা ফুঁড়ে কলি গজায়! কতদিক থেকেই না বাধা আসে! একে ত' বাইরের চাপ, তার ওপর স্বকৃত ফাঁকির বোঝা। কিন্তু সুযোগও আসে তাইতে। ভিন্ন ভিন্ন অংশের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা এক হতে

বাধ্য, সকলেরই মূলে জীবন, সকলেরই মধ্যে দিয়ে জীবনের উর্দ্ধগতি। অথচ খগেন বাবু জীবনস্রোতে বিশ্বাসী নন। যুক্তিটা গ্রহণ করা যায়। পার্টির প্রয়োজন ভদ্রলোক ধরতে পারেন নি, নিতান্ত স্বাভাবিক, তাঁর সংস্কার ব্যক্তি-গত, অন্তমু খী, জোর ক'রে, কল্পনার জোরে বাইরের সংস্থান বুঝতে চাইছেন, তবু ভাল, বিজনের চেয়ে। বিজন কেন্দ্রচ্যুত হচ্ছে, অবশ্য কেন্দ্র তার ছিলই না। বিজনের কথা ভাবতে সফীকের চিবুক দৃঢ় হয়। প্রাণবান ছেলে, কিন্তু মাত্র প্রাণ নিয়ে কি হবে। গলির দু'ধারে এইত' প্রাণের পরিণতি। গলির মোড়ে বাতি টিম্‌টিম্ করছে, একটু জ্বলে উঠল, নিবল না, বিজলী বাতি। মিউ-মিউ শব্দ কানে এল, মরা ছানার পাশে বেড়াল কাঁদছে, কেবল কাঁদছে, আর কাঁদছেন ভারতমাতা, হাপুসনয়নে, বিধবার বেশে, উঠে দাঁড়ান না, চোখ পুঁছে ঘাঘ্‌রা ঘুরিয়ে হাতুড়ি নিয়ে তেড়ে আসেন না। সফীক বেড়ালটাকে লাথি দেখিয়ে তাড়ালে, মরা ছানাটাকে ঠোক্কর মারতে মারতে গলির মোড়ে নিয়ে এল। সমঝোতা নেহী হোনা চাহিয়ে, নেহী হোগা··· মোলকের চোখ জ্বলছে সামনে, ম্যয় ভুঁখা হুঁ। আহুতির যোগান চাই।

মজুর-পাড়ার কিনারা যেন দেখা যায়, আলোর আশীর্ব্বাদে নয়, তমসার ঘনতর প্রলেপে। ধোঁয়া নেই, কল বন্ধ, চুলাও বন্ধ, তবু আকাশটা ত' স্পষ্ট। তার মধ্যে প্রবেশ করতে জাগরণের মৃদু কম্পন অনুভব হয়, তিন মাসের ভ্রূণের মতন, একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তবে বাড়বে, যথা সময় প্রসূত হবে। নেতারা নিজেদের ভাবেন জন্মদাতা, দম্ভের শেষ নেই তাঁদের, তাঁরা ধাই মাত্র, দেশী ধাই, তাই আঁতুড় ঘরেই মরে মা ও বাচ্চা উভয়েই, শিক্ষিত ধাই চাই, পরে নার্স, তার পরে গভর্নেস, তার পরে শিক্ষয়িত্রী, শেষে চ'রে খাকগে। অনেক দেরী লাগায় প্রকৃতি ঠাকরুণ সহুরে ভদ্রঘরের বাপ মায়ের মতন। জৈব-অভিব্যক্তির বিকাশ দীর্ঘকাল ব্যাপী। এতদিন তাতে আসত যেত না, কোটি বছর লেগেছে এক-একটা জাতি জন্মাতে। কিন্তু আজ অচল তার এই মন্থর-গতি। বিজ্ঞান এল, কল-কব্জা এল, জীবনযাত্রার উপায় পরিবর্ত্তিত হল, এখনও সমাজ-বিবর্ত্তন মহাকালের খেয়ালের তাঁবেদারী করবে! কিলিয়ে কাঁটাল পাকাতে হবে, পাতা ঢাকা দিয়ে, তাপ দিয়ে কাঁচাকে ডাঁসা, ডাঁসাকে পাকাতে হবে, তবে বাজারে চলবে। আমেরিকায় রাশিয়ায় যব গম পাকছে

তিন সপ্তাহে, আর মানুষ সচেতন হতে লাগবে বিশ বছর। তা হয় না—অত বেহিসেবীপণা মধ্যযুগে চলত। বিশেষত যখন দারিদ্র্যের দুর্দ্দশার অন্ত নেই, ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। শ্রেণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা প্রকৃতির নিয়মাধীন নয়। অন্ততঃ যে-রীতি নিয়ম বলে চালান হয়েছে এতদিন যাবৎ। বিরোধের পর বিরোধ, হাতুড়ির ঘা-এর ওপর ঘা, এক ঘা-এ হল না ত' বিশ ঘা, এতে হারজিত নেই, ধারাবাহিক আঘাতের ফলে চৈতন্য আসবে। উধামজী ভাবছেন এটা বুঝি সরকারের কাজ। সরকারের চোদ্দ-পুরুষের ক্ষমতা নেই। ওরা নিজেরা লড়ুক। পার্টির কাজ জাগান, জাগিয়ে রাখা। সাপে কামড়ান লোক ঘুমুলেই মরে, তাই ঠেলে বসাতে হয়, চড়-চাপড়-ঘুষি দিয়ে। এতে হারজিত নেই, সবটাই জিত।

'করিম, তোমাদের পাড়ার খবর কি ?'

'আমাদের পাড়ার জন্য ভাবি না, কিন্তু অন্য পাড়া যেন তৈরী নয় সন্দেহ হল। তারা বলে বোঝাপড়া হওয়াই মঙ্গল।'

'সেখানে কে কে আছে ?'

'সরযূপ্রসাদ, উধামজীর লোক।'

'সরাও তাকে। পাড়া থেকে নিজেদের লোক খাড়া কর।'

'আগেই বলেছি ওস্তাদ, ওদের নিয়ে চলে না। সরযূপ্রসাদের চার-চারখানা বাড়ী।

'জানি, কিন্তু না নিলে আপাতত চলে না, তাই সরযূর মত লোক এসে পড়ে। যা হবার হয়ে গেছে, এখন ?'

'কাল পর্য্যন্ত দেখি।'

'কালের বাকি কি! সকাল হয়ে এল। তোমার মিলের সামনে…'

'আমাদের মিল-কমিটির আওরাৎরা বাচ্চা নিয়ে চলে গেছে আধ ঘণ্টার ওপর। ওস্তাদ…'

'কি ?'

'যদি ওরা ঘাবড়ে যায়।'

'কারা ?'

'ও পাড়ার দল…'

'তখন প্রত্যেক মিলের সামনে যারা শোবে তাদের মাথায় ও পায়ের কাছে আমাদের লোক থাকবে, তারা লরি আটকাবে, লরি যদি চলে তাদের বুকের উপর দিয়ে প্রথম চলবে।'

'আচ্ছা ওস্তাদ, মজদুর সভার···'

'মজদুর-সভা লীড্ দেবে তখন, যখন আমাদের পিকেটিং সুরু হবে—প্রস্তাব গৃহীত হতে লাগবে দুতিন দিন—অত দেরী সহ্য হয় না, ইতিমধ্যে হাজার লোক হাজির হবে। আমাদের তৈরী থাকা চাই।'

'কেবল তৈরী ওস্তাদ ?'

'ঠিক বলেছ করিম, কেবল তৈরী থাকলে চলবেনা। ব্যাপারটা বাধিয়ে দিতে পারলে মজদুর-সভা বাধ্য হবে আমাদের সমর্থন করতে।' করিম চলে গেল।

আগে এটা হোক্ পরে ওটা হবে। কিন্তু এটা-ওটার মাঝখানে প্রকাণ্ড অবসর, সেই ফাঁকে কর্ম্মপ্রবাহে ভাঁটা আসে, লোকে আরাম খোঁজে, ঝুলে পড়ে, ভিজে যায়, নিবে যায়। ধাক্কার পর ধাক্কায় গাঁথুনি নিরেট হয়, নয়তো বালির প্রাসাদ। যে বিশ্রামে ঘুম আসবে অচেতনদের, সেই বিরামে বিরোধের নতুন ফন্দী আবিষ্কৃত হোক্। তার বদলে মিউ, মিউ, মিউ...স্বদেশ-প্রেমিকের রচিত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। বিরামে সাহিত্য, চারুকলাও তৈরী হয় না। যে অবস্থায় চিন্তার সুযোগ ঘটে তাকে বিরাম বলে না—সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ক্লান্তি এল, আধ-জাগন্ত আধ-ঘুমন্ত মনটা তখনও অচেতন হয় নি, সেই সময়ে কলম নিয়ে বোসো, যদি পার, তখন হাত দিয়ে যা বেরুবে, তাই সুপাঠ্য। অকাজের আই-ঢাই থেকে বেলোয়ারী, ঠুন্‌কো সাহিত্য পয়দা হয়। সহরের হঠাৎ-বড়লোকদের বাংলোর চিম্‌নী যেন! ভোরের দিকে এখনও ঠাণ্ডা পড়ে,···আরও এক কাপ চা পেলে ভাল হ'ত।

গোয়ালটুলির চৌরাহায় আলো নিবেছে, সূর্য্যের আলো পড়তে দেরী। যাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল, তারা এখনও উপস্থিত হয় নি। অত্যন্ত দেরী করে এরা···কিষণচাঁদ কথা অমান্য করে না···হয়ত অত রাত্রে উধামজীর দেখা পায় নি। খগেন বাবু পলিটিশিয়ান নন, তবু খেটে ভাল নোট লিখলেন। উপকারী জীব···বুদ্ধিসর্ব্বস্ব বলে অভিমান আছে। সন্তুষ্ট রাখলে কাজ

পাওয়া যাবে। বিজন ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। স্ত্রীলোকটি···স্ত্রীলোক··· সাধারণ স্ত্রী···বিজনের আরাম মিলবে···একটু বিপদ আছে। অন্যত্র সরিয়ে দিলেই চলবে।

'কিষণ চাঁদ।'

'ওস্তাদ! তুমি নিজে একবার চল। লোক রয়েছে, তবে যেন যা চাইছ, তা নয়। উধামজী বলছিলেন, সরকার ভয় পাচ্ছেন হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাতে।'

'বাধবেনা। যদি বাধে, সরকার রয়েছেন কি করতে! গুলি ফুরিয়েছে!'

'ওঁরা চালাবেন না।'

'শান্তিপ্রিয়, বুঝেছি। টিয়ার-গ্যাস—তাতেও বাধা!'

'জানি না।'

'সাইকেলটা দাও, দেখে আসি কতদূর বন্দোবস্ত হল। সরযূপ্রসাদের পাড়ায় প্রথমে যাব।'

পথে একটা দোকানে চা খেয়ে সফীক জুহীর পথে একটা মজুর-পল্লীতে হাজির হল। মেয়ে-পুরুষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে। মিলের ফাটক থেকে হাত পঞ্চাশ দূর পর্য্যন্ত রাস্তায় মজুর নেই, কিন্তু জনকয়েক পালোয়ানের মতন চেহারার লোক মোটা মোটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—হাতে খয়নি মলছে। মহবুবের সঙ্গে দেখা হতে সফীক প্রশ্ন করলে, 'কি হালচাল?'

'ভাল নয় ওস্তাদ।'

'শুনেছি। কি করবে?'

'আগে থাকতে বলতে পারছি না। দেখি, ওরা কি করে?'

'ওরা ত বেশ এন্তাজাম করেছে! গুণ্ডাগুলো যদি প্রথমেই মারপিট সুরু করে, তবে এ-পাড়ার মজুররা ভয়ে পিছিয়ে যাবে। তার পূর্ব্বে যদি···হুড় হুড় করে সব মজুর ওদের ঘিরে ফেলে, তবে আমাদের সুবিধা। একবার অন্তত জয়ের স্বাদ পেলে আর ভাবি না। এক কাজ কর—তুমি ভিড়ের ঐ দিকটার পাড়ায় যাও, আমি এ দিকটায় ঢুকছি। পাড়ার লোকদের বলগে যে আরো গুণ্ডা আসছে, তার পূর্ব্বে এদের ঘিরে ফেলা চাই চালাকী করে।'

মহবুব কথামত চলে গেল, সফীক ওভারকোটের কলার নামিয়ে কোমরের

বেল্ট এঁটে ঢুকে পড়ল জনতার ডান দিকের পাড়ায়। তাকে যেতে দেখে জনকয়েক লোক ছুটল সঙ্গে। চারপাশে খোলার ঘরের মাঝখানে একটা খোলা জায়গা, যত রাজ্যের ময়লা জমেছে, একটা নর্দ্দমায় পচা জল, সবুজ বুদবুদ ফুটে আছে, ছুটো ঘেয়ো কুকুর চেঁচিয়ে উঠল, বেড়াল ছুটে পালাল, মুরগী ও হাঁস চরছে কাদা মেঝে, খোলার ঘরে দরজায় চটের ছেঁড়া পর্দ্দা ঝুলছে, ন্যাংটো ছেলেমেয়ের মাথায় পশমী টুপী, গায়ে জামার ওপর জামা, জাঙ্গিয়া নেই কারুর, হামাগুড়ি দিচ্ছে তিনটে বাচ্ছা। জন পনের মজুর জম্‌ল সফীকের পাশে—পর্দ্দার আড়াল থেকে মেয়েরা উঁকি দিচ্ছিল।

সফীক বল্লে চেঁচিয়ে, 'তোমরা মরদ না আওরাৎ? ফাটকের সামনে গুণ্ডা জমায়েৎ, লরিভর্ত্তি আরো আসছে, যদি মজুর আসে তবে তোমাদের খানা-পিনা জুটবে না, যদি গুণ্ডা আসে তবে তোমাদের বিবিদের ইজ্জৎ থাকবে। ওরা মুসলমানদের জেনানা ভেঙ্গে দেবে, আর তোমরা দাঁড়িয়ে সহ্য করবে।'

একজন মেয়ে মানুষ পর্দ্দার আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল অভদ্র ভাষায়, 'পরশু থেকে আদমী বেহোঁস হয়ে পড়ে রয়েছে, আরো দারু চায়, বলে পিয়াস লেগেছে, আওরাতের সারা অঙ্গে কাল্‌সিটে, এ আদমী কোনো কাজের লায়েক নয়, বাইরের গুণ্ডা এলে তাদের সঙ্গে ভাঁটিতে যাবে জেনানা ছেড়ে।'

'চুপ্ রহো—চুপ্ রহো…'

'কাহে চুপ্ রহুঙ্গী' বলে মেয়েমানুষটি বেরিয়ে এল বোরখা পরে। সফীক তাকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'এ আওরাতের কি দশা হবে ভেবেছ…তোমরা এখনই বিহিত কর। তোমাদের সর্দ্দার কে!…নেই। বেশ, এখনই সর্দ্দার ঠিক কর, এটা লড়াই, সর্দ্দার চাই।'

একজন বুড়ো বল্লে, 'এরা যদি চায়, আমি রাজি আছি।'

'তোমরা রাজি আছ?' তিন চার জন একত্রে বলে উঠল, 'খাঁ সাহাব বড় কাবিল আদমী।'

সফীক—'আচ্ছা, খাঁ সাহাব, তোমার মতে কি এখন ঘরের ভেতর বসে থাকা উচিত, না বেরিয়ে এসে ফাটকের সামনে যে সব গুণ্ডা জমায়েৎ হয়েছে তাদের তাড়ান উচিত?'

খাঁ সাহেব বল্লে, 'প্রথম থেকেই মার দেওয়া মরদের কাজ ?'

স—'তুমি যা বলবে, এরা তাই শুনবে, কেমন ?' সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠল।

'খাঁ সাহেব, তবে তুমি জন কয়েক বাছা-বাছা লোক নিয়ে ফাটকের দিকে এগোও—জন তিনেক জোয়ান-পাট্টা এইখানে থাকুক—তুমি যাকে যাকে বেছে নেবে তারাই যাবে, বাকী লোক এখানে থাকবে—তুমি সর্দ্দার।'

সফীক ছেঁচতলার গলি দিয়ে অন্য পল্লীতে পড়ল।

অত সকাল বেলাতেও কথক ঠাকুর চাঁদোয়ার তলায় ব'সে আছেন। পণ্ডিতজীর গলার মালা শুখিয়েছে, অখণ্ডপাঠ নিশ্চয়। হারমোনিয়ম বেজে উঠল, পণ্ডিতজী গাইতে শুরু করলেন ভাঙ্গা গলায়, তবলার ঠেকা ঢিমে লয়ে। মধ্যে মধ্যে পণ্ডিতজী বক্তৃতা দিচ্ছেন, অযোধ্যায় রামরাজ্যের গুণবর্ণনা, বিনিয়ে বিনিয়ে বলছেন, মহারাজ প্রজাবৎসল, ব্রাহ্মণদের গাভীদান করেন, যাগযজ্ঞ লেগেই আছে, ভোরের বেলা নহবতে সানাই বাজে। সফীক পাশের লোকের কাণে কাণে বল্লে, 'এ রাজ্যে মিলের ভোঁ'। লোকটা হাসলে। রাজ্যে ছুর্ভিক্ষ নেই, (এখানে খেতে পায় না), মরাই-ভরা গেঁহু আর যব (এখানে খালি), গোয়াল-ভরা গাই, ছুধের দাম দিতে হয় না, (এখানে ছুধ মাখন খেতে পাও নাকি হে।), যত পার খাও (যত পার খেটে মর), সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, প্রত্যেকের জমিজরাত, (ভেইয়া, তোমার তালুক থেকে ক' হাজার রূপেয়া ওঠে।) পাশের ছ'তিন জন লোক সফীকের টিপ্পনী শুনে মুচকে মুচকে হাসছিল। সফীক ভাল মানুষের মতন জিজ্ঞাসা করলে, 'পণ্ডিতজী, সে সময় জমিদারী ছিল না, লাগান দিতে হত না ?' পণ্ডিতজী থতমত খেয়ে বল্লেন, 'কথার সময় বিরক্ত করতে নেই, পাপ হয়।' সফীক বিনীত মুখভঙ্গী করে অতিশয় নম্র কণ্ঠে মাপ চাইলে। সামনের জন কয়েক লোক পিছন ফিরে দেখলে। পণ্ডিতজী গান সুরু করতে সফীক এগিয়ে গেল তাঁর সামনে। 'বাঃ বাঃ পণ্ডিতজী, ইয়ে আপিকা কাম।' ঠেকা দ্রুত চলছে, পণ্ডিতজী উৎসাহিত হয়ে গাইছেন, সফীক তাল দিচ্ছে, সকলে তালি দিতে সুরু করল, সফীক উত্তেজিত হয়ে জোরে তালি বাজাতে লাগল, মনে হয় যেন আড়িতে বাজাচ্ছে, লোকগুলো তাল রাখতে পারছে না, ক্রমে যেন তাল ভ্রষ্ট হল,

পণ্ডিতজী তবলচিকে ধমকালেন, সে তাল ঢিমে করে সিখে ঠেকা দিতে স্থরু করলে। সফীক বল্লে, 'ওস্তাদ, জোরসে, ফুর্ত্তিসে বাজাইয়ে।' পঞ্চাশ জোড়া হাতে তখন ঘন ঘন তালি চলছে। পণ্ডিতজী গান থামালে সফীক দশাপ্রাপ্ত ভক্তের মতন মাথা নাড়তে লাগল। 'বা, বা, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ···জয় রামচন্দ্রজীকো জয়'—পণ্ডিতজী বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

একজন লোক এসে খবর দিলে, 'খাঁ সাহেব লোকজন নিয়ে ফাটকের দিকে গেল, বাইরে থেকেও নাকি গুণ্ডা এসেছে।' সফীক উচ্চ কণ্ঠে বল্লে, 'আমিও শুনেছিলাম বটে আসচে, তারা এরি মধ্যে হাজির হয়েছে? মুসলমান গুণ্ডা? তোমাদের পাড়ার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত চাই।' 'নিশ্চয়ই,' জনকয়েক লোক সফীককে ঘিরে দাঁড়াল।

'পঞ্চায়েৎ বানাও, এ-পাড়ায় একজন গুণ্ডাকেও ঢুকতে দেওয়া হবে না কিছুতেই।' পঞ্চায়েৎ তৈরী হল তৎক্ষণাৎ। 'এইবার পঞ্চায়েৎ একটা সর্দ্দার খাড়া করুক।' সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে সফীক বল্লে, 'কেউ কাউকে বিশ্বাস কর না দেখছি। ও-পাড়ার খাঁ সাহেবের মতন মরদ একজনও তোমাদের ভেতর নেই, অথচ সে হল বুড়ো থুড়থুড়ে।'

'খাঁ সাহেবের কথা ছুস্‌রী, সন্ সাতাওয়নের জোয়ান।'

'বেশ পঞ্চায়েৎ বানিয়ে মার খাও সকলে মিলে। যদি না পার, অন্তত পাশে খাঁ সাহেবের পাড়া আর তোমাদের পাড়া এককাট্টা করে পাহারা দাও। এস জনকয়েক আমার সঙ্গে।' জন পাঁচেক ছোকরা সফীকের সঙ্গে চল্‌ল। পথে সফীক তাদের বল্লে, 'বড়ই লজ্জার কথা—তোমরা জোয়ান, আর বাইরের লোক এসে কাণপুরের মিলে কাজ করবে, কাণপুরের মজুরদের বাড়ী ঢুকে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করবে, ঘর দোর জ্বালিয়ে দেবে, বাড়ী অবশ্য তোমাদের নয়···হা, হা,, হা···কার বাড়ী কে জ্বালায়···' সঙ্গীরা হেসে উঠল।

'কিন্তু বড়ই লজ্জায় কথা।'

'আপনি কি বলেন?'

'আমার ত' মনে হয়, মারপিটে কাজ নেই।'

'নিশ্চয়ই মারপিটে বহুৎ লোকসান।'

'কিন্তু আমি বলি—না খেতে পেলেও লোকসান। যেই বাইরে থেকে মজুর আসবে তখন তোমাদেরই সর্ব্বনাশ। ওদের আসা বন্ধ করতে হবে। এখন পর্য্যন্ত মাত্র জন কয়েক এসেছে। বেচারীদের দোষ কি! তাদেরও বালবাচ্চা আছে। তাই আমি বলি—ভালয় ভালয় তারা ফিরে যাক।'

'তাই কখনও যায়!'

'নিশ্চয়ই যাবে।'

'দেখবেন তখন, গলা ধাক্কা না খেলে তারা ভাগবে না।'

'অতদূর যাবার প্রয়োজন নেই। মহাত্মাজী বলেন···'

'তা ঠিক···সত্যাগ্রহ করতে হবে।'

'সত্যাগ্রহ করবে তোমাদের জাতভাইদের বেলা। আর যারা লাঠি নিয়ে যমদূতের মতন সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে?'

'তাদের···?'

'আমি ভাবছি, তাদের চারধার থেকে ঘিরে ফেলতে হবে। যেই তারা দেখবে অনেক লোক, তখন তারা ভাগবে নিজে থেকেই।'

'সেই ঠিক—কিন্তু লোক?'

'তার ভাবনা নেই। তোমাদের পাড়ায় ক'জন মরদ?'

'পঞ্চাশ-ষাট।'

'খাঁ সাহেবের সঙ্গেও তাই। ঐ রকম আরও শতখানেক চাই। রাস্তার দু'দিক থেকে ঘিরতে হবে। তোমরা এ ধার থেকে যাও, আমি আমি অন্য পাড়ার লোক আনছি।'

সফীক যখন ফাটকের সামনেকার বড় রাস্তায় এল, তখন বিস্তর লোক হাজির হয়েছে। তখনই মহবুব প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক নিয়ে এল। দুটো ভিড় মিশে গেল।

'মহবুব, এ হবে না, সকলেই একদিকে রয়েছে, শতখানেক লোক নিয়ে ওপাশে যেতে পার কাউকে না জানতে দিয়ে? যদি না পার, তুমি ওদিককার পাড়ায় খবর দাও যে মন্ত্রীরা শীঘ্রই আসছেন, তারা ঝাণ্ডা নিয়ে চলে আসুক, সামনে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে তুমি এগুবে, পাশে থাকবে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা, সেইটে আগে রাখবে, বড় রাস্তায় পড়লে লাল ঝাণ্ডা সামনে—বুঝেছ?

মহবুব চলে যেতে সফীক এ পাশের ভিড়কে এগিয়ে নিয়ে গেল। সফীক একজন ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাদের ঝাণ্ডা নেই ? লাল ঝাণ্ডা ?'

'কংগ্রেসের ঝাণ্ডা আছে।'

'তাই নিয়ে এসো জল্‌দি।' লোকটা ছুটল। সফীক খাঁ সাহেবকে দেখে বল্লে, 'আপনি একবার কষ্ট করে এদের বুঝিয়ে দিন যে মারপিট মজুর পল্লীতে চলবে না, ছুঁচ গলেনা এ-পাড়ায়, লাঠি ত মোটা।' খাঁ সাহেব উত্তর দিলে যে বক্তৃতা তার ধাতে নেই, সে জানে লাঠি ধরতে ছুরি খেলতে।

'আপনি এ-পাড়ার শের—আওয়াজ দিলেই হবে। ভেঁইয়ো, খাঁ সাহেবের কিছু কথা আছে। তোমরা বসে পড়।' সকলে মাটিতে বসল। খাঁ সাহেব বল্লে, 'আমি বুড়ো হয়েছি—এক কাল ছিল যখন লাঠির জোরে একা দশ দুষমণের শির ভেঙ্গেছি। এখন পারি না।'

সফীক বল্লে, 'এখনও পারেন, কেঁও ভেঁইয়া, তোমরা ভাবো পারেন না ?'

'উনি আবার পারেন না, সেবারকার হাঁম্‌লায় একা তিন জনকে কে সাবাড় করলে!' 'রহীম যে রহীম অত বড় পালোয়ান, ছুটল খাঁ সাহেবের গণ্ডাশের ভয়ে!'

খাঁ সাহেবের মুখে হাসি ফুটল—'ব্যাটা ভারী বদমায়েস ছিল, রাম-খেলাওয়নের লেড়কীকে নিয়ে ভাগবার মতলব। ব্যাটাকে সমঝে দিলাম এ-পাড়ায় ও-সব চালাকি চলবে না, বদমায়েসী করতে চাস্ অন্য যায়গায় চলে যা, যতদিন এখানে থাকবি তদ্দিন চুপচাপ থাক।'

সফীক নীচু স্বরে বল্লে, 'কিন্তু খাঁ সাহেব, ওরা বাইরে থেকে গুণ্ডা এনেছে।'

'ভেতরে আসতে পাবে না—এক পা এগিয়েছে কি মরেছে!'

'লরি-ভর্ত্তি লোক আসছে!'

'আসতে দেওয়া হবে না, আদমীর দেওয়াল উঠবে।'

সফীক জোরে জোরে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে লাগল। সকলে বল্লে, 'জরুর, দেওয়াল বন্ যায়গা।'

'কিন্তু সামনে ?'

খাঁ সাহেব— 'সামনেও তাই হবে!'

'নিশ্চয়ই খাঁ সাহেব, তাই ঠিক। কিন্তু ওরা ফাটকের সামনে, পিছন থেকে পুরী হালুয়া, কোপ্তা কাবাব আসবে, যতদিন ইচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকবে পরোয়া নেই, আর আমাদের যেতে হবে ঘরে খানার জন্য, ঘরে যা খানা আছে তা ত জানি। হা, হা, হা, তবু···আমি বলি, ওদের লোক কম, আমরা বেশী, যদি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই দু'পাশ থেকে ওরা কোণ-ঠেসা হবে, ভয়ে তখন ফাটকের ভেতর পালাবে, তখন ফাটকের সামনে ধন্না দিলেই চলবে।'

'বহুৎ আচ্ছা বেটা!'

'ওদিকের বন্দোবস্ত করে আসছি, আপনি তৈরী থাকুন।'

সফীক ছুটে গলির ভেতর দিয়ে রাস্তার অন্য দিকে পৌঁছুল। মহবুব বিস্তর লোক এনেছে, তারা মন্ত্রীদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। সফীক বল্লে, 'এগিয়ে নিয়ে এস সকলকে, ওদিকে খাঁ সাহেব তৈরী, জাঁতাকলে পিষে মার। সামনে মুসলমান রাখ, যতজন আছে ততজনেই হবে, তাদের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দাও, তুমি পিছনে থেকো। 'ওপাশ থেকে এগুচ্ছে দেখলেই তোমরা এগুবে—আদৎ কথা, মুখোমুখি যেন দুটো ভিড় মেশেনা, একটু ত্যারছা ভাবে চোলো, যাতে ফাটকের সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা ভাবে যে তাদেরই দিকে এগুচ্ছে···বুঝেছ···কিছুতে মুখোমুখি নয়। আমি যাব, না এইখানে থাকব?'

'ওস্তাদ, তুমি এই পাশটায় দেখ, আমি ওধারে যাচ্ছি···এদের মেজাজ ঠিক বুঝতে পারছি না, এসেছে এরা মন্ত্রীদের অভ্যর্থনা করতে, যদি উল্টা বোঝে?'

'সোজাকে উল্টা করতে হবে। মহবুব, তুমি ওদিকে যাও, দেখ যেন ফাটকের দিকেই এগুচ্ছে দারোয়ানেরা এই সন্দেহই করে।'

মহবুব সরে যাবার পর সফীক পাশের লোককে একটু উঁচু গলাতে বল্লে, 'আমার মনে হয়, মন্ত্রীরা এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন না। সকাল থেকে আবার মিটিং বসেছে, একটা হেস্ত-নেস্ত না করে তাঁদের আসা উচিত নয়।' লোকটি উত্তর দিলে, 'তাঁরা এখনই আসবেন আমি খবর পেয়েছি।'

'পাকা খবর?'

'নিশ্চয়ই, আমার কাছে কাঁচা খবর আসে না।' পাশের লোক হেসে

মন্তব্য করলে, 'চৌধুরীর কাছে কাঁচা খবর, কি বলছ ভেইয়া! উনি নিজে ছাপাখানায় কাজ করতেন, এখনও ওঁর জামাই তেল ঢালে।'

সফীক ক্ষমা চাইলে ভুল খবরের জন্য।

'কতক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়ান যাবে, তার চেয়ে মিলের দেওয়ালের পাশে ছায়া আছে, সেইখানে চৌধুরী সাহেব দাঁড়াবেন চলুন। ঐ যে ও-পাশের লোকেরাও এগুচ্ছে—বা রে! ওরা আবার অত লোক কেন! সে হয় না, আমরা আগে পৌঁছুব···কি বলেন, চৌধুরী সাহেব?'

'নিশ্চয়ই, সকলের ছায়াতে দাঁড়াবার জায়গা কোথায়!'

'নিশ্চয়ই, কে আগে ছুটে পৌঁছুতে পারে! এক, দুই, তিন···'

সফীক একটু দ্রুত ভাবে হাঁটতে সুরু করলে, সঙ্গে চৌধুরী সাহেব, আরো দশজন, কুড়িজন—তাই দেখে ও-পাশের লোকেরাও দ্রুত এগুতে লাগল। যখন দুটো দল প্রায় ফাটকের সামনে। তখন সফীক এগিয়ে এসে জোর গলায় হেঁকে ফাটকের দারোয়ানদের হুকুম দিলে, 'ভাগো হিঁয়াসে···' ও পাশ থেকে খাঁ সাহেব বল্লেন, 'ভাগো হিঁয়াসে', মহবুব আর সফীক দুজনে প্রহরী-দের সামনে এসে বল্লে, 'জলদি ভাগো হিঁয়াসে···'

দারোয়ানদের চোখের পাতা কেঁপে উঠল, হাতের খয়েনি খসে গেল, এক-জনের গলা থেকে গয়ার ওঠার মতন শব্দ হল··চোখের ওপর চোখ রেখে সফীক মুখে হাসি এনে বল্লে, 'দেখছ না ভেঁইয়ো, ওরা কেবল ফাটকের সামনে আসতে চায়, ভেতরে ঢুকবে না, তোমরা দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে পাহারা দাও···তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না···যাও, এই বেলা ভেতরে যাও, আমি ওদের সামলাচ্ছি···'

লোকটা থতমত খেয়ে বল্লে, 'মারপিট যদি করে, আমরাও পিছপাও না, কি ভাবে আমাদের!'

লোকটা থতমত খেয়ে বল্লে, 'মারপিট যদি করে, আমরা পিছপাও না, কি ভাবে আমাদের!'

'ওরা মারপিট করবে না···শীগ্‌গির ভেতরে যাও···এই যে মহবুব···ওদের বল যেন ফাটকের দশ পা দূরে না আসে, যাও···রুখে দাও···যাও'···

সফীক দুটো হাত বিস্তৃত করে জন তিনেক প্রহরীকে ফাটকের মধ্যে ঢুকিয়ে

দিলে, যেন তাদের রক্ষা করছে। মহবুব দেখতে পেয়ে ছুটে এল…দুজনে মিলে হাত জুড়ে আরো ৫।৬ জন, তাই দেখে দু'দল থেকে আরো জন কয়েক হাত জুড়ে বাকী ক'জন প্রহরীকে ভেতরে ঠেলে দিলে। সফীক ছুটে গিয়ে খাঁ সাহেবকে অভিনন্দন জানালে…'এবার আদমীর দেওয়াল গাঁথুন, রাজমিস্ত্রী…' সফীক চৌধুরীকে খাঁ সাহেবের সামনে টেনে হাজির করে বল্লে, 'চৌধুরী সাহেব বলেন যে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করতে হলে রাস্তার ওপর হয় না। আপনার কি মত ?'

'নিশ্চয়ই।'

'মহবুব, তুমি না হয় একবার ছুটে যাও, খবর নিয়ে এস। ইতিমধ্যে আমরা দেখব যেন ফাটকের বাইরে অন্য কোন লোক না আসে। সব বসে যাও। সরকার এলে উঠব, লরি-ভর্ত্তি গুণ্ডা আর মজুর এলে সত্যাগ্রহ করব।' মহবুব চলে গেল। খাঁ সাহেব ও চৌধুরী উৎসাহের সঙ্গে জনতাকে বসাতে, ওঠাতে, হঠাতে লেগে গেলেন।' পানওয়ালা, হুক্কাওয়ালা, জিলেবীওয়ালা ঘুরতে লাগল।

সফীক পাশের একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। দু-পেয়ালা চা, দুটো পরেটা খাবার পর একটা বর্ম্মা চুরুট ধরালে। এখনও এরা নাবালক, এক দুই তিন বলতেই ছোটে, খগেন বাবু চেয়েছিলেন এরা নিজেরাই কর্ত্তা বেছে নেবে, এ-অবস্থায় তা' হয় না, আপাতত পার্টি বাছবে, তারপর দেখা যাবে… এখন কাদা, এঁটোলো মাটি চাই, তবেই এধারে-ওধারে টেপো, রূপ পাবে। একমাত্র উপায় বিরোধ, ধাক্কার উপর ধাক্কা…বলে কিনা হিন্দু-মুসলমানের লড়াই বাধবে…চাপা হাসিতে ক্ষণিকের জন্য চোখের কোণের চামড়া কুঁচকে গেল। কিন্তু যদি বোঝা-পড়া হয়ে যায়, তবে এই জনতা ঝুলে গিয়ে ভিড়ে দাঁড়াবে…সে হয় না। কিন্তু যদি সমঝোতার খবর পাকা হয়, তবে! মজদুর-সভা যেন কিছুতে সমঝোতা না করতে দেয়·· ভোটে যদি নিষ্পত্তি হয়, তবেই সব যাবে ··উধামজীর ওজস্বিনী বক্তৃতায় বাধা টিঁকবে না। তাঁকে সরান উচিত…কিন্তু কে সরাবে? উপকারী জীব ইতিহাসের শত্রু।

চায়ের দোকানে মহবুব বল্লে, 'সমঝোতা প্রায় হয়ে গেল। শুনছিলাম, মন্ত্রিপক্ষ বলেছেন, ওদের রায় দিয়ে যদি মিল খোলা হয় তবে ১৪৪ ধারা

জাহির হবে। তাইতে মালিকরা ঘাবড়ে গেছেন। গুজোব এই যে তাঁরা রাজি হয়েছেন মজুরদের নিতে।' শুনে সফীক বর্ম্মা চুরুট ফেলে দিয়ে যাবার সময় বল্লে, 'মন্ত্রীরা আসছেন, তাঁদের অভ্যর্থনায় যেন ত্রুটি না হয়···যতক্ষণ মজুর-সভা বোঝাপড়ার সর্ত্ত না নিচ্ছে, ততদিন ফাটকের সাম্নে সত্যাগ্রহ চলবে··· এটুকু পারবে···না তুমিও একটা বোঝাপড়া করে নেবে? আমি আড্ডায় যাচ্ছি···ঘুমুব।'

মহবুব গম্ভীর হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ···বিড়বিড় করে কাকে গালাগালি দিলে অভদ্র ভাষায়···'আবে শালে···চায়ে লেয়া···'

ক্রমশঃ

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

মধ্যযুগের ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৬)

আমরা এখন ভারতের ইতিহাসের ষোড়শ শতাব্দীতে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, এই কালকে ভারতের মধ্যযুগ বলা হয়। এই সময়কার ভারত বলিলে উত্তরের সর্ব্বগ্রাসী মোগল সাম্রাজ্য, দাক্ষিণাত্যের তিনটি মুসলমান রাজ্য ও তাহার দক্ষিণে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ—হিন্দুরাজত্ব।

এই সময়ে মোগলদের শাসন-পদ্ধতি অনুযায়ী কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা ছিল আমলাতন্ত্রের কার্য্য। এই কার্য্যের সুবিধার জন্য অনেক স্থানে "জমিদার" বলিয়া লোক নিযুক্ত করা হইত; ইহারা কৃষক ও সম্রাটের মধ্যবর্ত্তী লোক। ইহারা কিন্তু রাজবংশীয় বা সর্দ্দার গোছের লোকের ন্যায় ছিল না। এই যুগের যত বিদেশী পর্য্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই দেশের জনসংখ্যা অত্যধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের বর্ণনা পাঠে এই ধারণা হয় যে, তখনকার ইউরোপীয় দেশসমূহের তুলনায় বাঙ্গলা, উত্তর-পশ্চিম গুজরাট এবং দক্ষিণ ভারত বেশ জনাকীর্ণ ছিল (১)।

এই সকল জনপদের লোকদের অর্থনীতিক অবস্থার পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক মোরল্যাণ্ড বলেন যে, সেই সময়ে মধ্যবিত্তশ্রেণী বিশিষ্টভাবে ছিল না, ইহার সংখ্যা অতি সামান্য ছিল (২)। আকবরের সময়ের পঞ্চাশ বৎসর পর ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ে বলিয়াছেন, "দিল্লীতে মধ্যবিত্ত স্তরের লোক নাই। একজন মানুষকে হয় অতি উচ্চপদস্থ হইতে হইবে, না হয় দারিদ্র্যে জীবন যাপন

১। W. H. Moreland—India at the death of Akbar, P 13.

২। W. H. Moreland—India at the death of Akbar, P 26.

করিতে হইবে। মোরল্যাণ্ডের মতে এই সময় আজকালকার ন্যায় আইন ব্যবসায়ীর দল ছিল না, পেশাদার শিক্ষকের দল হয়ত মুষ্টিমেয়; সংবাদপত্র-সেবী কিংবা রাজনীতিকের দল ছিল না, ইঞ্জিনিয়ার এবং আজকালকার রেলওয়ে কর্ম্মচারীর দল ছিল না, পোষ্ট ও সরকারী জলবিভাগ, ফ্যাক্টরী এবং বড় কারখানায় কর্ম্মপ্রাপ্ত লোক ছিল না; আধুনিক জমিদারের দল বড় কম ছিল, হয়ত পৈত্রিক সঞ্চিত সম্পত্তি ভাঙ্গিয়া খাওয়ার লোকও কম ছিল। এইগুলির পরিবর্ত্তে ছিল কতকগুলি সরকারী পদের অধীনস্থ বা নির্ভরশীল গোষ্ঠি।

এই চিত্র মধ্যযুগীয় অবস্থার বর্ণনার সহিত মিলে। এই ভিত্তির উপর যে শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও সেই যুগের অবস্থার অনুযায়ী। ভারতের হিন্দু অংশ, বিজয়নগর রাজ্যের জমি জনকতক সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে বিভক্ত ছিল। ইউরোপীয় পর্য্যটক নুনিজ বলেন, সম্ভ্রান্ত লোকেরা (nobles) খাজনা প্রদানকারীদের (renters) ন্যায়; ইহারা রাজার নিকট হইতে সমস্ত জমি গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রতি বৎসর রাজাকে তাহার প্রাপ্য বলিয়া ষাট লক্ষ মুদ্রা খাজনা প্রদান করে। সমস্ত জমির আদায় ১২০ লক্ষ; ইহা হইতে ৬০ লক্ষ রাজাকে দিয়া বাকীটা তাহার সৈন্যদের মাহিয়ানা ও হাতির খরচের জন্য রাখে। এইসব রাখা তাহাদের বাধ্যতামূলক ছিল। এইজন্য জনসাধারণ বিশেষ দুঃখভোগ করে; কারণ যাহারা জমি ভোগ করে তাহারা বড় অত্যাচারী (৩)।

বিজয়নগর ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজত্বগুলির অবস্থা অনুসন্ধান করিলে ষোড়শ শতাব্দীর শাসনপ্রণালীর সংবাদ মিলে না। বার্বোসা যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাহমনী রাজত্বের শেষকালের সংবাদ। তিনি বলিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজ্য মুসলমান সামন্তদের মধ্যে বিভক্ত ছিল; রাজা শাসনের কোন সংবাদই রাখিত না। এই অবস্থা পরের খণ্ডীকৃত রাজ্যগুলির ছিল কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু সন্দেহাতীত রূপে বলা যাইতে পারে যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোলকোণ্ডার সম্রাটেরা অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিত। থেবেনা নামক জনৈক ইউরোপীয়

৩। Moreland—India at the death of Akbar, P 32.

পর্য্যটক মোগল সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিবার সময় শেষোক্ত স্থানের খাজনা আদায়কারীদের ঔদ্ধত্য দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন; এই সকল জমি সম্ভ্রান্তেরা রাজার নিকট হইতে পায়, রাজা যে সর্ব্বাধিক দর দিত তাহাকে অথবা তাহার কোন প্রিয়পাত্রকে খাজনায় জমি দিত। সম্ভ্রান্তেরা ইহার জোরে জোর জুলুম করিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিত, এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহারা রাজনীতিতেও মধ্যে মধ্যে উৎপাত করিত। মোরলাণ্ড অনুমান করেন, বোম্বাই হইতে পূর্ব্বদিকে একটি সামান্য লাইন (latitude) টানিলে তাহার দক্ষিণের ভারতের অংশ সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোকদের দ্বারাই শাসিত হইত (৪)।

মোগল সাম্রাজ্যে সরকারী পদগুলি "কাচ্চা" ভাবে, অর্থাৎ অস্থায়ীভাবে প্রদান করা হইত, এবং আকবরের সময়ে বিভাগীয় শাসন প্রণালী অঙ্কুর প্রাপ্ত হইয়াছে। আকবর তাঁহার সাম্রাজ্যকে সুবায়, অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করেন, সুবার শাসনকর্ত্তা শাসন-পদ্ধতির প্রত্যেক বিভাগের জন্য দায়ী থাকিত। সুবার শাসনের unit ছিল জেলা—ইহার একজন সামরিক কর্ম্মচারী (ফৌজদার) ও একজন খাজনা বিভাগীয় কর্ম্মচারী (আমল গুজার) ছিল (৫)।

আইন বিভাগ এই সময় বিশেষভাবে বিবর্ত্তিত হয় নাই, ব্যক্তিগত নালিশ রাজা কিম্বা সম্রাট শুনিতেন। আকবর "কাজী" বা "মির আদল" নামে আইন বিভাগীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু বোধ হয় তাহারা কেবল মুসলমান আইন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বিচার করিত। ইহাদের যে বিচারের পূর্ণাধিকার ছিল না, তাহা আকবরের গভর্ণরদের আইন বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার অনুজ্ঞায় (আইন-আকবরী, তর্জ্জমা, ২, ৩৭, ৩৪) বোঝা যায়। পর্য্যটকেরা বলেন, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সহর কোটালের সম্মুখে কার্য্য নির্ব্বাহক (executive) কর্ম্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এই প্রথা বিজয় নগর হইতে উত্তর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল (৬)।

এই সময়ে উৎকোচ গ্রহণ প্রথা ভারতের সর্ব্বত্রই ছিল। লিখিত আইন (constitutional law) ছিল না; হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম্ম আইন,

---

৪—৫। Moreland—India at the death of Akbar, P 33.

৬। Moreland—India at the death of Akbar, P 34.

লোকাচার (custom) এবং ব্যক্তিগত খেয়াল প্রভৃতি দ্বারা কর্ম্মচারীরা বিচার করিত। শাসনতন্ত্র সুদৃঢ় না হইলে চারিদিকে ডাকাইতের উৎপাত হইত। ফিচ্ (১৫৮৩—৯১ খৃঃ) বাঙ্গলায় হুগলীতে আসিবার কালে জঙ্গল দিয়া আসিয়াছিল, কারণ রাজপথে ডাকাইতের উৎপাত ছিল (৭)। দেশের মধ্যে ব্যবসায়ের জিনিষ পত্র লইয়া যাইবার জন্য শুল্ক প্রদান করিতে হইত। এইসব সত্ত্বেও ব্যবসায় চলিত, কারণ এইসব খরচা বিক্রেতা মাল-ক্রেতার ঘাড়ে চাপাইত। এই সময়ে—"যে যত পার শোষণ কর", এই প্রথা প্রচলিত ছিল ; এইজন্য লোকে ধনী হইলেও ধন গোপন করিয়া রাখিত। এই সকল কারণ বশতঃ মূলধনী প্রথায় (capitalist basis) শিল্প ও বাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া অসম্ভব ছিল। এই সময়ে শিল্পশ্রমের উৎপাদন (industrial production) বৃহৎভাবে হইত ও তাহা দামী ছিল, কিন্তু এই কর্ম্ম শিল্পীদের হাতেই ছিল ; বোধ হয় তাহারা সওদাগর ও মধ্যবর্ত্তী লোকদের দ্বারাই অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম করিত (৮)। এই শিল্পীরা ব্যক্তিগতভাবে এত ক্ষুদ্র ছিল যে কর্ম্মচারীদের লোলুপ দৃষ্টি এড়াইয়া যাইত। কর্ম্মচারীরা নগদ মাহিয়ানার পরিবর্ত্তে "জায়গীর" পাইত। দেখা গিয়াছে, ইহাই প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রথারূপে চলিতেছিল। আকবর ইহার পরিবর্ত্তে নগদ মাহিয়ানা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের সময় পুরাতন প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত হয় (৯)। এই কর্ম্মচারীরা অধিকাংশই বিদেশী ছিল। আবুল ফজল আমীর ও মনসবদারদের যে-তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন, ব্লকম্যান উহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উক্ত বিশ্লেষণ পরীক্ষা করিয়া মোরল্যাণ্ড বলেন, কর্ম্মচারীদলের মধ্যে শতকরা ৭০ জন বিদেশী গোষ্ঠীজাত। ইহাদের গোষ্ঠী হয় হুমায়ুনের সঙ্গে ভারতে আসিয়াছিল, না হয় আকবরের সিংহাসন প্রাপ্তির পর দরবারে আসিয়া জুটিয়াছিল ; অবশিষ্ট শতকরা ৩০ জন ছিল ভারতীয় ; বরং ইহার মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান এবং অর্দ্ধেকের কম হিন্দু (১০)।

৭। Moreland—India at the death of Akbar, P 45.
৮। Moreland—India at the death of Akbar, P 51
৯। Moreland—India at the death of Akbar, P 68
১০। Moreland—India at the death of Akbar, P 70.

উপরোক্ত শ্রেণীসমূহ ব্যতীত অন্যান্য পেশার শ্রেণীর সন্ধান করিলে দেখা যায়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বড় কম ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী ফকিরের দল আজকালকার মতই ছিল। পর্য্যটকেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে তাহাদের সংখ্যার প্রাচুর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১১)। এই সময় মন্দিরগুলি ভারতের সর্ব্বত্র দেবোত্তর জমি ভোগ করিত; মুসলমানেরাও ইসলামীয় শাসকদের নিকট জমি দান পাইত। আকবরের পূর্ব্বে ইসলামীয় প্রতিষ্ঠান-গুলি যেসব জমি পাইয়াছিল উহা তাঁহার রাজস্বের অনেকটা খাইয়া ফেলিত।

এই সময়ে গোলাম রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল, ধনীর প্রচুর গোলাম থাকিত। আইন-আকবরীতে উক্ত প্রথা স্বীকৃত হইয়াছে। আফ্রিকা ও পশ্চিম এসিয়া হইতে অত্যধিক সংখ্যায় গোলাম আমদানী করা হইত, এবং ভারতের অভ্যন্তর হইতে গ্রামাদি লুণ্ঠন পূর্ব্বক গোলাম সংগ্রহ করা হইত। এতদ্দ্বারা এত অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইত যে আকবর তাঁহার সৈন্যদের উক্ত কর্ম্মে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন (১২)। এতদ্ব্যতীত দুর্ভিক্ষের সময় লোকে নিজেদের পুত্র বিক্রয় করিত। সাধারণতঃ ছেলেদের চুরি করিয়া বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া অথবা ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইত। এই সকল বিষয়ে বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বদনাম ছিল। বাঙ্গালা হইতে খোজা গোলাম (eunuchs) সংগ্রহ করা হইত (১৩)। ইহার কারণ—একে বাঙ্গালী রণভীরু জাতি, তারপর তাহাকে নপুংসক করিয়া দিলে স্বভাবতঃই সে আরও শান্ত প্রকৃতির লোক হইবে!

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এই তথ্য পাওয়া যায় যে ভারতীয় সমাজে দুইটি স্তর ছিল—ধনী ও গরীব। ইহার মধ্যে ধনী ও তাহাদের চাকরের দল এবং সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকের দল কোন উৎপাদনশীল শ্রম করিত না। তাহারা যে আয় বরবাদ করিত তাহা অবশেষে কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে পড়িত।

১১। Moreland—India at the death of Akbar, P 85.

১২। Akbarnama—translation ii, 246. ১৩। বাঙ্গলা যে খোজা সংগ্রহ করিবার একটি বড় কেন্দ্র ছিল তাহা Marco Polo (Yule, ii, 115), Barbosa (P 363), Pyrard (translation, i, 332) প্রভৃতি পর্য্যটকেরা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আইন আকবরী (Ain-i-Akbari) গ্রন্থে বাঙ্গলা প্রদেশ বিবৃতিকালে উল্লেখ আছে (translation, ii, 1227).

শ্রমিকের অবস্থা

আকবরের সময়ের শ্রমজীবী শ্রেণী সমূহের কি অবস্থা ছিল তাহার অনুসন্ধান কালে আমরা দেখিতে পাই যে এই সময়ে গ্রামে একটা বড় জমি-শূন্য শ্রমজীবী শ্রেণী ছিল। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারত এই প্রকারের লোক দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ইহারা এই সময়ে সার্ফ (serf) ছিল কিংবা সেই অবস্থা হইতে সদ্য-মুক্ত হইয়াছে। এই শ্রেণী আকবরের সময়ে বিদ্যমান ছিল অথবা তাহার পরে উদ্ভূত হইয়াছে (১৪)। সম্ভবত গ্রাম্য অর্দ্ধ-গোলামীত্ব একটি পুরাতন প্রথা যাহা আকবরের পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। এই যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই সামাজিক প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান ছিল। মোরল্যাণ্ডের এই মন্তব্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের Report on Slavery-র উপর স্থাপিত। ইহাতে অনুসন্ধানকারীরা (Commissioners) পুরা গোলামী (regular slavery) এবং কৃষি সম্বন্ধীয় গোলামী (agricultural bondage) সম্পর্কে পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে গ্রাম্য অর্দ্ধ-গোলামীত্ব (serfdom) কিম্বা তাহার চিহ্ন সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত। বাঙ্গালার কতগুলি জেলা হইতে এই সংবাদ আসে যে কৃষি-গোলামেরা জমির সহিত সাধারণতঃ বিক্রীত হইত! দেখিয়া বোধ হয় স্যার উইলিয়াম ম্যাকনটেন ইহা নিম্নোক্ত ব্যাপারকে স্থায়ী আইন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, পুরুষানুক্রমিক সার্ফেরা স্থাবর পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়ক আইনের অধীন। সার এডওয়ার্ড কোলব্রুক বলেন, তাঁহার সময়ে পুরুষানুক্রমিক সার্ফদের উপর বিহারের জমিদারের অধিকার প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছিল। এই বিষয়ের অনুসন্ধানকারীগণ "উত্তর পশ্চিমের কোন কোন অংশে (United Provinces) উক্ত প্রথা দেখিতে পান নাই, কিন্তু নবাবের শাসন কালে প্রত্যেক সম্পত্তিতে লগ্ন (স্থিত) লোকেরা অনেকটা অর্দ্ধ-গোলাম (adscripti glabæ) বলিয়া বিবেচিত হইত।" আজিমগড়ে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের এখনও (কমিশনের অনুসন্ধান কালে) জমিদারের "ব্যক্তিগত অনেক কার্য্য করিয়া দিতে হয়···আগেকার গভর্ণমেণ্ট সমূহের সময়ে···তাহারা অর্দ্ধ-গোলাম (predial) ছিল।" কুমাউনে স্বাধীন শ্রমিকের কার্য্য পাওয়া

১৪। Moreland—India at the death of Akbar, P 112—113.

অসম্ভব ছিল, কিন্তু "লাঙ্গলের গোলাম" এবং বাড়ীর গোলাম মধ্যে পৃথক করা হইত। আসামে গোলামকে দিয়া খাটান হইত; কৃষি কর্ম্মে স্বাধীন শ্রমিককে লাগান হইত না। মাদ্রাজে রাজস্ব বিভাগ (Board of Revenue) সংবাদ দেয় যে "সমস্ত তামিল দেশ, মালাবার (১৫) ও কানাড়াতে শ্রমজীবী শ্রেণীদের বেশীর ভাগ অতীত কাল হইতে দাসত্বে আবদ্ধ আছে। কুর্গে স্মরণাতীত কাল হইতে অর্দ্ধ-গোলামী প্রচলিত আছে, বোম্বাইয়ের বড় সংবাদ নাই, কিন্তু সুরাট ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে অর্দ্ধ-গোলামীত্বের অস্তিত্বের সংবাদ দেয় (১৬)। বাঙ্গালায়ও গোলামী প্রথা প্রচলিত ছিল, পূর্ব্ববঙ্গের "নফরজাতি" তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ (১৭)। এই সকল তথ্য দেখিয়া মোরল্যাণ্ড অনুমান করেন, ব্রিটিশ রাজত্ব প্রচলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং আকবরের সময়েতেও একটা গোলামশ্রেণী গ্রাম্যজীবনের প্রচলিত পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। এই পদ্ধতি মাল দিয়া (production) মাহিয়ানা দেওয়ার রীতি দ্বারা অধিকন্তু সমর্থিত হয়। এই রীতি বিগত শতাব্দীতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, এবং এখনও ইহা অন্তর্হিত হয় নাই।

মোরল্যাণ্ড অথবা Report on Slavery লেখক কমিশনারেরা "ব্যক্তিগত কার্য্য" বা মাহিয়ানার পরিবর্ত্তে ফসল নেওয়ার প্রথার পশ্চাতে যে মধ্যযুগীয় Manorial system আছে তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই। ভারতেও সামন্ততন্ত্রীয় জমিদার প্রথার সঙ্গে এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

কৃষকের সাধারণতঃ এই অবস্থা কখন কখন এখানে সেখানে উন্নতি লাভ করিত। Report on Slavery সাক্ষ্য দেয় যে স্থলবিশেষে সার্ফগণ নিজেদের এক টুকরা জমি রাখিতে পারিত, উক্ত জমি তাহারা অবসর মত চাষ করিত।

১৫। বার্বোসা এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর লেখকেরা মালাবারে চাষী ও শ্রমিকদের গোলাম (Serf) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬। Moreland—India at the death of Akbar, P 113—114.

১৭। বাঙলায় "সার্ফত্ব" এখনও একপ্রকার চলিত আছে। একজন কৃষক কোন লোকের নিকট হইতে টাকা ধার নিয়া তৎপরিবর্ত্তে যতদিন না উত্তমর্ণের এই ঋণ পরিশোধ হয় ততদিন বিনা বেতনে তাহার বাড়ীর চাকর হিসাবে থাকে। কিন্তু পুনঃ টাকার প্রয়োজন হইলে আবার এই প্রকারে খাটিয়া দেনা শোধ দেয়। এইপ্রকারে তাঁহাদের জীবন মুক্তির আস্বাদ পায় না।

শ্রেণীগত জীবনের অবস্থা

উপরোক্ত অর্থনীতিক ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সমাজে সম্ভ্রান্ত (nobles) ও দরবারী লোকেরা দুই হাতে খরচ করিত। সকলেই সম্রাট ও রাজাদের সর্ব্ব বিষয়ে অনুকরণ করিত; দরবারী কর্ম্মচারীরা তাহাদের আয় খরচা করিয়া উড়াইত। এইজন্যই "নবাবী করা" প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন ব্যবসায়ে টাকা খাটান বড় কম হইত, কারণ বাণিজ্যে মূলধন খাটান বিপজ্জনক ছিল। এইজন্য যে টাকা ব্যয়িত হইত না তাহা নগদ অথবা গহনা তৈয়ার করিয়া লুক্কায়িত রাখিয়া সঞ্চয় করা হইত। সঞ্চিত ধন রাজা কাড়িয়া লইত বলিয়া তখন লোকে তাহা গুপ্তভাবে রাখিত।

এই সময়ের ধনীরা খুব জাঁকজমকের সহিত বাস করিত,—অনেক চাকর, লস্কর রাখিত। এই প্রথা ভারতের সর্ব্বত্র এবং সকল ধর্ম্মের লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই জাঁকজমকের ফলে ওমরাহগণ ধনহীন হইয়া পড়িত। তাঁহারা নির্ধন হইয়া পড়িলে কৃষকদের শোষণ করিত। সাজাহানের রাজত্বের শেষভাগে ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ে ভারত ভ্রমণকালে গণ সমূহের দুর্গতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ধনীরা যখন ধন উড়াইত তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা ছিল কিরূপ? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা বড় কম ছিল এবং তাহাদের বিষয়ে সংবাদও কম পাওয়া যায়। বোধ হয় তখনকার কেরাণী প্রভৃতির জীবন-যাত্রা প্রণালী আজকালকার কেরাণী জীবন হইতে পৃথক নয়। এই সময়কার লিখিত বিবরণ যাহা সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর লোকদের দ্বারা লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে তাহাদের জীবন আদৌ স্বচ্ছন্দ ছিল না।

এই সময়ের সওদাগরদের অবস্থার বিষয় খুব কমই জ্ঞাত হওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অনেক ধনী ছিল, গড়পড়তা আয় (average income) বোধ হয় তেমন একটা খুব বেশী কিছু ছিল না (১৮)। ধনী সওদাগরদের ধনের

১৮। ডেলা ভাল নামক একজন পর্য্যটক সওদাগরদের আর্থিক অবস্থার অনিশ্চয়তার প্রমাণও দিয়াছেন (**Della Valle—P 134**).

বাহার দেওয়া বিপজ্জনকই ছিল; তাহা হইলে রাজা তাহাদের স্পঞ্জের মতন শুষিয়া নিবে। এইজন্যই বার্ণিয়ে বলেন, ধনীরা গরীব সাজিয়া থাকিত। বোধ হয়, এই অভ্যাসই আজকালকার অনেক সওদাগরের গরীবানা চাল-চলন রাখার কারণ। কেবল পশ্চিম কূলের মুসলমান ব্যবসাদারেরা ভাল খাইত ও পড়িত। ইহার হেতু,—এই সকল মুসলমান সওদাগরেরা নানা অধিকার ভোগ করিত, তাহাদের উপর কোন প্রকার উৎপাত হইত না।

নিম্নশ্রেণীর অবস্থা

বিভিন্ন পর্য্যটক ও ভারতীয় লেখকদের বর্ণনা হইতে আমরা নিম্নশ্রেণীর অবস্থা বুঝিতে পারি। এই সকল লেখকেরা বলেন, বাঙ্গলা প্রদেশ ব্যতীত বাকি দেশটা মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে, তজ্জন্য অধিক মৃত্যু সংখ্যা, সন্ততিগণকে বিক্রয় করিয়া ফেলা এবং নর-মাংস ভক্ষণ (১৯) সংঘটিত হয় (২০)। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে এই সব দুর্ভাগ্য আপনিই জুটিত,—অবশ্য দুর্ভিক্ষ সচরাচর হইত না। এতদ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে গণ-সমূহের সঞ্চিত আর্থিক কিছু থাকিত না বলিয়াই দুর্ভিক্ষের সময় তাহারা নানা বিপদে পড়িত (২১)। ষোড়শ শতাব্দীর প্রাকালে বার্ব্বোসা করমণ্ডল তীরভুক্তির (ত্রিহুত) বিষয় বলিয়াছেন, এই দেশে সর্ব্ব বিষয়ে প্রাচুর্য্য থাকিলেও বৃষ্টিপাত না হইলে, দুর্ভিক্ষে বেশী লোকের মৃত্যু হইত এবং এক টাকার চাইতেও কম মূল্যে সন্ততিগণ বিক্রীত হইত। ইহার পঁচিশ বৎসর পর, কোরিয়া এইস্থানেই জন-শূন্যতা ও নরমাংস ভোজনের সংবাদ দেন; ইহার দশ বৎসর পর বাদাওনী আগ্রা ও দিল্লীর নিকটবর্ত্তীস্থলে এই প্রকার অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

১৯। Letourneau বলেন, লোকে অভাবের তাড়নাতেই নরমাংস ভক্ষণে বাধ্য হয়। এই বিষয়ে তিনি নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই তথ্যে উপনীত হইয়াছেন (তাঁহার Anthropophagie পুস্তক দ্রষ্টব্য)। Black Deathএর সময় ইউরোপে নরমাংস খাদ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে (Sorokin—The Sociology of Revolution, P 152 দ্রষ্টব্য)। Crusaderরা যুদ্ধে তুর্ক শত্রুর মাংস খাইত (The National History of France, P 116.)

২০। Moreland—India at the death of Akbar, P 266.

২১। Moreland—India at the death of Akbar, P 266.

এই শতাব্দীতে উত্তর ভারতেরও এই দুর্দ্দশা হয় (২২)। ইহাতে এই মনে হয় যে লোকে নিজেদের আহার্য্য সংগ্রহের জন্য ঋতুর উপর নির্ভর করিত, এবং বৃষ্টিপাত না হইলে তাহাদের আর্থিক দুর্দ্দশা হইত।

পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে নিকিটিন নামে একজন রুশ পর্য্যটক বলিয়াছেন, দেশটি জনাকীর্ণ; যাহারা গ্রামে থাকে তাহারা অতি দুঃখে জীবন যাপন করে; কিন্তু অভিজাতেরা অত্যন্ত ধনী এবং বিলাসিতায় আনন্দ লাভ করে (২৩)। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বার্ব্বোসা মালাবার কূলের (২৪) লোকদের দারিদ্র্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং ঐ স্থানের কতকগুলি নিম্নশ্রেণীয় লোক অত্যন্ত গরীব ছিল। ইহাদের কতক লোক বিক্রয়ার্থে কাঠ ও ঘাস সহরে আনয়ন করিত, অন্যলোকে বন্য ফলমূল ও পশুর মাংস খাইয়া লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের পাতা জড়াইয়া জীবন ধারণ করিত। বার্থেমাও এই প্রকারের ধারণা আমাদের প্রদান করিয়াছেন। বিজয়নগরের সাধারণ লোকের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে, কেবল শরীরের মধ্যস্থলে এক টুকরা কাপড় জড়াইয়া রাখে।"

দক্ষিণ ভারতের নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের দুঃখ দুর্দ্দশার বিষয় যাহা বিদেশী পর্য্যটকেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও পর্য্যন্ত সত্য। এই শ্রেণীগুলি সভ্যতার যে-স্তরে অবস্থিত আছে তাহা নগ্ন দারিদ্র্যের জন্য কতকটা দায়ী। অবশ্য সভ্যতা অর্থনীতিক অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। ইহাদের অর্থনীতিক পরিস্থিতি পুরোহিতদের আশীর্ব্বাদে চিরস্থায়ী হইয়াছে। একটা লোকসমষ্টির আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে তাহার সভ্যতার উন্নতি হয় না, কিন্তু ভারতের গণশ্রেণীরা সভ্যতার উন্নতির পথেই অভিশপ্ত হইয়া "পতিত" হইয়া আছে। এইজন্যই ভারতের পতিতদের নগ্ন দারিদ্র্য চিরকাল বিদেশীয়-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

২২। Moreland—India at the death of Akbar, P 266

২৩। Translation of Nikitin in Major's "India in the Fifteenth Century, P 14.

২৪। সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্ব উপকূলের কৃষক ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের নগ্ন-দারিদ্র্য লেখক যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহা তিনি জীবনে আর কোথাও দেখেন নাই।

বার্থেমাও বার্বোসার পঁচিশ বৎসর পর পেয়স ও নুনিজ নামক পর্টুগিজ পর্য্যটকেরা বিজয়নগর ভ্রমণ করিয়া যে-অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা সেওয়েলের ভাষায় "হিন্দু গভর্ণমেণ্টের অধীন সম্ভ্রান্ত লোকদের দ্বারা দক্ষিণ ভারতের রায়তেরা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হইত।...দুইজন পর্য্যটক পরস্পর স্বাধীনভাবে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই বোঝা যায় যে গণসমূহ নিষ্পেষিত হইত এবং অত্যন্ত দুঃখ ও দারিদ্র্যে জীবন যাপন করিত" (২৫)। এই বিষয়ে বিভিন্ন পর্য্যটকদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে আর উদ্ধৃত না করিয়া স্যার টমাস রো-এর কথা পর্য্যাপ্ত ঃ "ভারতের লোকেরা মাছ যেমন সমুদ্রে বাস করে সেই প্রকারে বাস করে—বড়গুলি ছোটদের খাইয়া ফেলে। প্রথমে জোতদার (farmer) কৃষককে লুণ্ঠন করে, ভদ্রলোক (তালুকদার বা জমিদার) জোতদারকে লুণ্ঠন করে, বড় ছোটকে লুটিয়া লয়, রাজা সকলকে লুণ্ঠন করে"।

বাঙ্গলায় ইংরেজদের বাণিজ্য বিষয়ে কি সুবিধা আছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সার মর্ম্ম এইরূপ ঃ বাজার কেবল "ভদ্রলোকদের মধ্যে গণ্ডীভূত ; ইহারা আবার সংখ্যায় অতি অল্প—অধিকাংশ অধিবাসীরা অত্যন্ত গরীব (২৬)। এই প্রদেশের অধিবাসীদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আবুল ফজল বলেন, "এক রকম চটের কাপড় (sack cloth) রঙ্গপুরে উৎপন্ন হইত। এতদ্বারা অনুমান হয় যে পাট হইতে এক প্রকারের কাপড় প্রস্তুত হইত ; কারণ পাটের কাপড় উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত গরীবদের নগ্নতা নিবারণ করিত। বাঙ্গালার সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ফিচ্ বলেন, গৌড়ের পুরাতন রাজধানীর নিকট তাণ্ডাতে "লোকে কোমরে একটু কাপড় জড়াইয়া নগ্ন হইয়া থাকে" ; চট্টগ্রামের নিকট বাকোলার লোকদেরও সেই অবস্থা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। আর রাজধানী 'সোণারগাঁ'-এর লোকদের বিষয় তিনি বলিয়াছেন, "সম্মুখে (শরীরের গুপ্তাংশ) অল্প কাপড় পরে, বাকী শরীর উলঙ্গ থাকে (২৭)। এই বর্ণনা গুলি আইন আকবরীর সহিত মিলে।

২৫। Sewell—"Vijaynagar, a forgotten Empire."

২৬। Moreland—India at the death of Akbar, P 269.

২৭। Moreland—India at the death of Akbar, P 276.

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে সুসা নামে পর্টুগিজ ঐতিহাসিক বাঙ্গলার জনসংখ্যা বেশী ছিল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন (২৮)। সর্ব্বশেষ বাবরের নিজ কথা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাউক : চাষী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উলঙ্গ থাকে। লজ্জা নিবারণের জন্য নাভি কুণ্ডলের নিম্নে তাহারা "লাঙ্গোটা" নামে একটা আচ্ছাদন বাঁধে। স্ত্রীলোকেরা একটি কাপড়ের (লুঙ্গী) অর্দ্ধেক কোমড়ে জড়ায় আর বাকি অর্দ্ধেক মাথায় দেয়"। এই বর্ণনাই পর্য্যাপ্ত, ইহা কম-বেশী পরিমাণে আজও সত্য। অবশ্য বর্ত্তমান ভারতের স্থান বিশেষে সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে পরিচ্ছদ, আসবাবাদি সাধারণ লোকে বেশী ব্যবহার করিতেছে।

বাঙ্গালার মধ্যযুগের অবস্থার বিষয়ে ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—"এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া পড়িয়া বেশ সুখী ছিল (২৯)। গৃহজাত দ্রব্যেই দৈনন্দিন অভাবগুলি একরূপ সুন্দরভাবে মোচন হইত, বাজারের ব্যয় কিছুই ছিল না বলিলেই চলে"। মধ্য-যুগের মৎস্য-ন্যায়ের অবস্থার মধ্যে তিনি যে সত্যযুগের কল্পনা করিয়াছেন ইতিহাস তাহার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ প্রদান করে না। যদি অভাবের জন্য সর্ব্ব বিষয়ে ভোগ-বিরহিত হইলেই "স্বর্ণ যুগের" সুখ ভোগের কল্পনা করা যায়, যদি "সত্যযুগ" অর্থে সভ্যতা-বিরহিত বর্ব্বরাবস্থা যখন লোকে Domestic economy রূপ (যাহা প্রয়োজন তাহা স্বহস্তে সৃষ্ট করা, এই অর্থনীতিক অবস্থা) অতি প্রাচীন কৌমগত অবস্থার স্তরে থাকে তাহাই হয়, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বাঙ্গালা তখন সভ্যতার সেই স্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে ; তখন একদিকে ধনের প্রাচুর্য্য অন্যদিকে নিত্য-বুভুক্ষা—এই বাঙ্গালী সমাজের অর্থনীতিক অবস্থা !

কবি কঙ্কণের চণ্ডিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় দেশের রাজনীতিক অবস্থার জন্য লোকে সদা সশঙ্কিত থাকিত। মুসলমান শাসকেরা "জিম্মিদের" (বিধর্ম্মী প্রজা) সকল সময়ে ভাল করিত না, ইসলামীয় বিধান অনুসারে জিম্মিদের নানা দুরবস্থা করিত

২৮। Steven's translation of "The Portuguese Asia," i, 415.

২৯। দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩৫১ পৃঃ।

(৩০)। বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে, "কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে···বাছিয়া ব্রাহ্মণ পায় পৈতা যার কাঁধে। পেয়াদাগণ নাগ-পাইলে হাতে গলায় বাঁধে"॥ মুকুন্দরাম যখন তাঁহার কাব্যে নায়ক ধনপতি সওদাগরকে সিংহল যাত্রা করাইলেন তখন সওদাগরের ডিঙ্গি এমন স্থানে আসিল যে "রাত্রি বহে যায় হারমাদের (পর্টুগিজ বোম্বেটে) ডরে"। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেতকদাস-ক্ষেমানন্দের "মনসা মঙ্গল" বিরচিত হয়। ইহাতে কবি নিজের পরিচয় প্রদানকালে বর্ণনা করিয়াছেন যে বলভদ্রের তালুকে তিনি বাস করিতেন। জমিদারের মৃত্যুর পর তালুকে গোলমাল হয়, "তাহার তালুকে বৈসে, প্রজা নাহি চাষ চসে শমন নগর কাঁথড়া ॥···দিন কত ছাড়িয়া যাই, তবে সে নিস্তার পাই, সকলের তবে ভাল যায়। শ্রীযুক্ত আস্কর্ণ-রাত্র, অনুমতি দিল তাত্র, যুক্তি দিল পালাবার তরে"॥

এই অত্যাচার যে কেবল মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর উপর অনুষ্ঠিত হইত তাহা নহে, হিন্দুও হিন্দুর উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিত! রামদাস আদকের "অনাদি-মঙ্গল" রচনার মূলে একটি গল্প আছে—হায়ৎপুরে চৈতন্য সামন্ত নামক এক দুর্দ্দান্ত তহশীলদারের অত্যাচারে অল্পবয়স্ক কবি কারারুদ্ধ হন···কবি পলাইয়া মাতুলালয়ে যাইতেছিলেন এমন সময় বাঘনান গ্রামের পথে এক সশস্ত্র সিপাহী তাঁহাকে বেগার ধরিবার জন্য আটকাইল; এবং সিপাহী বলিল, "আমার সম্মুখে যদি ফেল এই মোট। দ্বিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট"। তারপর কবি ধর্ম্ম ঠাকুরের কৃপার পাত্র হয়। পুনঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্দ্রাবতী নাম্নী ময়মনসিংহের এক মহিলা এক রামায়ণ রচনা করেন। স্বীয় পরিচয় প্রদান কালে তাহাতে তিনি বলিতেছেন, "ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছা (উনি)। আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি॥ বাড়াতে দারিদ্র্য-জ্বালা কষ্টের কাহিনী। তার ঘরে জন্ম লৈলা চন্দ্রা অভাগিনী॥"

এই যুগে সাধারণতঃ পুরুষদের জুতা পায়ে দিবার প্রথা ছিল না, নিম্ন-শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা "ক্ষুঞা" নামে এক প্রকার পট্টবস্ত্র পরিধান করিত (৩১)।

৩০। "গৌড়ের ইতিহাস"—১ম খণ্ড-এ "রাজ কর্ম্মচারীগণের অত্যাচার" ও সেই স্থানে উদ্ধৃত ভবানী দাশের কবিতা দ্রষ্টব্য; ২৪৯—২৫১ পৃঃ।

৩১। বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য—৫০ পৃঃ।

ইতিপূর্ব্বেই ইহা আমরা বিদেশী পর্য্যটকদের প্রদত্ত বিবরণাদি হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

বিদেশীয় ও দেশীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি শ্রবণান্তর আমরা ইহা উপলব্ধি করি যে মধ্যযুগে বাঙ্গালার গরীবদের ও জনসাধারণের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না; তাহারা যে খাইয়া পড়িয়া বেশ সুখে ছিল" তাহা নিছক হাল ফ্যাসানের বুর্জ্জোয়া সাহিত্যিকদের কল্পনা মাত্র। গৌড়ের সুলতান ও তাঁহার বারভূইয়াঁরা ও জমিদারেরা, দিল্লীর বাদসাহ ও তাঁহার প্রাদেশিক সুবেদার ও ওমরাহের দল বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ ও তাঁহার সামন্ত রাজারা ও পলিগারের (ভূস্বামী) দল হাঁসিয়া খেলিয়া খাইয়া বেশ সুখে ছিল, একথা স্বীকার করা যায়! কিন্তু মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বিশেষতঃ ভারতের অবস্থার যে-বর্ণনা আমরা বিদেশী ও দেশীয় লেখকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ভারতের গরীব সাধারণ অতি দুঃখ দারিদ্র্যে ও অত্যাচার উৎপীড়নের ভিতর জীবন যাপন করিত, এবং দারিদ্র্যের জন্য অনেকে অর্দ্ধ-দাসত্ব ও পূর্ণ গোলামীত্বে পতিত হইত। আর সেই সময়ে গোলাম ও খোঁজা সংগ্রহ করিবার একটি বড় কেন্দ্র ছিল বাঙ্গলা (৩২)।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

৩২। মধ্যযুগের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ("মধ্যযুগে বাঙ্গলা"—৩৫৪—৩৫৫ পৃঃ) বলেন, "এক শ্রেণীর সমালোচক সেকালের অবস্থা বড়ই সুখের ছিল কল্পনা করিয়া লইয়া ইহার পরিপোষক প্রমাণ-স্বরূপ বলিবেন;...... মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের কষ্ট ছিল না। কায়স্থের কথায় পাটোয়ারী হইতে উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলের আনুমাণিক আয় ব্যয়ের একটা হিসাব দেখাইয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সমর্থন চলিবে। কিন্তু সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের বিষয়ে এই সমালোচক কোন বাঙ্-নিস্পত্তি করিবেন না! ভদ্রলোক সুখে থাকিলেই দেশের অবস্থা ভাল হইত!...কিন্তু কৃষিজীবী লোকের বেলায় আর সে কথা বলা চলিবে না। কবি কঙ্কণের আত্মকথায় দেখা গিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মণেরও সর্ব্বথা সুখ ছিল না। কাব্য-কথিত ভাঁড়দত্তের শ্রেণীর কৃপা ভিক্ষার্থী কায়স্থও অনেক ছিল; ঔষধের থলি বগলে বৈদ্যরাজ সম্বন্ধেও ঐ কথা। উচ্চ জাতির স্বাচ্ছল্য ছিল স্বীকার করিলেও কৃষক এবং শ্রমজীবির যে সুখ ছিল, ইহা কেহই প্রমাণ করিতে পারিবে না। যে কালে টাকায় পাঁচ মণ ধান্য বিক্রীত হইত, সেই সময়ে সাধারণ শ্রমজীবীর মজুরী চার পয়সারও কম ছিল; তখন তাহারা বস্ত্র ও গৃহের উপকরণ যে ভাল করিতে পারিত তাহা বলা চলে না। বাস্তবিক বিদেশীরা আসিয়া এই শ্রেণীর লোকের কষ্টই দেখিয়াছেন"!

বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী

(৫)

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান অবদান—বিবর্তনবাদ। ঐ বাদের আবিষ্কার ও প্রসারের ফলে চিন্তারাজ্যে যুগান্তর প্রবর্তিত হইয়াছে। বিবর্তন অর্থে ক্রম-বিকাশ; অবিশেষ হইতে বিশেষের, অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃতের, এবং ব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃততরের অভিব্যক্তি—"From the homogeneous to the heterogeneous"—যাহাকে এদেশের ভাষায় বলে—অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ।

আমরা দেখিয়াছি—অণোরণীয়ান্ ইথার-বিন্দু ইলেক্‌ট্রন্ হইতে কিরূপে বিচিত্র ও বিবিধ সংযোগ-সংহনন দ্বারা এই মহতো মহীয়ান্ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে। বিবর্তন-স্রোতঃ প্রথমতঃ স্থাবর রাজ্যে বহুবিধ স্তর উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে কৃষ্টাল বা স্ফাটিকে উপনীত হয়। ঐ স্থাবরের বিবিধ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—স্থাবরং বিংশতের্লক্ষম্।

ক্রমশঃ ঐ বিবর্তন-স্রোতঃ ধীর ও মন্থরগতিতে স্থাবর রাজ্য অতিক্রম করিয়া একদিন জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয়। আমরা জানি জঙ্গম দ্বিবিধ—animal ও vegetable—পাদপ ও পশু। বিবর্তন-স্রোতঃ জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হইলে এক অতর্কিত অভূতপূর্ব ব্যাপার দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় বলি—'as a new and astonishing departure comes the Cell। আমরা জানি পাদপ বা পশু—যে যতই নিম্ন স্তরে অবস্থিত হউক না কেন—জঙ্গম মাত্রেরই বিশ্লেষণ করিলে চরমে ঐ Cell বা কোষাণুই পাওয়া যায়। কোথা হইতে এই Cell বা কোষাণু আইসে? যেখান হইতেই আসুক—উহার মধ্যে আমরা এক বিস্ময়কর অভিনব শক্তির খেলা দেখিতে পাই। সেই শক্তি জীবনীশক্তি (Life)। জীবনী কি? স্যার অলিভার লজ্ বলেন—It is the vivifying principle which animates matter—যে শক্তি জড়কে অনুপ্রাণিত করে, জীবনী সেই শক্তি। লজ্ আরও বলেন—Life must be considered sui

generis ; it is not a form of energy, nor can it be expressed in terms of something else। অর্থাৎ, প্রাণ বস্তুটি এক অদ্ভুত, আজব পদার্থ। উহা কোন জড় শক্তির রূপান্তর নহে, কিম্বা কোন কিছুর সজাতীয় নহে—অর্থাৎ সম্পূর্ণ আজব।

স্থাবরের মধ্যে উত্তাপ, আলোক প্রভৃতি যে সকল জড় শক্তির ব্যাপার লক্ষিত হইয়াছিল, এ জীবনীশক্তি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত শারীর-বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হ্যারিস্ (Fraser Harris) বহু আলোচনা ও গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—Between the living and the non-living, there is a great gulf fixed and no efforts of ours, however heroic, have as yet bridged it over. অর্থাৎ,

প্রাণী আর অপ্রাণীতে বহুত অন্তর।
হুঁহু মাঝে সেতু গড়া ব্যর্থ নিরন্তর॥

অতএব বিজ্ঞানের মতে স্থাবর প্রাণহীন, কিন্তু জঙ্গম প্রাণভৃৎ ; স্থাবর অপ্রাণী, জঙ্গম প্রাণী ; স্থাবর নিরঙ্গ (inorganic) জঙ্গম সাঙ্গ (organic)। প্রাচীনেরা এদেশে ঐ জঙ্গমকে চতুর্ধা বিভক্ত করিতেন—স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ মিলিয়া পাদপ (vegetable kingdom) এবং অণ্ডজ ও জরায়ুজ মিলিয়া পশু (animal kingdom)। ঐ পাদপের প্রায় অগণ্য প্রভেদ—শৈবাল (algœ), তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, তরু, মহীরুহ, পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি। বিবর্তন-স্রোতঃ ঐশী প্রেরণার ফলে ঐ উদ্ভিদ্ রাজ্য অতিক্রম করিয়া ক্রমে জীব রাজ্যে (animal kingdom-এ) উপনীত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে জীব রাজ্যেরও অসংখ্য স্তর এবং ঐ রাজ্যে বিকাশের ক্রম এইরূপ :—প্রথম সরীসৃপ, তারপর পক্ষী, জন্তু, বানর, মনুষ্য ইত্যাদি। অর্থাৎ, জঙ্গমরাজ্যে উপনীত জীবন প্রথমে সরীসৃপের দেহ গ্রহণ করে ; ক্রমশঃ বিবর্তনের ফলে সে সরীসৃপ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে জন্তুদেহে প্রবেশ করে ; এবং পশু রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়া অবশেষে মনুষ্য দেহ ধারণের উপযোগী হয়। এবিষয়ে জীব-বিজ্ঞানে (Zoology-তে) প্রচুর আলোচনা আছে—অভিজ্ঞ পাঠক তাহার সহিত নিশ্চয়ই পরিচিত আছেন। তাঁহার লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এদেশের

প্রাচীন শিক্ষার মতে জীবকে জলজ ও স্থলজ লক্ষ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্য-যোনিতে উপনীত হইতে হয়। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ এ বিষয়ের এইরূপ বিস্তার করিয়াছেন—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ॥

অর্থাৎ, স্থাবর ২০ লক্ষ, জলজ ৯ লক্ষ, কূর্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, জন্তু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ—ইহার পর তবে জীব মনুষ্য-যোনিতে প্রবেশ করে এবং অসভ্য হইতে অর্ধ সভ্য ও ক্রমশঃ সভ্য হইয়া অবশেষে সুসভ্য হয়। এই সুসভ্যকেই এদেশে দ্বিজ বলা হয়।

এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বম্ উপজায়তে।

সে যাহা হউক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য প্রজ্ঞান এ সম্পর্কে একমত যে, বিবর্তন-স্রোতঃ স্থাবর রাজ্য অতিক্রম করিয়া পাদপ রাজ্যে উত্থিত হয় এবং ক্রমশঃ পাদপ রাজ্য ছাড়াইয়া পশু রাজ্যে উপনীত হয়। পশুর সর্বোত্তম মানুষ—সেক্স্‌পীয়র যাহাকে হ্যাম্‌লেটের মুখে—'the paragon of animals' বলিয়াছেন।

বিস্ময়ের বিষয় যে, বিবর্তনের ঐ মুখ্য কথা ৮০০ বৎসর পূর্বে একজন সুফি সাধক জালালুদ্দিন রুমির ধী-র মধ্যে মুখরিত হইয়াছিল। তাঁহার নিশ্চয়-বাণী শ্রবণ করুন:—

I died from the mineral and became a plant. I died from the plant and reappeared in an animal. I died from the animal and became a man. Wherefore then should I fear? When did I grow less by dying?—Mansavi

এই বিবর্তন স্রোতের ঊর্ধ্বগতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস কয়েকটি সুচিন্তিত কথা বলিয়াছেন:—

—All life whatsoever, whether in mineral, plant, animal and man, is fundamentally the *One Life*. This *Life* reveals its

attributes more fully or less fully, according to the amount of limitation which it has surmounted in evolution. * * In the evolution of its attributes, the life undergoes these limitations in succession. After enduring the limitation of mineral matter and there having learnt to express itself, it next passes on to become the life of the vegetable kingdom. Retaining all the capacities which the Life learnt through mineral matter, it now adds new capacities as the plant, and discovers new ways of self-revelation. When sufficient evolutionary work has been done in the vegetable kingdom, this Life, with all the experiences gained as the mineral and as the plant, builds organisms in the animal kingdom, in order to reveal more of its hidden attributes, through the more complex and more pliant forms of animal life. When its evolutionary work is over in the animal kingdom, its next stage of self-revelation is in the human kingdom.

—First Principles of Theosophy, pp 166-7.

বিবর্তনের প্রসঙ্গ বর্তমানে আমার আলোচ্য নহে। এ সম্পর্কে আমার 'কর্মবাদ ও জন্মান্তরে' অনেক আলোচনা আছে। বর্তমানে লক্ষ্য করিতে চাই যে, মহামতি প্লেটো যে বিশ্বনাথের সার্বভৌম জ্যামিতিকীর কথা বলিয়াছেন, ঐ পাদপ রাজ্যে ও পশু রাজ্যে তাহার কি পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা জানি পাদপ বা plant কোষাণুর সমষ্টি—aggregations of cells—"every one of which has its little particle of protoplasm enclosed by a casing of the substance called celulose." (Dr. Carpentar). Universal English Dictionary-তে cell বা কোষাণুর এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে—

The smallest vital element of an organism, unit of living tissue, consisting of a mass of protoplasm, surrounded by a membrane and containing a nucleus.

তবেই দেখিলাম কোষাণুর কেন্দ্রস্থলে খানিকটা জীব-পঙ্ক বা protoplasm এবং তাহার চতুর্দিকে একটা কোষ বা cell-wall। ঐ সকল কোষাণুর আকার কিরূপ?

Plant-cells may be round, oval, rectangular, polygonal (many angled), prismatic and stellar (star-shaped)—এক কথায় geometrical বা জ্যামিতিক। Harmsworth-এর 'Popular Science'-গ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নে কয়েকটি cell বা কোষাণুর চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলাম—পাঠক তন্মধ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর পরিচয় পাইবেন।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন সকল cell-গুলিই বর্তুলাকার (Spherical) অর্থাৎ *Geometrical.*

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র জীবদেহে সজ্জিত cell-সমষ্টির একটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে—নিম্নে আমরা তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিলাম। পাঠক লক্ষ্য করিবেন কি অদ্ভুত জ্যামিতিকী!

এ প্রসঙ্গে পাঠক 'Scientific Recreations' গ্রন্থ হইতে গৃহীত নিম্ন চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দেখিবেন এখানে কোষাণুর আকার Hexagonal (six-angled)।
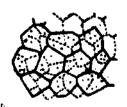
এ সম্পর্কে গ্রন্থকার লিখিতেছেন—

"The cells in consequence of mutual pressure, more frequently assume the form of a polygon, the section of which is generaly hexagonal. * * If we place balls of moist clay together and then press them more or less strongly, every individual ball will assume a polygonal shape corresponding to the form of the cells represented above. Such disposition is, in many plants, preserved with the utmost regularity," Why? Because God geometrises.

শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস (in order to show 'how its protoplasmic filaments traverse the cell-walls') একটি Scolopendrium officinarium-এর কোষাণুগুচ্ছের চিত্র দিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।
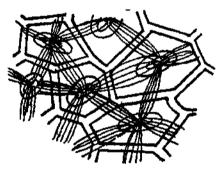
এ সম্বন্ধে তাঁহার টীকা এই—The life force in the vegetable kingdom *insists* on building geometrically.

আমরা পাদপকে cell-সমষ্টি বলিলাম। এ লক্ষণে কিন্তু অতিব্যাপ্তি ঘটিল—কারণ, এমন অনেক পাদপ আছে যাহারা এককৌষিক বা unicellular—যেমন—Diatom। Diatom কি? অতি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক বা তাড়াগিক এককৌষিক পাদপ—a microscopic marine or freshwater vegetable organism, consisting of one cell.

অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই সকল এককৌষিক পাদপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদিগের সৌষ্ঠব ও মূর্তির বিচিত্রতায় ও জ্যামিতিকতায় বিস্মিত হইতে হয়।

Unicellular acquatic plants such as diatoms exhibit various forms and wonderful sculpturings on their walls.

যাহাকে বীজাণু বা Bacteria বলে (যাহা চর্মচক্ষুর অগোচর এককৌষিক পাদপ), তাহাদের মধ্যেও ঐ জ্যামিতিকী ও বর্ণ বৈচিত্র্য—

Bacteria (which are unicellular plant-organisms which are invisible plants) present a great diversity of forms as revealed by the most perfect microscope, and methods of staining.

যাহাকে Fungus বলে তাহাদের spore-এর মধ্যেও ঐ সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—spores of fungus exhibit beautiful sculpturing and ornamentation। এমন কি পুষ্প-পরাগ (pollen-grains of flowers)—যাহা প্রায়শঃই এককৌষিক—তাহার মধ্যেও জ্যামিতিকী। এ সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ লিখিয়াছেন—

Pollen-grains of flowers present a great diversity of forms; they may be elipsoidal, spherical, angular, crystalline, three-sided prisms or four or five-sided (as in পুঁই শাক) or cubical (i.e. dianthus); and a very conspicuous feature of many pollen-grains is the infinitely varied sculpturing etc. of their walls. (See illustrations in Kerner and Oliver's Natural History of Plants)

আমরা এতক্ষণ এক-কৌষিক পাদপের কথা বলিলাম কিন্তু অনেক পাদপই বহু-কৌষিক। তাহাদের মধ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায় কিনা? লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বৃক্ষের কাণ্ডে, শাখায়, পত্রে, পুষ্পে, ফলে এবং অবয়ব-সংস্থানে সর্বত্রই জ্যামিতিকী। এ বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস বলিয়াছেন—

Each plant is built rhythmically, the place of leaf on twig, and branch on stem, being fixed by laws of *geometry* and design.

—First Principles of Theosophy, p. 359.

উদ্ভিদ্‌-বৈজ্ঞানিক বলেন যে, Internal structure of plants as revealed by the microscope shews a purposive and intelligent design এবং ঐ design *geometrical.*

কিন্তু পাদপের অন্তরঙ্গ কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বহিরঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, যদি বট, অশ্বত্থ, oak, নারিকেল, সুপারী, তাল, pine প্রভৃতির প্রতি

একটু নিবিষ্ট নয়নে চাহিয়া দেখি, তবে তাহার মধ্যে জ্যামিতিকীর কি অদ্ভুত নিদর্শন পাই। নিম্নে আমরা একটি pine গাছের চিত্র ও সপত্র oak ও elm বৃক্ষের শাখার ছবি অঙ্কিত করিয়া দিলাম। পাঠক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।

Pine　　　　　　Oak

Elm
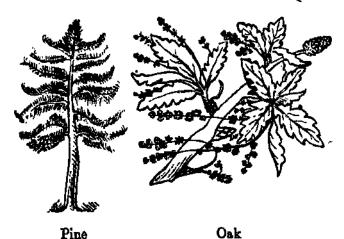
বড় মহীরুহের কথা ছাড়িয়া দিই। দেখা যায় চৈত্রমাসে একটু খালি জমি পাইলেই কাঁটানটে গাছ গজাইয়া উঠে। কাঁটানটে একটা আগাছা—অযত্নে আপনি জন্মায়। কিন্তু তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিবেন কি অদ্ভুত জ্যামিতিকীর নিদর্শন!

কাণ্ডের মধ্যে ঐ জ্যামিতিকীর সন্ধান পাইয়া বৈজ্ঞানিক লিখিতেছেন—

The outlines of stems in cross sections may be round, angular, triangular with plane, convex or concave sides, square etc.

অতঃপর পাদপের পত্রের প্রতি দৃষ্টি করি। সেখানে ঐ জ্যামিতিকী আরও বিস্পষ্ট। The leaves of plants are set in a definite order of succession—half, one-third, two-fifth, three-eighth, five-thirteenth and so on. *

পাদপের পত্রে জ্যামিতিকীর নিদর্শন প্রদর্শন জন্য আমরা বিভিন্ন জাতীয় তিনটি পত্রের চিত্র মুদ্রিত করিলাম—পাঠক ঐ সকল পত্রের শিরা-প্রতানের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিবেন—"the distribution of veins in leaves may be parallel, divergent, convergent or reticulate (net-like)."
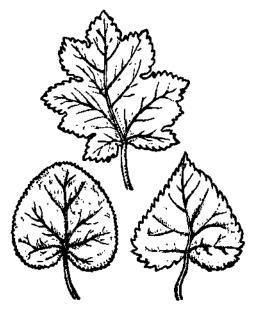
পাদপে পত্রের সংস্থান সম্বন্ধে Botany-গ্রন্থে অনেক আলোচনা আছে। এ সম্পর্কে একজন গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"The arrangement of leaves on the stem is exceedingly interesting, not only in reference to their own relative positions, but as determining generally the ramification of the stem."

---

* এ সম্পর্কে একখানি Botany-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—
The divergences common in plants may be expressed in two series :—
(a) 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13 etc, and (b) 1/4, 1/5, 2/9, 3/14, 5/23, etc. etc.

আমার এক Botanic বন্ধু (শ্রীযুক্ত অমূতোষ দাসগুপ্ত, এম, এ) আমাকে এ সম্বন্ধে একটি নোট সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে পাদপে পত্রসজ্জা নানাভাবে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সমস্ত সজ্জাই কয়েকটি নিয়মের অনুসারী (are in accordance with certain general laws)।

The leaves may be alternate, when there is only one at a node, or opposite, when there are two at the same level facing each other, or whorled when there are 3 or 4 leaves at the same level (যেমন রক্তকরবী, সপ্তপর্ণী বা ছাতিম বৃক্ষে)।

বৈজ্ঞানিক যাহাকে 'node' বলিলেন, তাহার প্রাচীন নাম • শূক—a knot on the stem of a plant from which the leaves spring। যখন একটি শূক হইতে একটি মাত্র পত্র উদ্গত হয়, তখনও দেখা যায় পত্রগুলি অ-নিয়মে এলোমেলোভাবে সজ্জিত হয় না—but are arranged spirally।

In this spiral arrangement, the angle of divergence between two successive leaves is *fixed* in all plants of the same species, as also of different species having similar forms of leaves.

জবায়, চীনা গোলাপে (Rosa-sinensis) এবং অশ্বত্থে ঐ কোণ (angle) ১৪৪ ডিগ্রী এবং তুলসী, পুদিনা ও কদম্বে ১৮০ ডিগ্রী। তবেই এস্থলেও জ্যামিতিকীর খেলা দেখা গেল।

এইবার পুষ্পের কথা বলি। পুষ্প প্রকৃতপক্ষে পত্রেরই সৌন্দর্যযুক্ত প্রকারভেদ—

In flowers the floral *leaves*, namely, sepals. petals, stamens are arranged in various ways, and each arrangement is constant for the same species ; and may be true for all individuals of the same family.

ইহা লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন,—

The floral diagram may be described as a ground plan of the flower, showing the relation of the parts to each other and to the mother-axis.

পুনশ্চ—**"The folding of young leaves in the bud exhibits definite** *designs* **in the various plants."**

এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাসের উক্তি আরও চমৎকার—

"When we look at the flowers, each flower, built as it is according to "number" is as a chord in a great musical octave."

অর্থাৎ, প্রত্যেক পুষ্পটি যেন বিশ্বপতির বিরাট ঐক্যতানের এক একটি রাগ রাগিণী। আমার কালিম্পং-এর বাগানে এক জাতীয় বঙ্কলতায় এক রকম

অদ্ভুত ফুল হয়। লোকেরা তাহাকে Passion-flower বলে। ফুলের এ নাম কেন হইল জানি না—আমি ত' দেখি যেন একটি সচিত্র প্রজাপতি—চঞ্চল পক্ষদ্বয় স্থির করিয়া গাছের উপর বসিয়া আছে। ঐটি বনফুল—কিন্তু দেখিলে কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—'এটি বনফুল, শোভায় অতুল'—যেন সাকার জ্যামিতিক কৌশল।

পুনশ্চ—"Consider the arrangement of sepals and petals, of stamens and ovaries in *any* flower and the geometry (which we have seen in the mineral life) reappears in new variations and combinations."

ঐ জ্যামিতিকীর নিদর্শনস্বরূপ শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস চারি জাতীয় পুষ্পের অন্তরঙ্গ সজ্জা প্রদর্শন করিয়াছেন—Lythraceæ, Cucurbitaceæ, Boragineæ and Geraniaceæ। নিম্নে আমরা ঐ চিত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।
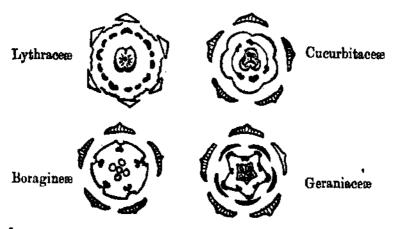
কি অদ্ভুত জ্যামিতিকী! জিনরাজদাস যথার্থই বলিতেছেন—Surely God geometrizes as he builds the above four types!

পুষ্পের পর ফল—বেল, নেবু, কমলা, পেঁপে, সুপারি, তাল, নারিকেল ইত্যাদি। এ সকল ফলই আমরা সর্বদা আস্বাদন করি, কিন্তু তাহার মধ্যে বিশ্বনাথের যে জ্যামিতিকীর পরিচয় পাই তাহা কি কখনও ভাবিয়া দেখি? এ প্রসঙ্গে আনারস ও কাঁটালের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উহাদের অন্তরঙ্গ সংস্থানে ও বহিরঙ্গ সজ্জাতে কি অদ্ভুত সৌষ্ঠব ও নিয়মানুবর্তিতা এবং কি বিচিত্র জ্যামিতিকী।

পাদপরাজ্যে জ্যামিতিকীর কথা এখানেই সাঙ্গ করি। পশুরাজ্যে জ্যামিতিকীর কি নিদর্শন পাওয়া যায় আগামী সংখ্যায় তাহার অন্বেষণ করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রাচীন গীতা

গীতার শ্লোক সংখ্যা সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান চলিতেছে।

ভীষ্মপর্ব্বের ৪৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে গীতার শ্লোক সংখ্যার পরিমাণ উক্ত হইয়াছে—যথা,—

ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ
অর্জ্জুনঃ সপ্ত পঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং চ সঞ্জয়ঃ
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ৬২০টি শ্লোক বলিয়াছিলেন, অর্জ্জুন ৫৭, সঞ্জয় ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্র একটি মাত্র শ্লোক বলিয়াছিলেন। অতএব গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭৪৫।

চতুর্দশ শতাব্দিতে কেশব কাশ্মীরি গীতার তত্ত্ব-প্রকাশিকাখ্য ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি গীতার শ্লোক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাষ্য লিখিয়াছিলেন—

"তচ্চ গীতাশাস্ত্রং পঞ্চচত্বারিংশদধিক সপ্তশত শ্লোকৈ মহাভারতে ভগবতা ব্যাসেন নিবদ্ধং তদুক্তং ভীষ্ম পর্বণি 'ষট্‌শতানি সবিংশানি............গীতায়ামানমুচ্যত' ইতি।"

কিন্তু অতীব বিস্ময়ের বিষয় যে, কেশব কাশ্মীরির যে ভাষ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে তিনি গীতার ৭০০ শ্লোকের উপর টীকা লিখিয়াছেন। কেশব কাশ্মীরি তাঁহার টীকায় শ্রীভগবন্নিম্বার্ক মুনীন্দ্রোপবৃংহিত ভেদাভেদ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

দশম শতাব্দিতে অভিনব গুপ্তাচার্য্য ভগবদ্গীতার্থ সংগ্রহ নামক গীতার একটি টীকা লিখিয়াছিলেন। উক্ত টীকা ৭৪৫ শ্লোক সংখ্যক কাশ্মীরি গীতার অনুকরণে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু নির্ণয় সাগর প্রেস অভিনব গুপ্তাচার্য্য লিখিত যে টীকা প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে Prof. F. O. Schrader of Kiel University (Germany) লিখিয়াছেন যে, '...in spite of the publication of the same commentary as long ago as 1912, by the well known Nirnaya Sagar Press, escaped attention, because of the misleading way in which the work has been published...'

অতএব নির্ণয় সাগর প্রেস যে অভিনব গুপ্তের ৭০০ শ্লোকাত্মক গীতার টীকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। উক্ত গীতার টীকা সম্বন্ধে গোণ্ডলের রাজবৈদ্য জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, 'This edition sheds a flood of light on the problem of the original Gita of 745 stanzas.'

অধ্যাপক অটো শ্রডার অনেক অনুসন্ধান করিয়া গীতার লুপ্ত ১৪ $\frac{১}{২}$ শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

দশম শতাব্দির শেষভাগে শ্রীরাজানক রামকবি বিরচিত 'সর্বতোভদ্র' নামক টীকায় দেখা যায় যে তদবধি তিনি মোট ১৭টি শ্লোক উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুনার আনন্দাশ্রম এই গীতা প্রকাশ করিয়াছেন।

মৈলাপুর শুদ্ধ ধর্ম্ম মণ্ডল একটি ৭৪৫ শ্লোকাত্মক গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গীতাতে প্রচলিত গীতা হইতে ৩৭টি শ্লোক কম আছে এবং মহাভারতের অন্যান্য পর্ব্ব হইতে ৮২টি শ্লোক যোগ করিয়াছেন এবং তাহাতে ২৬টি অধ্যায় আছে। উক্ত গীতার প্রথম অধ্যায়ে দুর্গাস্তুতি আছে।

মোগল বাদশাহগণের সময় ফাইজী ও আবুল ফজল গীতার পারসীক অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং এই দুই অনুবাদ দৃষ্টে জানা যায় যে গীতার শ্লোক সংখ্যা হইতেছে ৭৪৫। সংবৎ ১২৩৬ বিক্রমাব্দে সুরাট হইতে একটি হস্তলিখিত গীতার পুঁথি পাওয়া যায় তাহাতে প্রচলিত গীতা হইতে ২১টি অধিক শ্লোক পাওয়া যায়। উক্ত গীতার শেষে তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে,—যথা—

'সংবৎ ১২৩৬ বর্ষে মিত্তি জৈষ্ঠ শুক্ল পঞ্চম্যাং...দিনে গঙ্গাশঙ্কর পঠনার্থং গণপত ব্যাসেন লিখিতং প্রতিলিপী সংবৎ ১৫৯৮ বর্ষে চৈত্রে বিমলগণী শিষ্য মূণী সিংহ বিমলা'।

এই পুঁথিটি গোণ্ডালের রসশালা সরস্বতী গ্রন্থভাণ্ডারে রক্ষিত আছে। এতৎ ব্যতীত উক্ত গ্রন্থভাণ্ডারে আরও ৩৯ খানি গীতার প্রাচীন পুঁথি আছে।

উক্ত গ্রন্থাগারে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কাশী হইতে প্রাপ্ত গীতার একটি প্রাচীন পুঁথি আছে যাহাতে গীতার লুপ্ত ৪৫ শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিটি পড়ী মাত্রায় লিখিত এবং পুঁথির শেষে এইরূপ লেখা আছে যথা—

'ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সমাপ্ত। বিক্রম সংবৎ ১৬৩৫ মাঘ কৃষ্ণ ১ প্রতিপদী মন্দ বাসরে'।

এই গীতাখানি গোণ্ডাল রসশালা ঔষধাশ্রম হইতে রাজ বৈদ্য জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরের গ্রন্থাগারে উক্ত একখানি গীতা আছে। এই প্রবন্ধে উক্ত গীতার অতিরিক্ত শ্লোক সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা আছে।

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই, যদিও পাঠভেদ অনেক আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত বন্ধুবর্গকে দেখিয়া অর্জ্জুনের মনের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি অতীব সুন্দর শ্লোক আছে, যথা—

ত্বং মাঙ্গয়োপেতমপোহ্যস্তরাত্মা
বিষাদ মোহাভি ভবাদ্বিসংজ্ঞঃ।
কৃপাগৃহীতঃ সমবেক্ষ্য বন্ধু-
নভি প্রপন্নাম্মুখমস্তকস্য ॥ ১১

দেহীর দেহ যে আত্মস্তবস্তু, এই সম্বন্ধে একটি নূতন শ্লোক আছে, যথা—

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেপি তত্তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥ ১৯

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে দুইটি ভাবার্থপূর্ণ জ্ঞানবিজ্ঞান মূলক নূতন শ্লোক আছে, যথা—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
বিজানতামবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৭৪
ব্রহ্মজ্ঞানং ব্রহ্মলাভ একমেব দ্বিধোদিতম্।
জ্ঞাত্বা লব্ধ্বাথবা হ্যেতং শান্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীম্ ॥ ৭৬

তৃতীয় অধ্যায়ে, কাম সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন শ্লোক আছে, তন্মধ্যে নিম্নে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

এষ সূক্ষ্মঃ পরঃ শত্রুর্দেহিনামিন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
সুখতন্ত্র ইবাসীনো মোহয়ন্ পার্থ তিষ্ঠতি ॥ ৩৮
কামক্রোধময়ো ঘোরঃ স্তংভহর্ষ সমুদ্ভবঃ।
অহংকারোঽভিমানাত্মা দুস্তরঃ পাপকর্মভিঃ ॥ ৩৯

পরম ব্রহ্ম ও অব্যক্ত সম্বন্ধে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং চেতঃ চেতসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধ মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ৪৬
অব্যক্তাত্তু পরং ব্রহ্ম ব্যাপকং চাপ্যলিঙ্গকম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জীবো হ্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥ ৪৭

চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে তিনি অন্ন এবং অন্নের ভক্ষক। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

অহমন্নং সদান্নাদ ইতি হি ব্রহ্ম বেদনম্।
ব্রহ্মবিৎ গ্রসতি গ্রাসাৎসর্বং ব্রহ্মাত্মনৈব হি॥ ২৪

পঞ্চম অধ্যায়ে ঈশ্বরের স্মরণকারীগণের কিছুতে আসক্তি হয় না, সেই সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

স্মরন্তোঽপি মুহুস্ত্বেতৎ স্পৃশন্তোঽপি স্বকর্মণি।
সক্তা অপি ন সজ্জন্তি পঙ্কে রবিকরা ইব॥ ১৮

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অনেকগুলি অধিক শ্লোক আছে তন্মধ্যে নিম্নে একটি উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

স এব সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥ ৩০

সপ্তম অধ্যায়ে অনেক পাঠভেদ আছে। অষ্টম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে অক্ষর ব্রহ্মই প্রাণ, বাক্য ও মন, সেই সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণো বাঙ্‌ মনশ্চ সঃ।
তৎসত্যমমৃতং চৈব তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ১২

নবম অধ্যায়ে অরূপের রূপ সম্বন্ধে এবং হৃৎপুণ্ডরীকে বিরজ বিশুদ্ধ ব্রহ্মরূপের চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে, দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং
শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং
বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥ ৩০

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
হৃতপুণ্ডরীকে বিরজং বিশুদ্ধং
সন্নিচন্তয়েদ্ ব্রহ্মরূপং বিশোকম্॥ ৩১

দশম অধ্যায়ে কেবলমাত্র কতকগুলি পাঠভেদ আছে।

একাদশ অধ্যায়ে অনেকগুলি অধিক শ্লোক আছে, তন্মধ্যে একটি শ্লোক যেখানে শ্রীভগবানকে জগতের একমাত্র কর্তা বলা হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

দিব্যানি কর্মাণি তবাদ্ভুতানি
পূর্বাণি পূর্বা ঋষয়ঃ স্মরন্তি।
নান্যোহস্তি কর্তা জগতস্তমেকো
ধাতা বিধাতা চ বিভুর্ভুবশ্চ॥ ৫০

দ্বাদশ অধ্যায়ে কেবলমাত্র কতকগুলি পাঠভেদ আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ধ্যানগম্য পরম পুরুষকে সকলের প্রশাসিতার বলা হইয়াছে। আমরা কেবলমাত্র সেই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

প্রশাসিতারং সর্বেযামণীয়াং সমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং জানীয়াৎ পুরুষং পরম্॥ ২৩

চতুর্দশ অধ্যায়ে কেবল কতকগুলি পাঠভেদ আছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে জীবের পাপও নাই, পুণ্যও নাই এবং তাহার নাশ নাই। জীব কি করিয়া দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায় তাহার উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে। আমরা এই অধ্যায় হইতে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

বেদান্তবিজ্ঞান বিনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগেন চ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকে চ পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি দুঃখাৎ॥ *

ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো
ন জন্ম দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিরস্তি।
ন ভূমিরাপো মম বহ্নিরস্তি
ন চানিলো মেস্তি ন চাম্বরং চ ॥ ১৮

ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে কেবল মাত্র কতকগুলি পাঠ ভেদ আছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে অনেক পাঠভেদ এবং একটি অধিক শ্লোক আছে, যাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—যথা,—

রাজন্‌ভগবতো বাক্যং নিগমাগমগর্ভিতম্‌।
নিশম্য স্বস্থমনসা প্রহ্বোবোচদথার্জুনঃ ॥ ৭৪

৭৪৫ শ্লোকাত্মক সম্পূর্ণ গীতাখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে অনেক দার্শনিক জটিল তত্ত্বকে সুগম ও সহজবোধ্য করা হইয়াছে। সুধী সমাজে এই প্রাচীন গীতার আলোচনা হইলে আমরা আরও সুখী হইব। আমরা মাত্র এই গীতা সম্বন্ধে সংবাদ বহন করিলাম।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

পুস্তক-পরিচয়

ফসিল (গল্পের বই)—সুবোধ ঘোষ। নবসাহিত্য নিকেতন।

বাংলা গল্পের প্রকৃতি যে বদলাচ্ছে তার প্রমাণ সুবোধ ঘোষের এই প্রথম বইখানি। ব্যাপক এক আন্দোলনের আভাস প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট। সামাজিক চৈতন্যই শুধু লেখককে উদ্বুদ্ধ করে নি, আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের প্রভাবও তাঁর উপর বেশ সক্রিয়। জীবনকে দেখছেন তিনি নূতন দৃষ্টিতে, সে-দৃষ্টি হয়তো বা কতকটা সংশয়াচ্ছন্ন। বস্তুত সংশয়বাদের মূল্য বর্ত্তমানকালে সব চেয়ে বেশি ; কেন না প্রতর্কের নেপথ্যেই এর অবস্থান। তা ব'লে লেখকের এই মনোভাব মোটেই নঙর্থক নয়। তাঁর গল্পগুলি আমাদের নাড়া দেয়, শান্তি ভঙ্গ করে, যদিও চমক লাগায় কদাচিৎ। তার কারণ গল্প রচনার কলাকৌশলের চেয়ে গল্পের বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর নজর তীক্ষ্ণ। দুর্ম্মর বিধাতা বা নির্ম্মম নিয়তির ক্রীড়নকরূপে মানুষকে ভাবতে তিনি নারাজ। ভাবের নূতন রূপকল্পের উপর গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পের পশ্চাৎপট। এ হিসাবে পূর্ব্ববর্ত্তী গল্প-লেখকদের চেয়ে নিঃসন্দেহে তিনি অগ্রসর। কিন্তু যে লিপিকুশলতার ফলে সামান্যের মধ্যে প্রকাশ পায় অসামান্যের ব্যঞ্জনা সেই গুণ তাঁর লেখায় এখনো বর্ত্তায় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দণ্ডমুণ্ডের' কথা ধরা যাক। জেলের শান্ত্রী অনুকূল গোঁসাই-এর পরিবর্ত্তন অতটা আকস্মিক না হ'লে গল্পটা নিখুঁত হ'তে পারত। তাই তাঁর সব গল্পের ভার থাকলেও ধার নেই।

'ফসিল' গল্পটি কিন্তু এর ব্যতিক্রম। সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রকে কাজে লাগিয়ে অমন পূর্ণাঙ্গ গল্প তৈরী করা বিস্ময়কর, বিশেষতঃ যে-গল্পে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের মধ্যে এতটুকু বিরোধ নেই। এ জাতের গল্প নিয়ে কিছুকাল থেকে বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা চলছিল বটে, কিন্তু তা সফল হ'ল এই প্রথম। দুই বিরোধী স্বার্থের সংঘাত কোন্ অবস্থায় এসে সদ্ভাবে দাঁড়ায় এবং তাদের দৈবী চক্রান্তে কেমন ভাবে নিধন হয় নির্ধনরা তারই ইতিবৃত্ত অতি নিপুণভাবে বিবৃত হয়েছে এই গল্পে। 'অযান্ত্রিক' তেমন না জমলেও এই গল্প থেকে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার ধরা পড়ে। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যে

অহিনকুলের মতো নয় বাংলা গল্পে এই কথাটা এতোদিন অনুক্ত ছিল। বরং এর বিপরীত মতটা রবীন্দ্রনাথের কাছেও প্রশ্রয় পেয়েছে। 'গোত্রান্তর' আর একটি অসাধারণ গল্প। দুর্ব্বলচিত্ত বাঙালী যুবকের উপর এমন কশাঘাত পাঠকের মনেও জ্বালা ধরায়। সঞ্জয়কে যেন নিজের মধ্যে দেখে চমকে উঠি। এ-রকম চরিত্রাঙ্কন রীতিমতো শক্তিসাপেক্ষ। ঘটনা সংস্থাপন, এমন কি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বর্ণনাতেও লেখকের সকারী মনের স্বাক্ষর বর্ত্তমান। তা ছাড়া তাঁর বিষয়-বৈচিত্র্য ও দুর্লভ অভিজ্ঞতা বাংলা সাহিত্যের পরিধি বাড়াচ্ছে ব'লেই আমার বিশ্বাস।

তাঁর গল্পগুলি প'ড়ে পাঠক আনন্দ পাবেন এবং আশা করি সেই সঙ্গে বুঝবেন, আর্য্যসত্যে আস্থা খোয়ানো গোলকধাঁধার মধ্যে ঘোরার সমার্থক নয়।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ডাঃ সেন—শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী।

জীবন-মৃত্যু—শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়
চিত্রা-পাবলিশিং কোং। কলিকাতা।

নবীন লেখকের কাছে নিখুঁত রচনার প্রত্যাশা না করাই সঙ্গত। অন্তত এই মনোভাব নিয়ে তরুণ সাহিত্যিকের রচনা পড়তে আরম্ভ ক'রলে পাঠকের নৈরাশ্যের লাঘব হয়। "ডাঃ সেন" এবং "জীবন-মৃত্যু"—এই উপন্যাস দু'-খানি প'ড়ে এই কথাই আমার মনে হ'লো। প্রথম বইখানিতে তবু যা হোক একটি আখ্যান আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বইটিতে না আছে সুসংবদ্ধ কোনো আখ্যান, না আছে মনস্তত্ব, না আছে আবহসৃষ্টি, না আছে উল্লেখযোগ্য সংলাপ। সুধাংশুবাবু একটি মাত্র প্রধান চরিত্র নির্বাচন করে প্রমাণ করেছেন যে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন। এটি সুখের কথা। কিন্তু

বইটিতে পটভূমি-র যে ব্যাপকতা দেখা যায়, তা' থেকে লেখকদের উচ্চাশা ব্যতীত অন্য কিছুই সূচিত হয় না। আর "গিরিরাণী" চরিত্রটির স্রষ্টা দয়া করে মনে রাখবেন যে 'সাব্‌লাইম্‌' বা সুমহান এবং 'রিডিকিউলাস' বা হাস্যোদ্দীপক— এই দুই বস্তুর মধ্যবর্তী ব্যবধানটি মনে রেখে, অত্যন্ত সতর্ক হ'য়ে, এই শ্রেণীর চরিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করতে হয়। শরৎচন্দ্র 'অন্নদাদিদির' ছবি এঁকেছিলেন। সেই অন্নদাদিদি জীবন্ত মূর্তি গ্রহণ করে আমাদের মানস-লোকে বিচরণ করতে সক্ষম হ'য়েছেন কারণ, অন্নদাদিদির যিনি স্রষ্টা, তিনি হ'চ্ছেন সুবিজ্ঞ, বহুধা অভিজ্ঞ, প্রতিভাবান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অলৌকিক মাটিতে যা গড়া হ'য়েছিলো, অলৌকিকত্বের মর্য্যাদা বহন ক'রে লৌকিক পৃথিবীতে সে মূর্তি প্রাণময়ী হ'য়ে উঠলো। লৌকিক-অলৌকিকের মধ্যে এই সেতুবন্ধন প্রতিভা ব্যতীত অসম্ভব।

হরপ্রসাদ মিত্র

মভার্ণ কবিতা—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। বাতায়ন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

সুরের স্বরগ্রামে যেমন diatonic উন্নতি অবনতি আছে, সমাজ-জীবনেও সেইরূপ উন্নতি অবনতি বা পরিবর্ত্তন আছে—কোথাও সে static নয়। আজ যা আধুনিক কাল তা প্রাচীন। আধুনিকের সঙ্গে প্রাচীনের বা প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের সংঘাত প্রায় শাশ্বত নিয়মাদিষ্ট ব্যাপার। ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরবিরোধী যে চিন্তা ও শক্তিসমূহ নিরন্তর বিপ্লব ক'রে চলেছে, সমাজ বা সমষ্টির জীবনে তারই প্রতিফলন এই পরিবর্ত্তনে আমরা লক্ষ্য করি। মানুষের মন, বিশেষত সক্রিয় মানুষের মন যখন নিশ্চেতন নয়, তখন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, প্রাত্যহিক জীবনের সুখ দুঃখ, অভাব অনটন, বা আচার ব্যবহারের সঙ্গে তার বাস্তব আদর্শের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে ধস্তা-

ধস্তি, ধাক্কাধাক্কি না থাকাই অস্বাভাবিক—বিশেষত এই স্থিত্যন্তর কালে। অনেকে এই ধাক্কাধাক্কি ও ধস্তাধস্তিকে অজ্ঞানতার ফল বলে বর্ণনা করেন এবং কল্পনাতে কল্পনাতে, ভাবনায় ভাবনায় এই সংঘর্ষকে নূতন চিন্তাধারা ও নূতন লক্ষ্যেরই কারণ বলে অভিহিত করেন। কারণটাকে একেবারে অকারণ বলে উড়িয়ে দেওয়া না গেলেও, এটা দেখা যায় যে,—চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মানুষের প্রাতিস্বিক মন যদি বা সমষ্টিগত সমাজ-জীবনে বৈকল্য ও বৈগুণ্যের সৃষ্টি করে, তাহ'লেও,—বিজ্ঞানময় মানব সমাজের সংস্কৃতিক প্রমাণের (standard) স্থিততায় যাঁরা বিশ্বাসশীল নয়, তাঁদের এ-নিয়ে ক্ষুব্ধ হবার কিছুই নেই ; কারণ, তাঁরা জানেন, বর্ত্তমান মানুষের মন যখন অবিচ্ছিন্ন নয়, ক্রমবিবর্ত্তনই যখন প্রকৃতির সনাতন পদ্ধতি—তখন অন্ধকারের পর আলোর দেখা মিলবেই—দু'দিন আগে বা পরে !—আজকের বর্ত্তমান কালকের ভবিষ্যতে যখন পর্য্যবসিত হবেই—কয়েক ঘণ্টার তারতম্যে, তখন এ-নিয়ে তালঠোকাঠুকির আর কি থাকতে পারে। অবশ্য তা'ব'লে বর্ত্তমানকেও আমরা একেবারে উপেক্ষা করতে পারি না, কারণ এই বর্ত্তমানের মধ্যেই অনাগত ভবিষ্যতের ছবি দেখা দেয়—অন্তত আংশিক ভাবেও ; প্রভাতের প্রারম্ভে দিনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেমন আমরা খানিকটা ধারণা করি আর কি।

কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের 'মডার্ণ কবিতা' উপস্থিত কালের সমাজ-জীবনের কয়েকটি রূপান্তর, যা কবির চক্ষে একপ্রকার বিকৃতি বা ভাঙন বলেই রূপায়িত হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তির মনপ্রাণ সমষ্টির মনপ্রাণের অন্তর্গত বলেই, সামাজিক মানুষের এই স্খলন কবির চিন্তারাজ্যে যে আলোড়ন বা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে 'মডার্ণ কবিতা'র কবিতাগুলি তারই প্রতিচ্ছবি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, আমার উপর্য্যুক্ত এই ধারণা জন্মেছে কবির গ্রন্থস্থ গুরুগম্ভীর ভূমিকাটি পড়েই—কবিতাগুলি পড়ে নয়। তিনি নিজেই এই ভূমিকার এক-স্থানে বলছেন : "আসলে এগুলি 'সোসাল পোয়েম' বা 'সামাজিক কবিতা'। বর্ত্তমান পরিবেশ সম্বন্ধে কবির যে (attitude) বা ভাবধারণা এই কবিতাগুলির উদ্ভব হয়েছে তারি থেকে। এগুলি সেই ভাবেরই কবিতা, যে ভাবে আমরা বর্ত্তমান সমাজের একদিনের ভাঙনকে লক্ষ্য করেছি।"

'মডার্ণ কবিতা' গ্রন্থের নামটি ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে একটু

anomalous ঠেকেছে। কথাটা বল্লাম এই কারণে যে, প্রথমে বাংলা বই-এর আধা-ইংরেজি আধা-বাংলা নামের আমি পক্ষপাতী নয়; দ্বিতীয়ত, মডার্ণের অর্থ আধুনিক হওয়ায়, এবং তাহার উপর এটি কাব্যগ্রন্থ হওয়ায়, সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যে সাম্প্রতিক কবিতার অবস্থিতিরই আভাষ দেয়। মডার্ণ এ্যাটিটিউড্ সম্বন্ধে বীতস্পৃহ কবি-মনে এ-ধরণের নাম নির্ব্বাচন আমি সমর্থন করি না। কবিতাগুলির শিরোনামার মধ্যেও প্রায় সমস্তগুলিই ইংরেজী শব্দে শব্দিত। এগুলির কোন বাংলা নামকরণ করলে কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়কে অর্থপূর্ণ করার দিক থেকে কোন ব্যাহতি ঘটতো বলে মনে হয় না, বরং তাদের স্বরূপ আরও প্রাঞ্জল হ'ত।

সাধারণ রসোপলব্ধির দিক থেকে 'মডার্ণ কবিতা'র কবিতাগুলি মন্দ লাগে না—হাল্‌কা রসের টপ্পা ঠুংরির মতো এরা শ্রুতিসুখকর ও রসাল। সহজ ও সরল চিত্রপটের মতো এরা অভিব্যক্ত—গভীর অনুভূতিসাপেক্ষ নয়; গূঢ়ৈষণার বিভূতিতে এরা জটিলতা সৃষ্টি করে নি, স্বাভাবিক স্বচ্ছতায় আপনা আপনিই এরা ধরা দেয়—পাঠককে ভাবিয়ে তোলে না। কিন্তু যা সহজ, সরল ও সহজ-প্রাপ্য তার মূল্য আমাদের কাছে নিতান্তই যৎসামান্য—তার প্রতিক্রিয়াও হয় আমাদের মনে অতি অল্প। এখানে কবির প্রতিকারী মন, যে মন তাঁর ভূমিকার শেষাংশে বলেছে: 'যদি এই মডার্ণ কবিতার আয়নায় আমাদের সমাজের আধুনিক আধুনিকাদের কেহ কেহ নিজের মুখচ্ছবি দেখতে পান এবং নিজের আসল রূপ দেখে আত্মসম্বিৎ ফিরে পান, তাহ'লে মনে করব মডার্ণ কবিতা লেখার প্রয়োজন ছিল ও তা সার্থক হয়েছে'—তা' এত সহজ সারল্যে মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে কি না সন্দেহ; অর্থাৎ এ সম্বন্ধে আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে: কবির ইচ্ছার সার্থকতায় কবিতাগুলি ভাব ও ভাষাগত আরো কিছু খরধার পারুষ্যে শোধিত হওয়া উচিত ছিল, যা সাধারণ পাঠকের রসাভাবভীতিতে কবি বোধ হয় ক'রে উঠতে পারেন নি।

কবি হিসাবে সাবিত্রীপ্রসন্ন খ্যাতিবান ও প্রবীণ। তাই সানুরাগে তাঁর কাব্যগ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করে শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে—তিনি তাঁর কবিতাগুলিকে 'সোসাল পোয়েম', 'mood বা মেজাজের কবিতা নয়' বা অন্য যে কোন আদর্শের অভিধাতেই অভিহিত করুন না কেন—

আমার কাছে এগুলি নিঃসন্দেহে অপরাজিতা বা বনফুলের রসিকতাবহুল কবিতাগুলির পাশেই স্থান নিতো এবং সেটা কিছু অশোভনেরও ছিল না,—যদি না তিনি তাঁর গ্রন্থের সূচনাতেই দীর্ঘ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভূমিকার অবতারণা ক'রে আমাদের মনকে বৃহত্তর সত্তার স্বাদগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন।

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
চৈত্র ১৩৪৮

পরিচয়

বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী

(৬)
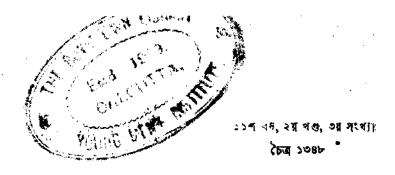
গত মাসের 'পরিচয়ে' আমরা দেখিয়াছি কিরূপে বিবর্তন-স্রোতঃ ধীর মন্থর গতিতে স্থাবর রাজ্য অতিক্রম করিয়া জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয় এবং সেখানে উপনীত হইলে কি এক অভূতপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হয়। ঐ ব্যাপার Cell বা কোষাণুর উৎপত্তি—যে কোষাণুতে Life বা জীবনীশক্তিরূপ এক বিস্ময়কর অভিনব শক্তির খেলা আমাদের নয়নগোচর হয়। ঐ প্রাণশক্তি এক অদ্ভুত আজব পদার্থ। স্থাবরের মধ্যে আমরা যে উত্তাপ, আলোক, তাড়িত, শব্দ, চৌম্বক ও কিমিয়াযুতি-রূপী জড়শক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম—এ জীবনীশক্তি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অর্থাৎ, স্থাবর প্রাণহীন—অপ্রাণী, জঙ্গম—প্রাণী।

আমরা আরও দেখিয়াছিলাম যে, জঙ্গম দ্বিবিধ—পাদপ ও পশু। কি পাদপ কি পশু—প্রত্যেক প্রাণীর শরীরই হয় এককোষিক (unicellular)—নয় কতকগুলি cell বা কোষাণুর সমষ্টি। গত মাসের 'পরিচয়ে' আমরা ঐ কোষাণুর মধ্যে এবং এককোষিক প্রাণীর মধ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি এবং বহুকোষিক পাদপের কাণ্ডে, শাখায়, পত্রে, পুষ্পে, ফলে এবং অবয়ব-সংস্থানে সর্বত্রই জ্যামিতিকীর কি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইবার পশুর কথা বলিব।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বিবর্তন-স্রোতঃ ঐশী প্রেরণার ফলে পাদপ রাজ্য অতিক্রম করিয়া জীব-রাজ্যে (Animal kingdom-এ) উপনীত হইয়া ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে সরীসৃপ, পক্ষী, জন্তু, বানর ও মনুষ্য রূপে বিবর্তিত হয়। এখন আমাদের দেখিতে হইবে মহামতি প্লেটো বিশ্বনাথের যে সার্বভৌম জ্যামিতিকীর কথা বলিয়াছেন, এই পশুরাজ্যে আমরা তাহার কি পরিচয় প্রাপ্ত হই।

পশুরাজ্যে জ্যামিতিকীর প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন—

In *all* the myriads of creatures of the animal kingdom, God geometrises, as in the plant and the mineral. *

— First Principles of Theosophy p. 360.

কিরূপে?—আমরা ক্রমশঃ দেখিবার চেষ্টা করি। প্রথম ঝিনুক, কড়ি, কাঁকড়া ও শামুকের কথা বলি। পাঠক যদি কখনও সমুদ্র-সৈকতে জোয়ার হইয়া গেলে এই সকল জিনিষ কুড়াইবার যত্ন করিয়া থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাদের কি বর্ণ বৈচিত্র্য ও গঠন ভঙ্গিমা! অতি সাধারণ কাঁকড়া সম্পর্কে একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন—"The ordinary crab has been fashioned by nature on a truly geometrical pattern."

কিন্তু বিশেষ করিয়া শামুকের দিকে চাহিয়া দেখুন—বিশেষতঃ যাহাকে Nautilus ও Solarium বলে। নিম্নে আমরা একটি Nautilus pompilius-এর চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলাম। ঐ চিত্র দেখিয়া কে না বলিবে—'how exquisite is God's geometry in the shell of the Nautilus pompilius? Surely a Grand Geometrician is visibly at work!

* পশুরাজ্যে symmetry (সৌষ্ঠব) প্রসঙ্গে একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন...

As regards symmetry, animals may be distinguished as (a) radially symmetrical, (b) bilaterally symmetrical and (c) a-symmetrical. Radial symmetry is illustrated by sponges, Cœlenterata, Hydra, Jelly fish, Echinoderma, Star fish etc. etc. লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, যে সকল পশু এখনও asymmetrical, তাহারাও বিবর্তনের ফলে symmetrical হইবার প্রয়াস করিতেছে।

Solarium-এর মধ্যে জ্যামিতিকী আরও অদ্ভুত।

More instructive is the sea-shell, Solarium perspectivum, because its spiral is a logarithmic curve.

নিম্নে আমরা Solarium-এর একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলাম।

সৌন্দর্যের ত' কথাই নাই ; কিন্তু প্রত্যেক বক্র রেখায় যে জ্যামিতিকী উচ্ছ্বাসিত হইতেছে তাহার কি ? এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন—

Beauty is there clear to our gaze ; but what of the laws of mathematics in their curves, and of mechanics in the moulding of their chambers?

এইবার মাছের কথা বলি। বাঙ্গালীর কাছে মৎস্যের মূল্য সুখাদ্য বলিয়াই। এমন কি আমরা বাংলা দেশে শ্লোক রচিয়া ইলিশ, খলিশ প্রভৃতি মৎস্য-পঞ্চককে নিরামিষত্ব দান করিয়াছি—পঞ্চ মৎস্যাঃ নিরামিষাঃ। কিন্তু পাঠক যদি কখনো কোন aquarium-এ পদার্পণ করিয়া থাকেন, (মান্দ্রাজের সমুদ্রকূলে এরূপ একটি মৎস্যাগার আছে—আমি সেখানে অনেকবার গিয়াছি) —তবে তিনি মৎস্য জাতির সৌষ্ঠব, বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং গঠনের মধ্যে জ্যামিতিকী লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই বিস্ময়াপ্লুত হইয়াছেন। Star-fish সম্বন্ধে একজন

বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন—'The Star-fish is star-like or pentagonal, more or less flattened at right angle to the main axis of the body'.

এইবার সরীসৃপের কথা বলি—কারণ মৎস্যের পরই কূর্ম। সরীসৃপের বৈজ্ঞানিক নাম 'reptiles'।

Then came the amphibians, water-born animals which go ashore to live and the way was clear for the reptiles.

এক সময় পৃথিবীতে এই সরীসৃপদিগেরই একাধিপত্য ছিল। স্মরণ রাখিবেন, Dinosaur, Iguanodon—ইহারাও সরীসৃপই বটে।

These fearsome monsters lorded it over the land, with none even to challenge their supremacy.

কিন্তু নিসর্গ সরীসৃপের প্রভুত্ব বেশীদিন সহ্য করিলেন না। ঐ সরীসৃপ বংশ হইতেই স্তন্যপায়ী পশুর উদ্ভব হইল—The primitive egg-laying creature was this first Mammal which at last arrived। সে যাহা হউক, 'মাৎস্য-ন্যায়' আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমরা লক্ষ্য করিতে চাই যে সরীসৃপ (তাহাদের বংশধর কুম্ভীর প্রভৃতি এখনও ভূমণ্ডলে বর্তমান আছে) যতই বীভৎস ও ভয়ানক হোক না কেন, পাঠক যাদুঘরে ঐ সকল অধুনালুপ্ত সরীসৃপ-শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন এখানেও ঐ জ্যামিতিকীর খেলা।

স্তন্যপায়ী পশুর কথা বলিবার পূর্বে পক্ষীর কথা বলি। ময়ূর যখন পুচ্ছ মেলিয়া নৃত্য করে, বা শকুনি যখন পক্ষ সঞ্চালন করে—তাহার মধ্যে জন্মান্ধও দৃষ্টি করিলে জ্যামিতিকীর পরিচয় পাইতে পারেন। Harmsworth-এর Popular Science-গ্রন্থ হইতে আমরা 'Condor'—গৃধিনী পক্ষীর পক্ষ আস্ফালনের এক চিত্র তুলিয়া দিলাম : পাঠক লক্ষ্য করিবেন কি অদ্ভুত জ্যামিতিকী!
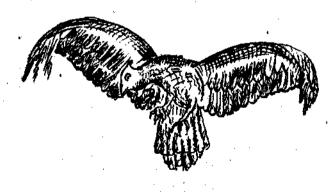
কিন্তু পক্ষী জগতে জ্যামিতিকীর চরম দৃষ্টান্ত Lyre-পাখী। Lyre-পাখী নৃত্য গীতের জন্য ঠিক প্রস্তুত হইতেছে এই অবস্থার একটি চিত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক তাহার অপূর্ব জ্যামিতিকী লক্ষ্য করুন।

এইবার পশুর কথা বলি। সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, কুকুর, বিড়াল, হরিণ, মেষ, মহিষ, গরু—যে কোন চতুষ্পদের প্রতিই দৃষ্টি করিবেন সে চতুষ্পদ যদি বা দেখিতে কুৎসিৎও হয় তথাপি তাহার দেহের গঠনে, তাহার চলনে বলনে, আহার-অন্বেষণে—জ্যামিতিকীর পূর্ণ পরিচয় পাইবেন। একটা অতি ভীষণ করাল-দন্ত শার্দ্দূল—নিম্ন চিত্রে তাহার বিক্রীড়িত লক্ষ্য করুন। দেখিবেন পরিপূর্ণ জ্যামিতিকী।

এইবার পশু জগতের শেষ বিবর্তন মানুষের কথা বলি। নিসর্গ যেন সুদূর অতীত হইতে মনুষ্যের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাঁহার আশা প্রতীক্ষা পূর্ণ হইল।

From this group arose in time the ancestors of the whale and all its family ; the Polar bear and the Siberian tiger, the anthropoid ape of the steaming tropics, the camel of the arid desert, the mammoth and the mouse and, at last, lord of them all, Man himseif.

—Harmsworth's Popular Science Vol. 1, p. 50.

এই মানুষেই জান্তব জগতের প্রপূর্তি! মানবই পাশব সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ। তাই সেক্‌সপীয়র হ্যাম্‌লেটের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

What a piece of work is a man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals!

এই মানুষকে লক্ষ্য করিয়াই শুকদেব ভাগবতে বলিয়াছেন—

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপ পশূন্ খগদংশমৎস্যান্।
তৈ তৈঃ অতুষ্টহৃদয়ো মনুজং বিধায়
ব্রহ্মাববোধধিষণং মুদামাপ দেবঃ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মণ্যদেব বহুবিধ পুর রচনা করিলেন—পাদপ কীট পতঙ্গ মৎস্য সরীসৃপ পশু বানর ইত্যাদি—পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চতুষ্পদঃ (উপনিষদ্)—চতুষ্পদ দ্বিপদ কত কি! কিন্তু তাহাতে তিনি তুষ্ট হইলেন না—যতক্ষণ না মানুষ সৃষ্টি করিলেন। যখন 'মনুজং বিধায়', তখন বলিলেন 'সুকৃতং'—well done (পুরুষো বাব সুকৃতম্—ঐতরেয় উপনিষদ্); তখন 'মুদামাপ দেবঃ'—তখনই তিনি তৃপ্তি অনুভব করিলেন।

সেই বাইবেলে Psalmist-এর কথা—'we are fearfully and *wonderfully* made.'

প্রাচীন গ্রীসেও এই ধরণের একটি প্রবচন ছিল—

—'Wonders are many but nothing is more *wonderful* than Man.'

এই মনুজ সৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন—

'Every atom and cell in his vehicles then spring forth to give their love of order, rhythm and beauty, to make his life as a melody in the eternal symphony of the *Logos*.'

উহাই মানবের চরম নিয়তি—to amplify the great chords sounded by the Logos and weave out of them new melodies of our own.

কিন্তু সে কথা যাক। সম্প্রতি আমাদের লক্ষ্য জ্যামিতিকী। জান্তব জগতের চরমোৎকর্ষ নরনারীতে আমরা যে সুষমা, সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব প্রতিদিন লক্ষ্য করি—অতি পরিচয়ের ফলে যদি না আমাদের চিত্ত অবজ্ঞা-কলুষিত হইয়া থাকে, তবে তাহার মধ্যে আমরা অপূর্ব, অত্যদ্ভুত, আশ্চর্য জ্যামিতিকী

প্রত্যক্ষ করিতে পারি। চিত্রকরের তুলিকার চলনে ও ভাস্করের রেখার বলনে সে জ্যামিতিকীর কত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ প্রকাশিত হয়! অথচ তাহা দেখিয়াই আমরা ধন্য ধন্য করি। কিন্তু যিনি অমোঘ চিত্রকর, অমেয় ভাস্কর, যিনি 'কবিং পুরাণম্'—নর নারীর মধ্যে প্রতিনিয়ত তাঁহার সৃষ্টি-কৌশল আমাদের সমক্ষে মুখরিত হইলেও আমরা মূক থাকি।

জান্তব জগতের যাহাকে by-products বা অনু-সর্জন বলা যায়—যেমন মাকড়সার জাল, বোলতার চাক, মক্ষিকার মধুচক্র, পাখীর ও কীট পতঙ্গের বাসা—এমন কি অণ্ডজের অণ্ডেও বিশ্বনাথের এই জ্যামিতিকী প্রত্যক্ষ করা যায়। একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন :—

The common garden-spider makes a web which is a beautiful work of unconscious art.

মাকড়সার জালে শুধু সৌন্দর্য নয় কিন্তু কি অদ্ভুত জ্যামিতিকী! ইহা লক্ষ্য করিয়া জিনরাজদাস লিখিতেছেন—

In the centre of the spider's web is the logarithmic curve. How does the spider know to build according to *geometric* principles?

নিম্নে চিত্রিত অতি-সাধারণ একটি লূতাতন্তুর প্রতি পাঠক দৃষ্টি দিবেন কি?
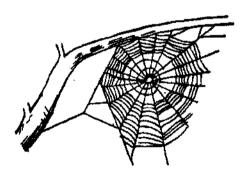
বোলতার চাক ও মধুচক্র—আমরা সকলেই দেখিয়াছি কিন্তু একটু অবধান করিলেই তন্মধ্যে কি অপূর্ব hexagonal জ্যামিতিকী দেখিতে পাওয়া যায়।

এইবার পাখীর বাসার কথা বলি। বাবুইএর বাসা আমরা কেহ কেহ দেখিয়াছি কিন্তু অনেকেরই বোধ হয় 'সোয়ালো'র বাসা দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আমি কিন্তু প্রতি বৎসর কালিম্পং গেলে হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশ হইতে সমাগত Swallow-মিথুনের নীড়-রচনা প্রত্যক্ষ করি। তাহার মধ্যে কি অদ্ভুত জ্যামিতিক কৌশল। পাখী কেন—ক্ষুদ্র কীটের বাসা অণু-বীক্ষণের

সাহায্যে প্রত্যক্ষ করুন। কি দেখিবেন? অদ্ভুত জ্যামিতিকী। নিম্নে হার্‌ম্‌স্‌ওয়ার্থের 'Popular Science' গ্রন্থ হইতে আমরা ঐরূপ দুইটি বাসার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলাম।
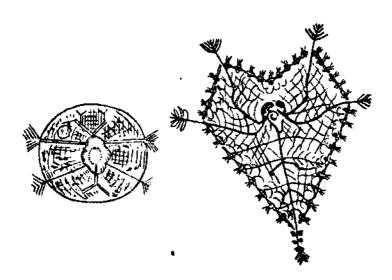
অবশেষে অণ্ডের কথা বলিয়া এ-প্রসঙ্গ সাঙ্গ করি। অণ্ড লইয়া যাঁহারা কিছুমাত্র নাড়াচাড়া করিয়াছেন তাঁহারা এক্ষেত্রেও জ্যামিতিকীর পরিচয় পাইয়াছেন। সে বিষয়ের বিস্তার করিব না—তবে প্রজাপতির অণ্ড সম্বন্ধে মনস্বী স্যার টমাস্ ব্রাউনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিব।

Some resemblance there is of this order in the eggs of some butterflies * * which doth nearly declare how Nature geometrises.

আমরা দেখিয়াছি শক্তির অষ্টবিধ ভেদ। স্থাবররাজ্যে তাপ, তাড়িত, আলোক, শব্দ, চৌম্বক ও কিমিয়াযুক্তি এবং জঙ্গমরাজ্যে জীবনীশক্তি। কিন্তু জীবনীশক্তিই সৃষ্টির শেষ কথা নহে। জীবনীশক্তির (Life-এর) উপর অধ্যাত্মশক্তি—যে শক্তি উচ্চতর জীবে দেদীপ্যমান। যেমন জড়শক্তির উপর জীবনীশক্তি, সেইরূপ জীবনীশক্তির উপর ঐ অধ্যাত্মশক্তি (psychic force)। অধ্যাত্মশক্তি প্রধানতঃ মানবের চিন্তারাজ্যে স্বপ্রকাশ করে। মানুষ মননশীল—সেই জন্যই সে মানব—পশুসৃষ্টির চরমোৎকর্ষ—সেক্‌স্‌পীয়রের ভাষায় —'The paragon of animals'.

এই চিন্তাশক্তির ব্যাপারে আমরা জ্যামিতিকীর কিছু পরিচয় পাই কি? যদি না পাই, তবে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী সার্বভৌম হইল কিরূপে?

যখন আমরা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর বিষয়ে চিন্তা করি—একটি গোলাপ ফুলের কথা ভাবি, কিম্বা কোন পরিচিত বন্ধুকে মনে করি, তখন কি হয়? প্রাচীন দর্শনের ভাষায় তখন আমাদের চিত্ত 'তদাকারে আকারিত' হয়। এ সম্বন্ধে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডাঃ বারাডুক (Dr. Baraduc of Paris) অনেকগুলি পরীক্ষা-সমীক্ষা করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে চিত্তের 'তদাকারে আকারিত' হওয়ার কথা যে সত্য ও সঠিক, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। ডাঃ বারাডুকের পরীক্ষার প্রণালী এইরূপ ছিল:— তিনি একাগ্রভাবে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর চিন্তা করিবার সময় ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর নিজ হাত রাখিতেন। কিছুক্ষণ পরে ঐ প্লেট 'develop' করিলে—সেই ব্যক্তি বা বস্তুর ফটো ঐ প্লেটে স্পষ্ট দেখা যাইত।

Dr. Baraduc obtained various impressions by strongly thinking of an object, the effect produced by the thought-form appearing on a sensitive (photographic) plate.

এ প্রসঙ্গে ডাঃ বারাডুক নিজে বলিয়াছেন—The creation of an object is the passing out of an image from the mind and its subsequent materialisation, (being the chemical effect caused on silver salt by the thought-created picture).

অবশ্য চিত্তস্থ ঐ সকল সূক্ষ্ম চিন্তামূর্তি আমাদের চর্মচক্ষের গোচর হয় না কিন্তু যাঁহারা দিব্যদৃষ্টিশীল—যাঁহারা clairvoyant, তাঁহারা ঐ সকল মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক চিন্তার ফলে আমাদের মনোময় ও কামময় কোশে (থিয়সফিতে যাহাদিগকে Mental body ও Astral বা Desire-body বলে) স্পন্দন উৎপন্ন হয়—

Every thought gives rise to a set of correlated vibrations in the matter of those bodies, accompanied with a marvellous play of colour, and that body under this impulse throws off a vibrating portion of itself.

অর্থাৎ, ঐ স্পন্দিত কোশের ভগ্নাংশ—যাহা চিন্তিত ব্যক্তি বা বস্তুর আকারে আকারিত হইয়াছে—সেই অংশ কোশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া ব্যোম হইতে অনুরূপ উপাদান সংগ্রহ করিয়া চিন্তামূর্তি বা Thought-form-এর আকার ধারণ করে।

If a man thinks of a room, a house, a landscape—tiny images of these things are formed within his mental body and afterwards externalised.

—Thought Forms, p. 37.

কিরূপে ?

This gathers from the surrounding atmosphere, matter like itself in fineness from the elemental essence of the mental (or astral) world.—Ibid p. 18.

এখন আমরা দিব্যদৃষ্টিশীল ব্যক্তির সাহায্যে জানিতে চাই—অনেক স্থলেই অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় রচিত সাধারণ দৃষ্টির অগোচর ঐ সকল চিন্তামূর্তির মধ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায় কি না ?

বিশেষতঃ যাঁহারা সাধন পথে অগ্রসর, ধ্যান ধারণায় অভ্যস্ত—যাঁহারা যোগী, ধ্যানী—তাঁহাদের একাগ্র চিন্তার সমকালে যে সকল সজীব চিন্তামূর্তি (Thought-forms) সৃষ্ট হয়, * ঐ সব মূর্তি জ্যামিতিক আকারে আকারিত হয় কি না ?

আমরা জানি, ক্ষর প্রকৃতি (Matter) ও অক্ষর পুরুষ (Spirit) সংযুক্ত হইয়া বিশ্ব রচনা করেন—

সংযুক্তম্ এতৎ ক্ষরম্ অক্ষরঞ্চ

—শ্বেতাশ্বতর

—এবং ঐ সংযোগের ফলেই জগতের অপূর্ব শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য—যাহাকে 'Cosmic Order' বলে। একজন থিয়সফিষ্ট একবার নিবিষ্ট চিত্তে ঐ 'cosmic order'-এর বিষয় ধ্যান করিতেছিলেন। তাহার ফলে কিরূপ চিন্তামূর্তি সৃষ্ট হইয়াছিল—'Thought-forms' গ্রন্থ হইতে আমরা সেই চিন্তা-মূর্তির চিত্র নিম্নে অঙ্কিত করিলাম—পাঠক উহার বিচিত্র জ্যামিতিকী লক্ষ্য করিবেন।

* Adepts, well-trained in concentration, are capable of vitalising their thought-forms.—Mrs David Neil's Mystics and Magicians of Thibet.

চিত্রের দুইটি সংবদ্ধ (interlaced) ত্রিভুজের অর্থ কি ? Here we have an upward-pointing triangle signifying the threefold aspect of the Spirit, interlaced with the downward-pointing triangle which indicates Matter with its three inherent qualities.

একবার একজন ভাবপ্রবণ সাধক বুদ্ধদেবের অনুকরণে বিশ্বমানবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা বর্ষণ করিতেছিলেন। দিব্যদৃষ্টিশীলের নিকট তৎসৃষ্ট চিন্তামূর্তি কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল ? নিম্নচিত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন—'The form is the result of an endeavour to extend love and sympathy in all directions'.
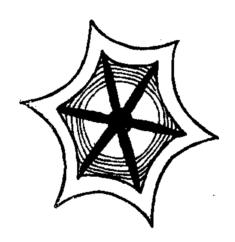
পাঠক ! চিত্রটির প্রতি একটু নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করুন—দেখিবেন অদ্ভুত জ্যামিতিকী—'a curious hexagon with its inward-curving sides."

গীতাকার বলিয়াছেন—ব্রহ্মণ্যদেব বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত আছেন—ময়া ততমিদং সর্বং জগদ্ অব্যক্তমূর্তিনা—'He pervades and permeates the whole universe.'

যখন কোনো উচ্চ সাধক ঐ ভাবে ব্রহ্মণ্যদেবের ধ্যান করেন, তখন তাঁহার চিন্তামূর্তি কি আকারে আকারিত হয় ? নিম্নাঙ্কিত চিত্রদ্বয়ে আমরা ঐরূপ চিন্তামূর্তির অক্ষম অনুকরণ করিবার প্রয়াস করিলাম—কিন্তু আসলে ও নকলে কি আকাশ পাতাল ব্যবধান !
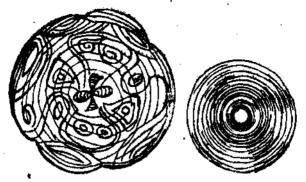
পাঠক লক্ষ্য করুন কি বিস্ময়কর কারুকরী, কি wonderful tracery, কি মনোহারী জ্যামিতিকী।

আমরা জানি ব্রহ্মণ্যদেব বিশ্বের মধ্যে সপ্তধা আত্মপ্রকাশ করেন—ঐ প্রকাশের কেন্দ্রসমূহকে কেহ প্রজাপতি বলেন, কেহ Archangels বলেন, কেহ Ameshpentas বলেন—নামে কি আসে যায়?

The Logos manifests Himself through seven mighty channels, often regarded as minor Logoi or great Planetary Spirits.

যদি কোন উত্তম সাধক ঐভাবে ব্রহ্মণ্যদেবের ধ্যান করিতে পারেন, তবে তাঁহার চিন্তামূর্তি কি অপূর্ব জ্যামিতিক আকারে আকারিত হইবে, পাঠক তৃতীয় প্রবন্ধের শেষ ভাগে চিত্রিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন—অতএব আমরা ঐ বিষয়ের এখানে আর বিস্তার করিব না।

অতএব আমরা বলিতে চাই—মহামনস্বী প্লেটোর উক্তি 'God geometrises' অথবা তাঁহার অনুচর শ্রীযুক্ত জিনরাজদাসের ভাষায় 'There exists underneath each of nature's creations a geometrical design'—এ উক্তি সার্বভৌম সত্য—সর্ব ভূমিতে সত্য।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মানুষ কেন কাপড় পরে

পোষাক পরার অভ্যাসটা মানুষের পক্ষে এত সর্ব্বজনীন এবং অভ্যাসটা এতই পুরোনো যে অনেক সময় মনে হয় পোষাক আমাদের শরীরেরই একটা অঙ্গ-বিশেষ। ওটা যে বাইরের জিনিস এ সম্বন্ধে মনে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা নিতান্ত নির্ব্বিবাদে আলো আর বাতাসের মতোই পোষাককেও মেনে নিয়েছি, যদিও দেখতে গেলে পোষাকই আমাদের দেহ থেকে আলো আর বাতাসের আশীর্ব্বাদকে ঠেকিয়ে রাখে। সত্যি যদি ভাবতে বসা যায় দেখা যাবে পোষাক আমাদের অনাত্মীয় এবং বস্ত্রের সংস্থানের জন্যে আমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়!

মানব সভ্যতার সঙ্গে পোষাকের একটা অনুষঙ্গ আছে। যে-কোন সভ্যতার যে-কোন কালের কথা নেওয়া যাক—মানুষের পক্ষে আহার এবং আশ্রয়ের প্রয়োজন যেমন, পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজন তার থেকে কিছু কম নয়। কেবল দুরধিগম্য জায়গায় কোনো কোনো অসভ্য উপজাতির কথা শোনা যায়, যাদের গায়ে কাপড়ের টুকরোটি পর্য্যন্ত নেই। এদের মধ্যে কোনো জাতি সময়-বিশেষে কিছু কাপড় পরে, অন্য সময় পরে না। কিন্তু মোটের উপর বলা যেতে পারে কাপড় জিনিসটা মানুষমাত্রেই পরে।

পৃথিবীতে এত বিভিন্ন রকমের পরিচ্ছদ আছে যে অবাক হতে হয়। বোধ-হয় পৃথিবীতে যত রকমের ভাষা আছে পরিচ্ছদও তত রকমের। এবং ভাষার মতো পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্যও মানব-সমাজকে অগণ্য ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এক দলের পোষাক অন্য দলের কাছে একটা অনাসৃষ্টি। এবং একজন যে-পোষাক পরে তার মর্য্যাদা রক্ষা করে, কয়েক শ' মাইল দূরের আর এক জনের কাছে সেটা হয়ত খুবই হাস্যকর বলে গণিত হতে পারে।

আধুনিক কালের ইয়োরোপে পোষাক পরার নিয়ম অতি সূক্ষ্ম ভাবে পালন করা হয়। পুরুষ মানুষ প্রধানতঃ পরে ট্রাউজার, কোট, শার্ট এবং জুতো। এ ছাড়া স্কার্ফ, টাই, বো প্রভৃতিও পরতে পারে, এবং মোজা সবার পায়ে থাকে। মেয়েরা পরে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা স্কার্ট এবং ব্লাউজ। তা ছাড়া

ষ্টকিং ও জুতো। মূলতঃ এই হচ্ছে ওদের পরিধেয়। এরই আবার নানা রকম রূপান্তর ও বৈলক্ষণ্য আছে; সেটা নির্ভর করে যিনি পরেন তিনি সমাজের যে পর্য্যায়ের লোক তার উপর এবং পরিধানের কাল ও উদ্দেশ্যের উপর। যেমন ঈভনিং পার্টিতে কালো কোট পরতে হবে, তার পিছনে ঝোলানো থাকবে একটি টেএল্। ট্রাউজারও হবে কালো, শার্টের সম্মুখ ভাগ মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করে শক্ত করা থাকবে, এবং বো হবে সাদা। এই হবে অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের পোষাক। এঁরই পরিচারক একই পোষাক পরবে, শুধু গলায় পরবে সাদার বদলে কালো বো যাতে লোকে তাকেও ভদ্রলোক বলে ভুল না করে বসে।

এই অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের সকালের পোষাক হবে একটু অন্য ধরণের। পোষাকের রং হবে হালকা; শার্ট সুতোর এবং বো-এর বদলে থাকবে একটি টাই। গল্‌ফ্ খেলবার সময় এঁর ট্রাউজার হবে খাটো—সেটা হাঁটু থেকে চার ইঞ্চি নীচে এসে সেই খানে বকলেস দিয়ে বাঁধা থাকবে। টেনিস খেলবার সময় ট্রাউজার হবে গোড়ালি পর্য্যন্ত লম্বা; তার রং হবে সাদা; গলায় টাই অথবা বো কিছুই থাকবে না। রাত্রে ঘুমোবার জন্যে এবং সমুদ্রে অথবা নদীতে স্নানের জন্যেও ভিন্ন রকমের পোষাক আছে। এমনি মেয়েদের বেলাও সময় উদ্দেশ্য অথবা উপজীবিকা হিসেবে পোষাকের প্রবল তারতম্য। যে সময়ে যে পোষাকটি দরকার সে সময় অন্য কোন পোষাক পরে যদি কেউ হাজির হয়, সেটা বিষম বিসদৃশ এবং হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

ইয়োরোপীয়েরা তাদের নিজেদের পোষাকে এতই অভ্যস্ত যে অন্য যে-কোন পোষাককে তারা অসভ্য বলে মনে করে। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই সম্পূর্ণ অন্যরকম পোষাক পরে। ইয়োরোপীয়দের পোষাক রেড ইণ্ডিয়ানদের পালক এবং রংচঙে কাপড়ের কাছে নিষ্প্রভ এবং নীরস মনে হয় না কি? আরবীয়েরা পরে বৃহদায়তন বিস্তৃত পোষাঁক—তাতে থাকে ঢিলে ইজের এবং খাটো ঢিলে কোর্ত্তা। জাপানীরা পরে কিমোনো। ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা রকমের পোষাক। পুরুষরা স্থানীয় প্রথা অনুসারে ইজের, ধুতি অথবা লুঙ্গি পরে। ভারতবর্ষের সামান্য কয়েকটা অংশ ছাড়া মেয়েরা আর সব জায়গাতেই শাড়ি পরে—শাড়ির দৈর্ঘ্য দশ হাত থেকে কুড়ি হাত

পর্য্যন্ত হতে পারে। পাঞ্জাবের এবং কাশ্মীরের মেয়েরা ঢিলে পজামা, কামিজ ও ওড়না পরে; ভুটিয়া মেয়েরা এক রকম মোটা কাপড় কোমরবন্ধ দিয়ে পরে। মোটের উপর ভারতবর্ষে কোনো একটি বিশিষ্ট জাতীয় পোষাক নেই।

এই তো দেশে দেশে কালে কালে জাতিতে জাতিতে পোষাকের এত রকমের বিভিন্নতা, কিন্তু প্রতি দেশ-কাল-সমষ্টিতে এই অভ্যাসটা অভিন্ন রয়ে গেছে যে পোষাক দিয়ে অঙ্গ ঢাকতেই হবে। লাঙল কাঁধে একজন বাংলা দেশের চাষীর পোষাক ল্যাপল্যাণ্ড বাসীর অথবা তীব্বতীয়ের বা বেদুইনের পোষাকের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য বলে বোধ হতে পারে—কিন্তু তাহলেও এক জায়গায় এরা সবাই এক—কারণ প্রত্যেকেই কিছু না কিছু গায়ে পরে থাকে।

এই থেকে এই সব প্রশ্নগুলো মনকে নাড়া দিয়ে ওঠে—"কেন মানুষ পোষাক পরে?" "কবে সে পোষাক পরতে আরম্ভ করল?" "মানুষের পক্ষে পোষাক পরা কি নিতান্তই আবশ্যক?" অধিকাংশ মানুষ এর উত্তর নিয়ে বেশী ক্ষণ মাথা ঘামাবে না—উত্তর তৈরীই আছে, এবং সকলেরই জবাব প্রায় এক—"শ্লীলতা এবং সুরুচির জন্য, তা ছাড়া শীত গ্রীষ্মের হাত থেকে বাঁচবার জন্য।" এই জবাব যে কতদূর খাঁটি এবং কতটা সঙ্গত তা দেখা যাক।

(২)

এখনকার দিনে মানুষের পোষাক অতি জটিল। সভ্যতার জটিলতা দিনে দিনে যুগে যুগে যেমন বেড়ে গেছে মানুষের বেশ ততই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় মানুষের পরিচ্ছদ এমন ছিল না। আরো নানা বস্তুর মত পোষাক পরিচ্ছদেরও একটা ক্রমবিকাশ হয়েছিল। বহু সহস্র বছর ধরে পোষাক পরার পদ্ধতি বদলে বদলে আজকার এই প্রথায় দাঁড়িয়েছে। জীবজগতে মানুষ যেদিন প্রথম মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই দিন থেকেই সে পোষাক গায়ে দিয়েছে, যদিও হয়ত প্রথম অবস্থায় অভ্যাসটা এত ব্যাপক ছিল না।

প্রথম অবস্থায় মানুষ ব্যবহার করত হয় বল্কল নয় চর্ম্ম। এই সময় তার পোষাককে বলা যেতে পারে শুধু 'আবরণ'। বহুদিন ধরে এই বৃক্ষাবরণ

মানুষকে পরিধেয় যুগিয়ে এসেছে। এই হচ্ছে সকলের চেয়ে সাদাসিধে পোষাক। গাছের ছাল ছাড়িয়ে তাকে পিটে নেমদার মতো করে কাপড়ের উপাদান তৈরী হত। এই নিয়ে দেহের চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘাঘরার মতো পরা হত, অথবা দুপাশে দুটো হাত-গলাবার ফুটো করে দিয়ে টিউনিক-এর মতো ব্যবহার করা হত। এখনকার দিনেও ব্রেজিলের অরণ্যবাসীরা এই রকম পোষাক পরে। নানা অসভ্য জাতির মেয়েরা বল্কল অথবা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্য পিটিয়ে ঘাঘরা তৈরী করে পরে। পুরুষরা যে পুরাকালে চামড়ার পোষাক পরত তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে পাথরের যন্ত্রের সাহায্যে তখনকার মানুষরা পশু চর্ম চেঁছে পরিষ্কার করত—এই সহস্র সহস্র বছর পরে তাদের আবার খুঁজে পাওয়া গেছে ; যদিও সে সব পোষাকের আর চিহ্নমাত্র নেই। এই সব চর্ম আগে ব্যবহার হত শুধু চাদরের মতো করে, পরে তাতে আঁকড়া লাগানো হয়।

বল্কলের ঘাঘরার আর চামড়ার আচ্ছাদনের কালক্রমে অনেক উন্নতি হয়েছিল এবং আজকালকার বেশভূষা এই আদিম পোষাকেরই হাজার হাজার বছরের উন্নতির ফল। পরে মানুষ ঘাস বুনতে এবং বিন'তে শিখল। South Sea Island বাসীরা এখনকার দিনেও এই শিল্পে অভ্যস্ত। তারপর কালে সুতো কাটা এবং কাপড় বোনা এল। কাপড় বোনার কৌশল আবিষ্কার হতেই পোষাকের ক্রমবিবর্ত্তন অতি দ্রুত হয়ে উঠল।

পশুপক্ষীরা কোনো কৃত্রিম পোষাক গায়ে পরে না। এবং মানুষও আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে কাপড় পরতো না। ঠিক কোন যুগে মানুষ পোষাক ব্যবহার করতে আরম্ভ করল তা নির্ণয় করা শক্ত ; কিন্তু পুরোপলীয় যুগের উত্তর কালে মানুষ বোধহয় কাপড় পরেছে।

"Later Paleolithic man clothed themselves, it would seem, in skins, if they clothed themselves at all. These skins they prepared with skill and elaboration, and towards the end of the age they used bone needles, no doubt to sew these pelts. One may guess pretty safely that they painted these skins, and it has even been supposed printed off designs upon them from bone cylinders. But their garments were mere wraps ; there are no

clasps or catches to be found. They do not seen to have used grass or such like fibres for textiles. Their statuettes are naked. They were, in fact, except for a fur wrap in cold wea-ther naked painted savages." *

তারপর হচ্ছে নবোপলীয় মানুষ। এরা "dressed chiefly in skins, but they also made a rough cloth of flax. Fragments of that flaxen cloth have been discovered." † এই যুগের অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব দশ হাজার বছরের মানুষ পোষাক-পরিহিত মানুষ।

(৩)

লোকে সাধারণতঃ বিশ্বাস করে মানুষ কাপড় পরে লজ্জা-নিবারণের জন্য। ওয়েল্‌স্ দেখিয়েছেন পুরোপলীয় মানুষ ছিল "Painted naked savage"। তার মধ্যে শীলতার বোধ উদ্ভাসিত হয়েছে ক্রমবিকাশের ধাপে এগতে এগতে। এই বোধ মানবতার একটি বিশেষ লক্ষণ এবং এরই চরিতার্থতার জন্য মানুষকে তার অঙ্গ ঢেকে রাখতে হয়।

তাই বলে শীলতা মানুষের সহজাত নয়। এটা যে প্রথাজাত তা বোঝা যায় শুধু এইটুকু বিচার করলে যে বিভিন্ন জাতির এই শীলতা সম্বন্ধে কি রকম বিভিন্ন সংস্কার আছে। মুসলমানদের মধ্যে মেয়েদের পক্ষে জনসমাজে মুখ অনাবৃত করা অবিধেয়। চীন দেশের মেয়েদের পক্ষে তাদের কৃত্রিম-উপায়ে খাটো-করা-পা প্রদর্শন করা অত্যন্ত অশিষ্ট। সুমাত্রা ও সেলিবিস দ্বীপের বন্যজাতিরা তাদের হাঁটু উন্মুক্ত করে রাখাকে অভদ্র বলে মনে করে। মধ্য এশিয়ায় আঙুলের ডগা এবং সামোয়ায় নাভি অনাবৃত করাও এমনি অসভ্যতা মনে করা হয়। তাহিতিতে কাপড় একেবারে না-পরলেও চলে এবং ক্যারিবদের মধ্যে মেয়েরা কটিবন্ধ ছাড়াই বাইরে আসতে পারে যদি তার দেহ চিত্রিত করা থাকে।

পুরুষ এবং মেয়েরা কতখানি পর্য্যন্ত তাদের দেহকে অনাবৃত করতে পারে তা তাদের লজ্জাবোধের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে না—করে তাদের সম্প্রদায়ের

* Outline of History, H. G. Wells, page 94

† Outline of History, H. G. Wells, page 108

প্রচলিত প্রথার উপর। ইয়োরোপে যেমন—যদিও পুরুষ ও মেয়েরা যখন একত্রে স্নান করে, তারা কাপড় পরে করে, কিন্তু Red Rivieraয়, ফিনল্যাণ্ড এবং জাপানে পুরুষ ও মেয়ের একত্রে নগ্নস্নান মোটেই অজানা নয়। পাশ্চাত্যে পুরুষদের একত্রে নগ্ন হয়ে অথবা মেয়েদের একত্রে নগ্ন হয়ে স্নান করবার প্রথা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে এই অভ্যাস অত্যন্ত অবিধেয় ঠেকবে।

শীলতা-বোধটা যে নিতান্তই প্রথাজাত তা আরও স্পষ্ট হবে এই দেখে যে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে যা এক সময়ে অনুমোদিত অন্য সময়ে তা নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা যখন বাড়িতে থাকেন—শুধু একটি ঠ্যাং-ঠেঙে ধুতি, এমন কি গামছা পরে দেহের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ খোলা রাখতে পারেন। এঁরাই যখন বাড়ির বাইরে যান, ধুতিটিকে গোড়ালি অবধি নামিয়ে না দিলে এবং কামিজে গা না ঢাকলে চলে না। পোষাক পরার এই লৌকিকতার দিকটা পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে আরো সুস্পষ্ট। সমুদ্রের তীরে পুরুষদের শুধু Knickers পরলেই চলে। আর মেয়েদের শুধু Knickers ও বুকের জন্যে ন্যূনতম আবরণ। সমুদ্রতীরে চল্লেও এই পোষাক পরে রাস্তায় হাঁটা কিন্তু চলে না। এমনি ধারা খেলার পোষাক আপিসে চলে না, আপিসের পোষাক নাচের মজলিসে অচল।

নৃতত্ত্ববিদেরা এবং পর্য্যটকেরা যাঁরা আদিম মানব জাতির আচার, রীতি ও জীবন নিয়ে পর্য্যালোচনা করেছেন তাঁরা "মানুষের এই লজ্জাবোধ জিনিসটা যে কত আপেক্ষিক তা দেখাতে রাশি রাশি উপাদান উপস্থিত করেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার বরোরো-রা মাথায় শিরস্ত্রাণ, গলায় মালা, কোমরে কটি-বন্ধ এবং পায়ে মল পরত, কিন্তু জননেন্দ্রিয় ঢাকা রাখত না; উচ্চ নাইলের কোনো অসভ্য জাতি শুধু কানের দুলটি পরে। ফিউজীয় পোষাক হচ্ছে পশু চর্ম্ম নির্ম্মিত একটি স্কন্ধচ্ছদ যাতে করে পরিধাতার সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত থাকে।" *

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শীলতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পরিমান আবরণ ব্যবহার করে—তা বরোরো বা তাহিতিদের সম্পূর্ণ নগ্নতা থেকে আরবীয় মুসলমান স্ত্রীলোকের আপাদমস্তক ঢাকা বোরখা পর্য্যন্ত যে কোন

* *Among the Nudists*, **Francis & Mason Merrile.**

ক্রমের হতে পারে। অঙ্গাচ্ছাদনের এই এত রকম বৈলক্ষণ্য—এর থেকে সহজেই মনে হয় শীলতা-বোধ মানুষের সহজাত এবং স্বাভাবিক নয়—নিতান্তই লৌকিক।

কিন্তু তা হলেও এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে যে-কোন সভ্য মানুষ সর্ব্ব সময়ে বস্ত্র মোচন করতে বিষম আপত্তি করবে ও খুবই লজ্জা পাবে। এর কারণ আত্ম-সচেতনতা—আসলে লজ্জা নয়। ইয়োরোপে এমন ক্লাব আছে যেখানে পুরুষ এবং মেয়েরা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘোরা-ফেরা, খেলা ধূলা, সাঁতার কাটা প্রভৃতি করতে পারে; তারা বলে—তারা প্রথম অবস্থায় আত্মসচেতন থাকে, কিন্তু একটু অভ্যেস হয়ে গেলেই তাদের নগ্নতা সম্বন্ধে কোনো হুঁস থাকে না; অসভ্য জাতি—যারা নগ্নতায় অভ্যস্ত তাদের কথা আগেই বলেছি—"There is the evidence of competent observers to show that members of a tribe accustomed to nudity when made to assume clothing for the first time, exhibit as much confusion as would a Européan compelled to strip in public." * এইসব কারণে বলতে চাই কাপড় পরার অভ্যাস থেকে শীলতা বোধ উৎপাদিত হয়েছে; সাধারণ লোকের যে বিশ্বাস—কাপড়ের প্রবর্ত্তন হয়েছে শীলতা বোধ থেকে—তা ঠিক নয়।

পোষাকের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের যৌন-নির্ব্বাচনের একটা সম্পর্ক আছে। মানব সমাজের প্রগতির কোনো বিশেষ অবস্থাকালে মানুষ একদিন আবিষ্কার করল যে তার শরীরের বিশেষ কিছু কিছু অংশ খুলে রাখার চেয়ে ঢেকে রাখায় যৌন-উদ্দীপনা বেশী হয়। † এ সত্য অতি সুস্পষ্ট। আংশিক ভাবে বস্ত্রাচ্ছাদিত মানুষের মূর্ত্তির সম্পূর্ণ নগ্নমূর্ত্তির চেয়ে যৌন-আকর্ষণ অনেক বেশী। কোনো কোনো অসভ্য জাতি—যারা মাঠের উপর উলঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটায়—তারা অনেক নাচে কিছু কিছু পোষাক পরে আসরে নামে। সেই সব নাচের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দর্শকের মধ্যে যৌন-আবেগ জন্মানো। নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে বিশেষজ্ঞেরা মানেন যে মানুষ তার যৌন-আকর্ষণ বাড়াবার জন্য পোষাক পরা সুরু করেছিল। মানুষের কামবৃদ্ধির

* Encyclopaedia Britannica, 13th ed. Costome.
† Encyclopaedia Britannica. 13th. ed. Costume.

কাযে পোষাক জিনিসটা কত সাহায্য করে তা আলোচনা করতে গিয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ বলেছেন "To an early Vtctorian a woman's ankles were sufficient stimulus, whereas a modern man remains unmoved by anything up to the thigh, this is merely a question of fashion in clothing. If nakedness were the fashion, it would cease to excite us, as women would be forced, as they are in certain savage tribes, to adopt clothing as a means of making themselves sexually attractive." *

সভ্যজাতির পোষাকের ধর্ম্ম হচ্ছে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে দৈহিক পার্থক্য তাকে সুস্পষ্টতর করে তোলা—তাকে গোপন করা নয়। পুরুষের পোষাক পুরুষের ঠিক সেই গুণগুলি অতিরঞ্জিত করে যা মেয়েরা পুরুষের কাছ থেকে চায়; এবং মেয়েদের পোষাকের বেলাও তাই। টুপিতে পালক গোঁজা, আঁটি সাঁটি কটিবন্ধ, স্ফীত ঘাঘরা এমনি অনেক ছোট খাটো জিনিসই এর প্রমাণ। তা ছাড়া অনেক রকমেরই পোষাক যা শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ঢাকবার জন্যে পরা হয় বলে বলা হয়—তার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঐ অঙ্গের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা।

পোষাকের উৎপত্তি এবং নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ওয়েষ্টার মার্ক বলেছেন "The facts appear to prove that the feeling of shame far from being the cause of man's covering his body, is, on the contrary, a result of this custom ; and that the covering if not used as a protection from the climate, owes its origin at least in a great many cases, to the desire of man and women to make themselves mutually attractive. *

পোষাকের ক্রমবিকাশে জল হাওয়ার মস্ত প্রভাব পাওয়া যায়, কিন্তু পোষাকের উৎপত্তির সঙ্গে জল হাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। মানুষ প্রথম জন্মেছিল গ্রীষ্মমণ্ডলে অথবা তার নিকটস্থ অঞ্চলে এবং জল হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার আচ্ছাদনের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মানুষ-গোষ্ঠি যতই মেরুর দিকে সরে যেতে লাগল ততই তার পোষাকের

* *Marriage & Morals*, Bertrand Russell, page 115.

* Encyclopaedia Britannica, 13th ed. Costume.

কায হতে লাগল মানুষকে শীতের হাত থেকে বাঁচানো। কিন্তু এখনকার দিনেও যে সকল জায়গায় শীত-গ্রীষ্মের কোপ মোটেই নেই সেখানেও সভ্য মানুষের প্রচুর পোষাক দিয়ে দেহ আচ্ছাদন করা অভ্যাস। মানুষ যে মুখ্যতঃ জল হাওয়ার জন্যে পোষাক পরে না তা স্পষ্ট দেখা যায় এই থেকে যে "আরবীয়েরা, যারা অত্যন্ত গরম দেশে বাস করে তারা প্রচুর পোষাক পরে থাকে ; অথচ ফিউজীয়েরা, যারা হর্ণ-অন্তরীপের প্রান্তে থেকে কুমেরুর কঠোর শীত ভোগ করে তাদের শরীর রক্ষার একমাত্র বস্তু দেহের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি পশুচর্ম্ম—যা যেদিক থেকে হাওয়া বইছে সেইদিকে ঘুরিয়ে পরা যায়।" †

পোষাককে যে এমন অক্লেশে এবং ব্যাপক ভাবে মানুষ গ্রহণ করেছে, তার তলে আছে মানুষের যৌন-আকর্ষণ বাড়াবার ইচ্ছা—এ নিঃসন্দেহ। কিন্তু ফ্রেজারের মতে আর একটি উপাদান পোষাকের উৎপত্তির তলে আছে। সেটি হচ্ছে যৌনেন্দ্রিয়ের প্রতি taboo। আদিম মানুষের কাছে যৌন-বিষয় ছিল রহস্যময়। যৌনেন্দ্রিয়ের প্রতি দেবত্ব আরোপ করা হত এবং তার অলৌকিক গুণ আছে বলে ভাবা হত, * কাযেই তা হয়েছিল taboo। শুধু তাই নয়, তাকে ডাকিনীর এবং অন্যান্য দুষ্ট প্রভাব থেকে বাঁচাবার প্রয়োজন হত। সুতরাং তাকে ঢেকে রাখা দরকার ছিল। এই থেকে কতকটা বোঝা যায়, মানুষের পোষাকের এত রকম বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি জিনিষ প্রায় সর্ব্ব-লৌকিক—তা হচ্ছে, পোষাকের প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন তার দ্বারা আদ্য যৌন-চিহ্নগুলিকে গোপন করার জন্য যত্ন নেওয়া হয়।

আজ মানুষ ভুলে গেছে—কেন সে একদিন পোষাক পরতে আরম্ভ করেছিল। আজ সে পোষাক পরে শুধু অভ্যাসের বশে। যে কারণে সে পোষাক পরতে সুরু করেছিল তা আজকের দিনে না-ও থাকতে পারে, কিন্তু বহুদিনের আচারের আজ সে দাস হয়ে পড়েছে—যে আচারকে এখন আর সে ত্যাগ করতে পারে না।

শান্তিপ্রিয় বসু
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

---

†. Encyclopaedia Britannica, 13th ed. Costume.

* আমাদের দেশের শিবলিঙ্গ একটি উদাহরণ।

বুর্জোয়া

গাঁয়ে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মায়ের পীড়াপীড়িতে কণ্ঠাগত হয়ে এসেছিল প্রাণ। মা হলেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। সনাতনপন্থী। আর আমি হলাম সমরোত্তর যুগের আধুনিক যুবক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য মার্কা নিয়ে বেরিয়েছি। কলেজীয় আবহাওয়ার আওতায় মন এখনো তাজা। সুতরাং মায়ের সঙ্গে আমার মতের তফাৎটা হোল অনেক যোজনের। প্রাক্-সামরিক দিনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে পারি না আমরা আর। জীবনের রং গেছে আমাদের বদলে। গত যুগ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি আমরা। তাই অনুনয়বিনয় সহকারে মা যতটা চোখের জল আর নাকের জল এক করেন, আমি ততটা বেঁকে বসি। সত্যি, ঝঞ্ঝাট বইবার মতো মন আমাদের নয়। আর বিয়ে মানেই তো চিরস্থায়ী সম্পত্তির সনন্দ লাভঃ শয্যার আইনতঃ অধিকার। এ দেশের মেয়েরাও যে আবার শস্য-শ্যামলা বাংলা দেশের মাটীর মতো উর্বরা।

গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে অন্ততঃ কিছুদিন ডুবে থাকা যাবে পরম নিশ্চিন্তে। বাবারও তাই ইচ্ছে। দেশের জমিদারীর কিছু তদারকও হবে।

নায়েব-গোমস্তাদের উপর বাবার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন আমার এক সম্পর্কীয় দাদা। আমার হঠাৎ আগমনে তিনি মহা বিব্রত হয়ে পড়লেন। বাড়ির ভালো যে দুখানা ঘর এতদিন তিনি কায়েমীভাবে অধিকার করে আসছিলেন, সে দুখানাই আমাকে দিলেন ছেড়ে। বৌদিটীও তাঁর বিপুল কলেবর নিয়ে আমার সুখ সুবিধার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

চা, সিগারেট আর রেঁস্তোরা ছিলো আমার জীবনের একমাত্র উপজীব্য বস্তু। শেষেরটার অভাব হলেও এখানে দিন আমার গড়িয়ে চললো আরামে।

সেদিন দুপুরে বারান্দায় বসে সকালের ডাকে-আসা বাসি কাগজ পড়ছিলাম। হঠাৎ চাপা কাশির এক শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখলাম : সাত-

আট বছরের একটি ছেলের হাত ধরে ডুরে-শাড়িপরা একটি মেয়ে নিজের প্রণামটা সেরে নিয়ে ছোট ছেলেটাকে দিয়ে আমাকে প্রণাম করাচ্ছে। ছেলেটার হাতে দেখলাম, একখানা বহু পুরোনো থালা আর তার উপর দুটি টাকা। থালা খানা আমার পায়ের কাছে রেখে মেয়েটি গিয়ে দাঁড়াল সসম্ভ্রম দূরত্বে। ছেলেটিকে দিয়ে শুনাল :

'আপনি এসেছেন শুনে মা নজর পাঠালেন। মার খুব অসুখ, তাই নিজে আসতে পারেন নি।'

আমার চোখদুটি তার উপর পড়ে রইল। রোগা ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি। একটু বেঁটে বলে তেমন খুব রোগা দেখা যায় না। হাতে মাত্র কয়েক গাছা বেলোয়ারী কাঁচের চুড়ি। কিন্তু যে জিনিষটা সর্বাগ্রে নজরে পড়ে সেটা হোল ওর সুন্দর মুখখানি। নীচের ঠোঁটটা ওর একটু পুরু আর বনের চঞ্চল হরিণী বুঝি তার কালো চোখ দুটি বিনিময় করে গেছে মেয়েটির সঙ্গে।

অপরিচিতা মেয়ে। আমাকেই বা নজর পাঠানো কেনো? আর কিসেরই বা নজর কিছু বুঝে উঠলাম না। ঘেমে উঠলাম রীতিমত। কলেজের প্রথম ধাপ থেকে শেষ ধাপ পর্য্যন্ত মেয়েদের সাথে আমি এক সঙ্গে পড়াশুনো করে আসচি। রেষ্টুরেণ্টে মুখোমুখি বসে দিব্যি কাঁটা-চামচে চালিয়ে এসেচি। কিন্তু আজকের মতো বুঝি এমন ফাঁপরে পড়তে হয় নি।

তড়াক করে উঠে পড়ে হেঁকে উঠলাম—

'এই রামা, একঠো কুরসি ল্যা আও।'

আমার হাঁক-ডাকে গামছা কাঁধে রামপদ ছুটে এল। কুরসি কি এবং কার জন্যে কিছু বুঝে উঠতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বললাম :

'যা না, দেখচিস না উনি দাঁড়িয়ে আছেন? একটা চেয়ার নিয়ে আয়।'

রামপদর বুদ্ধিটা একটু স্থূল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এবার হেসে ফেলল। বললে :

'চেয়ার কি হবে বাবু? ও যে আমাদের সারদার মেয়ে। পাখী, তোরা ভেতরে যা না।'

অপস্রিয়মান মেয়েটির পিছন থেকে চোখ তুলে আমি রামাপদর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। রামপদ বল্‌ল :

'জানেন বাবু, গেল সন যখন বাকি খাজনার দায়ে ওদের ঘর বাড়ি সব ক্রোক হয়ে গেল, বড় দাদাবাবু তখন বামুনদের পোড়ো ভিটেয় ওদের মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই দিলেন। বড় দাদাবাবু কিরপা না করলে মা-বেটীকে বুঝি এ্যাদ্দিনে ভিক্ষে করতে হোতো দোরে দোরে।'

'ওদের কি কেউ নেই ?'

'না থাকারই মতন বাবু। বাপ-ব্যাটা কুলির কাজ করে জেটিতে। টাকা-পয়সা যা কামাই করে সব ব্যাটা ফুর্তি করেই উড়িয়ে দেয়। বছরের মধ্যে এক দিনও যদি ঘর-মুখো হোতো।'

'ওদের খুব দুর্দিন যাচ্ছে তাহোলে ?'

'দুর্দিন বই কি বাবু। মেয়েটি তবে খুব লক্ষ্মী। সেই তো সারাদিন খেটে খুটে সবার মুখে দুটি গ্রাস যোগাচ্ছে। মাও আবার সারা বছর বিছানায় পড়ে থাকে কিনা।'

কাগজখানার মধ্যে আমি আবার ঝুঁকে পড়্‌লাম। সেখানে অনেক সমস্যা—বহু জটিলতম কূটনীতি—রাজনীতি, বিরাট পৃথিবী। পাখী তার ক্ষুদ্রতম অন্ধকার পটভূমিখানি নিয়ে কোথায় আস্তে আস্তে তলিয়ে গেল। টাটকা খবরগুলোর উপর আমি তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলাম। একটি গেঁয়ো মেয়ের প্রতি অতো ঔৎসুক্য প্রকাশের আমার অবকাশ কোথায় ? আমার কত কাজ। উনবিংশ শতাব্দীর শোষক মনবৃত্তি নিয়ে আমি এখানে আসিনি। দুঃস্থ প্রজাদের চর্বি-খেকো পরগাছা জমিদার আমি নই। নবীয় কাদায় মন আমার গড়ে উঠেছে। আমি গাঁয়ে ফিরচি যুগান্তরকারী সংস্কারক হিসেবে। শিক্ষার প্রদীপ্ত আলো দিয়ে অজ্ঞতার পুঞ্জীভূত তমিস্রা দূর করে আমাদের জুল-ধরা সমাজকে নূতন ছাঁচে গড়ে তুলতে আমি এসেছি পল্লী-উন্নয়নের তাজা আইডিয়া আমার মাথায় কিলবিল করচে।

ইস্কুল-প্রাঙ্গনে সভা ডেকে ছিলাম। যেতে হবে। কাগজখানা ফেলে উঠে পড়্‌লাম।

মিটিং সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। সবে সন্ধে হয়েছে। পথের দুপাশে ইতস্ততঃ ছড়ান গাছপালার কাল ছায়ায় অন্ধকার গিয়ে জমছে।

নির্জন পথ দিয়ে একলা ফিরছিলাম। উত্তেজনায় কান দুটি তখনো গরম। আজকের মিটিং-এ আমার বক্তব্য বিষয় ছিল : ধন-বৈষম্য ও তার প্রতিকার। কার্ল মার্কস্ আমার কণ্ঠস্থ। অশিক্ষিত আর অর্দ্ধশিক্ষিত পল্লী-বাসীদের তাক্ লাগাতে আমার বেগ পেতে হয়নি। ঘন-ঘন হাততালিতে ওরা ইস্কুলের টিনের চালাঘরটি বুঝি উড়িয়ে দিচ্ছিল।

মনে মনে বক্তৃতার রেশ টেনে চলেছিলাম। সহসা দেখলাম, আমার আগে আগে কে যেন যাচ্ছে। ডেকে জিজ্ঞেস করতেই সে ফিরে দাঁড়াল। বিস্মিত হয়ে শুধালাম :

'পাখি যে! এতো অন্ধকারে আসচ কোত্থেকে ?'

সে পথ ছেড়ে দিয়ে একটা কেয়া ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল :

'মার অসুখটা হঠাৎ বেড়ে গেল, তাই কোবরেজ বাড়ি গিয়েছিলাম। কোবরেজ মশাই কিন্তু এলেন না।'

শেষের দিকে এক করুণ হতাশায় কেঁপে উঠল ওর গলা।

'দক্ষিণেটা তুমি অগ্রিম দাও নি ?'

বিদ্রূপে আমি ফেটে পড়লুম।

'আমরা গরীব মানুষ বাবু, দক্ষিণে দেবো কোত্থেকে ? মাকে এমনি ওষুধ দিতেন।'

মনিব্যাগ থেকে একখানা নোট বার করে আমি পাখীর সামনে ধরলাম।

'এটা নাও। তোমার কোবরেজের মুখের উপর এটা ধরো গিয়ে, দেখি, এবার তিনি আসেন কি না।'

ঝোঁকের মাথায় নোটখানা প্রায় ওর হাতের মধ্যেই গুঁজে দিচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি সে হাত সরিয়ে নিল। এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'থাক বাবু। আপনারা দয়া করেন, এই আমাদের যথেষ্ট। গরীবের আবার পয়সা দিয়ে ওষুধ খাওয়া! আপনা থেকেই মা সেরে উঠবে।'

'না, উঠবে না। ধনী আর গরীবের জন্য রোগ চিরকাল একই প্রেসক্রপশন করে থাকে, বুঝলে ? আজকের মিটিং-এ যদি থাকতে, তোমার কিন্তু এ ভুল

জানতো। এ কথাটাই আমি গাঁয়ের সবাইকে জোর গলায় বলছিলাম। টাকার অভাবেই যদি তোমার মার অসুখের চিকিচ্ছে চলে না, তবে কেনো সেদিন আমাকে নজরের টাকা দিতে এসেছিলে?'

প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় আমি মুখ তুলে তাকালাম। অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখলাম ওর ঠোঁট দুটি সবল ভাবে কাঁপছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীর সংযত কণ্ঠে সে জবাব দিল:

'সে যে আপনাদের প্রাপ্য বাবু। সকলে দিয়ে আসচে বহু দিন থেকে।'

'না, প্রাপ্য নয়। ওটা হোল প্রজাদের এক্সপ্লয়ট কোরবার একটা ভূয়ো রীতি। তোমরা তা চোখ বুজে মানবে কেনো?'

পাখী মুখ তুলে আমার দিকে একবার তাকালে। তারপর চোখ নাবিয়ে বললে:

'কি জানি বাবু, আমরা হলাম মুখ্খু মানুষ—ও সব বুঝিও না। রাত হোলো বাবু, আমি যাই। হাটবারের দিন, কেউ হয়তো আবার এসে পড়বে।'

আমার সম্মতির পূর্বেই অন্ধকারে কোথায় সে মিশে গেল।

মনটা তিতিয়ে উঠল। সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে হোঁচট খেলাম এই প্রথম। রাগ হোলো নিজের উপর। কেন ওকে গায়ে পড়ে দরদ দেখাতে গেলাম? আমি তো আর নোটের ছাপাখানা খুলে বসি নি? মুমূর্ষু মা ওর বিনা চিকিৎসায় মরলেও বা! আমারই সব মাথা ব্যথা কেন? ওকে নির্বাসন দেবার চেষ্টা করলাম মন থেকে। পথে দেখা হোলেও সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতাম, যেন চিনি না। এভাবে গেল কিছু দিন।

সকালে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। দেখা হোলো ওর ভাইয়ের সঙ্গে। পুকুর পারের ডুমুর গাছ থেকে সে ডুমুর পাড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম:

'কি রে ভোলা, মা তোর কেমন আছে?'

'মা ভালো আছে বাবু। তবে দিদির বড্ড অসুখ গেল। কী জ্বর বাব্বা! কপালে আপনি হাত দিয়েছেন কি অমনি ছ্যাঁক্ করে উঠবে। এমনি করে রোজ আমি কপাল টিপে দিতাম কিনা।'

ভোলা তার কচি হাত দিয়ে কপালের দুপাশের রগদুটি সজোরে টিপে ধরে দেখাল।

'কার ? পাখীর ?'

'হ্যাঁ। জানেন দাদাবাবু দিদি অসুখের সময় আপনার খুব নাম করতো। বলতো, আপনি ঠিক দেখতে আসবেন। কই, এলেন না কেন ?'

ভোলার উৎসুক মুখের দিকে আমি কিছুক্ষণ নীরবে তাকালাম; তারপর বললাম :

'অনেক কাজ ছিল কিনা; তাই যেতে পারিনি। দেখিস, এবার ঠিক যাবো।'

'জানেন দাদাবাবু', ভোলা আমার কাছে এগিয়ে এল—'জানেন, দিদি মার কাছে খুব বকুনি খেয়েচে। কেনো বলুন তো দিকি ?'

ভোলা চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তারপর আবার বলল : 'কেন জানেন ? আপনি সেবার দিদিকে টাকা দিতে চেয়েছিলেন না ? দিদি তা নেয় নি বলে। বাব্বাঃ ! মার সে কি বকুনি। দিদিকে এই মারে—এই ধরে আর কি। "আইবুড়ো মেয়ে, মরতে পারিস না তুই ?—মর না। বাবু অতোগুলো টাকা ওঁর হাতে তুলে দিতে গেলেন, তা উনি নিলেন না। গলায় দড়ি জুটে না হতভাগী।" সত্যি, টাকাটা যখন আপনি দিতে গেলেন, দিদি তা নিলেই তো পারতো।'

আমার কত কাজ। ভোলার সঙ্গে গল্প করলে চলে না। চা খাওয়া সেরে নিয়ে এক্ষুণি আবার বেরুতে হবে। আজকাল আরো দশ-বিশটা গাঁয়েও আমাকে যেতে হয় বক্তৃতা দিতে। গাঁয়ের যুবকেরা আমাকে জানে নবোদিত ধূমকেতুর মতো। আমি ওদের নিয়ে এক অগ্রণী-ফ্রন্ট গড়ে তুলেচি। কালের ধাপে ধাপে সবাই চলেচে এগিয়ে—প্রগতির পথে। স্থবিরের মত বসে থাকা আর চলে না। সামঞ্জস্য বজাই রেখে চলতে হবে সমান তালে—চলতে হবে আমাদেরও পথের সকল-বাধা-বিপত্তির মূলে ডিনেমাইট বসিয়ে।

সভা সমিতির ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম তাই বাড়ির পিছনে আমাদের নূতন কেনা বামুনদের দীঘিটা দেখবার সময় করে উঠতে পারিনি এতোদিনে। সকালের চা-খাওয়াটা সেরে নিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে জোর করেই বেড়িয়ে পড়লাম একদিন। বহুদিনকার দীঘি। সংস্কারের অভাবে এখন প্রায় মজে গিয়েছে। শ্যাওলা আর পানিফলের দীর্ঘ গাছ

জন্মেছে দীঘির বিশাল বুকে। উঁচু পাড়ের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এদিক-ওদিক ছড়ান গোটা কয়েক পুরোনো আম গাছ। একটি গাছের নীচ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম একটা নীচু ডালে এক থোকা আম পেকে রয়েছে। বাগানের আর সব আম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমার কেমন লোভ হোলো। আমের থোকাটাকে লক্ষ্য করে আমি এক লাফ দিলাম। কিন্তু যতো কাছে ভেবেছিলাম ততো কাছে নয় ডালটা। নাগাল না পেয়ে আমার রাগ গেল বেড়ে। বোঁ করে হাতের ছড়িটা ছুঁড়ে মারলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ ডালে ঠেকে ছড়িটা জলে গিয়ে পড়ল। আমের আশা ছেড়ে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম ছড়িটার জন্য। বড় সখের ছড়ি! জলের কিনারে দাঁড়িয়ে কি কোরবো ভাবচি, এমন সময় পিছনে হাসির মৃদু আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখলাম: কলসি কাঁখে পাখী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসচে।

ধরা পড়ে গিয়ে কৈফিয়তের সুরে বললাম: 'ফসকে গিয়ে ছড়িটা হঠাৎ জলে পড়ে গেল, কি করি এখন বলোতো?'

কলসীটা পাখী গাছতলায় নামিয়ে রাখল।

'এখন উঠে আসুন তো দিকিন। ছড়ির বদলে নইলে আপনাকেই টেনে তুলতে হবে জল থেকে। সহুরে সব বীরপুরুষের দল কিনা!'

পরণের শাড়িখানা হাঁটুর উপর তুলে পাখি সপা-সপ্ নেমে পড়ল জলে। আমি আজ পাখীকে যেন নূতন চোখে দেখলাম! ওকে যেন আজ প্রথম উপলব্ধি করলাম। অফুরন্ত যৌবন থোকায় থোকায় ওকে সুশোভিত করে তুলেছে। খুব ফরসা সে নয়; কিন্তু স্নিগ্ধ এক শ্যামল-শ্রী যেন উপচে পড়ছে ওর সর্বাঙ্গ থেকে। আমার মুগ্ধ দৃষ্টি পাখীর নগ্ন সুডোল উরু দেশে পড়ে রইল।

নাগরিক রুচির কাচে পল্লীর সহজ সরলতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল নির্মম ঘা খেয়ে। সলজ্জ পাখী তাড়াতাড়ি তার হাঁটুর কাপড়খানা নামিয়ে দিলে। ওর কপোল আরক্ত হয়ে উঠল্।

ধরা পড়ে গিয়ে বললাম: 'পাখি, তোমার কাপড়টা যে ভিজে গেল!'

পাখী এর জবাব দিলে না। জল থেকে ছড়িটা নিয়ে উঠে এল।

'একটু দাঁড়ান, আমটাও পেড়ে দি। বাড়ি থেকে একটা বাঁশ নিয়ে আসি।'

'তোমাদের বাড়ি বুঝি এদিকে ?'

'হ্যাঁ—ওই যে দেখা যাচ্ছে।' আঙুল দিয়ে সে অদূরে ছোট একটা কুঁড়ে-ঘর দেখিয়ে দিলে। হেসে বললে: 'ভয় নেই বাবু, আমাদের বাড়ি যেতে বলবো না। গরীব মানুষের বাড়ি যাবেনই বা কেন, বলুন ?'

পাখীর এ অভিমানের কথা। ওর অসুখের সময় আমি যাইনি তাই আজ খোঁচা দিলে! আমি কিন্তু সব অভিযোগের বোঝা চাপিয়ে দিলাম ওর ঘাড়ে। বললাম:

'আমি না হয় যেতে পারিনি পাখী, তুমি এসো না কেনো ? সত্যি, দুপুরটা যে কি বিশ্রী কাটে—বাসি খবরের কাগজ পড়তে আর ভালো লাগে না। এসো লক্ষ্মীটি!'

খুশীতে মন ওর গলে গেল। তারপর থেকে আসত সে রোজ। আমার ঘরের টুক-টাক্ এটি সেটি করে দিয়ে যেত। যেদিন সে আমার ধুতিখানা কুঁচিয়ে রেখে যেতো না, সেদিন বুঝি আমার কাপড় পরাই হোতো না। কেমন যেন ঠেকত। মনটা ভারী উস্‌খুস করে উঠত। দুপুর হোলেই আমি উৎসুক হয়ে উঠি। সেদিনও এমনি তার প্রতীক্ষায় বসে আছি, নীচে সিঁড়ির তলায় শুনলাম বৌদি কাকে যেন শাসন কোরছেন:

'রোজ উপরে তোর অতো কি দরকার, বলতো ? কার কাছে যাস্ ?'

'দাদাবাবু বলেন কিনা।'

'দাদাবাবু বলেন কিনা! অতো বড়ো ধিঙি মাগী, ওর সঙ্গে যে অতো ঢলাঢলি করিস্—শেষকালে তোর সীঁথিতে সিঁদুর উঠবে কোনদিন ? লজ্জা করে না মুখপুড়ি ?'

পাখীর কাছ থেকে এর কোন জবাব এলো না। বৌদির গলা আবার শোনা গেল:

'বেরিয়ে যা শীগগীর। ফের দেখেছি তো ঝেঁটিয়ে বাড়ির বার কোরবো, বজ্জাৎ—হারামজাদী!'

আমার পিঠে কে যেন সজোরে চাবুক মারলো। তিন লাফে সিঁড়ি বেয়ে আমি নেমে এলাম। পাখী তখন চলে গেছে। বৌদিও চলে যাচ্ছিলো, ডেকে থামালাম।

'বৌদি, ওকে অপমান কোরবার অধিকার তোমাকে দিল কে শুনি ?'

'অধিকারের কথা তো নয় ঠাকুরপো, তোমার ভালোর জন্যই বলছিলাম।'

'ধন্যবাদ বৌদি, কিন্তু তার জন্য তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। নিজেদের ভালোমন্দ আমরা নিজেরাই ভালো বুঝি।'

'বোঝো নাকি ভাই! তাই তো বলি, অতোগুলো পাছ-ফেলে ঠাকুরপো পুকুরপাড়ের গাছতলায় কেনই বা অতো ফুর-ফুর করে উড়ে বেড়ায় ?'

'একসাথে যার সঙ্গে আজীবন উড়তে হবে বৌদি, তার সঙ্গে না হয় আগে থেকে ওড়ার একটু রিহার্সেল্ দিয়েই নিলাম—দোষ কি ?'

আমার মুখ থেকে এমন ধারা প্রত্যুত্তর তিনি আশা করেন নি। আমার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন :

'দোষ তো কিছু নয় ভাই, তবে দুঃখ হয়। মেয়েটাকে যে অমন ধারায় নাচাচ্ছো, শেষে কিছু একটা ওর হোলে দায়ী হবে কে ? তুমি ?'

আমার শিক্ষিত মন ঘিন-ঘিন কোরে উঠল। আর দাঁড়ালাম না। ক্রুদ্ধ চটির শব্দ করে বেরিয়ে গেলাম। শুনিয়ে বললাম—

'মানুষের অতো নোংরা-সঙ্কীর্ণ মন থাকা ভালো না বৌদি। এখানকার মুক্ত নির্মল হাওয়ায় বাস কোরচো, খানিকটা এবার উদার হোতে শেখো, বুঝলে ?

পাখীদের বাড়ি গিয়ে সিধে উঠলাম। দেখলাম, জানালার একটা শিক ধরে স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার বুকের উপর শাড়ির স্তূপীভূত আঁচলটা তখনও প্রবলভাবে কাঁপচে। আমার পায়ের শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল। আঁচল ধরে ওকে থামালাম।

'যেয়ো না—শুনে যাও পাখী, দরকার আছে।'

সে ফিরে দাঁড়াল। আমি সোজা বললাম :

'আমাকে বিয়ে কোরবে, পাখী ?'

জল ভরা তার বড় চোখ দুটি পাখী তুলে ধরল আমার দিকে।

'গরীব বলে কি বাবু, আমাদের গায়ে মানুষের চামড়া নেই ? আবার কেন অপমান কোরতে এসেছেন ?'

'তুমি অমন করে বলচ, পাখী ? আমি তো অপমান কোরতে আসিনি।

যাকে ভালোবাসি তাকে আমি অপমান করতে পারি ; একথা তোমাকে কে জানালে ?'

পাখী কোন জবাব দিলে না। নীরবে চোখের জল মুছতে লাগল।

'সত্যি বলচি পাখী, আমাকে বিয়ে কোরতে তোমার তো কোন আপত্তি নেই ?'

পাখীর মাথাটা এবার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল।

'কেমন, তা হোলে তোমার কোন আপত্তি নেই তো ? আমি ভেবে দেখেচি পাখী, তোমাকে না হোলে আমার চলবে না—কিছুতেই চলবে না।'

'তা কি কোরে হয় ? বাবা-মাই বা মত দেবেন কেনো ?'

'বিয়েটা কার শুনি—বাবার না আমার ?'

ধারাল বুলিটা ছেড়ে আমি ওর দিকে তাকালাম। আবার বললাম : 'ভুলে যেয়ো না পাখী, এটা গণতন্ত্রের যুগ। প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীন মত পোষণ কোরবার সমান অধিকার আছে।'

পাখী কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলে। তারপর আমার দুপায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

বিয়ের প্রস্তাবটা যে ঝোঁকের মাথায় করে বসেচি, এমন নয়। কথাটা পাড়বার মতলবে ছিলাম কদিন থেকে। বিয়ে কোরব না, এমন ধনুক-ভাঙা পণ তো আর করে বসিনি—করাটা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়। সুতরাং বিয়ে যদি কোরতেই হয় তবে পাত্রী হিসাবে পাখী তেমন মন্দটা কি ? সে এখনও পল্লীর তাজা বস্তু। কোন হেতু নেই আফশোসের। জানি, কিছুদিন থেকে মা ফিকিরে আছেন যাতে লোকেন গুপ্তের বোন মিস্ কল্যাণী গুপ্তা বি-এর সাথে আমার বিয়েটা চুকে যায় শীগগীর। মার নজরটা অবশ্য বিশেষ করে লোকেন গুপ্তের মোটা পুঁজিটার দিকে। আর পাত্র হিসেবে আমারও দর অল্প নয়। কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ রায়ের আমি একমাত্র পুত্র—সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী। তাই মিসেস্ গুপ্ত পার্টি আর ডিনারের ফাঁকে আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার মিলনের অফুরন্ত প্রশ্রয় দিয়ে আসচেন বহুদিন থেকে। লিফট্ দেবার নাম করে আমার গাড়ীতে বহুবার আপনার মেয়েকে একাকী তুলে দিয়ে টোপ্ গেলার প্রতীক্ষায় আছেন এখনও।

শুধু কি তাই ? র‍্যাডিকেল কিছু একটা করাও হোলো। পাখীকে কে আশা করেছিল কাউন্সিলর ব্যোমকেশ রায়ের একমাত্র পুত্রবধূ হিসেবে ? দেশে রীতিমত সাড়া পড়ে যাবে। প্রগতিশীল কাগজগুলো আমার প্রশস্তি গাইবে শতমুখে। আমাদের যুগ্ম ফটো ছাপবে ওদের কলমে।

খবরটা একবার কলকাতায় জানান দরকার। চিঠি লিখব ভাবছিলাম। মারই পত্র এল আগে। বিস্তর কান্নাকাটি করে তিনি লিখেছেন : শুনলাম, সারদার মেয়েকে তুমি নাকি বিয়ে করতে চাচ্ছ। অমন কাজটি কোরো না, বাবা। বংশের মুখে কি কালি দেবে ? ৭ই আষাঢ় কল্যাণীর সঙ্গে তোমার বিয়ের সব ঠিক হয়েছে, শীগগীর চলে এসো।......

এটা যে আমার পরম হিতৈষিণী বৌদিটির কর্ম বুঝতে আর বাকি রইল না। কিন্তু মার একটুখানি চোখের জলে ভেসে যাবার মত আমার তরল ভাবালুতা নেই। আমি বাস্তবপন্থী আধুনিক যুবক। মাকে কড়া জবাব দিলাম।

তার প্রত্যুত্তর এল বাবার কাছ থেকে একখানা ছোট টেলিগ্রাম। জরুরি দরকারে তিনি কাল এখানে আসছেন।

বাবা চিরকালই কম কথা বলেন। এসে বললেন :

'বিকেলের ট্রেনে তোমাকেও আজ কলকাতায় ফিরতে হবে।'

আমি মাথা চুলকালাম।

'এখন কি করে যাই ? পাখীর সঙ্গে আমার বিয়ে—'

'পাখী নয়, কল্যাণীর সঙ্গে।'

'ওকে যে আমি কথা দিয়েচি।'

'বেশ, আমি তাহোলে একলাই ফিরবো। আশা করি, দু-তিন দিনের মধ্যে মেসার্স ড্যাট্ এ্যাণ্ড সান্‌স্ কোম্পানী থেকে চিঠি পাবে যে আমার সকল সম্পত্তি থেকে তুমি বঞ্চিত হলে। আচ্ছা, তিন ঘণ্টা সময় দিলুম ভেবে দেখবার।'

গম্ভীর মুখে বাবা ভিতরে ঢুকলেন।···

তারপর প্রবল ঝড় উঠল। দারুণ অস্বস্তিতে কাটল সারাটা দুপুর। কল্যাণীকে মনে পড়ল—অনেক দিনের কল্যাণী—আর অনেক কাহিনী—

অনেক কথা। আর পাখী—বৌদি, মা, বাবা—তাঁর বিপুল সম্পত্তি। অসম্বদ্ধ অনেক চিন্তার মধ্য দিয়ে বেলা কখন পড়ে এল, মনে নেই। যখন সচেতন হলাম, ট্রেন তখন পূর্ণ বেগে চলেছে। আর আমি বাবার ঠিক সমুখের বেঞ্চিতে একটি জানালা ঘেঁসে বসে আছি।

শ্রীনিখিল সেন

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জমিবিলি ব্যবস্থা

(১৭)

বৈদিকযুগের অর্থনীতিক অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধানকালে আমরা দেখিয়াছি যে তৎকালে জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, প্রত্যেক লোক নিজের জমি চাষ করিত। চাষের জমি যে তৎকালে কৌমগত বা জমিদারের সম্পত্তি ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বৈদিকযুগের পর যে-সব কৌম আর্য্যাবর্ত্তের গঙ্গাতীরবর্ত্তী জনপদসমূহে বাস করিত, তাহাদের মধ্যে জমি কৌমগত (tribal communism in the land) ছিল বলিয়া কোন কোন লেখক অনুমান করেন। ইহারা বলেন, পাঞ্চাল, কুরু, লিচ্ছবী প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কৌমগুলি যে-জনপদে বাস করিত তাহা তাহাদের কৌমের যৌথ-সম্পত্তি ছিল। ইহার অর্থ—এই কৌমগুলি তাহাদের নামের সহিত সংযুক্ত জনপদগুলির জমির যৌথ মালিক ছিল; তাহারা শাসকরূপে তথায় স্বামীত্ব করিত। কিন্তু তাহা হইলে চাষ করিত কাহারা এবং চাষীদের সহিত জমির কি সম্পর্ক ছিল? যদি ক্ষত্রিয় কৌমগুলি শাসক ও জমির মালিক ছিল তাহা হইলে অন্যশ্রেণীয় লোকেরা তাহাদের খাজনা প্রদানকারী প্রজা ছিল এবং চাষীরা হয় এবম্প্রকারের প্রজা বা শাসকরূপে সেই জমিতে চাষ করিত। এইসব বিষয়ে এখনও প্রমাণাভাব রহিয়াছে।

এই যুগের পর মৌর্য্য শাসনকালে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জমি বিষয়ক কিছু সংবাদ পাই। এই সময়ে গভর্ণমেন্ট জমি হইতে আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টান্বিত থাকিত, রাজস্বের অনেক পরিমাণ জমি রাজার নিজের সম্পত্তিরূপে ছিল। এই সময়ে গভর্ণমেন্ট যে সমস্ত জমির মালিক ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই; বরং জমির উপর লোকের ব্যক্তিগত

অধিকারের বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই প্রকারের জমিকে "ব্রহ্মদেয়" (ব্রহ্মোত্তর) বলিত ব্রাহ্মণেরা 'ইহা দানস্বরূপ পাইয়াছে। তারপর জমি "অ-করদ"রূপে প্রজাদের হাতে ছিল। ইহারা রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্ত্তে রাজাকে একটা কর প্রদান করিত। এই দুই শ্রেণী জমি বিক্রয় ও দান করিতে পারিত। কিন্তু এই ক্ষমতা গভর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীদের মধ্যে আবদ্ধ করিতে বাধ্য করিত, অর্থাৎ "ব্রহ্মদেয়" ও "অ-করদ" জমি কেবল সেই অধিকার প্রাপ্ত লোকদের কাছে বিক্রীত বা দত্ত হইতে পারিত। উদ্দেশ্য এই, এইসব অধিকার কেবল যে-সব শ্রেণীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাদের মধ্যেই তাহা একচেটিয়া হইয়া থাকিবে (১)।

এই দুই শ্রেণী বোধ হয় অতীত কাল হইতে এইসব অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু নূতন জমি পত্তনের সময় নূতন ধরণের প্রজা উদ্ভব হয়। একদল করদ-প্রজা সৃষ্টি হয়, তাহারা সাধারণের সেবার পরিবর্ত্তে জীবনব্যাপী জমি ভোগ করিতে পারিত। তাহাদের এই জমি হস্তান্তর করিবার অধিকার ছিল না। এই শ্রেণী গ্রাম্য কর্ম্মচারী, ভিষক, কিম্বা গ্রাম্য মিস্ত্রী (craftsmen) দ্বারা সংগঠিত হইত। আর একদল ছিল যাহারা চাষের জন্য পতিত জমি বিলি পাইত; ইহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চাষের জন্য অর্থ এবং শস্য পাইত। উপরোক্ত সর্ত্তে ইহারা জমি ভোগ করিত। এতদ্ব্যতীত রাজার খাস জমি ছিল। এই জমি গোলাম, কয়েদী কিম্বা ভাড়াটিয়া শ্রমিক দ্বারা রাজকীয় কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে চাষ করা হইত অথবা ভাগে প্রজা-বিলি করিয়া চাষ করান হইত। ইহা ছাড়া অন্য জমি ছিল; সেগুলি বিশিষ্ট সর্ত্তে বিলি করা হইত। অর্থশাস্ত্রে আমরা গ্রাম সমূহ উল্লিখিত হইতে দেখি। এই সকল গ্রাম সৈন্য, শ্রমিক কিম্বা বিভিন্ন প্রকারের কাঁচা মাল গভর্ণমেণ্টকে সরবরাহ করিত। যে-সব গ্রাম সৈন্য সরবরাহ করিত তাহা সামন্ততান্ত্রিক সর্ত্তানুযায়ী বিলি (feudal holding) করা হয় এবং যে-সব গ্রাম শ্রমিক সরবরাহ করিত তাহা সার্ফত্বের সর্ত্তানুসারে বিলি হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় (২)।

কৌটিল্যে আমরা জমিদারী প্রথার সন্ধান পাইলাম না, বরং মৌর্য্য

১। Dr. N. C. Bandyopadhyaya—Kautilya, P 145.
২। Dr. N. C. Bandyopadhyaya—Kautiya, P 146.

গভর্ণমেণ্ট একটা আয়াস-প্রিয় এবং উপার্জ্জন না করিয়া আয়ভোগী-শ্রেণীর সৃষ্টি করার বিপক্ষে ছিল বলিয়াই অনুমান হয় (৩) ; কিন্তু এই গভর্ণমেণ্টের জমি-বিলির ব্যবস্থার মধ্যে সামন্ততন্ত্রীয় পদ্ধতির বীজ নিহিত ছিল বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মৌর্য্যযুগের পর স্মৃতিসমূহ হইতে আমাদের জমিবিলির ব্যবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে। মনুতে আমরা কৃষি-জমির ব্যক্তিগত মালিক ("ক্ষেত্রিন"—ক্ষেত্রস্বামী) বিষয়ে উল্লেখ দেখিতে পাই ; কেহ এই জমির অনিষ্ট সাধন করিলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য (৮,২৪১)। আবার যে অর্দ্ধেক ভাগে জমি চাষ করিত তাহাকে "অর্দ্ধ শিরিন" (বিষ্ণু সংহিতা ৫৭,১৬) বলিত। গ্রামের সংলগ্ন জমি যে বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল তাহা স্মৃতিতে (৪) জমির সীমানা লইয়া গোলমালের মীমাংসার বিষয়ের ব্যবস্থাতেই প্রমাণিত হয়। কেহ অপরের জমি নিজের সীমানার অন্তর্গত করিলে বা সীমা নষ্ট করিলে তাহার শাস্তি হইত (৫)। বিভিন্ন লোকের জমির সীমানা বড় গাছ, উই-এর টিপি, কাঁটা গাছ প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত করিত (৬)।

আমরা জমিতে এইসব ব্যবস্থার দ্বারা কৌমগত যৌথ অধিকার বা জমিদারী প্রথার সন্ধান পাই না। বরং জমিতে ব্যক্তিগত অধিকারের সমর্থনই পাওয়া যায় (৭)। বৃহস্পতি কিন্তু জমি চাষ করিবার জন্য যে সমবায় প্রথার (co-operative system) কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১৪,২১-২৬) সেই বিষয়ে জলি বলেন, ইহা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে তাহা যৌথভাবে জমি ভোগ প্রথা হইতে উত্থিত হয় নাই ; কারণ বৃহস্পতি এই কর্ম্মে অংশীদার মনোনয়নকালে বিশেষ সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই জমি চাষের সমবায় প্রথা ব্যবসায় বিষয়ক সমবায় প্রথা সংশ্লিষ্ট ব্যাপার (৮)। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে হিন্দু রাজারা কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানার পরিবর্ত্তে জমি ভোগ করিতে

৩। Dr. N. C. Bandyopadhyaya—Kautilya, P 145.

৪। মনু—৮,২৪৫।

৫। বিষ্ণু সংহিতা—৫,১৭২ ; মনু—৮,২৯১ ; যাজ্ঞবল্ক্য—২,১৫৫।

৬। মনুসংহিতা—৮,২৪৬—২৫১ পৃঃ।

৭। U. N. Ghoshal—The Agrarian System in Ancient India, P 961

৮। Jolly—937

দিত; এবং হয়ত পরবর্ত্তীকালে তাহা জমিদারী বা জায়গীরদারী প্রথায় উদ্ভূত হয়।

ইহার পর মুসলমানদের দ্বারা উত্তর ভারত বিজয়ের পর আমরা ঠিকা দিয়া জমিদার নিযুক্ত করার প্রথা উল্লিখিত হইতে দেখি। এইসব জমিদারেরা কিন্তু ভূস্বামী ছিল না, তাহারা খাজনা আদায়কারী ছিল। এই সঙ্গে আমরা জায়গীরদারী প্রথাও দেখি। একটি নির্দ্দিষ্ট জমি সুলতান বা বাদসাহের নিকট হইতে একজন কর্ম্মচারী চিরস্থায়ীভাবে পাইত। মুসলমান যুগে জমির মালিকানা স্বত্ব বিষয়ে পুরাতন প্রথা প্রচলিত ছিল। জমি যে কর্ষণ করে তাহারই সম্পত্তি, ইহাতে রাজার অধিকার নাই—তবে রাজা রাজত্ব চালাইবার জন্য একটা রাজস্ব প্রজাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিত (৯)। এই প্রথা বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্থান পতন, বিভিন্ন বিপ্লব সত্ত্বেও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। হয়ত রাজস্ব দিবার পরিমাণের পরিবর্ত্তন মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াছে (হিন্দু রাজা $\frac{১}{৬}$ অংশ নিত, আকবর $\frac{১}{৩}$ অংশ ধার্য্য করে)।

মধ্যযুগীয় ভারতের প্রকৃষ্ট স্বদেশী রাষ্ট্রের নিদর্শন ছিল বিজয়নগর। তথায় সামন্তেরা রাজস্ব আদায় করিয়া একাংশ সম্রাটকে প্রদান করিত এবং বাকী অংশ নিজেদের জন্য রাখিত। মুসলমান শাসনাধীন ভারতে তুর্কি ও পাঠান শাসকদের সময়ে প্রজাদের একটা মোটা হারে রাজস্ব দিতে হইত। তারপর আকবর যখন নিজের শাসন ভারতের বেশীর ভাগ স্থানে স্থাপিত করিয়াছে তখন অনেক স্থানে পুরাতন প্রথাই বজায় রাখে, এবং সাম্রাজ্যের ভিতরে সের শাহের পদ্ধতি বজায় রাখে (১০)। তিনি রাজস্বের পরিমাণ হিন্দু প্রথা অপেক্ষা বাড়াইয়া উৎপাদিত মোট শস্যের (gross produce)এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিতেন। প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় শস্য উৎপন্ন হইলে ভাগ হইত এবং রাষ্ট্র-লাভ লোকসানের দায়িত্ব গ্রহণ করিত; কিন্তু আকবর কর্ত্তৃক প্রচলিত প্রথায় কৃষকই বেশী দায়িত্ব গ্রহণ করিত। যে শস্য সে বপন করিয়াছে তাহার অনুপাতে সে রাজস্ব প্রদান করিত। এইজন্য রাজস্ব দিবার পর যাহা বাকী থাকিত তাহা কৃষকেরই লভ্য হইত। এই প্রথা দ্বারা কৃষক তাহার কার্য্যে

৯। Baden Powell—Land tenure System in India.

১০। Moreland—India at the death of Akbar, P 99

উৎসাহ পাইত এবং ইহা পাকা খাজনা প্রথায় পরিণত হয় নাই বলিয়া কৃষক নগদ খাজনা প্রদানকারী প্রজায় (cash-paying tenant) পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে (১১)।

রাষ্ট্রে সামন্ততন্ত্র পদ্ধতি

মধ্যযুগীয় ভারতে সামন্ততন্ত্র প্রথা অভিব্যক্ত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধানের তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া আমরা যাহা পাই তদ্দ্বারা ভারতে যে সামন্ততন্ত্র প্রথা উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। হিন্দুযুগ হইতে মুসলমান যুগের শেষাশেষি পর্য্যন্ত এই প্রথার সমস্ত লক্ষণ আমরা ভারতীয় রাষ্ট্র-পদ্ধতির অন্তর্গত হইতে দেখি। ফিউডালিসমের সমস্ত লক্ষণ গুলির স্বরূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; তত্রাচ এক কথায় ইহার অর্থ হইতেছে, ইহা জমি বিলির একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি (১২)। এক্ষণে কথা এই—উক্ত পদ্ধতির উৎপত্তি কোন সময় আরম্ভ হয়। সমাজতত্ত্ব বলে যে সভ্যতার একটা স্তর হইতে আর একটা স্তরে যাইতে দীর্ঘকাল ব্যয়িত হয়। বিপ্লব বা প্রলয় ব্যতীত তাহা শীঘ্র সম্পাদিত হয় না, অভিব্যক্তির রাস্তায় অনেক সময় লাগে। এই যুক্তি অনুসারে আমরা দেখি যে ভারতের সামন্ততন্ত্র পদ্ধতির সমস্ত লক্ষণ বিবর্ত্তিত হইতে দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। আর ইহা রাষ্ট্রে প্রবর্ত্তিত হইবার কালে সমাজ শরীরে কি বিপ্লব ঘটাইয়াছিল তাহার সংবাদ কোথায় পাওয়া যাইবে? কোন প্রথা ভাঙ্গিয়া কখন কেন্দ্রীভূত 'এক রাট' প্রথা উদ্ভূত হয় এবং কোন পরিবর্ত্তনের ফলে সামন্ততন্ত্রীয় প্রথা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার অনুসন্ধান এখনও সম্যকরূপে হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন, হিন্দুযুগে সামন্ততন্ত্র প্রথা ছিল না; তবে রাজপুতদের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উৎপত্তির কারণ অজ্ঞাত বলিয়া ইহারা মনে করেন (১৩)। আমাদের অনুমান হয়, এই যুক্তি সমীচীন নয়। হিন্দুযুগের শেষাশেষি রাজপুতদের উত্থানের সময়ে এবং মুসলমান যুগে,

১১। Moreland—India at the death of Akbar, P 100

১২। R. T. Davies—Mediæval England, P 29

১৩। Dr. P. N. Banerjee—Public Administration in Ancient India, P 52

রাজপুতনায় সামন্ততন্ত্রের লক্ষণগুলি স্পষ্ট প্রতীত হয় বলিয়া এবং ইহাদের সহিত ইউরোপীয় প্রথার সৌসাদৃশ্য পর্য্যবেক্ষণকারীর চক্ষে শীঘ্র পড়ে বলিয়াই এই অনুভূতির উদ্ভব হয়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে পালরাজবংশের রাজত্ব কালে বাঙ্গলায় সামন্ততন্ত্র ছিল, বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার উল্লেখও আছে— সেন রাজাদের সময়ও তদ্রূপ (১৪)। পুনঃ সুদূর দক্ষিণের বিজয়নগর সাম্রাজ্যে এই প্রথা যে ভালভাবেই ছিল আমরা তাহার নিদর্শন পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তৎপর মুসলমান যুগের প্রথমার্দ্ধে অর্থাৎ মোগল শাসন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই প্রথা সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায় (১৫)।

বৈদিকযুগে আমরা জমিতে ব্যক্তিগত স্বামীত্ব (individul ownership) প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখি (১৬)। কিন্তু এই সঙ্গে জমিদার অভিজাত শ্রেণী (landed aristocracy) ও সামাজিক বৈষম্যের সন্ধানও পাওয়া যায় (১৭)। এই সময়ে রাজা প্রজা হইতে "বলি" বা রাজস্ব চাহিত, কিন্তু তাহার ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামী থাকার কোন নিদর্শন বেদে নাই (১৮)। কিন্তু ক্রমশঃ একটা ভূ-স্বামীর দল উদ্ভূত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহা রাজাদের দ্বারা বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের এবং শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের গ্রাম প্রদান করার ফল স্বরূপ। ক্রমে সমাজে ধনী (১,৩১,১২ ; ২,৬,৪ ; ১০,১০,৭) ও গরীবদের (১০,১১৭) বিষয়ে বেদে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

পরে মৌর্য্য সাম্রাজ্য কালে আমরা এক শ্রেণীর নিদর্শন পাইয়াছি—যাহা কতকগুলি সর্ত্তে রাজার নিকট হইতে জমি ভোগ করিত। হয়ত এই সর্ত্তই সামন্ততন্ত্রীয় প্রথার (feudalism) প্রথম চিহ্ন, যাহা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই।

১৪। মধ্য যুগে বাঙ্গলা—১৮৮-.৯৩ পৃঃ।

১৫। গৌড়ের ইতিহাস—১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ।

১৬। Dr. N. C. Bandyopadhyaya—Economic Life and Progress in Ancient India, vol. I, Pp 102—103 ; Vedic Index—vol. I, P 991.

১৭। Dr. N. C. Bandyopadhyaya—Economic Life and Progress in Ancient India, vol. I, P 182.

১৮। Dr. N. C. Bandyopadhyaya—Economic Life and Progress in Ancient India, vol., P. 187.

সামন্ততন্ত্রের একটি লক্ষণ "সার্ফশ্রেণী"। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান যুগের শেষকাল পর্য্যন্ত সময়ে ইহার ক্রমবিকাশ হয়—আমরা ভারতের ইতিহাসে তাহারও সন্ধান পাইয়াছি।

ফিউড্যাল পদ্ধতির আর একটি লক্ষণ manorial system। ইহার নিদর্শন ভারতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে রাজা যেমন তাহার দরবারের সমস্ত কার্য্যের জন্য নগদ বেতন না দিয়া লোকদের জমি দান করিত এবং এই জমি ভোগের পরিবর্ত্তে তাহারা দরবারের প্রয়োজনীয় সমস্ত কর্ম্ম করিত, তদ্রূপ রাজার অধীনে সামন্তেরা এবং তাহাদের অধীনে ছোট ছোট জমিদারেরা পর্য্যন্ত এই পদ্ধতির নকল করিত। রাজার অধীনে ভূ-স্বামীদের বাটীকে ইউরোপের মধ্যযুগে manor-house বলিত। ইহা হইতে এই পদ্ধতির নামকরণ হইয়াছে। বাঙ্গলার "চাকরাণ জমি" ভোগ করার প্রথা এই পদ্ধতির নিদর্শন। রাজপুতনাতে এই পদ্ধতি এখনও পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। তথাকার একটি রাষ্ট্রের মহারাজা হইতে গ্রাম্য জমিদার পর্য্যন্ত সকলেই এই পদ্ধতির অনুসরণ করে। ইহা দ্বারা রাজা হইতে জমিদার সকলেই পুরোহিত, কামার, কুমার, নাপিত, ধোপা, গোয়ালা প্রভৃতিদের জমি প্রদান করে এবং এইসব লোক জমি ভোগের বিনিময়ে বিনা বেতনে বা অর্থে ভূ-স্বামীর কাজ করিয়া দেয় (১৯)।

ভারতের ইতিহাসের অর্থনীতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা ফিউড্যালিসমের সমস্ত লক্ষণ নিরীক্ষণ করি, এবং তাহা একত্রিত করিয়া এই দেশের রাষ্ট্রে তাহার পূর্ণ বিবর্ত্তন হইয়াছে। তবে মুসলমান যুগে তাহা চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়ে; কারণ, এই যুগের ইতিহাস প্রাচীনকাল অপেক্ষা আমরা ভালভাবে পাই।

১৯। টডের "Annals of Rajasthan" নামক পুস্তকে একটি গল্প উল্লিখিত আছে। তদ্বারা এই পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একবার উদয়পুরের এক মহারাণা কোন কারণ বশতঃ তাহার গোয়ালার জমি কাড়িয়া লইয়াছিল। পরে আহারের শেষে রাণা যখন দধি খাইতে চাহেন তখন ভাণ্ডারী বলিল, "মহারাজ, আপনি আপনার গোয়ালার জমি কাড়িয়া লইয়াছেন; সে দই দিবে কি প্রকারে?"

মধ্যযুগীয় আন্দোলন

মধ্যযুগে পূর্ব্বোক্ত রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের সমাজ অবস্থিত ছিল। তখন মুসলমান শাসনকালে ভারতীয় সমাজ অখণ্ড ছিল না, বরং ভারতে দুইটি সতত যোধ্যমান ও পরস্পর বিপরীত ভাবাক্রান্ত সমাজ সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে অনেক হিন্দু নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া ভারতে মুসলমান সমাজের বৃদ্ধিসাধন করিতেছিল। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের জন্য প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত সভ্যতার সমস্ত পদ্ধতি ইহারা ত্যাগ করিতেছিল বলিয়া হিন্দুসমাজের সহিত মুসলমান সমাজের বিরোধ আরও দৃঢ়মূল হইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্ম ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং ইসলাম আন্তর্জাতিকতার প্রতীক হইয়াছিল। সে সময়ে হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করিলে ভারতীয় সভ্যতার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া "মুসলমান বেরাদারান" এই মনোভাব প্রকাশ করিত (২০)। কারণ অন্য ধর্ম্মের লোক মুসলমান হইলে তাহার একটা জাতিতত্ত্বীয় (Ethnological) পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। হালের আবিষ্কৃত "রসুল বিজয়" পুস্তকে এই পরিবর্ত্তন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় নিজেকে বাঁচাইবার জন্য হিন্দুসমাজও কমটবৃত্তি অবলম্বন করে। হিন্দু জাতিভেদ, আচার-ব্যবহার, এমন কি, বাহ্যিক বেশভূষার দ্বারা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। আত্মরক্ষার এই চেষ্টার ফলে এবং হাতে রাষ্ট্র না থাকায় শ্রেণী-সংগ্রাম এবং জাতি-সংঘর্ষ অপেক্ষা ধর্ম্ম-সংগ্রাম অর্থাৎ হিন্দু-ধর্ম্মীয় বনাম মুসলমান ধর্ম্মীয়দের সংগ্রাম ভারতের ইতিহাসে বিরাট আকার

২০। আরব ঐতিহাসিকদের দ্বারা মহম্মদ বিনকাসেমের সিন্ধুবিজয়ের পরের পরিস্থিতি বিষয়ে লিখিত একটি পুস্তকে উল্লিখিত আছে যে আরব নেতা একজন ব্রাহ্মণকে কয়েদ (আটক) করে এবং তাহাকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। পরে সেই ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব মনিব এক রাজার সহিত মুসলমান নেতার সন্ধি স্থাপিত হয়। রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকালে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পায়। কিন্তু সে রাজাকে দেখিয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় উঠিয়া সসম্মানে অভিবাদন করিল না। রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ব্রাহ্মণ উত্তরে বলে, "তুমি কাফের এবং আমি মুসলমান হইয়াছি; তোমার নিকট আমি আর মস্তক অবনত করিতে পারি না। এই গল্প সম্বন্ধে Elliot—"History of India. দ্রষ্টব্য।"

ধারণ করে। তত্রাচ শোষিত ও পতিত শ্রেণীয় লোকের ইহার মধ্যেও নিজেদের যথাসম্ভব সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মুসলমান-ভারতে হিন্দু সমাজ মস্তিকবিহীন হইয়া কেবল আত্মরক্ষার কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিল, তজ্জন্য রাষ্ট্রীয় সামাজিক সংগঠন কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা সমাজের যে পুনঃ-সংগঠন করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা বাঙ্গলার সামন্ত রাজা ও জমিদারদের সহায়তাতেই সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় (২১)। মোগল শাসনের পূর্ব্বে বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজ যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ন্যায় ছত্রভঙ্গ ও মস্তিষ্ক-বিহীন হয় নাই তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হিন্দু সমাজের গঠন এবং মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন জাতির "মেল বন্ধন," "একজাতি করণ", "সমীকরণ" প্রভৃতি এবং নূতন সমাজ-পদ্ধতির প্রচলন। মুসলমান শাসনকালেই বাঙ্গলার বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের বিবর্ত্তন পরিপূর্ণ হয়। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এই প্রদেশের হিন্দু-সমাজ মস্তিষ্ক-বিহীন হয় নাই। বাঙ্গলার সামন্ত রাজারা এবং ক্ষণিকের জন্য স্বাধীন হিন্দু নরপতিদের উত্থান এই কর্ম্মকে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বাঙ্গলার হিন্দুরা নিশ্চেষ্ট ও মস্তিষ্ক-বিহীন হয় নাই বলিয়াই বাঙ্গলায় শ্রেণীসমূহ এত ওলট-পালট হইয়াছে। বৌদ্ধযুগের অনেক শ্রেণী পতিতদের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে, অনেক নূতন শ্রেণী উত্থিত হইয়াছে, অনেক নূতন জাতি সৃষ্ট হইয়াছে—বৌদ্ধ-বাঙ্গলার সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। আর বিশেষ আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছিল সুদূর দক্ষিণে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে। এই সুদূর দক্ষিণে স্বাধীন রাষ্ট্রের আশ্রয়ে বৈদিক কৃষ্টির অনুসন্ধান করিয়া তাহার অনুশীলন হইতেছিল এবং দক্ষিণ-ভারত বৌদ্ধ ও জৈনদের সহিত কলহ করিয়া বেদান্তবাদের নামে বৈদিক-ধর্ম্ম প্রসূত ব্রাহ্মণ্যবাদকে আবার আক্রমণ-শীল করিয়া তুলিতেছিল।

ভারতের যখন এই অবস্থা তখন অধঃপতিত শ্রেণীগুলি কি করিতেছিল তাহার অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বৌদ্ধ ও জৈনেরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা ভাল চক্ষে নিরীক্ষিত হইতেন না। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের

২১। গৌড়ের ইতিহাস—১ম খণ্ড, ১৪৬—১৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পুনরুত্থান কালে তাঁহারা নানা প্রকারে নির্য্যাতিত হইতেন। দক্ষিণে বেশীর ভাগ সময়ে ব্রাহ্মণ রাজত্বের জন্যই বোধ হয় ব্রাহ্মণ্যবাদ বিশেষ গোঁড়া ও অত্যাচারী হয়। দ্রাবীড়ভাষী জাতিদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আশ্রয়ে আনয়ন রূপ অনুকম্পার প্রতিফল স্বরূপ ব্রাহ্মণ প্রাধান্য অতি নির্ম্মম হয়। আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার দেশে অতি ভীষণভাবে অব্যাহত রহিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে যে অত্যাচারিত ও শোষিতেরা অস্থির হইয়া তাহার একটা প্রতিকারের প্রচেষ্টা করিবে তাহা অসম্ভব নয়। দক্ষিণে প্রাচীন-কাল হইতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মীয় লোকসমূহ ছিল; কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি বৌদ্ধদের হাতে আসে নাই বলিয়া বোধ হয় তাহাদের ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। সুদূর দক্ষিণে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণ্যবাদ দৃঢ়-মূল হইয়াছিল, বোধ হয় সেখানকার লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করিয়াছিল (২২)। ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম (২৩) সেখান হইতে নিলোপ হইয়াছে, কিন্তু জৈনধর্ম্ম কিছুদিনের জন্য রাজশক্তি করায়ত্ত করার ফলে আজও স্বীয় ভক্তদের মধ্য দিয়া জীবিত আছে, যদিও তাহারা মুষ্টিমেয়।

মধ্যযুগে ভারত যখন নূতন পদ্ধতির কটাহে দ্রবীভূত হইতেছিল তখন একটি আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র নিরীক্ষিত হয়—সর্ব্বত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে একটা উদার ধর্ম্মমত উদ্ভূত হয় এবং ক্রমে তাহা ভারতব্যাপী হয়। এই নূতন ধর্ম্মে পতিত ও নিপীড়িতেরা স্থান পায়।

যখন সামন্ততন্ত্রীয় সমাজ অভিজাতদের অধীনে থাকিয়া গরীব ও পতিতদের নিষ্পেষণ করিতেছিল তখন পতিতেরা যে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়াছিল তাহা নহে। উত্তর ভারতে পতিতদের অনেকে সাম্যবাদীয় ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ করিতেছিল। সামাজিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া যখন একদিকে স্বীয় সমাজে নিজেদের উত্থানের উপায় নাই দেখিল, অন্যদিকে মুসলমান শাসকেরা বিজাতীয় হইয়াও

২২। চোল রাজাদের রক্তপাত দ্বারা জৈনধর্ম্মের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করার প্রমাণ আছে; Vaidya—Vol. iii, P 408.

২৩। S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, Pp 29—58.

সাম্যের পথ দিয়া নিজেদের সমাজে আসিতে আহ্বান করিল, তখন একদল পতিত সেই আশ্রয়স্থলে গিয়া দাঁড়াইল আর একদল হিন্দু সমাজের মধ্যে যে সংস্কার আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইল তাহার মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। পণ্ডিতেরা বলেন, ইসলামের আক্রমণের ফলেই হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলন উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ সাম্যবাদীয় ইসলামের আক্রমণের প্রতি-ক্রিয়ার ফলেই হিন্দুসমাজে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়।

আশ্চর্য্যের কথা, সাম্যবাদীয় হিন্দু প্রতিক্রিয়া বৈষম্যপূর্ণ হিন্দু দক্ষিণে প্রথম আরম্ভ হয়। যখন অভিজাতেরা শঙ্করের মতকে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ পরিপুষ্টিকর বলিয়া গ্রহণ করিতেছিল, বিজয়নগরের সম্রাট বক্কারায়ের অধীনে হেমাদ্রি স্মৃতির নূতন অর্থ করিয়া বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পরিপোষকতা করিতেছিল, আর সেই সাম্রাজ্যের সহায়তায় সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বেদ ও প্রাচীন সংস্কৃত ধর্ম্মপুস্তকের টীকা করিয়া বৈষম্যপূর্ণ ব্রাহ্মণাবাদের পুনঃ প্রচলনে সহায়তা করিতেছিল, তখন সুদূর দক্ষিণেই হিন্দুর মধ্যে সাম্যবাদের ভেরী বাজিয়া উঠে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই দক্ষিণ শ্রীরঙ্গম মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তন্মধ্যে রঙ্গনাথ ঠাকুরের মূর্ত্তি পুনঃ সংস্থাপিত হয় (২৪)। এই দেবতার উপাসক বৈষ্ণব চূড়ামণি বেদান্তদেশিক, বিজয়নগর সম্রাটের দরবারে থাকিবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া রামানুজের উপদেশ অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ-ভারতের বৈষ্ণবধর্ম্মের শেষ রূপ পরিগ্রহণে সবিশেষ সহায়তা করেন (২৫)।

সুদূর দক্ষিণে তামিল সাহিত্যের প্রারম্ভে ভক্তিমার্গীয় শৈবধর্ম্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে নাণিক্কভাসাগারের তিরুভাসাগাম, তিরু ভাষাইপ্পা এবং তিরু পাল্লাণ্ডু নামক বিখ্যাত ধর্ম্মপুস্তক রচিত হয়। কাহার কাহার মতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মণিক্কাভাসাগার প্রকট হন। ইনি সিংহলাগত বৌদ্ধদের তর্কে পরাস্ত করেন। ইহার পর দ্বাদশ শতাব্দীতে "বীরশৈব" নামে

২৪। S. K. Aiyangar—Some contributions of South India to Indian Culture, P 308.

২৫। S. K. Aiyangar—Some contributions of South India to Indian Culture, Pp 311—312.

আক্রমণশীল শৈব মত এই দেশে উত্থিত হয়। তেলিঙ্গানার কাকটিয়া দেশেই এই মত প্রথম প্রকট হয় (২৬)। কোথা হইতে শৈবধর্ম্ম এই নূতন তেজ প্রাপ্ত হয় তাহার স্পষ্ট নিদর্শন নাই; তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গলা আক্রমণ কালে কতকগুলি শৈব ব্রাহ্মণ সেখান হইতে স্বদেশে লইয়া যায় (২৭); আবার কাকাটিয়া ১ম রুদ্রদেবের রাজত্বকালে বুন্দেলখণ্ড হইতে লোক গিয়া এই দেশে বসবাস করে (২৮)। রাজেন্দ্র চোলের সময়ে কোশলের জঙ্গল ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশিকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। ইহারা আর্য্যাবর্ত্তের উপর গজনীর মামুদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে এই স্থানে আশ্রয় নেয় (২৯)। মাহমুদের ভারতে শেষ আক্রমণ ও রাজেন্দ্র চোলের এই স্থান আক্রমণ (১০২৪—২৫) একই বৎসরে হয়। বোধ হয় এই সব বিতাড়িত ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণের এই হিন্দু রাজত্বের দ্বারা দ্রাবিড় দেশে অতিথি-রূপে গৃহীত হন। তৈলঙ্গ দেশের গোলাকি মঠ, বুন্দেলখণ্ডের দাহালা হইতে আগত শৈব ব্রাহ্মণ দ্বারা স্থাপিত হয় (৩০)। ইহাদের নিকট হইতে নব-শৈব মত সংগঠিত হওয়ার উদ্দীপনা প্রাপ্ত হয়।

এই বীর-শৈবধর্ম্ম জাতিভেদ বর্জ্জন প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক সংস্কার সাধন করে। এই ধর্ম্ম আন্দোলন কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত হয়—স্থিতিশীল (conservative) ও চরমপন্থীয় (radical)। প্রথমোক্তটি ব্রাহ্মণদের এক-চেটিয়া হয়; অপরটি জাতিভেদ বর্জ্জন করে। এই শেষোক্ত ভাগটি বাসব কর্ত্তৃক সংগঠিত হয়; এবং ইহা "লিঙ্গায়েৎ" নামে আজও পর্য্যন্ত পরিচিত হইতেছে। এই সম্প্রদায় জাতিভেদ বর্জ্জন করে এবং বলে যে ব্রাহ্মণদের কোন বিশিষ্ট পবিত্রতা নাই এবং সকলেই চরমস্থানে পৌঁছিতে পারে। যখন বৈষ্ণবেরা বর্ণাশ্রমের গণ্ডী পরিত্যাগ করিতে পারিল না সেই সময়ে বাসব

২৬। S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 247.

২৭। E. R. Rep. 1917, Secs. 30—37.

২৮। S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 247.

২৯। S. R. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 260.

৩০। " " " "

জাতিভেদ ত্যাগ করে এবং তাহার সময়ে তাহার দলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের বিবাহও সম্পন্ন হয় (৩১)। বাসব সাধনাক্ষেত্রে সন্ন্যাস ও ত্যাগ ভাব বর্জন করে এবং বলে যে প্রত্যেকে নিজের পরিশ্রমের রোজগার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং কখন ভিক্ষা করিবে না (৩২)। এই আইন তাহাদের পুরোহিত-জঙ্গমদের উপরও বলবৎ হয়। বাসবই প্রথম ভারতীয় ধর্ম্মনেতা যিনি শ্রমের যথার্থ সম্মান প্রদান করেন এবং ভিক্ষা করিতে বারণ করেন। তিনিই একমাত্র ধর্ম্মপ্রচারক যিনি বলিয়াছেন, কেবল কায়িক শ্রম (কায়ক) দ্বারা কৈলাস যাইতে পারে! আজ পর্য্যন্ত কর্ণাটকের কৃষক ও ব্যবসায়ী লোকদের মধ্যে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় দলে ভারী।

এতদ্ব্যতীত এই সম্প্রদায় নিজের গায়ত্রী এবং বংশগত গোত্র-প্রবর পৃথক করিয়া লইয়াছেন (৩৩)। বাসব উপদেশ দিতেন যে, সকল জাতিই লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, এই সম্প্রদায় বিধবাদের বিবাহ দেয় এবং মৃত দেহের কবর দেয় (৩৪)।

এতদ্বারা আমরা দেখি যে মুসলমান আক্রমণের পরে এই সম্প্রদায় সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের লোকদের দ্বারা উদ্দীপনা পাইয়া একটা নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করে এবং ইহার মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সংস্কারগুলি বাদ দেয়। কিন্তু কাল-ক্রমে ইহার মধ্যেও জাতিভেদ উদ্ভূত হইয়াছে ; ইহাদের আচার্য্য ও জঙ্গমেরা ব্রাহ্মণের স্থান গ্রহণ করিয়াছে (৩৫)।

ইহার সম-সাময়িককালে আর একটি ভক্তিবাদী সম্প্রদায় দক্ষিণে উত্থিত হয় ; ইহারা বৈষ্ণব নামে পরিচিত হয়। "আলওয়ার" আখ্যা প্রাপ্ত ধর্ম্ম প্রচারকেরা এই মত প্রচার করিত। ইঁহারা বলিতেন, যাঁহারা নৈষ্ঠিক পদ্ধতিতে স্থান পায় না তাহারাও মুক্তি পাইবে। এতদ্বারা তাহারা বৌদ্ধ, জৈন, এমন কি, আগমবাদী শৈবদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া লোকদের

৩১। C. V. Vaidya—vol. ii, Pp 420—422.

৩২। S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, p 286.

৩৩। C. V. Vaidya—vol. ii, P 422.

৩৪। C. V. Vaidya—vol. ii, P 423.

৩৫। C. V. Vaidya—Vol. II, P 422.

নিজেদের দলে টানিয়া আনিতেন। এই মতটি প্রথমে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উদারভাব মাত্র ছিল। এই বৈষ্ণব দলের বার জন সাধুর মধ্যে সকল জাতির লোক ছিল, তন্মধ্যে নাম-আলওয়ার শূদ্রজাতীয় ছিলেন; ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু ছিলেন। এই সংখ্যার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। একজন সাধু পারিয়া (অস্পৃশ্য) জাতীয় ছিলেন; ইঁহার নাম ছিল যোগীবহ। বোধ হয়, ইনি পরবর্ত্তী কালের সাধু ছিলেন (৩৬)।

অবশেষে শিষ্য পরম্পরায় যমুনাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের নেতা হন। ইনি প্রথম চোল রাজাদের সময়ে যখন ধর্ম্ম সম্পর্কীয় তর্কে দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল, তখন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্রীর পুত্রই বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক রামানুজাচার্য্য (৩৭)। ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মায়াবাদী বৈদান্তিকদের মত খণ্ডন করিয়া বেদান্তের নূতন ব্যাখ্যা দেন; ইহাকে বৈশিষ্টাদ্বৈত মত বলে। রামানুজ বলিলেন, সমাজে মানুষের যে-স্থানই থাকুক, যদি সে ধার্ম্মিক জীবন যাপন করে তাহা হইলে সে অন্যান্য লোকের ন্যায় ঈশ্বরের নিকট সমানভাবে দাঁড়ায় (৩৮)। ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মকে দক্ষিণে পাকা ভিত্তিতে সংস্থাপিত করেন এবং নিজে শূদ্র ও পতিতদের সাদরে আহ্বান করেন। তাঁহার সময়ে আভিজাত্য ব্রাহ্মণ্যবাদ একটা ধাক্কা খায়। এই সময়ে বৈষ্ণব ও শৈবেরা বৌদ্ধ ও জৈনদের বিরুদ্ধে জোর প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিল (৩৯)। রামানুজের দক্ষিণের একজন বৈষ্ণব শিষ্য ব্রাহ্মণ গোঁড়াদের অত্যাচারে পলায়ন করিয়া উত্তরে কাশীতে বাস করেন। ইনিই রামানন্দ এবং উত্তরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক হন। জনশ্রুতি এই—ইনি নিরাকারবাদী ছিলেন এবং জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার শিষ্য ছিলেন বিখ্যাত জোলা (তাঁতী) কবীর।

জনশ্রুতি এই—কবীর মুসলমানবংশীয় ছিলেন (গুরু গ্রন্থসাহেবে তাঁহাকে

৩৬। S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 268.

৩৭। S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 282.

৩৮। S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 285.

৩৯। S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 291.

স্পষ্টই মুসলমানবংশীয় বলা হইয়াছে) (৪০), তিনি একটি নিরাকার ও জাতিভেদ-বিহীন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। কবীর দুই ধর্ম্মের লোকদের একত্রিত করিবার চেষ্টা করেন। এইজন্য প্রবাদ এই, তাঁহার মৃত্যুর পর দুই ধর্ম্মের লোকেরা তাঁহাকে নিজেদের বলিয়া দাবী করে। তৎপর, এই যুগে ব্রাহ্মণ তুলসীদাস রামায়ৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন বা উহার প্রসারে সহায়তা করেন। দাদূ নামক জনৈক অব্রাহ্মণ (ইনিও ধুনিয়া জাতীয় ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়) (৪১)। কবীরের ন্যায় একটি নিরাকার এবং জাতিভেদ-বিহীন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। পাঞ্জাবে এই সময়ে অব্রাহ্মণ নানকও একটি নিরাকারবাদী ও জাতিভেদ-শূন্য শিখধর্ম্ম সৃষ্টি করেন। এই মধ্যযুগে বাঙ্গলায় আমরা চৈতন্যের আবির্ভাব নিরীক্ষণ করি। চৈতন্যের যুগে গুজরাটে বল্লভাচার্য্য বেদান্তের দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া একটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে তিনি শেষে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। এই যুগে দক্ষিণে বেদান্ত দেশিকের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য উদয় হইয়া বেদান্তের আর একটি ব্যাখ্যা দেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মীয় একটি সম্প্রদায় গঠন করেন। প্রবাদ এই বাঙ্গলার বৈষ্ণব পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ নিজে বেদান্তের একটি টীকা করেন। তিনি মধ্বাচার্য্যের টীকা মানিয়া নেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশও নূতন ধর্ম্ম আন্দোলনের ঢেউ এড়াইতে পারে নাই ; তথায় নামদেব, জ্ঞানদেব প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশক উদয় হন এবং এই যুগের দুইশত বৎসর পর গরীব ও শূদ্র সাধক তুকারাম বৈষ্ণব ধর্ম্মের জোর প্রচার করেন।

নূতন ধর্ম্মের এই ঢেউ হিন্দুর অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। অনেক অজ্ঞাতনামা মহিলার সহতীর্থ হইয়া রাজপুত কন্যা মেবারের রাজবধূ মীরাবাঈ এই ধর্ম্মের সাধক হইয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণবাচার্য্যের (রূপ গোস্বামী) সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধক-রূপেই পরলোক গমন করেন। ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

৪০। রামকুমার বর্ম্মা—হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৪১। শ্রীক্ষিতি মোহন সেন—"দাদূ"।

মোহানা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আড্ডায় ফিরে এসে সফীক বিছানায় শুয়ে পড়ল। এই দেহটা কত সহ্যই না করতে পারে! ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, শান্তি, কোনো কিছুরই অভাব বোধ হয় না। কোথা থেকে শক্তি উৎসারিত হয়ে সকল ক্ষতির পূরণ করে। করিম একদিন বলছিল লোহা-লক্কড়েরও জান্ আছে, তারাও এলিয়ে পড়ে, খুব খানিকটা ব্যবহারের পর ভয় হয় এই ভাঙ্গল, একটু জিরোন দাও, আবার তাজা হয়ে যায়! শক্তি গোপনে সঞ্চিত থাকে। করিম অত খেটেছে সারা জীবন ধরে, তার ওপর বাড়ীতে বৌ ও কারখানায় মালিকের আক্রোশ বহন করেছে, তবু সে ভাঙ্গেনি, মচকায়নি, মিল্-কমিটির কাজ সে পুরোদমে চালিয়েছে। তার জোর এল সংঘাত থেকে, নিজেদের তৈরী অনুষ্ঠান থেকে, সক্রিয় জনগণের বিপ্লবেচ্ছা থেকে। তার মতন কর্ম্মীই ভবিষ্যতের ভরসা। আরো কিছুদিন ধর্ম্মঘট যদি চালান সম্ভব হয় তবে মজদুর-সভার বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বের পরিবর্ত্তে সমগ্র মজদুর-শ্রেণীর বুকচেরা অধিনায়কত্ব জন্মলাভ করবে। করিম বুঝবে, অন্যেরা বুঝবে না। তাদের সহানুভূতি ভাববিলাস মাত্র। আজ যদি করিম সমঝোতা না চায়, তবেই মঙ্গল, নচেৎ খুচরো সংস্কার আর বোঝা-পড়ার আবর্ত্তে নৌকা হাবুডুবু খাবে, ঘাটের কাছে ভরাডুবি হবে।

বিজন ব্যস্ত হয়ে এসে বল্লে, 'ওস্তাদ, ব্যাপারটা চুকে গেল মনে হচ্ছে।' একটু যেন বেশী ব্যগ্র, কি যেন ঢাকতে চায়।

সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'নতুন খবর কিছু আছে?'

বিজন—'গুজোব ত অনেক রকম। তোমার কি ধারণা?'

সফীক—'তোমার?'

বিজন—'আমার ধারণা এই অবস্থায়, এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে—'

সফীক—'বিপ্লব সাধিত হয় না, বরাবরই এই বলেছি···কেমন? তবে তুমি অত ছোটাছুটি কর কেন? হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেই পার। খগেন বাবু ও তাঁর সঙ্গে যিনি এসেছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

বিজন—'ওঁরা প্রায়ই তোমার কথা ভাবেন। নতুন বাড়ি ঠিক হয়েছে।'

সফীক—'ভাল। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যাই হোক, করিমরা যা ভাবে তাই হবে শেষে।'

বিজন—'তবু, তুমি যা বলবে তাই ত' হবে।'

সফীক—'আমাদের কোনো অধিকার নেই ওদের বিপক্ষে যেতে।'

বিজন—'বিনা নেতৃত্বে ওরা সামলাতে পারবে না ভয় হয়। আমরা না হয় বাইরের লোক দিয়ে কল চালান বন্ধ করলাম, তারপর? আমাদের লড়বার ক্ষমতা অসীম নয়।'

সফীক—'মাত্র বন্ধটুকুই না হয় কর, তারপর দেখা যাবে। কাল রাত্রে কোথায় ছিলে তুমি? ঘষতে ঘষতে বিদ্যুৎ জন্মায়, শক্তিটা বালতীর জল নয়, স্রোতের বহতা...বুঝেছ? শক্তি বাপের সম্পত্তি নয়, অর্জ্জিত ধন। সে যাই হোক মজুররা ফিরতে চায় বলছ...'

বিজন—'ফিরতে চায় বলছি না...খগেন বাবুর কাছে ঐ ধরণের অনেক কথা শুনেছি, যদিও তিনি বাপ তোলেন না।'

সফীক—'ফিরতে বাধ্য, ফেরা উচিত, একই কথা, মাত্র একটু বেশী খারাপ কথা। তুমি তারা কি চায় বেশী জান, না করিম জানে?'

বিজন—'এক হিসেবে করিম অবশ্য, কিন্তু...'

সফীক—'এর মধ্যে কিন্তু নেই। যা কিছু কিন্তু ঐ মাতব্বরীটুকু ছাড়বার বেলা।'

বিজন সিটিয়ে গেল। সফীক মেজের ওপর থেকে একটা পোড়া বিড়ি তুলে বিজনের গায়ে ছুঁড়ে দিলে...'বিজন, বিঁড়ি খেতে শেখ হে। পার্থক্য দূর হয়।' করিম ঘরে আসতে সফীক লাফিয়ে উঠে প্রশ্ন করলে, 'খবর কি?'

'কাল রাতেই ওরা লোক আনবার মতলবে ছিল, কিন্তু পারে নি। আজ আনবেই ওরা, কারণ, ওরা কাল পরশু সরকারের কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে।'

বিজন—'সর্ত্তগুলো যদি ভাল হয়, তবু খানিকটা লাভ নয় কি, করিম ভাই।'

করিম—'আরে ভাই, তাই কখনও হয়। এখন গুঁতোর চোটে যাই বলুক

না কেন, হয়তো না তার অভাব হবে না, তখন আবার ধর্ম্মঘট চালাতে হবে। কে-একজন অফিসার থাকবে শুনছি, প্রথমে তার দরবারে নালিশ করা চাই, তিনি ওদের ডাকবেন, ওদের কথা শুনবেন, তার পর, কতদিন পরে কে জানে, রায় বেরুবে। সে-রায় ওরা শুনবে কেন, যদি আমাদের স্বপক্ষে সেটা যায়! অফিসার হবে সায়েব মানুষ, সে ওদের সঙ্গে খানা খাবে, ওদের মেমেদের সঙ্গে নাচবে···অর্থাৎ ধর্ম্মঘট বন্ধ হল চিরকালের জন্য।'

সফীক—'কার কাছে শুনলে ?'

করিম—'উধামজীর বাড়িতে ভিড় জমেছে, সেইখানে শুনছিলাম।'

সফীক—'আর কি শুনলে ?'

করিম—'উধামজী না কি বলেছেন যে সরকার চান না যে এখানকার ব্যবসার কোনো ক্ষতি হয় অনবরত সত্যাগ্রহের চোটে। সরকারের মত, দেশের ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখা, তাকে বাড়ান, এ-সবই দেশের কাজ।'

সফীক—'তোমরা কি করবে ?'

করিম—'ওস্তাদ, ষ্ট্রাইক করতে পারব না এ কেমন কথা! ওরা যাকে ইচ্ছে তাড়াবে আর আমরা বাকি সব ভাল মানুষের মতন কাজ করে যাব— আমরা যেন মেশিন! এ হয় না।'

সফীক—'তোমরা মেশিন কে বল্লে! তোমাদের ভোট আছে যখন, তখন তোমরা মানুষ, নিশ্চয়ই মানুষ। চাকরী গেলে ভোট থাকবে। তা ছাড়া নতুন জজের কাছে দরখাস্ত দিলেই গোল চুকে গেল।'

করিম—'ও-সব আদালতী ব্যাপার আমাদের জানতে বাকী নেই। মোকদ্দমা চালাতে কতদিন লাগে ? তাতে খরচ নেই ? এই ত' কানুন রয়েছে দরখাস্ত দেবার পর হাত-পা ভাঙ্গলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে টাকা দেবে। ক'জন দরখাস্ত দেয়, ক'জন পায়, কেন দেয় না, কেন পায় না ? অত হাঙ্গামা যদি গরীবরা পোয়াতে পারত তবে আর ভাবনা ছিল না। এখন ত' ফাঁসি হোক, পরে আপীলে খালাস পাওয়া যাবে ভেবে ক'জন ফাঁসিকাঠে গলা দিতে পারে ? ও-সব আইন-আদালত বুঝি না—অফিসার লোক ওদের এক গেলাসের ইয়ার, ওদের বিবিদের দোস্ত—ওদের হাতে সেই ঘুরে ফিরে পড়তেই হবে। ষ্ট্রাইক করব—সরকার যা ভাবেন ভাবুন গে!' বলতে বলতে করিমের মুখ বেঁকে যায়,

দু-হাতের আঙুল ঘোরে যেন কল চালাচ্ছে, চোখ জ্বলে ওঠে, যেন মোটরের হেড-লাইট পড়েছে বন্য জন্তুর চোখে।

সফীক—'এখন কি করবে তোমরা ?'

করিম—'তাই-ত' ভাবছি। মজদুর-সভা কি করে দেখা যাক।'

সফীক—'সেখানে আরো অনেকে আছেন ভুলো না।'

করিম—'জানি ওস্তাদ। কিন্তু আমাদের নিজেদের সভার বিপক্ষে ত যেতে পারি না।' বিজন সোল্লাসে সফীকের দিকে চাইল।

সফীক—'কে যেতে বলছে বিপক্ষে! তবে মজদুর-সভাকে সঙ্গে নিতে হবে, যদি অচল হয় তবে টেনে নিয়ে যাওয়া চাই।'

করিম—'ওস্তাদ তুমি নিজে সেই সময় মিটিং-এ থেকো।'

সফীক—'দেখি। তার আগে তোমাদের কোনো কাজ নেই? তোমরা আর লড়তে পারছ না স্বীকার কর।'

করিম—'আমরা খুব পারব।' ও-কথা মুখে এন না ওস্তাদ, পাপ হবে।'

সফীক—'বিজনের তাই বিশ্বাস।'

বিজন—'আমি কখ্‌খনও তা বলি নি।'

সফীক—'ঠিক ঐ-ভাষা না হোক, অর্থ তাই।'

বিজন—'আমার ধারণা…'

সফীক—'তোমার ধারণা পকেটে তুলে রাখ, সুগন্ধী হবে, তার পর তোমার ভাবী-স্ত্রীকে উপহার দিও।'

বিজন—'ভদ্র মহিলার নাম না হয় নাই আনলে টেনে এখানে।' বিজন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দেখে করিম তাকে উদ্দেশ্য করে বল্লে, 'ঘাবড়াচ্ছেন বাবুজী। আমরা পারব।'

বিজন—'পারলেই ভাল। 'আমরা' কারা ?'

করিম—'আমরা সকলে। কেবল আমাকে নয়, আমার সঙ্গে প্রত্যেককে, শুধু আমি কেন, আমি ত' বুড়ো হয়েছি, প্রত্যেকটি মজুর, যাকে যাকে তাড়ান হয়েছে বিনা কারণে, মজদুর-সভার সঙ্গে যোগ আছে বলে, তাকে তাকে যদি ওরা ফেরৎ না নেয়, তখন দেখবেন বাবুজী আমরা ক'জন!' সফীক করিমকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি এক কাজ করতে পার? আচ্ছা, চল আমিই যাচ্ছি।

বিজন, তুমি আর খগেন বাবুকে কষ্ট দিও না।' করিম বল্লে, 'বাবুজীও আসুন না।' বিজন জবাব না দিয়ে চলে যাবার পর সফীক আর করিম রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

সফীক—'আমি একবার তোমাদের মিল্-কমিটির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

করিম—'তারা এখন বোধ হয়, ঠিক জানি না কোথায়, উধামজীর বাড়িতে পাওয়া যাবে।'

সফীক—'তাই চল। আমি না হয় বাইরে থাকব।' করিম হেসে বল্লে, 'তা বটে, বাইরে থাকাই ভাল, উধামজী আবার উল্‌টো ভাবতে পারেন।'

উধামজীর বাড়ি গস্ গস্ করছে, বিস্তর মোটর, বনেট্-এ ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা, একটিতে লাল সালুকের উপর অর্দ্ধচন্দ্র, অন্যটিতে গৈরিক-পতাকা, ফাটকের বাইরে সারি সারি টঙ্গা, প্রাঙ্গনে মজুর জনকয়েক। ওপরের বারাণ্ডায় চাঞ্চল্য, চাকরে চা-জলপান সরবরাহ করছে। সিঁড়ি দিয়ে করিম ওপরে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় একজন খাকি-খদ্দরের হাফ-প্যান্ট্ পরা স্বেচ্ছা-সেবক দুটো লাঠি তেরছা করে পথ আটকাল। এখন দেখা হবে না, আধঘণ্টা পরে আসিতে বল্লে। ওপরতলার ঘরের পর্দ্দা বাতাসে উড়ছিল, ভেতর থেকে আওয়াজ এল 'আইয়ে।' স্বেচ্ছাসেবক পথ ছেড়ে দিলে। করিম ভেতরে যেতেই উধামজী তার কাঁধে হাত রেখে বল্লেন, 'কি খবর ভেইয়া?'

করিম—'খবর ত' আপনিই দেবেন। খবরের মালিক ত' আপনিই।' উধামজী করিমকে নিয়ে বারাণ্ডায় এলেন, চোখে হাসি ঠোঁটে হাসি, চুপি চুপি বল্লেন, 'অনেক কোশীসের পর জেতা গেছে। এখন তোমার মত কর্ম্মীরা, যারা সত্যকারের কাজের লোক, কেবল বাক্যবাগীশ নয়, বিলেতী বুলি কপচায় না, তোমরা একটু মদৎ দিলেই ফতে। রফী সাহেবের উপস্থিতিটা বড়ই সমীচীন হয়েছে। ওঁরা একটু চা-পান করছেন। কিছু বলবার থাকে আমাকেই বল।'

করিম—'উধামজী, আপনাকে ছাড়া কি ওঁদেরকে বলব। সর্ত্তগুলো কি?'

উধামজী—'সবই একটু বাদে টের পাবে। তবে, জেনে রেখো আমাদেরই জিৎ।'

করিম—'জিৎ কি হিসেবে ?'

উধামজী—'যাদের বিনা অজুহাতে তাড়িয়েছিল তাদের ফিরিয়ে নেবে ওরা। সব চেয়ে আনন্দের কথা এই যে তোমাকেও আর বাইরে থাকতে হবে না। তবে কাগজ-পত্র নিয়ে একটু গোল আছে, তোমার। আরে ভাই, রাজি কি হয়। শেষে ভয় দেখান হল ফ্যাক্টরী জোর করে খুলতে গেলেই ১৪৪ ধারা জারি হবে সহরে। এখন ওপক্ষ মিটিং করছেন সর্ব্বস্বীকারের জন্য। আশা করছি আজ কালের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। ওধারে দেখছ ত' ভেইয়া, টাকা ঠিকমত উঠছে না, তার উপর একবার দাঙ্গামা বাধালেই হল, তখন ঠ্যালা সামলাতে সেই উধামজী।'

করিম—'হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধবে না, ঘাবড়াচ্ছেন কেন, উধামজী ?'

উধামজী—'তুমি ত ব'লে খালাস। ভাগ্যিস এখনও বাধে নি। তোমরা ফিরে আসছ এই যথেষ্ট, এর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ।'

করিম—'উধামজী, শুনছি কে একজন অফিসার আসবে যার কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হবে ?'

উধামজী—'সেই কথা চলছে। ওটা একটা বাহানা মাত্র। আসল কথা তোমরা।'

করিম—'মাপ করবেন উধামজী, আমি অত-শত বুঝি না। ওরা গুঁতোর চোটে না হয় আমাদের নেবে, কিন্তু দু'দিন পরে আবার তাড়াবে। তাই মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক আমরা নই, অন্য একটা।'

উধামজী করিমকে বারাণ্ডা থেকে ভেতরের অন্য একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। 'করিম ভাই, একটু চা দিই, না সে কিছুতেই হয় না।' হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে করিম বল্লে, 'দেখুন বাবু সাহেব, ব্যাপারটা সুবিধের নয় মনে হচ্ছে।'

উধামজী—'কেন, কেন, কেন ? তুমি ভাবছ অধিকারের কথা, কিন্তু আমাদের লড়াইএর কারণটা কি ? জনকয়েককে তাড়িয়েছিল ওরা, আমরা বল্লাম তা হবে না, নিতেই হবে ফিরিয়ে। রাজি কি হয়। কত ধ্বস্তাধ্বস্তিই না চলল সে কি বলব। আর যাতে কথায় কথায় বরখাস্ত না হয় তার বন্দোবস্ত পাকা না করে আমরা ছাড়ছি না।'

করিম—'ওরা যা করত, তাই করবে।' উধামজী হো-হো করে হাসতে

লাগলেন, হাসি আর থামে না, সর্ব্বদেহে ছড়িয়ে পড়ে, প্রতি অঙ্গ নাচতে থাকে, মাথা পিছন দিকে ঝোঁকে, দুটো হাত ওপরে ওঠে, মুখের মধ্যে সোনা বাঁধান দাঁত চোখে পড়ে, তাতেও পানের কালো ছোপ, হঠাৎ হাত দুটো হাঁটুর উপর এল, দেহ কুঁজো হল, হাসির গর্‌রায় করিম অপ্রস্তুত। উধামজী সোজা হয়ে উঠে বল্লেন, 'ভেইয়া, ও-টুকু বিশ্বাস হল না আমাকে? আর কিছু বুঝি আর না বুঝি, হাওয়া বদলেছে এ-টুকু বুঝি। আর, বাছাধনেরাও বোঝে। কিন্তু, করিম ভাই, একটা প্রশ্ন করি তোমাকে…এত অধিকার শিখলে কোথেকে? ও-সব এখন রেখে দাও। অধিকার কি ভাই হাওয়ায় ঝোলে? ও-সব পণ্ডিতী বিলেতী বোলচাল তোমার আমার মুখে শোভা পায় না।'

করিম—'অধিকারটা ওদেরই রইল তবে?'

উধামজী—'মোটেই না। অবশ্য কথাটা উঠেছিল বটে, কিন্তু প্যাঁচ্ কাটান গেছে। আমি বল্লাম, সরকার যে নতুন অফিসার নিযুক্ত করবেন তাঁরই হাতে ভার দেওয়া হোক।'

করিম—'কিসের ভার? তিনি ত তাড়াবার আগে নয়, পরে শোচ-বিচার করে রায় দেবেন? তার পর, তাঁর রায় গ্রহণ করা ওদের মর্জ্জি। এ যেন কি রকম লাগছে।'

উধামজী—'ভাই আমারও কি ভাল লাগে। কিন্তু এধারে দেখছ ত। আমরা কতদিন চালাতে পারব তার ঠিকানা নেই। ওরা খুব জব্দ হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু আমাদের অবস্থাও ত' সঙ্গীন, সেটা আমি জানি, টাকা তুলতে হয় সেই আমাকেই। অন্য অন্যবার একজন না একজন মালিকের কাছে মোটা টাকা পাওয়া গেছে, এবার একজনও উপুড় হস্ত করলে না। জব্দ যখন ওরা হয়েছে, আমরা যখন জিতেছি, ব্যস্…করিম ভাই ভেতরে চল, তোমার মতন লোককে মন্ত্রীরা দেখলে খুশীই হবেন। তোমরাই ভারত মাতার কৃতী-সন্তান…তোমরাই…সত্যি বলছি ভাই, তোমরাই…মা এখনও উর্ব্বরা… একধারে মহাত্মাজী অন্যধারে তোমরা…দুপাশ থেকে দু'হাত ধ'রে তোমরা মা-কে এগিয়ে নিয়ে চলেছ অন্ধকার পথে…তোমাদের আঁখির রোশনীতে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হল…সেই আলোয় আঁধেরা পালাল…না, না, সে হয় না, করিম-ভাই…অবশ্য কাজ যদি থাকে তবে অন্য কথা…তোমার সঙ্গে আমার কোনো

তকলুফ্ নেই···তবে ভাই একটি অনুরোধ রাখতেই হবে···আজকের সভায় হাজির থেকো।'

করিম—'বাইরের মিটিংএ কিছুই হবে না, যতক্ষণ না মজদুর-সভায় ঠিক হয়।'

উধামজী—'নিশ্চয়ই, মজদুর-সভার সকলেই সেই সভায় থাকবে। তোমরা কি ভাবছ যে লুকিয়ে লুকিয়ে বোঝাপড়া করছি? না, তা কখনও হয়। আমি থাকতে সেটা অসম্ভব জেনে রেখো। তবে, কেবল মজদুর-সভা কেন? তোমাদের মদৎ কি সহর শুদ্ধ লোকে দেয় নি? তাদের বাদ দিলে তারা কি ভাববে? সেটা কি আমাদেরই ভাল হবে?'

করিম—'আগে মজদুর-সভা মেনে নিক্, তারপর সাধারণ মিটিং হোক্।'

উধামজী—'চমৎকার কথা। কিন্তু স্বীকার করছি ভাই; এর মধ্যে আমাদের একটু চাল আছে। মন্ত্রীপক্ষ থাকতে থাকতে ওদের আটকে ফেলতে চাই। ও-পক্ষকেও সেখানে আনব, ওদের মুখ দিয়ে কথা বা'র করিয়ে নেবো।'

করিম এবার হেসে ফেলে মাথা নাড়তে লাগল। উধামজী বল্লে, 'দেখই না, করিম ভাই, যাতে হাত দিয়েছি সেটা কখনও ফস্কেছে? তুমিই বল, গুমোর করছি না। আমরা ত' পিছনে আছিই। যদি ওরা অমান্য করে তবে এবার শেষ-দেখা দেখে নেবো। তুমি কি ভাব ওরা এতই বোকা যে এই সোজা কথাটা ওদের মাথায় ঢোকে নি? কথাবার্ত্তার সময় যদি একবার ওদের মুখভঙ্গি দেখতে! ভাঙ্গবে ত' মচকাবে না!' উধামজী ওদের মুখভঙ্গী অনুকরণ করলেন। করিম গম্ভীর হয়ে বল্লে, 'যদি পিছনেই আছেন সর্ব্বদা তবে মজদুর-সভাকে আগেই থাকতে দিন।' উধামজী ব্যস্ত হয়ে পিছনে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, 'এখনই হাজির হচ্ছি, আভি···করিম ভাই, একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না—সরকারের সহানুভূতিটা ফেলে দেবার জিনিষ নয়, কংগ্রেস একসঙ্গে কজনের সঙ্গে লড়বে!' উধামজী সিঁড়ি দিয়ে নেমে করিমকে উঠানে পৌঁছে দিলেন। উঠানে জনকয়েক মজুর দাঁড়িয়ে রয়েছে, উধামজী তাদের কাঁধে হাত দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। করিম বেরিয়ে এল। উদাত্ত কণ্ঠস্বর ও হাসির রেশ অনেকদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে চলল।

ফাটকের বাইরেই মহবুবের সঙ্গে দেখা। মহবুব বল্লে, 'ব্যাপার সুবিধের নয়। যদিও গুণ্ডারা এখন ফাটকের ভেতর, তবু লরিভর্ত্তি লোক আসবে আজই, চুক্তির আগেই।' দুজনে ছুটল সফীকের কাছে। পথে করিম অন্য দুজন মজুরকে সঙ্গে নিলে। তারাও মিল্ কমিটির মেম্বর—বিতাড়িত। সফীক একটা ল্যাম্প্ পোষ্টের তলায় দাঁড়িয়েছিল। সফীক খবর জানবার ইঙ্গিত করাতে করিম বল্লে, 'ওস্তাদ, যা শুনেছ তাই ঠিক, তবে ও-পক্ষ এখনও মত দেয়নি। উধামজী আশায় আছেন যে ওরা মেনে নেবে, আমরাও।' সফীক খানিক নীরব থাকার পর জিজ্ঞাসা করলে, 'এরা ত' মিল-কমিটির লোক, এদের বক্তব্য শোনা যাক।' একজন বল্লে, 'করিম ভাই ভাল করেই জানে যে এ-বন্দোবস্ত চলবে না।' কণ্ঠে উষ্মা এনে সফীক মন্তব্য করলে, 'করিম ভাইকে ছাড়, তোমাদের কি বিশ্বাস?' উত্তর এল—'এ কখনও হয়!'

সফীক—'যদি না কখনও সম্ভব হয় তবে সমঝোতা মেনে নিতে অত ব্যগ্র কেন?' করিম তাদের হয়ে জবাব দিলে—'ব্যগ্র নই, ওস্তাদ। তবে একটা দিক আছে—আমরা যদি বাগড়া দিই তবে উধামজী ও তাঁর দলের লোককে পাওয়া শক্ত হবে।'

সফীক—'কথাবার্ত্তায় তাই বুঝলে?'

করিম—'অনেকটা তাই। উধামজী বলছিলেন যে একটা বড় মিটিং হবে, সেখানে আমাদের মত নেবেন।'

সফীক—'মত! সাধারণ সভায় মত! অর্থাৎ, তিনি যা বলবেন তাই ঠিক!'

করিম—'বড় মিটিং, বুঝি না। মজদুর-সভা যদি সায় দেয় তবেই আমরা ধর্ম্মঘট তুলে নেবো—আমি সাফ্ বলে দিয়েছি।'

সফীক—'তিনি কি বল্লেন?'

করিম—'কংগ্রেস ক'জনের সঙ্গে লড়বে!'

সফীক—'তাই বুঝি এক হাত খালি রাখতে চান, ভোট কুড়োবার জন্যে? ভুল, ভুল, ভুল...'

করিম—'কার ভুল?'

সফীক—'তোমাদের, আমাদের...তাঁরা বাধ্য আমাদের তরফে আসতে।

যদি ধর তোমরা বোঝাপড়া না মেনে ষ্ট্রাইক জোরসে চালাও তবে কি ভাব যে ওঁরা জবরদস্তী করে ভেঙ্গে দেবেন ?'

মহবুব—'বোম্বাইএ কি ঘটেছে, ওস্তাদ ?'

সফীক—'বোম্বাই আর এ-দেশ এক নয়। ওখানকার মিল্‌ওয়ালাদের শক্তি বেশী, তারা পুরানো, খানদানী, ওখানকার সাধারণ লোক ব্যবসায়ী, এরা নাবালক, এদের সমর্থন কম দেশের জনমতে। মারতে হয় ত' ছোট বেলাতেই···ওরা যেমন তোমাদের পাকড়ায় ছোট বেলাতেই···শত্রুর বয়োবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নয়।' গলার আওয়াজ ঢিলে করে সফীক বল্লে, 'আমার বিশ্বাস, আমাদের সরকার আমাদের ত্যাগ করতে পারবে না, এখানকার কংগ্রেস অন্য জাতের···নয় কি ? হয়ত, আমারই ভুল···কিন্তু ষ্ট্রাইক করতে পারব না এ-কেমন কথা !'

মহবুব—'নোটিশ দিতে হবে একমাসের—এই গুজোব।'

সফীক—'নোটিশ! ওরা নোটিশ দিয়ে লোক তাড়ায় ? নোটিশ দিয়ে কাজ কমায় ? নোটিশ দিয়ে মাইনে কাটে ? নোটিশ দিয়ে নতুন কল আনে ? নোটিশ!'

মহবুব—'নোটিশ দেওয়া হবে না।'

সফীক—'হবে না ত' বলছ! কাজে কি দেখাচ্ছ ?'

করিম—'মজদুর-সভা যা বলবে তাই হবে।'

সফীক—'শুনেছি। আমিও আবার বলি, তুমি কি জান না মজদুর-সভা কাদের হাতে এখনও ?'

করিম—'জানি। কিন্তু আজ যদি মজদুর-সভাকেও উড়িয়ে দিই, তবে ওরা পেয়ে বসবে!'

সফীক—'কে অস্বীকার করছে! কিন্তু ষ্ট্রাইক করতে পারব না এ-কেমন ব্যবস্থা! এ-যে মজদুর-সভার গোড়ায় কোপ্‌। ষ্ট্রাইক চলুক। ওরা আজ হেস্ত-নেস্ত করবেই।'

মহবুব···'আমিও সে খবর পেয়েছি। আজ লরি বোঝাই লোক আসছে!'

সফীক—'চল, ঐ ধারে' যাই। লোক আনা বন্ধ হোক ত' আগে, দেখি কি হয় তারপর!' সকলে জুহীর দিকে চলল।

কলের ফাটকের সামনে লোক জটলা করছে, দারোয়ানরা বাইরে আসতে পায় নি। খাঁ-সাহেব সফীককে দেখে এগিয়ে এল। খাঁ-সাহেব ফাটকের সামনে থেকে এক পাও নড়েনি, সেইখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া করেছে, পাশে বদনা, হুঁকো, হাঁড়া, সানকী। সফীক হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ-যে দাওয়াৎ দিয়েছেন; খাঁ-সাহেব! আহা, আগে যদি টের পেতাম!'

খাঁ-সাহেব উত্তর দিলেন, 'পেট না ভরালে কি কাজ পাওয়া যায়? ফাটক ছেড়ে যেতেও পারি না, একলা বসে খেতেও পারি না। বেচারা চৌধুরীর বাড়িতে বিপদ, তাই আমাকেই তদারক করতে হচ্ছে। চৌধুরীর বাচ্ছার খুব অসুখ, কি-সব বিলিতী দাওয়াই খাইয়েছে! এত করে বল্লাম হকিম ডাক, তা শুনলে না কিছুতে!'

সফীক চৌধুরীর পাড়ায় ঢুকল। একজন বুড়ি কাঁদছে চৌধুরীর দরজার বাইরে, চার-পাশে মেয়েরা ঘোমটার ভেতর থেকে কোঁপাচ্ছে, বুড়ি নিজের কপালে হাতের ভারি বালা ঠুকল, রক্ত বেরুল, পাশের মেয়েরা হায় হায় করে হাত চেপে ধরলে, যত চেপে ধরে বুড়ি তত হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে, পাশের চালা থেকে অন্য মেয়েরা উঁকি দিতে লাগল, একজন বয়স্থা এগিয়ে আসতে বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, এখান থেকে ভাগ, আমার সামনে আসিস নি, তুই ত' বল্লি তাই বিলিতী দাওয়াই···অভদ্র ভাষার আওয়াজে চৌধুরী বেরিয়ে এসে বুড়িকে ধমকালে। সফীককে চৌধুরী বল্লে, 'রোগীর শ্বাস উঠছে, তিন সপ্তা ভুগেছে যখন তখন পাড়ার লোকে পরামর্শ দিলে কলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে, বিলেতী দাওয়াই খেয়েছে, কিছুই ফল হল না, উল্‌টে খারাপ হয়ে গেল!

সফীক—'কলের ডাক্তার যেন আপনার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ দিচ্ছে! সে ত' লাল দাওয়াই দিয়েই মাইনে পাবে!' একজন মেয়ে কেঁদে উঠল···'হায় হায়···এক এক করে চারটি গেল।' চৌধুরীর চোখে জল,··· বুড়ি চেঁচাতে লাগল, 'বিষ···লাল বিষ···' চৌধুরী বল্লে, 'কেনই বা নিজে বিলিতী দাওয়াই খাওয়ালাম।' সফীক চৌধুরীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা জানালে, 'বিলিতী দাওয়াইএর দোষ কি! তাই খেয়ে হাজার লোক সারছে···যারা দিয়েছে পাপ তাদের··· তাদের কি মাথা ব্যথা যে একটা মজুরের ছেলে বাঁচে

কি মরে। সাহেব ডাক্তার ? সে ত' আরো মজা। এই সময় সত্যাগ্রহের ফলে ওদের ক্ষতি চলছে, এখন কি চৌধুরী সাহেব ওদের হাতের কোনো জিনিষ নিতে আছে।' 'বিষ দিয়েছে'···'খোকার মুখ নীল হয়ে গেল'···ছেঁচ্‌তলা দিয়ে পাড়ার মেয়েরা একে একে এসে বাড়ীর ভেতর গেল···ফোঁস ফোঁস কান্নার মধ্যে ফিস্ ফিস্ কথা ·বিষ····বিলিতী বিষ····চৌধুরী ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়াতে সফীক তাকে তুলে বাড়ির ভেতর ঠেলে দিলে।

গলি থেকে বেড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই বিজনের সঙ্গে দেখা···'তুমি ?'

বিজন—'খবর এসেছে, লরি বোঝাই লোক আসবে।'

সফীক—'তাই নাকি।'

বিজন নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে অন্যমনস্কভাবে বল্লে, 'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ?' সফীক উত্তর দিলে না, খাঁ সাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে, 'আজ দেখাতে হবে সন্ সাতাওনের জোয়ান কোন চীজে তৈরী।' খাঁ সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দিলে, 'আরে ভাই, সেদিন আর নেই, তবে, আমি থাকতে মারপিট হবে না।'

সফীক—'এবার হিন্দু-মুসলমানের হাঙ্গামা নয়। মিলওয়ালারা লরি করে লোক আনছে, তারা এসে পড়লে যারা ধর্ম্মঘট করেছে তাদের অন্ন যাবে।'

খাঁ—'তবে যে শুনলাম মিটমাট হয়ে গেল।'

সফীক—'এখনও হয় নি। তার আগে ওরা নিজেদের লোক এনে ফেলতে চায়, যাতে পরে আর আমরা আসতে পারব না কিছুতে। সব ভুখায় মরবে।'

খাঁ—'যারা লড়তে না পারে তাদের বেঁচে লাভ কি।' করিম এসে পাশে দাঁড়াতে খাঁ সাহেব থতমত খেয়ে গেল। সফীক বল্লে, 'সত্যিই তাই, খাঁ সাহেব, লড়তে হবে। কিন্তু লড়বার জন্যও ত' খানা চাই, তাই যদি যায় তবে হাওয়া খেয়ে কতদিন বাঁচবে মানুষে, বাল-বাচ্ছা নিয়ে। কি বল, করিম ?'

" করিম—আমি আর কি বলব। ভাবছি কেবল ওদের বেইমানির দৌড় কতটা। এধারে বোঝা-পড়া চলছে, অন্যধারে রাতারাতি লোক আনা।' খাঁ-সাহেব তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'আমিও তাই ভাবছি। এমন বেইমানি বরদাস্ত হয় না।'

সফীক—'বেইমানি কেন, খাঁ সায়েব ? আমার মিল্ থাকলে আমিও তাই করতাম। ইমান্ কোথায়, কার সঙ্গে ? যাদের ইজ্জৎ নেই তাদের সঙ্গে ইমান !'

খাঁ সায়েবের চোখে আগুণ। 'কভি নেই হোগা !' ব'লে খাঁ সায়েব গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, বার্দ্ধক্যের কোনো লক্ষণ নেই, কোমর সোজা, হাতের পেশী শক্ত, মুখের চামড়া নিটোল, দীর্ঘ পুরুষ, পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সমগ্র দেহের ভারে মাটিকে যেন চেপে মারছে। 'বেইমান, বেইমান, খানা চায় কোন্ এই বেইমানদের হাত থেকে !' বিজন তার মূর্ত্তি দেখে সন্ত্রস্ত হল।

আধ ঘন্টার মধ্যে মহল্লাময় প্রচার হয়ে গেল যে এখনই লরিভর্ত্তি বাইরের গুণ্ডা জোর করে মিলের মধ্যে ঢুকবে। চৌধুরীর পাড়ার লোক বেশী এল না, তারা মড়া নিয়ে ব্যস্ত। খাঁ সাহেব উপস্থিত লোক থেকে জনকয়েক জোয়ান বেছে নিয়ে বাকী লোকদের প্রতি হুকুম দিলে যেন তারা বাড়ি থেকে খেয়ে তখনই চলে আসে। খাঁ সাহেবের আদেশে রাস্তার ওপর লোকেরা শুয়ে পড়ল। সফীক একবার বল্লে, 'খাঁ সায়েব, ঐ ধার থেকে লরি আসবে বলে মনে হচ্ছে, প্রথমেই মেয়েদের রাখলে হয় না ?' খাঁ সায়েবের তাতে আপত্তি, তাঁর মতে আওরাত কোথাও না থাকাই ভাল এ-ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে জনকয়েক ছোকরা মেয়েদের পাশে বসে পড়তে খাঁ সায়েব তাদের তাড়া ক'রে গেল—'ভাগ্ হিঁয়াসে, ভাগ্ !' সফীক মিনতি জানালে, 'খাঁ সায়েব, আপনার মতন বীরের কি জাত থাকবে না ?' 'জাত ! সব বদ্জাত ব্যাটারা···হাতে তলোয়ার ধরবে ওরা ! যে-হাতে বিঁড়ি ফোঁকে !' খাঁ সায়েব একটু কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করাতে সফীক হেসে উঠল, ছেলেরাও হাসল, মেয়েরাও···খাঁসায়েব তখন বল্লে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তবে লেট্ যা···যা অর্ডার দেব শুনতে হবে, একদম উঠতে পাবি না, জমির সঙ্গে মিলিয়ে থাকবি, ঘাবড়েছিস ত' মরেছিস আমার হাতে, জানিস ত' ! আওরাতদের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করতে পারবি না বলে দিলাম, আমার চোখ এড়াতে পারবি না···লেট্ যা !' লেট্ যা, লেট্ যা কলরব করতে করতে ছোকরারা শুয়ে পড়ল। 'মেয়েরা ফাটকের সামনে যেন যাস নি, ভেতরের দারোয়ান হঠাৎ ফটক খুলে ধরে নিয়ে যাবে।

দু'চারটে বদমাস মাগীকে এখানে রাখলে হত। হুঁ, তারা কি এসেছে! আদমীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার ফন্দী আঁটছে রসুইখানার ভেতরে।' খাঁ সায়েব ঘৃণাভরে থুতু ফেলে ফরসীর নল মুখে নিলে।

সফীক একটা চায়ের দোকানে ঢুকল, সঙ্গে বিজন···চায়েয় দোকানে বিজলী বাতি জ্বলছে, ধুলোর আবডালে হলদে দেখায়···বিজ্ঞাপন ঝুলছে, 'চা খাও, উপ্‌রি রোজগার কর।' মহবুব এল চায়ের দোকানে। বিজনকে দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ ক'দিন দেখি নি বড়!' সফীক বল্লে, 'মেহ্‌মান এসেছে জানই ত! তাদের বাড়ি খুঁজছিল। আচ্ছা, বিজন, মহবুবকে চা-এর প্রসার হল কি করে বলেছ? সে ভারি মজা···প্রথমে বিনা পয়সায় বিতরণ, তার পর দো-দো পয়সা, এখন শুনেছি এক টাকার ওপর পাউণ্ড···না আরো বেশী, বিজন?'

বিজন উত্তর দিলে না।

মহবুব—'আরেকজন ছিল না খাঁ সাহেবের সঙ্গে?'

সফীক—'চৌধুরীর বাড়িতে বিপদ। তার বাচ্ছা মরেছে···বেচারা···বিজন, শিশুমৃত্যুর হার কত কাণপুরে?'

বিজন—'ভারতবর্ষে যত সহর আছে তার মধ্যে প্রায় সব চেয়ে বেশী, কিন্তু বাঁচবার আশাটাও ধরতে হয়! সেটা জন্মালেই সাড়ে চব্বিশ।'

সফীক—'বাঁচা গেল! অতদিন আর ভুগতে হল না। সংখ্যায় সান্ত্বনা পাওয়া যায়। বিজন, চা-বাগানের কুলীরা কত পায়?'

বিজন—'টাকার দিক থেকে এখানকার চেয়ে কম, কিন্তু অন্য সুবিধা বেশী।'

সফীক—'নিশ্চয়ই, সস্তায় চা, তাতে খিদে কমে। কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে, যেমন ধর কোলকাতার বাবুদের। মহবুব, ওরা কখন লাস নিয়ে বেরুবে? এই যে কিষণচাঁদ! ভাবছিলাম, তোমারও কি মেহ্‌মান এল? কিষণ, তুমি ত হিন্দু, তোমাদের শ্মশান ঘাটের রাস্তা কোথা?'

কিষণ—'ফ্যাক্টরীর দরজার ভেতর দিয়ে।'

সকলে হেসে উঠল। সফীক বর্ম্মা চুরুট ধরালে, ঠিক মত ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, ছিদ আছে নিশ্চয়, থুতু দিলে সেখানে, তবু ধোঁয়া আসছে না,

টানলেও ধোঁয়া বেরোয় না, একটা দিকমাত্র ধরেছে, আঙুল দিয়ে ছিদ চাপতে নীল ধোঁয়া সরল রেখায় ওপরে উঠল, ধোঁয়ার মাথা সাপের মতন বেঁকে যায়, একটা চোখ বুজে সফীক টানতে থাকে, ঘোরাতে ঘোরাতে সিগারের মাথা গোল হয়ে ধরে ওঠে। বিজনের দিকে এক চোখে চেয়ে সফীক বল্লে, 'একবার দেখে এস দিকিন ফাটকের সামনেটা, সকলে শুয়ে আছে কি না। এখানে হুজ্জোত হবে, তুমি···তোমার কি থাকবার প্রয়োজন আছে ?'

বিজন—'আমার বিশ্বাস আছে। এখনই আসছি।' বিজন চলে যাবার পর সফীক উঠে এসে মহবুবের পাশে বসল, কিষণকে কাছে ডাকলে। সিগার টানতে টানতে সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'মশানের রাস্তা কোন্ দিকে ?'

কিষণ—'এই ধার দিয়েই যেতে হয়।'

সফীক—'অন্য পথ আছে ?'

কিষণ—'বস্তী থেকে গলি বেরিয়েছে অনেক, কিন্তু বড় রাস্তায় না এসে উপায় নেই।'

সফীক—'মধ্যে মধ্যে ভগবান মানতে ইচ্ছে হয়। ভাল, ভাল, মড়ার রাস্তা আর কুলী মজুরের সড়ক এক হওয়াই উচিত।'

মহবুব—'সেই সড়ক দিয়ে আবার বড় সাহেবের মোটর যায়।'

সফীক—'তোমাদের ষ্ট্রাইক ভাঙ্গারও লরি আসে। কিষণ, কিষণ, তুমি চৌধুরীর পাড়ায় যাও। একটু মদৎ দাও···ভাখ, শোন যা বলছি··· লাস্ নিয়ে তুমিই বেরুবে, তুমি হিন্দু, আপত্তি হবে না, একটু ছোটখাট শোভাযাত্রা করলে হয় না ? খাট বইবে তুমি। যখন খবর দেবো তখন এই বড় রাস্তায় আসবে, বুঝেছ ?' সফীক সিগার টানতে লাগল নীরবে।

বিজন এল। কিষণ বল্লে, 'বিজনও চলুক না ?'

বিজন—'কোথায় ?'

কিষণ—'পাড়ায় চৌধুরী সাহেবের বাচ্চার স্বর্গলাভ হয়েছে, ওস্তাদ চাইছেন একটা ছোটখাট শোকযাত্রা।'

বিজন—'এ-সময় ! এখানে আমার যদি কোন কাজ না থাকে, ওস্তাদের মতে, তবে যাব।'

সফীক—'তুমি যাবে ? যাও।'

বিজন—'ওধারে লরি কখন এসে পড়বে হুড়মুড় করে তার ঠিকানা নেই, আর এখন শোকযাত্রা।'

সফীক—'ওটা সাঙ্কেতিক্, যাওই না···জিনিষটাকে একটু উঁচু স্তরে তোলা দরকার, ফুল-টুল পাওয়া অসম্ভব? একটু আর্টের পরশ না হয় এল। ক্ষতি কি? যা বলছি, তাই শোনো, যাও।'

কিষণ ও বিজন চলে গেল।

কানপুর সহর থেকে পিচ্ ঢালা রাস্তা বরাবর এসেছে রেল-লাইনের ব্রীজের তলা দিয়ে বেশ খানিকটা ঢালু বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে হয়। রাস্তার দু-পাশে লম্বা থাম্বা, সাদা-কালো দাগ নীচের দিকে, বাঁকের মুখে ও চড়াইএ মোটর যেন ধাক্কা না খায়, তীব্র আলো রাস্তার উপর, দু-পাশে বস্তী, মাটির তেলের ডিবে জুল্-জুল্ করে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যা নামল ধোঁয়ার ওপর, বিজলী বাতির জোর কমল, বস্তীর আলো খুলল। রাস্তার আলো আজ যেন নিষ্প্রভ, কমতে কমতে নিভে যাবার সামিল। বিজলী ঘরেও কি হরতাল সুরু হয়েছে? ওখানকার মজুরদের বাগানো যায় না সহজে, বলে, অবস্থা ভিন্ন। ভিন্ন কোথায়? একই অনুষ্ঠানের অঙ্গ, একই চাপের পেষাই, একই দারিদ্র্যের সাম্য, না খেতে পেলে একই রকমের যন্ত্রণা, রোগে একই ব্যবস্থা, মলে সেই একই মাটি আর আগুন। সমস্যাগুলোকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখে জীবনটাই টুক্‌রো টুকরো হয়ে গেল। যতক্ষণ বাঁচা ততক্ষণ এক—এই মোটা কথাটা ধরা শক্ত বটে, কিন্তু বাঁচতে যাবার, তার উপায় আবিষ্কারের পন্থার ঐক্যটা ধরাও কি কঠিন? চৌধুরী আর খাঁ সাহেবের ধাত আলাদা, কিন্তু দু'জনেই দু'বেলা দু'মুঠো খেতে চায়। চৌধুরীটা অকর্ম্মণ্য···ছেলে মরেছে বলে একেবারে ঘাবড়ে গেছে। ছেলে মরেছে এই জন্য কি চন্দ্র সূর্য্য উঠবে না, সহরে ধূলো উড়বে না, মাঠে ফসল ফলবে না, গাছে নতুন পাতা গজাবে না, কল চলবে না, কর্ত্তাদের মুনাফায় ঘাঁটতি পড়বে, সত্যাগ্রহ ধর্ম্মঘট থেমে যাবে! সফীকের হাঁপ লাগে···বুকটা দুর্ব্বল রয়েই গেল···থামতে পারে না লড়াই···যারা জীবন দিয়ে লড়বে না তারা অন্য কিছু দিয়ে লড়ুক···অত সহজে ছাড়ন নেই···বিজন দুর্ব্বল, অপদার্থ, মানুষ হবে কি ক'রে। খিদের কামড় নেই, উল্টে আদর আছে, ভাবিজীর কাছে···সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায় ভাবতে স্ত্রীলোকের অ-মানুষ করবার

অসীম ক্ষমতা, কখনও প্রয়োজন হয় নি নরম হাতের সেবার···হাঁসপাতালে নার্সকে দেহ ছুঁতে দেয় নি। রিলীফ-ম্যাপের মতন একই স্তরে সমগ্র অতীত প্রলম্বিত হয়, সমতলভূমি···উঁচু নীচু খাঁজ খন্দর বাঁকা চোরা নেই···স্ত্রীলোকের কোনো উল্লেখ নেই, নেহাৎ সাদামাটা তামার পাত, কেবল গরম। কুঁচকে গেল হঠাৎ, একটা যেন চোঁয়া···তার ভেতর দিয়ে কেবল দূরের জিনিষ দেখা যায়। গড়ান রাস্তার নীচে থেকে দুটো চোখ ধীরে ধীরে উঠছে।

'লরি আরহি···'লরি আরহি'। সফীক বল্লে, 'মহবুব, কিষণকে শীগ্‌গির লাস নিয়ে এখানে আসতে বল। যেন পাঁচ মিনিটের বেশী না লাগে। খাটিয়ার ওপর চাপিয়ে নিয়ে এস···আর কিছু চাই না···দু'চার জন লোক থাকলে সুবিধা হয়, বুঝেছ?' মহবুব ছুটল। 'লরি আরহি, আরহি···' রাস্তায় যারা শুয়েছিল তারা উঠে পড়ছে দেখে সফীক খাঁ সাহেবের কাছে গিয়ে বল্লে, 'উঠলেই সর্ব্বনাশ'···খাঁ সাহেব ঘাড় ধরে দু-এক জনকে শুইয়ে দিলে। অন্যেরা শুয়ে পড়ল, কিন্তু মাথা তুলে দেখতে লাগল। সফীক মাথার দিক থেকে গিয়ে পায়ের পাশ দিয়ে ঘুরে এল। প্রায় শত খানেক লোক রাস্তায় শুয়েছে। 'খাঁ সাহেব, এদের একটু ওপাশে সরালে হয় না? যাতে ফাটকের সামনেও লোক থাকে? যদি ফাটক খুলে ভেতরের দারোয়ানরা বেরিয়ে পড়ে?'

'ওখানে কোনো দরকার নেই। ঘাবড়াচ্ছ কেন? একবার দেখে আসছি।' খাঁ সাহেব ফাটকের সামনে গিয়ে হাঁক দিলে, যদি দরজা খোলা হয় তবে একটা লোক আর আস্ত থাকবে না। খাঁ সাহেব ফিরে এসে শোয়া লোকেদের পায়ের দিকে দাঁড়াল। হাতে লাঠি রয়েছে। সফীক বল্লে, 'ওর দরকার হবে না, খাঁ সাহেব, ওটা আমাকে দিন।'

'কেঁও জী? লাঠিতে আমার হাত দিও না। যায়, কভি নেহি ছোড়ুঙ্গা।'

জোড়া কয়েক চোখ গড়ান রাস্তা দিয়ে গুঁড়ি মেরে উঠছে। আলো কম, প্রাইভেট কার্? তদারক করতে এসেছে? গলির ভেতর থেকে ছোট খাট বেরুল···রাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হায়, সত্য হায় সত্য হায় রাম নাম সত্য হায়।···গিয়ার্ বদলানর কর্কশ আওয়াজে রাম নাম ছাপিয়ে সকলের কানে আসে। সত্যের আহ্বানে যারা শুয়ে ছিল তারা উঠে পড়ল। এক জোড়া চোখ চলে আসছে ওপরে। 'খাঁ সাহেব, শুইয়ে দিন।' হঠাৎ চোখ

দুটো আরো জ্বলে উঠল···হেড-লাইট···'লরি আ-গেই, লরি আ-গেই···লেট্‌ যা, লেট্‌ যা, ডরো মাৎ, রাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হায়'···রাস্তার মাঝখানটা ফাঁক হয়ে গেল, মধ্যে খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে, হাতে লাঠি···শবযাত্রা সেই ফাঁক দিয়ে এগুচ্ছে···বিজন রয়েছে···কেন এল? চলে যাক এখান থেকে···ওর কর্ম্ম নয়, সহ্য হবে না···দুর্ব্বল···লরি এসে পড়েছে, খোলা রাস্তা দেখে জোরে আসছে···কিষণের গলা শোনা যায়···রাম নাম সত্য হায়, গোপাল বোলো সত্য হয়···সফীক শবযাত্রার সামনে এসে গলায় গলা মিলিয়ে চেঁচাতে লাগল···রাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হয়, সাথ সাথ চলে আয়, সত্য হায় সত্য হায়, সাথ সাথ চলে আয়, চলে আয়, চলে আয়···লোক উঠে পড়ল, ফাঁক ভরে গেল···'বিজন, এখনই চলে যাও···অমান্য কোরো না আমার কথা···যাও···' বিজন গেল না···'বিজন, পিছনে যাও,শোন আমার কথা।' বিজন গেল না···শবযাত্রা দীর্ঘ হল। লরি এসে পড়েছে···'আবে, রোখ্‌লে, রোখ্‌লে'···লরি থামল না, ড্রাইভারের পাশে দু'জন গুর্খা, হাতে যেন বন্দুক, ঐ চোঁয়া দেখা যাচ্ছে না? তার দিয়ে ঘেরা লরি, কালো রঙ্‌, মাথায় কারা যেন শুয়ে আছে···হাতে তাদেরও বন্দুকের মতন কি রয়েছে···বন্দুক···গাড়ির ভেতর লোক নেই বোধ হয়···চুপ চাপ, কেবল এঞ্জিনের আওয়াজ···ধক্‌ ধক্‌···রাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হায়, গোপাল বোলো···হেড-লাইটের-আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, 'রোখ্‌লে শালে, রোখ্‌লে'···শববাহকরা থেমে পড়ল লরির সামনে···বিজন কেন সামনে? 'বিজন, ইধার আও'...ঘ্যাঁস করে গিয়ার্‌ বদলাল···বিজন শুনতে পায় নি, সফীক ছুটে এসে বিজনকে ঠেলে খাট কাঁধে করলে, রাম নাম বোলো, বোলো জোর্‌সে···ইন্‌ কিলাব জিন্দাবাদ ইন্‌-কিলাব জিন্‌-দাবাদ···ধক্‌ ধকানি বন্ধ, এঞ্জিন চলতে সুরু হয়েছে···'রোখো, রোখো'···সফীক চাকার সামনে খাট ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে সরে দাঁড়াল, মড়্‌ মড়্‌ করে ভেঙে গেল খাট পয়সার খাট। সফীক হাঁক দিলে, 'ইন্‌-কিলাব জিন্দাবাদ,' শতকণ্ঠে সেই রব ধ্বনিত হল। বিজন সফীকের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে···'এখান থেকে যাও'···'খুন কিয়া, খুন কিয়া,' 'বাচ্চাকো মার ডালা'···লরি থামল, চার-ধারে লোক ঘিরল, খাঁ সাহেব এগিয়ে এল···'ভাগো হিঁয়াসে—ভাগো হিঁয়াসে···সময় এইখানে গোছ দেয়, এই পাকা সড়কের

ওপর'···মহবুব টায়ারের ওপর খোঁচা মারছিল···'পেট্রল ট্যাঙ্ক জ্বালিয়ে দেব, ওস্তাদ ?' চার ধারে লোক চেঁচাচ্ছে···লরির ভেতরে বিশেষ কোনো শব্দ নেই···সফীক খাট থেকে মড়া খোকাকে তুলে নিলে···'মহবুব, মহবুব, যদি এখ্খনই না ফেরে ওয়া গাড়িতে পেট্রল জ্বালিয়ে দাও।' পিছন দিয়ে কিষণ লরির ছাতে উঠেছে···'ওস্তাদ, বন্দুক নয়, লাঠি, লাঠি···হো, হো, হো···' 'নেহিজী, বন্দুক···' অসভ্য গালি এল ভিড়ের মধ্যে থেকে···খাঁ সাহেবের আওয়াজ। এক, দুই, তিনটে লাঠি পড়ল ওপর থেকে···কিষণ হাসছে··· 'ওস্তাদ, ওস্তাদ লাঠি কেড়ে নাও···' সফীক মড়াটা বিজনের হাতে তুলে দিয়ে ড্রাইভারের সামনে এল···লরির ভেতর থেকে সামান্য কোলাহল হচ্ছে··· পিছনের দরজায় খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে···মহবুব একটা মশাল এনেছে···আগ্ লাগায়ে দেও···ভেতরে কারা চেঁচিয়ে উঠল, গিয়ার বদলাল, লরি ব্যাক করছে, কিষণ ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল···হঠাৎ লরিটা চলতে সুরু করল, পাশের লোক সরে দাঁড়াল···লরি খোলা রাস্তা পেয়ে ছুটল জোরে।···অন্য লরিগুলো মাঝ রাস্তায় ব্যাক্ করে আগে থেকেই সরে পড়েছে।

সফীক বল্লে, 'কিষণ, পাড়ায় পাড়ায় খবর দাও···লরি ভর্ত্তি গুণ্ডা আর নতুন মজুর আসছিল···এরা বাধা দেয়···একটা ছেলে চাপা দিয়েছে...মজদুর সভায় যেন সকলে এখনই ধাওয়া করে...আর বোলো, অতিশয় শান্তি ও অহিংস পদ্ধতিতে লরি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, আগুণ লাগান হয় নি···মারপিট হয় নি, এমন কি লরির মধ্যে যারা ছিল তারা নির্ব্বিঘ্নে ফিরেছে। সাইকেল নিয়ে যাও....জরুরী কাজ···বিজন, লাসটা দাও।' ধরাধরি করে রাস্তার পাশে মড়া শোয়ান হল...চৌধুরী চেঁচিয়ে কাঁদছিল, সফীক ধমকে উঠল...'মড়াও উপকারে আসে।' কিষণ আওয়াজ দিলে....ইন্‌-কিলাব জিন্দাবাদ...সফীক বল্লে...মুর্দ্দাবাদ...বিজন সামনে থেকে চলে গেল।

ক্রমশঃ

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এআরোপ্লেন

ঘন নীল নভে দেখেছি বিহার তব।
প্রভাত কিরণে শ্বেতসুন্দর দেহ।
খর নির্ঘোষে কি যে আছে কিবা কব।
মুগ্ধ চোখেতে তাকায় যে হোক কেহ।

ভুল ক'রে যদি বলে কেউ তব গতি
যেন পক্ষীর, যেন মৎস্যের মতো,
বৃথা তর্কে কি বলব তাহার প্রতি
মন্ত্রের গতি তার চেয়ে আরো কত?

বরং সূক্ষ্ম মাতরিশ্বার সাথে
তুলনা তোমার দেওয়া যে তবুও চলে।
পাতলা হাওয়ার ঢেউ কেটে চল প্রাতে।
অসীম ক্ষমতা জেনেছি তোমার কলে।

অথচ তেমন শক্ত নওকো তুমি।
হঠাৎ যে কেউ ছুঁড়লে একটি গুলী
উড্ডীন পাখা পাখসাটে নেবে ভূমি—
থেমে যাবে হৃদ্‌যন্ত্রের মোটা পুলি।

আজ অবশ্য তোমার ভয়েতে সারা।
পৃথিবীসুদ্ধ তোমার শত্রু যেন।
বৈশ্বানরের তাণ্ডবে গৃহহারা—
(তার চেয়ে ভাল শ্মশানে বসতি কেনও)।

আমি কিন্তু এ যুক্তিতে না দি' কান
না শুনি ভয়ের করুণ আর্তনাদ।
পৃথিবীও যদি হয়ে যায় খান খান,
তব সন্মানে থাকব অপ্রমাদ।

ভুলে যায় তারা নেই কো তোমার দোষ।
অন্যায় ভাবে ব্যবহার কেউ ক'রে
মুছে ফেলে যদি মানুষের সন্তোষ—
সবটা দোষ কি চাপাবো তোমার পরে?

তুমি তো সত্যি মানুষের মতো নও
যে, বিবেক বিবেচনায় চলবে কত।
আকাশ পারের কাণ্ডারী তুমি হও।
খেয়া পারাপার করে যাও অবিরত।

সেখানে তোমার অবাধ সঞ্চরণ
বুদ্ধিবিহীন জড়যন্ত্রেরই কাজ।
অথচ দেখেছি চেতনার লক্ষণ;
জড় জগতেই উদ্ভব তার সাজ।

আমিতো কতই বারে বারে বলি তাই
তোমার বহুল প্রচার হোক না দেশে।
কর্মজীবনে কত সাহায্য চাই।
কতনা খবর দেবে জানি তুমি এসে।

আমরা তো জান চাই পৃথিবীর দেশ
হোক্ একাকার হৃদয়ে হৃদয় মিলে।
সে কাজেতে জানি পাবে না কখনো ক্লেশ
শান্তি অথবা বিপ্লবে ভার নিলে।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কুমকুম

(শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-কে)

যেখানের মরা পৃথিবী গাছকে
স্তন দেয় না ; আজকে
বাহারি হেমন্ত তাকে নিয়ে
মেঘ-রৌদ্রের পাত্রে সোনা ভাঙিয়ে
যায়।
শরীর আর মনের অবাধ্যতায়
আমরা চঞ্চল। ইন্দ্র তার বজ্র চালাক,
(আমরা আরো চালাক !)
কঠিন আলোয় শাদচয়-কালোয় শাশ্বত কণ্ঠের জয়গান।

গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান—
দুর্লভ স্বপ্ন।
সকালে বাজার, দুপুরে আপিস, রাত্রে তাস। নগ্ন
শিশু, ছিন্ন কাঁথা, সূতিকা, ক্ষয়কাশ।
—জীবন জ্যামিতির ফাঁস।

হেমন্তের সূর্যভাঙা সন্ধ্যায় আলোর কুম্‌কুমে
ক্লান্ত চোখ চমকালো। ঘুমঘুমে
নেশায় নিজেকে ভালো লাগ্‌লো।
(সূর্য তোমার এতো আলো !)
পিরামিড্, গণ্ডোলা, হেলেন…
স্মৃতির কাঁথায় এলেন
ঈশ্বর।
সৈনিক সময় বিশ্ব'র
বুকে সরিসৃপের মত—
সূর্যভাঙা সন্ধ্যায় আলোর কুমকুম তবু তো !

কবে নীলকণ্ঠের অগ্নি
সুন্দরকে ভস্ম করেছিলো। বিকেলে চিনেবাদাম, ঘুগ্‌নি
ফেরি করে। শীতে জড়সড়।
মনে ঠাণ্ডা সাপ; মাঝেমাঝে খর
রৌদ্রের গান ভেসে আসে।
সমস্ত আকাশ একটি মেয়ের মুখের মত। দু পাশে
ঠাণ্ডা দিন, ঠাণ্ডা রাত্রি।

একটি

সরু রেখায় মশালের স্রোত আঁকাবাঁকা। একটি—
একটি মানুষ: কয়লার পাউডারে, কালির ক্রীমে,
—সারি সারি দূরে-দূরান্তরে, অসীমে।

•

হে কুমারী মেয়ে আর ঠাণ্ডা সাপ। কাস্তের মত ধারালো গলায় তোমরা জয়গান গাও। হে নীলকণ্ঠ। তোমার নীল অগ্নি সুন্দরকে ভস্ম করে যে পাপ করেছিলো, অসুন্দরকে ভস্ম করে আজ তার প্রায়শ্চিত্ত হোক।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নির্ব্বাণ-চতুর্দ্দশী

যে দেশে রসিক নেই, রসবস্তু দুর্ব্বোধ্য জটিল
পেঙ্গুইন মানুষেরা পঙ্গু যেথা বৈদিক বিলাপে
কাব্যের আকাশে যেথা স্বর্ণচঞ্চু শ্বেত-শঙ্খচিল
স্বাপ্নিক সঙ্গীতে মত্ত অর্থহীন মায়ূরী কলাপে।

বৃথারোষে রুদ্রগান বায়বীয় খড়্গ আস্ফালন
নিরিন্দ্রিয় আয়ানের ব্যর্থপ্রেম রক্তশূন্যতায়,
প্রজ্ঞার বল্মীকঢাকা জম্বুদ্বীপ স্বায়ত্তশাসন
ধ্বংস করে অহমের নির্ব্বিকল্প নিষ্কাম চিতায়।

সে দেশে তথাপি মোরা কবিযশঃপ্রার্থীদের দল
তত্ত্বময় কাব্য লিখি ফ্যাসী-নাজী-বল্‌শী-বুরোক্রেশী,
বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভায় ভূতাবিষ্ট চেতনা চঞ্চল
ভুলিতে পারি না আজো উর্ব্বশী মেনকা মিশ্রকেশী ;

আমাদের মৃত্যু তাই—পাঠকের পেঙ্গুইন বুকে
শ্যামের বংশীর রন্ধ্রে, শবাকার শিব-শিঙ্গা-ফুঁকে।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

মূষিক

সোণালী ফসল শেষ :
এখন তো পরীর প্রহর ;
রুপালী ডানার আলো
অয়নের হৃৎপিণ্ডে ঝরে।

দূরাস্তিক অবিচী মুখর,
স্থূল কৃষ্ণ ত্বকে তার
চীতে-ডোরা—
পরীদের ডানার ইঙ্গিত।
—তারই মাঝে
ভ্রাম্যমাণ মোমের পুতুল।
রাজ্যলুব্ধ বর্বরতা
কুঞ্চিকা ঘুরায়,
চোখে ভাসে মরুমায়া—
ভবিষ্যের স্বর্ণ ইতিহাস।

সহসা ফুৎকার!
নিতলান্ত আলোড়িত,
ভাসমান শিশুক বিমান!
স্পন্দমান দিকচক্রে
গম্ভীর আরাব। ঝড় উঠে—
অগ্নি ঝড়
গলে যায় মোমের পুতুল
আর এক নিঃসঙ্গ মূষিক।

ক্লীবরক্ত নির্জ্জরের তার,

জীবন-সমর শুধু প্রায়োপবেশন

পুঁজি-স্ফীত জোঁকের শিকার—।

এখন সে শতাব্দির বলি।

মর্ম্মর মিনার কোথা ?

ইতিবৃত্ত মূক।

মৃত্যু আসে—

প্রতি পলে মৃত্যুর নির্বাণ।

তবুও নিমিল চোখে

উঁকি দেয়—

আগামীর অণোরণীয়ান্‌।

শ্রীঅশোক গুহ

পুস্তক-পরিচয়

ঘরোয়া—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী রাণী চন্দ। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থখানির প্রথম ও শেষ থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত ক'রে দিলে অবনীন্দ্রনাথের রসবোধের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন—

"একালে যেন শখ নেই, শখ ব'লে কোন পদার্থই নেই। একালে সব কিছুকেই বলে 'শিক্ষা'। সব জিনিষের সঙ্গে শিক্ষা জুড়ে দিয়েছে। ছেলেদের জন্য গল্প লিখবে তাতেও থাকবে শিক্ষার গন্ধ। আমাদের কালে ছিল ছেলে বুড়োর শখ ব'লে একটা জিনিস, সবাই ছিল শৌখিন সেকালে; মেয়েরা পর্যান্ত—তাদেরও শখ ছিল। কত রকমের শখ ছিল এ বাড়িতেই, খানিক দেখেছি, খানিক শুনেছি। যারা গল্প বলেছেন তারা গল্প বলার মধ্যে যেন সেকালটাকে জীবন্ত করে এনে সামনে ধরতেন। এখন গল্প কেউ বলে না, বলতে জানেই না। এখনকার লোকেরা লেখে ইতিহাস। শখের আবার ঠিক রাস্তা ভুল রাস্তা কী। এর কি আর নিয়ম কানুন আছে।"

"দেখো মনে সব থাকে। সেই ছেলেবেলায় কবে কোন্‌কালে দেখেছি রাজেন মল্লিকের বাড়িতে নীলে সাদায় নক্সা কাটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, গা-ময় ফুটো, উপরে টাঙিয়ে রাখত। ভিতরে চোঙের মতো একটা কী ছিল তাতে খাবার দেওয়া হোত। পাখিরা সেই ফুটো দিয়ে আসত, খাবার খেয়ে আর এক ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেত। অবাধ স্বাধীনতা, ঢুকছে আর বের হচ্ছে। মানুষের মনও তাই। স্মৃতির প্রকাণ্ড জালা, তাতে অনেক ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে স্মৃতি ঢুকছে আর বার হচ্ছে। জালা খুলে বসে আছি, কতক বেরিয়ে গেছে কতক ঢুকছে; কতক রয়ে গেছে মনের ভিতর ঠোকরাচ্ছে তো ঠোকরাচ্ছেই, এ না তোলে হয় না আবার। মানুষ হিসেব চায় না, চায় গল্প। হিসেবের দরকার আছে বই'কি কিন্তু ঐ একটু মিলিয়ে নেবার জন্যে, তার বেশি নয়। হিসেবের খাতায় গল্পের খাতায় এইখানেই

তফাৎ। হিসেব থাকে না মনের ভেতরে, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়, থাকে গল্প। সেই ঘরোয়া গল্পই বলে গেলুম তোমাকে।"

অবনীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই লাজুক ও বিনয়শীল। গল্প আদায় করে নিতে হয়েছে তাঁর কাছ থেকে, কিন্তু একবার বলতে আরম্ভ ক'রে তাঁর এত কথা মনে পড়লো যে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শৈশবকাল হতে সেদিনকার গৌরী দেবীর নাচ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সময়ের মধ্যে ঘটা অনেক বিচিত্র কাহিনী তাঁর মনে পড়লো। কতক শোনা, কতক দেখা। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে রচিত অপ্রকাশিত ছড়া। স্বদেশী হুজুগ। বাজনা শিক্ষা। সখের অভিনয়। ভূমিকম্প। লালমোহন ঘোষের বাংলা বক্তৃতা। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের উৎকট সাহেবীয়ানা। চরকা কাটার হিড়িক। রাখী বন্ধন-উৎসব। হরেক রকমের সাবেকি সৌখিনতা—সাজ গোজের, বোটে চড়ে বেড়ানোর, খাবারের, ঘুড়ি ওড়ানোর, পায়রা পোষার ইত্যাদি অনেক গল্প তাঁর স্মরণে এলো আর বলবার আবেগে নিজের কথা এক রকম চাপা পড়ে গেলো। তাঁর সুদীর্ঘ ও সাফল্যমণ্ডিত শিল্পী-জীবনের বিবৃতি এ আলেখ্যে স্থান পায় নি।

যে আবেগের কথা বললাম সেটা ভাবালুতা নয়। সে হচ্ছে কতকটা আনন্দের আর বাকিটা কৌতুকের সংমিশ্রণ। আত্মভোলা শিল্পী যেন সার্থক জীবন যাপন ক'রে এসে সুস্থ ও কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন অতিক্রান্ত প্রান্তরের শোভা। দীর্ঘ চলার শ্রান্তি আর পথের ধূলি ও কণ্টকের কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি স্মরণ করছেন সহযাত্রীদের কথা।

তাঁর কাছে সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি। আমরা রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'-তে মহর্ষির যে ছবির সঙ্গে পরিচিত হই তার ওপর কোন নূতন রেখাপাত করেন নি অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু অনেকগুলি কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। বিশেষভাবে মূল্যবান হয়েছে তাঁর 'রবি কাকা'র গল্প। কবির স্বরচিত আত্মজীবনীতে এতখানি অন্তরঙ্গ চরিত্র-বর্ণন পাওয়া যায় না।

কবি বিপুল উৎসাহে ড্রামাটিক ক্লাব চালাচ্ছেন, স্বদেশী আন্দোলনের কর্ণধার হয়ে রাস্তার জনতার সঙ্গে মিতালি করছেন, রাখি বাঁধতে ছুটছেন

মসজিদের মধ্যে। কুলিদের নিয়ে সভা করে টাকা তুলছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস সভায় বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবী জানাচ্ছেন পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন নেতাদের আচরণে রুষ্ট হয়ে জব্দ করবার মতলব আঁটছেন। অজস্র গান আর নাটক লিখে অভিনয় করছেন। অনেক নাটক লিখতে হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে, সৃষ্টির প্রেরণায় নয়।

সে সময় অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ পার্শ্বচরদের মধ্যে একজন। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সত্ত্বেও ভয় ও ভক্তির ব্যবধান ছিল অনেকখানি। রবীন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গ সাহচর্য্য দিতে কার্পণ্য করেন নি কোন দিন কিন্তু তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এত প্রবল ছিল যে ভক্তির উদ্রেক স্বতোই হতো।

অবনীন্দ্রনাথ নিজের কথা কিছু কিছু বলেছেন অভিনয়ের প্রসঙ্গে এসে। মঞ্চসজ্জায় আর হাস্যরসের অভিনয়ে তাঁর উৎসাহ ও আনন্দ ছিল অপরিসীম। কথায় কথায় মনে পড়লো বহু বিচিত্র ঘটনা—বৃক্ষরোপনের ফলে পিচ্ছিল রঙ্গমঞ্চের সব বিপর্য্যয় কাণ্ড। অভিনেতাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। ইউরোপীয় দর্শকদের প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি। এই সব ব্যাপার এমন সরস ভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে পাঠকের স্মরণে থাকে না যে সে-সকল দিন আজ বিগত।

সে সময় যুবকদের উদ্দাম দেশ ভক্তি ছিল আর এক প্রকারের কৌতুকের ব্যাপার। বাঙ্গালী বেলুন-বীর আর সার্কাস-বীরের কাহিনী জ্যোতি ঠাকুরের জাহাজের ব্যবসার মতই করুণ মনে হয় আজ, কিন্তু সে সময় তা' প্রীতিমগ্ন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছিল।

এ ত' গেলো অবনীন্দ্রনাথের জীবনকালের কথা। তাঁর প্রপিতামহের আমলের গল্পই হচ্ছে গ্রন্থখানির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শোনা গল্প, কিন্তু সে সময় মেয়েরা গল্প বলবার সময় তাঁদের ছেলেবেলাকে জীবন্ত করে এনে সামনে ধরতে পারতেন। সে সব গল্পের সজীবতা আজও ক্ষুণ্ণ হয় নি। কে একজন আত্মীয়া তাঁর শাশুড়ী ঠাকরুণের তোলা গহনা বার করে শুঁখিয়েছিলেন বাদশাহি অভিজাত্যের খোশবো, আজ তা' অদ্ভুত মনে হয়। এক সময় ধনী ঘরের মেয়েরা নাকি অলঙ্কারের উপর মলমলের ফিতে জড়িয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন পাছে তাঁদের অঙ্গসজ্জায় প্রগলভতা প্রকাশ হয়ে পড়ে বার-বনিতাদের মত। কোন কোন জায়গায় প্রচলিত কিংবদন্তী ছিল আরও

অদ্ভুত। জনৈক ধনী জমিদার নকল বৃন্দাবন রচনা করে তাঁর পুণ্যলোভী মাকে ঠকিয়েছিলেন নাকি।

তখনকার দিনের সৌখিনতার গল্প যে অভিজাত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তার অবসান হয়েছে বহুদিন কিন্তু তাই বলে তার মর্য্যাদা অনুমাত্রও ম্লান হয় নি। একমাত্র ঠাকুর বাড়ির ইতিবৃত্ত অনুসরণ করলে বাংলা দেশের সংস্কৃতির ক্রম-বিকাশ হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানুষ হিসেব বা ইতিহাস চায় না, চায় গল্প তাই তিনি নিছক গল্প বলে গেছেন এলোমেলো ভাবে, সময় তারিখ বাদ দিয়ে। পড়তে সময় লাগে না। আমি একবার ব'সেই শেষ করে উঠলাম কিন্তু গল্প মনের ভেতর আসন গ্রহণ করলো ছন্দোবদ্ধ ভাবে। গল্পের রেশ শূন্য স্থানগুলি ভরতি করে নিয়ে বাঙ্গালীর ঐতিহ্যের এক শিক্ষাপ্রদ বিক্রৃতি রচনা করে বসলো।

শ্রীমতী রাণী চন্দকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে হয় পাঠকদের তরফ থেকে যে তিনি গল্পগুলিকে আদায় করে নিতে এতখানি পরিশ্রম করেছেন। গ্রন্থ হ'তে শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অংশগুলি উদ্ধৃত করে দিলে এর মূল্য উপলব্ধি হয় কিন্তু সমালোচনার স্বল্প পরিসরে তা দেওয়া সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই কিংবদন্তীর ক্ষেত্রে প্রয়াণ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই, সুতরাং এই বেলা তাঁর জীবনের ওপর যতটুকু আলোকপাত হয় ততটুকুই লাভ। বর্ত্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি দেখে গেছেন এবং কোন বর্ণনা অতিশয়োক্তিতে দুষ্ট বিবেচনা করেন নি।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

রাজযোটক—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। মূল্য দুই টাকা।

"জয়শ্রী"তে লেখিকার বড় গল্প পড়েছিলাম, তখন তাঁর ছোট গল্পের খবর জানতাম না। রাজযোটক বইখানা পড়ে অবাক হয়ে গেলাম—কি সুন্দর গল্পগুলি অথচ কত কম লোকেই এদের সন্ধান জানে।

প্রথমেই মন টেনে নেয় লেখিকার সরল ও স্বচ্ছ ভাষা, গল্প বলার অপূর্ব সংযম—কোথাও একটু বাহুল্য নেই, একটি অবান্তর কথা নেই। অতি অল্প কথায় তিনি বাঙালীর সংসারের প্রতিদিনকার খুঁটিনাটির কথা, জননীর অন্তরের ভাব, মাতৃহারা শিশুর অভিমানক্ষুব্ধ মনের ছবি, দরিদ্র পরিবারে বিবাহিতা ধনীর দুহিতার আভিজাত্যদৃপ্ত মহিমা, সংসারত্যাগী সাধুর বৈরাগযোগ-সাধনের পথে বাধার কথা, পুরুষের কপট আচরণে বঞ্চিত সরলা মেয়ে সুবালার কথা—এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যে গল্পগুলি মনে দাগ কেটে যায়।

জ্যোতিষীর রাজযোটক মিলও যে দম্পতীর মনের মিল আনতে পারে না; একই মায়ের সন্তান হলেও ভাইবোনের স্বার্থে যখন ঘা লাগে, তুচ্ছ অলঙ্কার আর টাকা পয়সা মনের কোমল বৃত্তিগুলিকে কি ভাবে চাপা দিয়ে দেয়; দুঃখকষ্টের মধ্যেও সংসারের চাকা বর্তমানকে কেন্দ্র করে কেমন ঘুরতে থাকে, অতীত দিনের স্থান এখানে নেই, "জননীকে কেন্দ্র করে যে আয়োজন, তাতে জননীকে স্মরণ করবার অবসর নেই"; আমাদের জীবনের এসব অতি সাধারণ কথাকেই লেখিকা অন্তরের দরদ দিয়ে এঁকে পাঠকের চোখে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন—পড়ে মনে হলো নিয়তই সংসারের হাটে এদের সঙ্গে দেখাশোনা—আমাদের আশেপাশের নরনারীরাই যেন গল্পগুলির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

খুব ভাল লেগেছে জননী আর স্ত্রীধন গল্প দুইটি—এ ধরণের গল্প বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়, আর দুটি গল্প খানিকটা এক ধরণেরও বটে, তবু লেখার গুণে এরা জীবন্ত হয়ে উঠেছে, অনেকেরই নিশ্চয় ভাল লাগবে। স্ত্রীধন গল্পে প্রথমে দেখি জননীর বধূবেশের ছবি—সঙ্কোচভীরু বালিকা, সকলের স্নেহ-ভালবাসায় তৃপ্ত, কিন্তু সামান্য একখানি গহনা অপরকে দেবার অধিকার নেই—মনে ক্ষোভ জাগে, কিন্তু অসহায়—তারপর দেখি 'মহীয়সী গৃহিণী, স্বামীর সংসার ও মন দুই রাজ্যেরই অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ, ঘরকন্না লোক-লৌকিকতা দানধ্যান সকল ব্যাপারেই চরিতার্থতায় সার্থকতায় ভরপুর—তৃতীয় দফায় দেখি বৈধব্যে ক্লিষ্ট জননী—যাবার দিন বেশি দূরে নয়। উপযুক্ত সুপ্রতিষ্ঠ ছেলেদের সংসারী দেখে নিশ্চিন্ত, মনে একটু খোঁচ শুধু মেয়ের জন্য—'গেরস্থঘরে' যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন শুধু ছেলে দেখে—সংসার যার শেষ পর্য্যন্ত টাকাপয়সার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো না। যা ভেবেছিলেন তাঁর 'স্ত্রীধন' দিয়ে

মেয়েকে পুষিয়ে দেবেন, কিন্তু এখনও দেখলেন সেই বধূকালের বোনকে গহনা দেওয়ার মতই বিবাহিতা মেয়েকে বিশেষ কিছু দেওয়ার সুবিধা হলো না— মা যুক্তি তর্ক করলেন না, "শুধু মনে হ'ল, শাঁখাসিঁদুর প'রে মনের তৃপ্তিতে সে থাক ; দিয়ে কে কাকে সমৃদ্ধ করতে পারে ?"

জননী গল্পের শেষ অংশটিও করুণ, বিধবা মা, উপযুক্ত পুত্র, বধূ, নাতি-নাতনী পরিবৃত হয়ে স্বামিবিরহের ব্যথা ভুলতে সচেষ্ট, কিন্তু সংসারের চাকা ঘুরে গেছে, স্বামীর সঙ্গেই সৌভাগ্যসূর্য অস্তে গেছে, এখন এসেছে নতুন কাল, জননী নিজের স্থানটি আর বজায় রাখতে পারছেন না, আজ নতুন আমলে তাঁকে যেন না হলেও চলে। সেদিন এল বৈরাগ্য—এ বৈরাগ্য অভিমানের নয়, এ বৈরাগ্য সব বন্ধনের অবসান কামনা। লেখিকা অবশ্য শীগগিরই অবসান ঘটিয়ে দিলেন—হয়তো বা এটা ইচ্ছাশক্তিরই জয়—সমস্ত অন্তর যখন মুক্তি চাইলো তখন ছুটি মিলতে দেরি হোল না—ছেলে মেয়ে দৌহিত্র পৌত্র—সব সূত্রেই টান পড়লো, কিন্তু তা সামান্য।

এই গল্পগুলির প্রায় সবই আগে মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল, তখনকার পাঠক-পাঠিকার মনে থাকবার কথা। যাঁরা তখন সন্ধান পান নি, তাঁদের পড়ে আনন্দ হবে। আমরা লেখিকার কাছে এই ধরণের আরো গল্প শুনতে চাই, তাঁর উদার ও গভীর সহানুভূতির আলোকে অন্তঃপুরের আবছায়া অস্ফুট আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যথা বেদনা কল্পলোকে স্পষ্ট হয়ে উঠুক।

স্বর্ণপ্রভা সেন

যোসেফ স্টালিন—বীরেন দাশ। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স। কলিকাতা।

সাম্যবাদী সাহিত্যের লেখক ও পাঠকের সংখ্যা বাংলা দেশে বোধ হয় সত্যই বাড়ছে। কিন্তু পাঠকের কৌতূহল যে পরিমাণে বেড়েছে, লেখকের সততা ও লিপিকুশলতা সে তুলনায় নগণ্য। যাঁরা এ সম্বন্ধে সততার সঙ্গে

পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করেছেন অথবা যাঁরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে এই মতবাদের স্বল্পতম আবাদও করেছেন তাঁরা হয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লেখক, না হয় নীরব কর্মী। সুতরাং সাধারণ জিজ্ঞাসু বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে দুটি পথ খোলা আছে,—ইংরাজী ভাষায় লেখা ভালো বই-এর সাহায্য গ্রহণ করা কিংবা পঞ্চম মানের দেশীয় মস্তিষ্কের মধ্যস্থতায় প্রতিফলিত মূল বিষয়টির আভাষ আস্বাদনেই সন্তুষ্ট থাকা। শক্তিমান বাঙ্গালী লেখক সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে অবহিত হ'লে সত্যই বাংলা সাহিত্যের উপকার হবে।

শ্রীযুক্ত বীরেন দাশ প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠার এই বইটিতে ষ্টালিনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। 'লেনিন ও ষ্টালিন', 'ষ্টালিন ও ট্রটস্কি', 'ষ্টালিন ও সোভিয়েট' প্রভৃতি অধ্যায়ের নামকরণ থেকেই এ কথা বোঝা যায়। দাশ মহাশয় যে পরিশ্রম করেছেন, সে জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। এই বইখানির বিরুদ্ধে আমার দুটি আপত্তি আছে। প্রথমতঃ,এর ভাষা দুর্বল এবং অনাবশ্যক ইংরেজী শব্দে ভারাক্রান্ত; দ্বিতীয়তঃ এ বই-এর অন্তর্গত একাধিক আলোচনা নতুন জ্ঞানান্বেষীকে তিলমাত্র সাহায্য করে না।

হরপ্রসাদ মিত্র

ফসল ও অন্যান্য গল্প—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা প্রেস।

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের এখানা প্রথম গল্পের বই। ছটি গল্প এতে আছে: ফসল, দাম, পথ, ঋণী, অবান্তর, খাঁচা। গল্পক'টিকে কোনো মতেই সাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। স্বাদে এদের পার্থক্য প্রকট। আধুনিক জড়বাদের টানা আর আখ্যানভাগের পোড়েনে এক একটি গল্পের যে ঠাসবুনানি হয়েছে তার বৈচিত্র্যেই অন্তত দুঃস্তোষ্য পাঠকের খুসি হবার কথা। উপাদান সংগ্রহের জন্যে সমাজের নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত লেখক নেমেছেন: দেখেছেন তলিয়ে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিক দুরবস্থার মূল কোথায়। তাই প্রেমের মোলায়েম কাহিনী রচনা করা তাঁর পক্ষে যেমন সম্ভব হয় নি, তেমনি বেধেছে প্রত্যক্ষ

বাস্তবের একটানা বর্ণনায় মুখর হ'তে। বাংলার জল-হাওয়ার গুণেই বোধ হয় এত্তোদিন এ-ধরণের গল্প জাতে ওঠে নি। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' থেকেই নতুন গল্পের সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের গল্পগুলির মধ্যে 'ফসল' আর 'পথ' একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত গল্পের শিল্পপ্রসঙ্গ ছাড়াও বিচার্য্য তার শিল্পপ্রকরণ। কোন্ কোন্ ঘটনার পাকে ভিক্ষা হ'য়ে দাঁড়ায় একজনের উপজীব্য এই হ'লো আলোচ্য সংলাপহীন গল্পের সার। কিন্তু ভাষার শিথিলতার জন্যে গল্পের রস তেমন জমতে পায় নি। অবশ্য পরীক্ষা হিসাবে এর মূল্য অনস্বীকার্য্য। 'পথ' গল্পটিতে কৃষক-দুহিতা রাধার জাগরণ শুধুই অনিবার্য্য নয় স্বাভাবিকও বটে। ভুলব না রাধার মানস-বিশ্লেষণ, লেখকের আঙ্গিক সার্থক। 'দাম' স্মরণ করিয়ে দেয় যুবনাশ্বের গল্পকে। 'অবান্তর' গল্পের আবেদনও ব্যর্থ হবার নয়। সুধীরের দুর্ব্বলতা সেই শ্রেণীরই মজ্জাগত—বেচারা যার প্রতিভূমাত্র। অমলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ('ঋণী') অথবা বাড়ির খাঁচায় আবদ্ধ ইলার দশা ('খাঁচা') সুন্দর ফুটেছে। গল্পগুলি অনাত্ম রীতিতে লেখা; ইশারউড্-এর বার্লিন-সম্পর্কিত রেখাচিত্রের কথা মনে প'ড়ে যায়। এই দুর্লভ গুণের জন্যে অন্যান্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান গ্রন্থখানি পড়ে প্রভূত আনন্দ পেয়েছি। বস্তুত বাঙালি লেখকরা প্রায়ই ভুলে যান যে, "অনাত্ম কাব্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী হ'তে পারে, কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপের পরম সুহৃদ।"

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রজাপতয়ে—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। দাম দু'টাকা।

ছোট গল্প লিখে যাঁরা সুনাম ও স্বকীয়তা অর্জ্জন করেছেন, অচিন্ত্যকুমার তাঁদেরই অন্যতম। প্রত্যেক ভালো গল্প লিখিয়েরই একটি আপন বৈশিষ্ট্য থাকে, ভাষায়, অথবা গঠন-শিল্পে। তবে উভয় গুণের অভিব্যক্তি ক্রমশঃ অগ্রসর হলে শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বাসিত হওয়া যায়। অনেক ভালো

লেখক আছেন, যাঁদের মৌলিকত্ব একটা ভঙ্গীতে অথবা একটা শিল্পমার্গে এসে থেমে গেছে। পরবর্ত্তী রচনা এস্থলে পুরাতনেই পুনরাবৃত্তি হতে বাধ্য। আবার অনেক মাঝারি লেখক আছেন যাঁদের ভাণ্ডার বৃহৎ কিন্তু একটি শক্তির অভাবে তাঁদের গল্প বেশ সুখপাঠ্য হয়, হয়তো মাঝে মাঝে চটকদারও হয় কিন্তু সার্থক হয়ে উঠে না।

অচিন্ত্যকুমার বিস্তর গল্প লিখেছেন এবং নানা ধরণের। 'টুটা-ফুটা' থেকে সুরু করে 'সঙ্কেতময়ী' পর্য্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতার ধারা মোটামুটি একই খাতে বয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলি গল্প ভালো বেরিয়েছে যেখানে অচিন্ত্যকুমারের কল্পনা অস্বাভাবিক নয়, ভাষাও চেষ্টাকৃত কারিকুরিতে আড়ষ্ট নয়। আবার কয়েকটি গল্প পাঠককে নিরাশও করেছে। কিন্তু 'ডবল ডেকার' এর পর থেকে তিনি যে ধারায় রচনার মোড় ফিরিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ উল্‌টো দিকে, অর্থাৎ নগরকেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে মফঃস্বলের সীমানায় ঢুকেছে। এই কারণে এ বইগুলির গল্প-সমষ্টির একটি বিশেষ মূল্য আছে। মফঃস্বলের আলো-বাতাস অবশ্য অনেক লেখকেরই উপজীব্য, কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের চোখে মফঃস্বলের যে রূপটি খুলেছে তা হাস্যকর, বিরক্তিকর হলেও প্রীতিকর নয়। অর্থাৎ অচিন্ত্যকুমারের কথাবস্তু হ'ল আইন-আদালতের জগৎ এবং এ দুটিকে ঘিরে যে সমাজ তার তুচ্ছতা গ্লানি এবং মূঢ় সন্তুষ্টি নিয়ে বাস করে, সেই সমাজ। এখানে ঈর্ষ্যা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অদ্ভুত রকমের রেষারেষি, আর কল্‌কাতার পুরাণো বছরের হাল-চালকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। জবরদস্তি মোটা সরকারী চাকুরের গিন্নী, সাক্ষী-সাবুদ, সার্কেল অফিসার আর সব্-জজ এই সব মিলে অচিন্ত্যকুমারের মনকে উত্তেজিত ও পীড়িত করেছে। অচিন্ত্যকুমার এঁদের থেকে খুব স্বতন্ত্র সমাজের জীব নন্, যদিও তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর, ব্যঙ্গ-করুণায় তির্য্যক্। কিন্তু বাঙলার মফঃস্বলের এই অর্দ্ধশিক্ষিত, শিক্ষিতঅন্ধ এবং সভ্যতাগর্ব্বী নর-নারীর চিত্র আমরা পূর্ব্বের দু'খানি বই-তে যথেষ্টই পেয়েছি। অচিন্ত্যকুমারের মনে যখন একটি জাগ্রত হাওয়া আছে, আশা করতে পারি এর পরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও নিম্ন স্তরে যারা বাস করে— অর্থাৎ যারা প্রকৃত অর্থে মফঃস্বলের মাটির মানুষ এবং যাদের শিকড় শহরমুখী নয়—তাদের তিনি পঙ্‌ক্তিতে তুলবেন। তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণতর হবে,

তাঁর চিত্রিত সমাজের খণ্ডিত রূপটি সমগ্রতা পাবে, এবং মফঃস্বলের গল্প শুধু নিপুণ ব্যঙ্গের খোরাক্ না হয়ে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রের একটা অপরিচিত পন্থার সন্ধানী হবে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সোভিয়েট দেশ—গোপাল হালদার ও সুকুমার মিত্র—সম্পাদিত প্রবন্ধ সঙ্কলন। সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ হইতে "পুঁথিঘর" (২২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দেড় টাকা।

এই বইটির প্রকাশ সময়োপযোগী হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় সমান। এদেশে তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, প্রথমত, যখন রাশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ বাধে, দ্বিতীয়ত, যখন জার্মেনী অতর্কিতভাবে সোভিয়েট দেশকে আক্রমণ করে। আমাদের দেশে এমন লোকের সংখ্যা কম যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না যে হিটলার রাশিয়াকে একেবারে পিষে ফেলবেন। সম্প্রতি একটু সুর বদলেছে, কেননা জার্মান বাহিনীর অপরাজেয়তা সম্বন্ধে যে উপকথার সৃষ্টি হয়েছিল তা যে কতখানি ভুয়ো সোভিয়েট লাল বাহিনী তা প্রমাণ করছে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস ধরে। এই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার ফলে রাশিয়া সম্বন্ধে অবজ্ঞার বদলে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ সম্ভ্রম দেখা দিয়েছে রাশিয়ার অপবাদে এক সময়ে যাঁরা শতমুখ ছিলেন তাঁদের মধ্যেও। কিন্তু অবজ্ঞা ঘুচলেও অজ্ঞতা ঘোচেনি ; লাল ফৌজের হাতে নাৎসি বাহিনীর যে লাঞ্ছনা ঘটছে কী কারণে তা' সম্ভব হ'ল, এর পিছনে কী অদ্ভুত ও অভিনব সংগঠন-প্রণালী কাজ করছে, কী ভাবে বছরের পর বছর ধরে দেশব্যাপী এই শক্তি গড়ে উঠেছে এই সব ব্যাপার সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা খুব কম লোকেরই আছে। 'সোভিয়েট দেশ' বইটি এই অজ্ঞতা দূর করতে সাহায্য করবে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, মন্মথ সান্যাল,

বিষ্ণু দে প্রভৃতি যাঁদের প্রবন্ধ এই বইতে সংকলিত হয়েছে তাঁরা সকলেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত—ফলে তাঁদের রচনাগুলি শুধু শিক্ষাপ্রদ নয় সুপাঠ্যও হয়েছে। কিন্তু বইটির উদ্দেশ্য সাহিত্যসৃষ্টি নয়—সোভিয়েট সম্বন্ধে যথাযথ তথ্যের প্রচার। এই তথ্যের সংগ্রহে ও প্রকাশে লেখকেরা যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁদের পরিশ্রম সফল হবে আশা করা যায়।

AMERICA FACES THE WAR : I. Mr. Roosevelt Speaks. II. An American Looks at the British Empire. III. The faith of an American. IV. The Monroe Doctrine Today. Oxford University Press. 6d. net each.

এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য Oxford Pamphlets on World Affairs-এর অনুরূপ। আমাদের দেশের পাঠকদের কাছে এই পুস্তিকাগুলি বিশেষ মূল্য এই যে বর্তমান জগতে, বিশেষ করে বর্তমান যুদ্ধে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান যত বেশি বড়, আমেরিকার চিন্তাধারা ও রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সেই পরিমাণে কম। রাশিয়ার মতন আমেরিকাও আমাদের কাছে প্রায় উপকথা ও কিংবদন্তীর সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উপকথা ও কিংবদন্তীর কুয়াশা ভেদ ক'রে আমেরিকার প্রকৃত পরিচয় এই পুস্তিকামালার ভিতর দিয়ে অন্তত খানিকটা ফুটে উঠবে এই আশা হয়।

এক পয়সায় একটি—কবিতা-ভবন কর্তৃক প্রকাশিত। দাম চার আনা।

ষোলো পাতার বইতে ষোলোটি কবিতা—দাম চার আনা, সুতরাং নাম 'এক পয়সায় একটি'। কবিতায় মিল না থাকলেও দামে ও নামে এরকম মিল বাংলা সাহিত্যে নতুন সন্দেহ নাই। অন্য সাহিত্যে এর জুড়ি আছে কিনা জানিনা। এই নাম অবলম্বন ক'রে শুধু একটি বই প্রকাশিত হয় নি—

হয়েছে দুটি এবং আরো হবে এই আশ্বাস প্রকাশক জানিয়েছেন। অর্থাৎ 'এক পয়সায় একটি' শুধু বই-র নয়, সিরিজের বা গ্রন্থমালার নাম। প্রথম বইটির লেখক বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয়টির অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রথমটির নাম গ্রন্থমালার নামে, দ্বিতীয়টির উপনাম 'মাটির দেওয়াল' :

এই বইটার নাম মাটির দেওয়াল।
হঠাৎ হয়েছিল খেয়াল
আখর আঁকতে
ধুলোর ধসবার আগে থাকতে।
দুদণ্ড রাস্তার লোককে ডাকতে
মাটির আঁচড়কাটা এই মাটির দেওয়াল।

মলাটের দ্বিতীয় পিঠে এই নাম-পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে—ষোলো পাতায় যে ষোলোটি কবিতা আছে তাদের থেকে স্বতন্ত্র ভাবে। সুতরাং এটি একেবারে ফাউ।

'কবিতা-ভবন' এই বই দুখানির সঙ্গে যে বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে 'এক পয়সায় একটি' এই নামে "কিছু বিদ্রূপ, কিছু হয় তো ঔদ্ধত্য আছে —তা থাক।" কিন্তু বিদ্রূপ বা ঔদ্ধত্যর চাইতে যা বেশি আছে তা ব্যবসাবুদ্ধি। তার পরিচয় পাই এই বিজ্ঞপ্তিতে : "নিচের ঠিকানায় (অর্থাৎ কবিতা-ভবনে) পাঁচ আনার ডাক টিকিট পাঠালে ভারতবর্ষের যে-কোনো ঠিকানায় একখানা বই পাঠানো হবে, দু খানার জন্য সাড়ে ন' আনা পাঠাবেন।" সুতরাং এই গ্রন্থমালা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় ভারতীয় অন্তর্বাণিজ্যের ইতিহাসেও নতুন উদ্যম—একেবারে সস্তায় জাপানী মাল 'ডাম্পিং'এর সামিল। এত সুলভে বাংলা কবিতা বিকোলে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা নিজেদের ভাষা ছেড়ে বাংলা ভাষার চর্চা সুরু করবে আশা করা যায় কি? কিম্বা স্ব স্ব প্রাদেশিক সাহিত্যের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তারা আবগারী শুল্ক বসিয়ে 'এক পয়সায় একটি'র প্রবেশ পথ বন্ধ করার জন্যে ভারতব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করবে?

সে যাই হোক, বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই কবিতা-ভবনের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এই রকম একটি 'গ্রন্থমালা' প্রবর্তনের জন্যে। কেন না, আধুনিক

কবিতা সম্বন্ধে মতভেদ যতই তীব্র হোক না কেন, বাংলা সাহিত্যে যাঁদের আগ্রহ আছে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া আধুনিক কবিতা সবই এক জাতীয় নয়। বুদ্ধদেব বসু ও অমিয় চক্রবর্ত্তী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছাঁদের কবিতা লেখেন—এঁদের একজনের কবিতা ভালো না লাগলে, আর এক জনের কবিতাও যে লাগবে না এমন কোনো কারণ নাই। এমন অনেকে নিশ্চয় আছেন যাঁদের কাছে এঁদের দুজনের কবিতাই আগ্রহের সঙ্গে পড়বার যোগ্য, নিছক কাব্যরসের জন্যে না হলেও আঙ্গিকের জন্যে। আর্থিক অক্ষমতার দোহাই দিয়ে যাঁরা এই আঙ্গিক সম্বন্ধে এতদিন নিজেদের অজ্ঞতা সমর্থন করতেন 'এক পয়সায় একটি' বেরোবার পর তাঁদের এই অজুহাত আর চলবে না।

এই গ্রন্থমালা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—গঠনসৌষ্ঠব। হাতে-তৈরী কাগজে ছাপা 'এক পয়সায় একটি' হাতে নিলে আনন্দ হয়—ছাপার পারিপাট্যে ও বিশেষ ক'রে মলাটের উপরকার নক্সার মনোহারিত্বে।

হিরণকুমার সান্যাল

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৪৯

উপনিষদে জড়তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

উপনিষদে জড়ের স্থান

['পরিচয়ে'র পরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় 'উপনিষদে জড়তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব' নাম দিয়া একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত;—প্রথম খণ্ডে উপনিষদুক্ত জড়তত্ত্ব এবং দ্বিতীয় খণ্ডে উপনিষদুক্ত জীবতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। উপনিষদের প্রতি দত্ত মহাশয়ের সমধিক পক্ষপাত; তিনি বহু বৎসর ধরিয়া উপনিষদের আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঐ আলোচনার আংশিক ফল স্বরূপ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে হীরেন্দ্রবাবু 'উপনিষদ্-ব্রহ্মতত্ত্ব' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি উপনিষদুক্ত জড় ও জীব-তত্ত্ব বিবৃত করিয়া গ্রন্থান্তর রচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এতদিনে সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হইল।

আর্য ঋষিরা উপনিষদের খনিতে ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল তত্ত্বরত্ন নিহিত রাখিয়া গিয়াছেন, হীরেন্দ্রবাবুর 'উপনিষদ্-ব্রহ্মতত্ত্ব' গ্রন্থে প্রধানতঃ তাহারই আলোচনা আছে। জড়তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্পর্কে আর্য ঋষিরা যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ উপনিষদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

'পরিচয়ে' বিগত বর্ষে হীরেন্দ্রবাবুর ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড হইতে আমরা জীবতত্ত্ব-বিষয়ক কয়েকটি অধ্যায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। বর্তমান সংখ্যা হইতে তাঁহার গ্রন্থে জড়তত্ত্ব বিষয়ে গ্রথিত কয়েকটি অধ্যায় প্রবন্ধাকারে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত করিব। আশা করি 'পরিচয়ে'র পাঠক তদ্দ্বারা যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিবেন—সম্পাদক]

উপনিষদের অকুণ্ঠ উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছান্দোগ্য, ৬।২।১)। ব্রহ্ম কেবল এক নন, তিনি অ-দ্বিতীয়—অর্থাৎ তিনি শুধু Unit নন, তিনি Unique।

ন তু তদ্-দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততোঽন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ—বৃহ, ৪।৩।২৩

'তিনি অদ্বিতীয়—তিনি ব্যতীত অন্য কেহ যখন নাই, তখন দ্বিতীয় কিরূপে দৃষ্ট হইবে?'

যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ—শ্বেত, ৩।৯

'তাঁহা হইতে অপর পরতর অন্য কিছু নাই।'

ইহা ঋগ্বেদের সেই প্রাচীন বাণী—

তস্মাৎ হান্যৎ ন কিঞ্চনাস—১০।১২৯।২

'তিনি ভিন্ন কোন কিছু নাস্তি নাস্তি'। এক কথায় তিনি সর্বেসর্বা—বিশ্বে কোন কিছু বিষয় নাই ;—আছেন এক অ-দ্বিতীয় ব্রহ্ম।

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ * * * আত্মৈব অধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণতঃ আত্মা উত্তরতঃ —ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১-২

'তিনিই অধে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে * * * আত্মাই অধে, আত্মাই ঊর্দ্ধে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে।'

ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতম্—মুণ্ডক, ২।১।১১

'সেই অমৃত ব্রহ্ম সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে, অধে ও ঊর্দ্ধে।'

ইহা নিপট অদ্বৈতবাদ (Uncompromising Idealism)—যে বাদে 'The Atman is the sole Reality—এক-রস, সর্বাংশে একরূপ, নির্দোষভাবে সম পরমাত্মাই সৎ আর সমস্তই অসৎ—যে বাদে জড় ও জীব সত্য নয় বস্তু নয়—প্রতিভাস মাত্র—'The Individual Soul (জীব) is an apparition as the External World (জড়) is an appearence.' * —যে বাদে দার্শনিক

---

* ইহুদি ধর্মগ্রন্থ জোহরে (Johar-এ) আমরা এই ধরণের কথা শুনিতে পাই—It is a sort of illusion * * It is a thing, which merely appears to be but is not.

বিচারের বিষয়ীভূত তত্ত্বত্রয়—ব্রহ্ম, জীব ও জড়ের মধ্যে ব্রহ্মই পরমার্থ, জীব ও জড় অবিদ্যার বিজৃম্ভণ মাত্র—It is all Avidya—'মায়া-মাত্রং তু'।

ফলতঃ দেখা যায় উপনিষদ্ এ ভাবে স্পষ্ট ভাষায় নানাত্বের নিষেধ করিয়াছেন—নো এতৎ নানা (কৌষীতকী, ৩।৮)। পুনশ্চ—'নেহ নানা হস্তি কিঞ্চন'—'It is not plurality that is real but only Unity.'

এই বচন উপনিষদে অনেকবার দেখা যায়।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥
—বৃহ, ৪।৪।১৯

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥
—কঠ ২।১।১০

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥
—কঠ ২।১।১১

'মনের দ্বারা ইহা দৃষ্টি করা কর্তব্য যে, এখানে কোন কিছু নানা (বহু) নাই। যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

'যিনি এখানে তিনিই সেখানে, যিনিই সেখানে তিনিই এখানে। যে এখানে নানা দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

'মনের দ্বারা ইহা নিশ্চয় করা উচিত যে, এখানে কিছু নানা (বহু) নাই। যে এখনে নানা দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

নৃসিংহ-তাপনীর উপদেশ আরও বিস্পষ্ট।

নাত্র কাচন ভিদা অস্তি, নৈব তত্র কাচন ভিদা অস্তি ;
অত্র হি ভিদাম্ ইব মন্যমানঃ * * মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি
—নৃসিংহ, ৮ম খণ্ড।

'ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ নাই নাই। যে এখানে যেন ভেদ মনে করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

এই নানাত্ব-নিষেধের তাৎপর্য্য কি ?

It involves that all plurality (consequently all proximity in space, all succession in time, and interdependance of cause and effect, all contrast of subject and object) has no reality in the highest sense.—অর্থাৎ, দৈশিক দূরাস্তিকত্ব, কালিক পূর্বাপরত্ব, নৈমিত্তিক কার্য্যকারণত্ব * এবং জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ের 'ত্রিপুটীরূপী নানাত্ব, পরমার্থ-দৃষ্টিতে অসৎ, অবস্তু—একমেবাদ্বিতীয় অদ্বয়ই বস্তু, সৎ। ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

তথান্য-প্রতিষেধাৎ—ব্রঃ সূ, ৩।২।৩৬

'উপনিষদ্ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত সমস্তের বারণ করিয়াছেন।'

কিন্তু এ নিপট অদ্বৈতে মানব চিন্তা সুস্থিত হইতে পারে না—এ তুঙ্গ শৃঙ্গে উন্নীত হইলে তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়—'With this thought, a height was reached on which a prolonged stay was impracticable. (Prof. Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 162)। কারণ, প্রতি মূহূর্তেই আমরা বিশ্বের বিবিধ বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করিতেছি—অতএব 'ইদং'কে, দ্বৈতকে একেবারে প্রত্যাখান করি কিরূপে? সেই জন্য উপনিষদ্ দ্বৈতকে কথঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিয়া বলিলেন—এই যে 'ইদং' তোমার সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে, ঐ ইদং বস্তুতঃ ব্রহ্ম—

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১

'এ সমস্তই ব্রহ্ম'।

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্ ইদং বরিষ্ঠম্—মুণ্ডক, ২।২।১১

'এ বিশ্ব বরিষ্ঠ ব্রহ্মই।'

ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্—নৃসিংহ, ২।৭

'ব্রহ্মই এ সমস্ত'।

আত্মৈবেদং সর্বম্—ছা, ৭।২৫।২

* Not as though God (ব্রহ্ম) were to be sought on the other side of the universe, for He is not at all in space ; nor as though He were before or after, for He is not at all in time ; nor as though He were the cause of the universe, for the law of causality has no application here.

—Deussen, p 161.

'আত্মাই এ সকল।'

ইদং সর্বম্ যদয়মাত্মা—বৃহ, ২।৪।৬

'এই সব সেই পরমাত্মা।'

ইহা ঋগ্বেদের সেই প্রাচীন উপদেশ—পুরুষ এবেদং সর্বম্—ঋগ্বেদ, ১০।৯০।২—ইহাই উপনিষদের Pantheism (বিশ্বব্রহ্মবাদ)। *

এই যে 'ইদং-কে' ব্যাবহারিক (pragmatic) ভাবে স্বীকার করিয়া পারমার্থিক ভাবে ব্রহ্মের প্রতিপাদন—শ্রুতি কি কৌশলে তাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন? উপনিষদের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, শ্রুতি কোথাও বলিয়াছেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত—আর কোথাও বলিয়াছেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মের বিধা,—এবং এই কথার সমর্থন জন্য উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিশ্ব যাঁহার বিবর্ত বা বিধা—তাঁহাকে জ্ঞাত হইলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়। এ সম্পর্কে বৃহদারণ্যকের ঋষি বলিতেছেন—

আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্—বৃহ ২।৪।৫

'পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান হইলে সমস্তই বিদিত হয়।'

মুণ্ডক উপনিষদে দেখিতে পাই, শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করিতেছেন—কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি—মুণ্ডক, ১।১।৩। উত্তরে গুরু বলিলেন—পরাবিদ্যা দ্বারা যে অক্ষর ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া যায় তাঁহাকে জানিলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়; সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পূর্বতন মহর্ষিরা বলিতেন যে অদ্য হইতে আমাদের আর কোন কিছু অ-শ্রুত, অ-মত, অ-বিজ্ঞাত রহিল না।

এতৎ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্য কশ্চন হ অশ্রুতম্ অমতম্ অবিজ্ঞাতম্ উদাহারিষ্যতীতি।—ছান্দোগ্য, ৬।৪।৫

---

* এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডয়সনের কয়েকটি সুচিন্তিত বাণী প্রণিধানযোগ্য—

'The universe was still something existing; it lay there before their eyes. It was necessary to endeavour to find a way back to it. This was accomplished without abandoning the fundamental idealistic principle, by conceding the reality of the manifold universe, but at the same time maintaining that this manifold universe is in reality Brhaman. Idealism therefore entered into alliance with the realistic view, natural to us and became thereby Pantheism.

—Philosophy of the Upanishads, p. 962.

এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যখন সমস্তই ব্রহ্ম, যখন জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র, যখন সমস্ত জাগতিক পরার্থ ব্রহ্মেরই বিধা বা প্রকার-ভেদ মাত্র, তখন ব্রহ্মের বিজ্ঞান হইলে আর কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

প্রথমতঃ আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি উপনিষদ্ কিভাবে বিশ্বকে ব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়াছেন। ঐরূপ উক্তির তাৎপর্য এই যে নানা-দ্বৈত-ভেদ মায়া মাত্র, অসৎ, অবস্তু। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ জড়কে স্পষ্টভাবে মায়া মাত্র বলিয়াছেন—

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ—শ্বেত, ৪।১০। এই 'মায়া' শব্দটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঋগ্বেদে প্রথম আমরা এই শব্দের সাক্ষাৎ পাই—ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে * (ঋগ্বেদ, ৬।৪৭।১৮)

অথর্ব বেদে হিরণ্যগর্ভকে মায়া দ্বারা ছন্ন বলা হইয়াছে—

যত্র দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ অরা নাভাবিব শ্রিতাঃ।
অপাং ত্বা পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্র তন্ মায়য়া হিতম্॥

—অথর্ববেদ ১০।৮।৩৪

* ঋগ্বেদের এই মন্ত্র বৃহদারণ্যকের ২।৫।১৯ ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত হইয়াছে।

নিত্যানন্দমুনি ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ মায়াভিঃ মায়য়া (নাম-রূপ-বিষয়-মিথ্যাভিমানাত্মনা পরিণতয়া) পুরুরূপঃ (বহুরূপঃ) ঈয়তে (প্রতীয়তে)—মিথ্যৈব জলসূর্যবৎ। মহেশ্বরের এই মায়াশক্তির কথা আমরা চুলিকা উপনিষদেও শুনিতে পাই—

বিকারজননীং মায়াম্ অষ্টরূপাম্ অজাং ধ্রুবাম্
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ॥
পিবন্তে নামবিষয়ম্ অসংখ্যাতাঃ কুমারকাঃ।
একস্তু পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দেন বশানুগঃ॥

—চুলিকা, ৩।৬

মায়াং ধ্যায়তে চিন্তয়তি (ঈশ্বরঃ) জগৎসৃষ্ট্যর্থম্ সংভাবয়তি নারীমিব ঋতুস্নাতাম্

(নারায়ণ)।

এই সহযোগের ফলে যে সকল সন্ততি উৎপন্ন হয় তাহারা মায়ার স্তন্য পান করে (drinks from the breasts of the foster-mother, Maya)। কিন্তু ঈশ্বর (মায়া যাঁহার বশে) তিনি স্বচ্ছন্দে সে দুগ্ধ পান করেন।

নৃসিংহতাপনীও বলিতেছেন—মহামায়ং মহাবিভূতি সচ্চিদানন্দমাত্রম্ একরসংপরমেব ব্রহ্ম। জগৎ মায়াবেষ্টিত বটে—মায়য়া এতৎ সর্বং বেষ্টিতং ভবতি—কিন্তু তিনি মায়াতীত—নাত্মানং মায়া স্পৃশতি।

অর্থাৎ 'The flower of the water (Hiranyagarbha) is concealed by illusion (maya)' *

নৃসিংহ-তাপনীয় উপনিষদ্‌ও এই বিশ্বকে মায়া মাত্র বলিয়াছেন—

ইদং সর্বং যদয়মাত্মা মায়ামাত্রএব।

পুনশ্চ—তদ্ যথা বট-বীজ-সামান্যম্ একং অনেকান্ স্বাব্যতিরিক্তান্ বটান্ সবীজান্ উৎপাদ্য তত্র তত্র পূর্ণং সৎ তিষ্ঠতি, এবমেব এষা মায়া স্বাব্যতিরিক্তানি পূর্ণানি ক্ষেত্রাণি দর্শয়িত্বা জীবেশৌ অবভাসেন করোতি—মায়া চ অবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি। সৈষা চিত্রা সুদৃঢ়া বহ্বঙ্কুরা—নৃসিংহ-উত্তর (৯ম খণ্ড)

'এই মায়া বিচিত্রা, সুদৃঢ়া, বহু-অঙ্কুর সমন্বিতা। যেমন একটি বটবীজ-সামান্য অনেক স্ব-অভিন্ন সবীজ বট উৎপাদন করিয়া স্বয়ং পূর্ণভাবে ব্যবস্থিত থাকে, সেইরূপ এই মায়া স্ব-অভিন্ন পূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ প্রদর্শন করিয়া জীব ও ঈশ্বরের অবভাস করে এবং নিজে মায়া ও অবিদ্যারূপে অবভাসিত হয়।'

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া পঞ্চদশী-কার বলেন—মায়াখ্যায়াঃ কামধেনো র্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ—কামধেনু মায়ার দুইটি বৎস—জীব ও ঈশ্বর।

জগৎ মায়া মাত্র (Illusion) বলিয়াই উপনিষদ একাধিক বার বলিয়াছেন —'জগৎ যেন আছে' 'দ্বৈত যেন আছে' 'দ্বিতীয় যেন আছে' 'নানা যেন আছে' (The world exists as it were—ইব) ; অর্থাৎ, দ্বৈত দ্বিতীয় বস্তুতঃ নাই—তাহার ভাণ হয় মাত্র।

যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি ইত্যাদি—বৃহ, ২।৪।১৪

যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ ইত্যাদি—বৃহ, ৪।৩।৩১

য ইহ নানা ইব পশ্যতি—বৃহ, ৪।৪।১৯, কঠ ২।১।১০,১১

অন্যত্র উপনিষদ জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

* অন্যত্র অথর্ববেদ বলিয়াছেন—

অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীং পরমমিব জনাঃ বিদুঃ।
উতো সন্ মন্যন্তেঽবরে যে তে শাখাম্ উপাসতে॥
— অথর্ববেদ, ১০।৭।২১

অর্থাৎ 'The common people however do not know this ; they regard as the real not the stem but that which He is not—the branches that conceal Him (অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীম্)।

ধ্যায়তীব লেলায়তীব—বৃহ, ৪।৩।৩১

'জীব যেন ধ্যান করে, যেন ক্রীড়া করে'।

এই 'ইব' শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। জগৎ যদি মায়া-মাত্র না হইত, তবে শ্রুতি জগতের সম্বন্ধে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, শ্বেতকেতু ঋষি-পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি।—ছান্দোগ্য ৬।১।৩

'হে ভগবান্! সেই আদেশ (রহস্য উপদেশ) কি—যদ্দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়।' অর্থাৎ, এমন কি আছে, যাহাকে জানিলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না।

ঋষি দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বস্তুর উপদেশ করিলেন—

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্।

যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্ এবং সোম্য! স আদেশো ভবতীতি।—ছান্দোগ্য ৬।১।৪-৬

"হে সোম্য! যেমন এক খণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুই জানা যায়, কারণ, তাহারা মৃত্তিকারই বিকার, বাক্যের যোজনা, নামমাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য; যেমন একখণ্ড স্বর্ণকে জানিলে সমস্ত স্বর্ণময় বস্তুই জানা যায়, কারণ, তাহারা স্বর্ণেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, স্বর্ণই সত্য; যেমন এক খণ্ড লৌহকে জানিলে সমস্ত লৌহময় বস্তুই জানা যায়, কারণ, তাহারা লৌহেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, লৌহই সত্য; হে সোম্য! এ আদেশও সেই রূপ।"

অর্থাৎ এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ, ইহা ব্রহ্মেরই বিবর্ত মাত্র—ইহা বাক্যের যোজনা, নামের রচনা, রূপের প্রস্তাবনা মাত্র। একথা আমরা পূর্বেই ঋগ্বেদের ঋষির মুখে শুনিয়াছিলাম—

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি—১।১৬৪।৪৬

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন

বাদ্ ইদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্ আচক্ষতে—২।৬

অর্থাৎ, 'It is a mere matter of speech'. বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রেও এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপদেশ দিতেছেন—

তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪

'ব্রহ্ম হইতে জগৎ অনন্য (অভিন্ন)—শ্রুত্যুক্ত বাচারম্ভণ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ইহা সূচিত হইতেছে।'

যথা ন তোয়তো ভিন্নাঃ তরঙ্গাঃ ফেন-বুদ্বুদাঃ
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বম্ আত্ম-বিনির্গতম্ ॥

'যেমন জলরূপী তরঙ্গ ফেন বুদ্বুদ জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত এই বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়।'

'বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত'। বিবর্ত' কি ?

অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ

—স্বরূপের প্রচ্যুতি না হইয়া বস্তুর অন্যরূপে যে ভান, তাহাই বিবর্ত। ইহার দার্শনিক নাম 'অধ্যাস'—অধ্যাসো নাম অ-তস্মিন্ তদ্-বুদ্ধিঃ (শঙ্কর)। উহা মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্ভিত—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, মরীচিতে মরীচিকা (mirage)-ভ্রম। ইহা প্রতীতি মাত্র—'mere matter of seeming' ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত (ভাগবত)—ইহার জননী মায়া। * এইরূপ মায়া-বশেই ব্রহ্ম বিশ্বরূপে বিবর্তিত হইতেছেন—

---

* এ মায়াকে পাশ্চাত্য দেশে 'Glamour' বলে—আমরা এ দেশে বলি ইন্দ্রজাল। মারীচ রাক্ষস ঐ ইন্দ্রজাল প্রভাবেই রাম-সীতার চক্ষে স্বর্ণ মৃগরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। Sir Walter Scott তাঁহার বিখ্যাত কাব্য 'Lay of the Last Minstrel'-এ (Canto III) Glamour বা ইন্দ্রজালের সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

It had much of glamour-might,
Could make a ladye seem a knight
The cobwebs on a dungeon-wall.
Seem tapestry in a lordly hall;
A nut-shell seem a gilded barge,
A sheeling seem a palace large.
And youth seem age, and age seem youth
—All was delusion, naught was truth.

Sheeling = Shepherd's hut

প্রতীতিমাত্রম্ এবৈতৎ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্।

অর্থাৎ, The entire unfolding in space and time is a merely *subjective* phenomenon.' এই প্রতীতিকেই এ দেশের দার্শনিক ভাষায় 'বিজ্ঞান' বলে। যাঁহারা বিজ্ঞানবাদী (Idealists)—তাঁহাদের মতের সার এই যে—নাস্তি অর্থঃ বিজ্ঞান-বি--সহচরঃ—'বিজ্ঞান'-ব্যতিরিক্ত বস্তুর সত্তা নাই। *

এই যে জগতের ভাণ হইতেছে—তাহা কি নিরাধার? মাধ্যমিক বৌদ্ধ যাহাকে 'শূন্য' বলেন, ইহা কি সেই শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? ব্রহ্মবাদী ঋষি বলেন—তা নয়—ব্রহ্মই জগৎ-রূপে প্রতিভাত হন—

তদাস্পদং হি ইদং সমস্তং কার্যম্ (শঙ্কর)। অধিকন্তু প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মত্ব-দর্শনাৎ বিয়দাদি প্রপঞ্চো ব্যবস্থিত-রূপো ভবতি (৩।২।৪ ব্রহ্ম সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য) অর্থাৎ, যতদিন না জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্মানুভূতি হয়, ততদিন পর্যন্ত আকাশাদি প্রপঞ্চ অ-বাধিত থাকে।

কিন্তু—যদা সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ বিজানতঃ তদা কং কেন পশ্যেৎ—বৃহ, ২।৪।১৩

পুনশ্চ শঙ্কর বলিতেছেন :—

ন তাবৎ উভয়-প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদ-প্রসঙ্গাৎ। কঞ্চিৎহি পরমার্থম্ আলম্ব্য অপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ। তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং পরিবেধতি, পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ।

, অর্থাৎ, জগৎ ও জগতের আধার—উভয়েরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে; কারণ, তাহা হইলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হয়। 'পরমার্থ সৎ' (ব্রহ্ম) অবাধিত—তিনি আছেনই। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরমার্থ (প্রপঞ্চ) বাধিত হয়। কিন্তু নির্বাধ ব্রহ্ম কখনও কোনও দিন প্রতিষিদ্ধ হন না—হইতে পারেন না।

মাধ্যমিক বলেন—বিজ্ঞানই বিশ্ব—নাস্তি অর্থঃ বিজ্ঞান-বি-সহচরঃ—আর ঐ বিজ্ঞান ক্ষণিক বিজ্ঞান। বৈদান্তিক বলেন বিজ্ঞানই বিশ্বরূপে প্রতিভাত হন বটে কিন্তু সে বিজ্ঞান ব্রহ্ম—বিজ্ঞানং ব্রহ্ম। তিনি ক্ষণিক নহেন, তিনি পরমার্থ সৎ—Eternal and Immutable—সেই জন্য তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জগৎ নিবৃত্ত হইলেও 'অভাব' হয় না, শূন্য হয় না।

---

* এ-সম্পর্কে মল্লিখিত 'শঙ্কর-বেদান্তে বিজ্ঞানবাদ' প্রবন্ধে সম্যক আলোচনা আছে। জিজ্ঞাসু পাঠক উহা হইতে বিবর্তবাদ-সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

নাভাব উপলব্ধেঃ—ব্রঃ সূ, ২।২।২৮

দ্রব্য যে ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, উপনিষদের মতে তাহা ব্যাবর্ত্ত (phenomenon) মাত্র, পরমার্থ (noumenon) নহে। ঐ নশ্বর ব্যাবর্ত্তের পশ্চাতে কিন্তু এক অবিনশ্বর, অজর, অমর, অক্ষর পরমার্থ বিদ্যমান আছেন। সেই জন্য শঙ্করাচার্য বলিলেন 'পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ'। ঐ পরমার্থসৎ ব্রহ্মই বস্তু, আর যাহা কিছু সমস্তই অ-বস্তু।

বস্তুতঃ বিশ্বের এই যে বিবিধ বৈচিত্র্য—মূলতঃ উহা কেবল নামরূপের প্রভেদ। যেমন হারে ও কিরীটে নামের ও রূপের ভেদ থাকিলেও উভয়েই সুবর্ণ, সেইরূপ জাগতিক পদার্থ নিচয়ের মধ্যে নামরূপের প্রভেদ সত্ত্বেও সকলেই ব্রহ্মের বিবর্ত—

নামরূপাভ্যাং ব্যক্রিয়ত—বৃহ, ১।৪।৭

কারণ, জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু নাই।

সেই জন্য কৌষীতকী উপনিষদ্ জগতের নানাত্ব নিষেধ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন :—

তদ্ যথা, অরেষু নেমিরর্পিতো নাভৌ অরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ।—কৌষীতকী ৩।৮

'যেমন রথের চক্র অরে অর্পিত থাকে এবং অর নাভিতে অর্পিত থাকে, এইরূপ ভূত-সমূহ ইন্দ্রিয়ে অর্পিত আছে এবং ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে অর্পিত আছে। সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ—অজর, অমর, ব্রহ্ম।'

এইভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় লোক, দেব, ভূত যাহা কিছু—এ সমস্তই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ * * সর্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্বং বেদ। ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রং ইমে লোকাঃ ইমে দেবাঃ ইমানি ভূতানি ইদং সর্বং যদয়ম্ আত্মা।—বৃহ, ২।৪।৬

এই অর্থে ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি আরুণি পুত্র-শ্বেতকেতুকে প্রাকৃতিক ও জৈবিক বিবিধ ব্যাপারের (নদীর প্রবাহ, বীজের অঙ্কুর, জীবের স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতির) মূল তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন —

স য এষ অণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো !—ছান্দোগ্য ৬।৮।

'যে সেই অণিমা, তদাত্মক এই সমস্ত—তিনিই সত্য তিনিই আত্মা। তুমিই তিনি, হে শ্বেতকেতু !'

অর্থাৎ, জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, যে কিছু ব্যাপার ঘটিতেছে, সে সমস্তই ব্রহ্মের বিবর্ত। তিনিই সব, তিনিই সত্য, তিনি ভিন্ন কোন কিছু নাই।

উপনিষদের ঋষিরা বিশ্বকে কি ভাবে ব্রহ্মের বিবর্ত বলেন, তাহা আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিলাম। বিশ্ব কি ভাবে ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার—আগামী বারে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। আজ এই পর্যন্ত।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বৌদ্ধ শূন্যবাদ

শূন্যবাদ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের এমন কি পণ্ডিতগণেরও ধারণা বড় অদ্ভুত। বৌদ্ধ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও, বিশেষত পাশ্চাত্য দেশীয়দের মধ্যে অনেকেই ইহা বুঝিতে পারেন নাই, বা ভুল বুঝিয়াছেন।

শূন্যবাদকে সর্বনাস্তিত্ববাদ, উচ্ছেদবাদ বা নিহিলিস্‌ম (Nihilism) বলিয়াই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন।

দেখা যাইতেছে 'শূন্য' শব্দটিই শূন্যবাদকে বুঝিবার বাধা এবং ভুল বুঝিবার কারণ হইয়াছে।

এই 'শূন্য' শব্দ যে প্রচলিত 'শূন্য' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই—ইহা যে অভাবাত্মক শূন্য শব্দ নহে, তাহা শূন্যবাদী ঋষি পরিষ্কার করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন :—

"'প্রতীত্য সমুৎপাদ' শব্দের যে অর্থ 'শূন্যতা' শব্দেরও সেই অর্থ। অভাব শব্দের যে অর্থ শূন্যতা শব্দের সে অর্থ নহে। অভাব শব্দের অর্থ 'শূন্যতা' শব্দের উপর আরোপ করিয়া আপনি অনর্থক আমাদের দোষ দিতেছেন (১)।"

(নাগার্জুন কৃত—মূলমধ্যমককারিকা ২৪।৭)।

অভাব অর্থে যে 'শূন্যতা' শব্দের প্রয়োগ হয় নাই তাহা প্রমাণিত হইল, সুতরাং 'শূন্যতা' সর্বনাস্তিত্ববাদ বা উচ্ছেদবাদ নহে।

যাহা কিছু আপেক্ষিক (Relative) অন্যসাপেক্ষ অন্যাশ্রিত পরতন্ত্র (other dependent) যাহারা উৎপাদ, বিরোধ, অস্তিত্ব সমস্তই অন্যের উপর (অর্থাৎ তাহার হেতু ও প্রত্যয়ের উপর) নির্ভর করিতেছে, সেই ভাগ্য প্রপঞ্চের নিরসনই শূন্যবাদের উদ্দেশ্য।

"সমস্ত প্রপঞ্চের উপশমহেতু, 'শূন্যতার' উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তুমি তাহা না বুঝিয়া শূন্যতার নাস্তিত্ব অর্থ কল্পনা করিয়া প্রপঞ্চ-জালই বৃদ্ধি

---

(১) এবং প্রতীত্যসমুৎপাদশব্দস্য যোঽর্থঃ স এব শূন্যতাশব্দস্যার্থঃ। ন পুনরভাবশব্দস্য যোঽর্থঃ স শূন্যতাশব্দস্যার্থঃ। অভাবশব্দার্থং চ শূন্যতার্থমিত্যধ্যারোপ্য ভবানস্মানুপালভতে।

করিতেছ। 'শূন্যতার' প্রয়োজন বুঝিতে পারিতেছ না। প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিশীল 'শূন্যতা'য় নাস্তিত্ব কোথায় (১)?"

—মূলমধ্যমককারিকা, ২৪।৭।

প্রশ্ন উঠিবে, প্রপঞ্চের নিরসনই শূন্যতার উদ্দেশ্য তাহা তো বোঝা গেল। কিন্তু প্রপঞ্চাতীত কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন শূন্যবাদ করে কিনা, এবং তাহা করিয়া থাকিলে, সেই কোনো কিছু কি, তাহাব বর্ণনা শূন্যবাদী করিয়াছেন কি?

শূন্যবাদী বলেন—"প্রপঞ্চাতীতের বর্ণনা সম্ভব নহে। সর্বপ্রকার জ্ঞানের অতীত হওয়ায়, উহা বর্ণনাতীত। কোন প্রকারেই উহাকে বুদ্ধির বোধগম্য করা যায় না। কেমন করিয়া তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিব?"

সর্ব-উপাধি বর্জিত (২) বলিয়া, সেই প্রপঞ্চ-বিনির্মুক্তি পরমার্থ সত্যতত্ত্বকে কোনো প্রকার কল্পনার দ্বারাও ধারণা করা যায় না। কল্পনার অতীত বলিয়া উহা শব্দেরও বিষয়ীভূত নহে। শব্দ হইতেছে কল্পনা বা ভাবের প্রকাশক; যাহা কল্পনা বা ভাবের অতীত, তাহা কেমন করিয়া শব্দের বিষয় হইবে? অতএব সর্বপ্রকার কল্প, বিকল্প, ভাব, ভাষা, ভাষণ, বিহীন হেতু, আরোপ বিরহিত, সংবৃতি-বিবর্জিত, অব্যবহার্থ, অনভিলাপ্য, অনির্বচনীয়, পরমার্থ-তত্ত্ব কীরূপে প্রতিপাদন করিব (৩)?

"পরমার্থ সত্য যদি কায়, বাক ও মনের বিষয়ীভূত হইত তাহা হইলে তাহাকে আর পরমার্থসত্য বলা যাইত না। তাহা সংবৃতি সত্যই হইয়া যাইত। অতএব উহা সর্ব-কল্পনার অতীত। সর্ব-বিশেষণের বহির্ভূত, ভাব,

---

(১) অতো নিরবশেষপ্রপঞ্চোপশমার্থঃ শূন্যতোপদিশ্যতে। তস্মাৎ সর্বপ্রপঞ্চোপশমঃ শূন্যতায়াং প্রয়োজনং। ভবাংস্তু নাস্তিত্বং শূন্যতার্থং পরিকল্পয়ন্ প্রপঞ্চজালমেব সংবর্ধয়মানো ন শূন্যতায়াং প্রয়োজনং বেত্তি। অতঃ প্রপঞ্চনিবৃত্তিস্বভাবায়াং শূন্যতায়াং কুতো নাস্তিত্বং।

(২) দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে, নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতং চ সর্বোপাধি-বর্জিতম্। বেদান্তদর্শন, শাঙ্করভাষ্য, ১।১।১১।

ব্রহ্মের দুইটি রূপ। একটি হইতেছে নাম-রূপ-বিকার-ভেদ-উপাধি-সমন্বিত এবং অন্যটি হইতেছে—তাহার বিপরীত—সর্ব-উপাধি-বর্জিত।

(৩) নির্গুণের গুণীকরণ সম্ভব নহে। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩১৬।১

অভাব, স্বভাব, পরভাব, সত্য, অসত্য, শাশ্বত, উচ্ছেদ, নিত্য, অনিত্য, সুখ, দুঃখ, শুচি, অশুচি, আত্মা, অনাত্মা, শূন্য, অশূন্য, একত্ব, অন্যত্ব, উৎপাদ, নিরোধ ইত্যাদি কোনো বিশেষণই, কোনো শব্দই পরমার্থসত্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। উহা অনভিলাপ্য, অনজ্ঞেয়, অপরিজ্ঞেয়, অবিজ্ঞেয়, অদেশিত, অপ্রকাশিত, উহা অ-ক্রিয়, অকরণ ইত্যাদি (১)।”

—বোধিচর্যাবতার, নবম পরিচ্ছেদ।

ইহা হইতে বোঝা যাইবে, প্রপঞ্চাতীত কোনো তত্ত্বে শূন্যবাদীর বিশ্বাস নাই বলিয়াই যে সে-বিষয়ে তিনি মৌন রহিয়াছেন, তাহা নহে, কিন্তু প্রপঞ্চাতীত পরমতত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়াই তিনি সে সম্বন্ধে নীরব থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন।

উপনিষদের ঋষিগণও বলিয়াছেন—

“বাক্য ও মন যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, (২) যেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন পৌঁছায় না—তাহাকে কেমন করিয়া বোঝান যায়, জানি না, বুঝিতে পারিতেছি না।”

—কেনোপনিষদ্, ১।৩।

সুতরাং সেই প্রপঞ্চাতীত পরমতত্ত্ব—যাহাকে নির্গুণ, নির্বিকল্পক, ভূব্রহ্ম বা ইংরাজীতে ‘অ্যাবসলিউট’ (Absolute) সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে অতি সামান্য কিছু আভাস দেওয়ার একমাত্র উপায় হইতেছে—তাহা;

(১) অদৃষ্ট, অশ্রুত, অমত, অবিজ্ঞাত।—বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২৩।

তাঁহার কার্য নাই, করণ নাই। শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮। তিনি নিষ্ক্রিয়। ঐ, ৬।১৯।

(২) শ্রুতিতে পাওয়া যায় বাস্কলি বাহবকে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি নীরবতা বা নিরুত্তরতার দ্বারাই সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। বেদান্তদর্শন, শাঙ্করভাষ্য, ৩।২।১৭।

বৌদ্ধ শাস্ত্রেও আছে মঞ্জুশ্রী অদ্বয়তত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে নানা জনে নানা বর্ণনা দিতে থাকেন। কিন্তু বিমলকীর্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইলে—তিনি একেবারে নীরব থাকেন। তখন মঞ্জুশ্রী বলিয়া উঠেন—সাধু, সাধু! আপনিই অদ্বয়তত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছেন। অদ্বয়-তত্ত্বে প্রবেশ করিলে মানুষ বাক্য হারাইয়া ফেলে।

—The Eastern Buddhist No. 2. Vol. IV, 1927.

"ইহা নয়" "উহা নয়," "তাহা নয়," "এমন নয়," "তেমন নয়" ইত্যাদি 'নেতি' বাচক শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ করা। উপনিষদের এবং শূন্যবাদের ঋষিগণ তাহাই করিয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ উপনিষদ্ ও শূন্যবাদ হইতে কিছু কিছু পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অ-লোহিত, অ-স্নেহ, অ-ছায়া, অ-তমঃ, অ-বায়ু, অনাকাশ, অ-সঙ্গ, অ-রস, অ-গন্ধ, অ-চক্ষু, অ-শ্রোত্র, অ-বাগ্, অ-মন, অ-তেজঃ, অ-প্রাণ, অ-মুখ, অ-গাত্র, অনন্তর, অ-বাহ্য॥" বৃহদারণ্যক, ৩৮৮।

"অপূর্ব, অনপর, অনন্তর, অ-বাহ্য, অজ-অজর, অমর, অমৃত॥"

—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৫।

"অনাদি, অমধ্য, অনন্ত॥ মহাভারত, শান্তি, ২০৬।১৩।

"অদুঃখ, অসুখ॥" ঐ, ২৫১।১২।

"অ-শব্দ, অ-স্পর্শ, অ-রূপ, অ-ব্যয়, অ-রস, নিত্য, অ-গন্ধ, অনাদি, অনন্ত, ধ্রুব।" কঠোপনিষদ্, ১।১৫।

"সর্ব-ব্যাপী, শুক্র (দীপ্তিমান্), অব্রণ (অক্ষত), অ-স্নায়ু, শুদ্ধ, অপাপ-বিদ্ধ॥" বাজসনেয়িসংহিতা, ৪০।৮।

"অ-দৃষ্ট, অ-ব্যবহার্য, অ-গ্রাহ্য, অ-লক্ষণ, অ-চিন্ত্য, অ-ব্যাপদিশ্য, একাত্ম-প্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অ-দ্বৈত॥" মাণ্ডুক্যোপনিষদ্, ১।৭।

"নিষ্কল (নিরবয়ব), নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবত, নিরঞ্জন দগ্ধ-ইন্ধন-অনলোপম॥" বেদান্তদর্শন, ১।১।১১।

"অ-স্পর্শ, অ-গ্রাহ্য, অ-শ্বেত, অ-পীত, অ-রূপ, অকোশোপম, শুদ্ধস্বভাব, অ-শীতল, অনুষ্ণ, অ-কঠোর, অ-কোমল, অ-হ্রস্ব, অ-দীর্ঘ, অ-বৃত্ত অ-ত্রিকোণ। অ-স্থূল, অ-সূক্ষ্ম, অ-কৃষ্ণ, অ-লোহিত, অ-বর্ণ, নিরাকার অদৃশ্য, শান্ত। অনুপম, অ-চিন্ত্য, অদৃশ্যপরমপদ, প্রপঞ্চাতীত, নির্বিকার, প্রভাস্বর॥"

—নৈরাত্ম্য-পরিপৃচ্ছা (অশ্বঘোষকৃত, বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত)।

"অ-নিরোধ, অনুৎপাদ, অনুচ্ছেদ, অ-শাশ্বত, অনেকার্থ, অ-নানার্থ, অনাগম, অ-নির্গম॥"—মূলমধ্যমককারিকা, ১।

"অ-নিরোধ, অনুৎপত্তি, অ-শাশ্বত, অনুচ্ছেদ (১)।"

—মাণ্ডুক্যকারিকা, ২।৩২ ; ৪।৫৭।

উপনিষদাদির ও শূন্যবাদের ঐ বচনসমূহের মধ্যে এরূপ মিল এবং সাদৃশ্য যে একের বচন অন্যের বলিয়া অনায়াসেই চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও অতি সাবধানী শূন্যবাদী পরমার্থ সম্বন্ধে অভাবাত্মক ব্যতীত ভাবাত্মক শব্দ প্রয়োগের অত্যন্ত বিরোধী, তথাপি উপনিষদের ঋষিদেরই মত বোধহয় অজ্ঞাতসারেই কিংবা ভাবাবেগেই কোথাও কোথাও বলিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহা "প্রকৃতিশুদ্ধ", "শান্ত", "শিব", "প্রভাস্বর"।

শূন্যবাদ যে ভাবাত্মক তাহা আরও পরিষ্কার করিবার জন্য প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার চন্দ্রকীর্তির ভাষ্য হইতে আর একটি পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"পরমার্থ-স্বভাব হইতেছে—সর্বদ্রষ্টব্যপ্রশমিত, শিবলক্ষণযুক্ত, (শান্ত-প্রকৃতি), সর্বকল্পনাজালবিরহিত, জ্ঞানজ্ঞেয় নিবৃত্ত স্বভাব-সমন্বিত শিব। পরমার্থ—অজর, অমর, অপ্রপঞ্চ, শূন্যতা-স্বভাববান্ নির্বাণ। মন্দবুদ্ধি এবং অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদি (২) মতবাদে অভিনিবিষ্ট, আসক্ত বা আবদ্ধ বলিয়া, অজ্ঞজন ইহাকে দেখিতে পায় না॥ (মূলমধ্যমককারিকা, ৫।৮)।

সর্বপ্রকার আসক্তির বিনাশ সাধনই হইতেছে শূন্যতার উদ্দেশ্য। কেবল ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়াশক্তি মাত্র নহে, সর্বপ্রকার ধর্ম ও সম্প্রদায়ের গণ্ডি, এবং নানাপ্রকার মতবাদের আসক্তি হইতে উদ্ধার করাও শূন্যবাদের উদ্দেশ্য।

সর্বপ্রকার মতবাদের আসক্তি নিরসনের জন্য যখন শূন্যবাদের উৎপত্তি, তখন শূন্যবাদের প্রতি আসক্তিও শূন্যবাদের উদ্দেশ্য-বিরোধী।

শূন্যবাদী বলেন—"সর্বপ্রকার মতবাদের বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবার জন্য

(১) তুলনীয়—এমন অবস্থায় শাশ্বতই বা কি? আর উচ্ছেদই বা কি?—মহাভারত শান্তিপর্ব, ২৯১।৪১।

(২) অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে। বেদান্ত দর্শন, ৩।২।১৮।

"সেই অনাদি পর ব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না।"

জিনগণ শূন্যতার উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং যাহারা শূন্য-মতবাদে আবদ্ধ, তাহাদের মুক্তির আর আশা নাই। উহা সাধ্যের বাহিরে (১)।"

মূলমধ্যমক, ১৩।৮ ; বোধিচর্য্যাবতার, পরি, ৯ ; চতুঃশতক, পরি, ১৬।

শূন্যতা হইতেছে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি রেচক ঔষধ, সর্ব-প্রকার আভ্যন্তরিক দুরিত দূষিত, কলুষ বাহির করাই ইহার কার্য। কিন্তু তাহা বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে উহাও যদি স্বয়ং বাহির না হইয়া ভিতরে থাকিয়া যায়, তবে অবস্থা মারাত্মক হইয়া ওঠে।" (মূলমধ্যমক, ১৩।৮। চতুঃশতক পরি, ১৬)।

এখন প্রশ্ন হইবে, পরমার্থ যদি প্রপঞ্চাতীত, বা নিষ্প্রপঞ্চস্বভাব, তবে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, চতুরার্যসত্য, দশপারমিতা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ইত্যাদির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কি জন্য ? এ সমস্তই তো তত্ত্বের বিপরীত অ-তত্ত্ব। যাহা অ-তত্ত্ব, তাহা অ-গ্রাহ্য—পরিত্যাজ্য।

শূন্যবাদী বলেন—প্রপঞ্চ পরমার্থ সত্য বা পরমতত্ত্ব নহে—ইহা ঠিক ; কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে ইহার অস্তিত্ব থাকায় বা লোকচক্ষে ইহা সত্য বোধ হওয়ায় (ইহা পরমার্থ-সত্য বা Absolute Reality না হইলেও) ইহাকে ব্যবহার সত্য (বা Emperical or Pragmatic Reality) বলা হয় (২)। এই ব্যবহারিক সত্যকে শাস্ত্রে সংবৃতি সত্য বা লোকসংবৃতি সত্য বলা হইয়াছে। ইহা সংবৃতি অর্থাৎ আবরণ। কেন না পরমতত্ত্বকে ইহা সর্বদিকে আবৃত, আচ্ছাদিত বা সংবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

---

(১) শূন্যতা সর্বদৃষ্টীনাং প্রোক্তা নিঃসরণং জিনৈঃ।
যেষাং তু শূন্যতাদৃষ্টিস্তানসাধ্যান্ বভাষিরে।
সর্বসংকল্পহানায় শূন্যতাঽমৃতদেশনা।
যস্তু তস্যামপি গ্রাহস্তয়াসাবসাদিতঃ॥

(২) জাগ্রত হওয়ার পূর্বে মানুষ যতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতে থাকে, ততক্ষণ যেমন স্বপ্নকে সত্য বলিয়াই অনুভব করে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত এই জগৎ ও জাগতিক সর্ব ব্যবহারকে মানুষ সত্য বলিয়াই অনুভব করে। সুতরাং অদ্বৈত বা অদ্বয় জ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত লোক ব্যবহারও সত্যরূপে স্বীকৃত হইতেছে।

বেদান্ত, শাঙ্করভাষ্য, ২।১।১৪।

এই আবরণ—এই মোহ ছিন্ন করিয়া সেই পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

কিন্তু ব্যবহার (সত্য) কে আশ্রয় না করিয়া—স্বীকার করিয়া, পরমার্থ-সত্যের জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে। সুতরাং ব্যবহার (সত্য) কে অবলম্বন করিয়াই পরমার্থ-সত্যে পৌঁছাইতে হইবে। (মূলমধ্যমক, ২৪।১০)।

কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টক উদ্ধার করা হয়, বিষের দ্বারা যেমন বিষ নষ্ট করা হয়, সেইরূপ মোহের দ্বারাই মোহকে ধ্বংশ করিতে হইবে।

শূন্যবাদী বলেন—"মোহ দুই প্রকার, এক প্রকার মোহ সংসার প্রবৃত্তির কারণ—আর অন্য প্রকার মোহ সংসার নিবৃত্তির কারণ।" (বোধিচর্যাবতার, ৯।৭৭)।

এই দুই মোহের মধ্যে দ্বিতীয় মোহকে অবলম্বন করিয়াই—সর্বমোহাতীত, সর্বদুঃখাতীত, পরমার্থ-সত্য লাভ করিতে হইবে (১)।

জীবের প্রতি করুণাকে শূন্যবাদী এই দ্বিতীয় প্রকার মোহের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মোহ—কেন না পরমার্থও জীব বলিয়া কিছু নাই। মোহের দ্বারা কল্পিত এক "কল্পিত বস্তু" হইল জীব। সুতরাং তাহার প্রতি করুণা মোহ ব্যতীত আর কিছু নহে। কিন্তু কণ্টক যেমন কণ্টক উদ্ধার করে। সেইরূপ এই মোহই সর্ব মোহ হইতে উদ্ধার করিবে।

এই করুণা ব্যাপকভাবে সর্ব-জগতের সর্ব-জীবের প্রতি করুণা। বলা হইয়াছে—সমস্ত বুদ্ধ-ধর্ম এই করুণার অন্তর্গত। করুণা যেখানে সমস্ত বুদ্ধ-ধর্ম সেখানেই। বোধিচর্যাবতার, ৯।৭৬।

এই করুণা কিরূপ ? আর্তে সুত ইব পিতুঃ প্রেম জগতি"—আর্ত পুত্রের প্রতি পিতার যেমন প্রেম, সমস্ত জগতের প্রতি সেইরূপ প্রেমই হইল এই করুণা। (বোধিচর্যাবতার ৯)।

(১) অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

বাজসনেয়িসংহিতা, ৪০।১৪।

ইহা মোহ অ-বিদ্যা বা অ-জ্ঞান অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞান না হইলেও ইহা দ্বারাই মৃত্যু পার হইয়া পরমার্থজ্ঞান লাভ করিবে। এবং তাহার পর সেই পরমার্থজ্ঞান বা যথার্থ বিদ্যার দ্বারা অমৃত উপভোগ করিবে।

এই মহা করুণা যাঁহার মধ্যে উৎপন্ন হয় তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। তিনি যাহা কিছু করেন সমস্তই পরের জন্য।

"তাঁহার ধর্মজীবন, তাঁহার চরিত্র রক্ষা, স্বর্গের জন্য বা ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য নহে; নিজের কোনো ভোগ, কোনো ঐশ্বর্য দেহের কোনো বর্ণ, রূপ,বা সৌন্দর্য লাভের জন্য নহে; যশের জন্য নহে; কিংবা পশু জন্ম বা নরকাদির ভয়েও নহে; সর্বজীবের হিতের জন্য, সুখের জন্য, কল্যাণের জন্যই তাঁহার ধর্ম জীবন—তাঁহার চরিত্র রক্ষ।"

—শিক্ষাসমুচ্চয়, পরি, ৭, পৃ, ১৪৭; মৈত্রীসাধনা, পৃ, ১৮।

"তিনি নিজের দেহ, নিজের জীবন, নিজের পরম কল্যাণের উৎস পর্যন্ত, জীবগণকে দান করেন। অথচ তাহার কোনো প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করেন না।

"তিনি সর্ব প্রথম জগতের অন্য সমস্ত প্রাণীর জন্য বোধি আকাঙ্ক্ষা করেন—নিজের জন্য নহে।"

—শিক্ষাসমুচ্চয়, পরি, ৭। মৈত্রীসাধনা, পৃ, ১৭।

গুণবান একমাত্র পুত্রের উপর যেমন কোনো গৃহস্বামীর মজ্জাগত প্রেম—মহাকরুণা লাভ করিয়াছেন যিনি, তাঁহারও সমস্ত প্রাণীর উপর সেইরূপ মজ্জাগত প্রেম।"

—শিক্ষা, পরি, ১৬, পৃ, ২৮৭। মৈত্রীসাধনা, পৃ, ১৬।

"সেইজন্য যখন তাঁহার দেহ ছিন্ন হইতে থাকে, তখনও তিনি সর্ব প্রাণীর উপর মৈত্রী বিস্তার করেন।

"যাহারা তাঁহার দেহ ছিন্ন করিতে থাকে, তখনও তাহাদের উদ্ধারের জন্যই তিনি শান্তভাবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেন।"

—শিক্ষা, পরি, ৯, পৃ, ১৮৭। মৈত্রী, পৃ, ১৮।১৯।

তিনি বলেন—"জীবজগতের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আমার সর্ব জন্মের সর্ব দেহ, সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু, অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সর্বকালের কুশল কর্ম নিরাসক্ত হইয়া ত্যাগ করিতেছি।"

—বোধিচর্যাবতার, ৩।১০। শিক্ষা, পরি, ১। মৈত্রী, পৃ, ২৩।

"সর্বজীবের যথেচ্ছ সুখ লাভের জন্যই আমার এই দেহ। আঘাত করুক,

নিন্দা করুক, ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন করুক, ক্রীড়া, হাস্য, বিলাসাদি তাহাদের সুখকর যে-কোনো কার্য তাহারা করুক, তাহাদিগকেই এই দেহ সমর্পন করিয়াছি, নিজের সুখ দুঃখের চিন্তার আর আমার কী অধিকার।

"যাহারা আমাকে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবে, যাহারা আমার শারীরিক ও মানসিক অপকার করিবে, যাহারা আমাকে উপহাস করিবে, বিদ্রূপ করিবে, নানা প্রকারে লাঞ্ছিত করিবে, তাহারা এবং অবশিষ্ট অন্য সকলেও যেন সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন বোধি লাভ করে।"

(বোধি, ৩।১২-১৪,১৬। মৈত্রী, পৃ, ২৪)।

শত্রু মিত্র সকলকেই সমান ভাবিব কেমন করিয়া? আমার সর্বনাশ করিয়াছে যে, কেন আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? আমার পরম শত্রুকেও ভালবাসিব কেন? কেন তাহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিব?

আমাদের মনে স্বভাবতই এই সব প্রশ্ন জাগিযা থাকে। শূন্যবাদী অতি মধুর মর্মস্পর্শী ভাবে ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন :—

"ক্রুদ্ধ ও প্রমত্ত মানব, কণ্টকাদির দ্বারা নিজে নিজেকে আঘাত করে, আহার পরিত্যাগ করিয়া উপবাসী থাকে। কেহ উদ্বন্ধনের দ্বারা, কেহ উচ্চ স্থান হইতে নিজেকে নিম্ন প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া, কেহ বিষাদি ভক্ষণ করিয়া, আত্মহত্যা করে।

"কাম ক্রোধাধির অধীনতাহেতু হতভাগ্য জীব, যখন সংসারের সর্বাপেক্ষা প্রিয় আপনাকেই এই ভাবে আঘাত করে, তখন অপরকে আঘাত করিবে না, ইহা কিরূপে হইতে পারে?

"পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি নানারূপ ক্ষতিকর কার্য করিলেও আমরা তাহার উপর ক্রুদ্ধ হই না। বরং তাহার উপর আমাদের দয়াই হয়। তাহা হইলে কাম-ক্রোধরূপ পিশাচের দ্বারা গ্রস্ত যে সমস্ত ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া ঐ ভাবে, অথবা পরাপকারাদি পাপাচরণের দ্বারা আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে, তাহাদের উপর দয়া না হইয়া ক্রোধ হয় কী রূপে?"

(বোধি, ৬।৩৫-৩৮। মৈত্রীসাধনা, পৃ, ৩৪-৩৫)।

"যখন কেহ কোনো দণ্ড বা সেইরূপ অন্য কোনো অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া

আমাকে আঘাত করে, তখন আমি ঐ দণ্ডাদি অস্ত্রের উপর ক্রুদ্ধ হই না। ঐ দণ্ডাদি অস্ত্র যাহার দ্বারা প্রেরিত হয় তাহার উপরেই ক্রুদ্ধ হই। অতএব দ্বেষের দ্বারা প্রেরিত জীব, যখন আমাকে আঘাত করে, তখন জীবের উপর দ্বেষ না করিয়া দ্বেষের উপরেই আমার দ্বেষ করা উচিত।

"যাহার দ্বারা আমাকে আঘাত করা হয়, সেই অস্ত্র এবং যেখানে আমি আঘাত পাই, সেই দেহ, এই উভয়ই দুঃখের কারণ। অস্ত্রধারী অরি, এবং দেহধারী আমি, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব।"

(বোধিচর্যাবতার, ৬।৪১,৪৩। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ৩৭)।

"যাহাদিগকে আমি অপকারী মনে করি, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া—অর্থাৎ তাহাদিগকে বহুবার ক্ষমা করিতে করিতে—আমার চরিত্রের উৎকর্ষ হয়, আমার পরম প্রয়োজনীয় ক্ষমা গুণ অর্জিত হয়—এবং সেইজন্য আমার সকল দুরিত—সকল কলুষ দূর হইয়া যায়।

"এদিকে আমাকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের হিংসা দ্বেষাদি উৎপন্ন হয়। তাহাদের মানসিক অবনতির অন্ত থাকে না—দীর্ঘকাল দুঃসহ দুঃখদায়ী নরক-যন্ত্রণা তাহারা ভোগ করে।

"তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমি যাহাদিগকে অপকারী মনে করি—বস্তুত তাহারা আমার উপকারী এবং আমিই তাহাদের অপকারী। ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া, হে খল চিত্ত! কেন তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ।"—(বোধি, ৬।৪৮-৪৯। মৈত্রী, পৃ. ৩৮)।

"স্তুতি, যশ ও সম্মানাদি আমার কী কাজে লাগে? উহা আমার কল্যাণ নাশ করে। আমার ধর্মভাব ধ্বংস করে। গুণীগণের প্রতি মাৎসর্য সৃষ্টি করে। "আমার গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক, আমারই সকল সম্পদ পাওয়া উচিত"—এই মনোভাব সৃষ্টি করিয়া অন্যের সম্পদে ঈর্ষা ও ক্রোধ উৎপাদন করে।

"আমি মুক্তিকামী, লাভ ও সম্মানাদিত বন্ধন আমার যোগ্য নহে, যাঁহারা আমাকে ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর আমার বিদ্বেষ হয় কী রূপে?

"দুঃখে প্রবেশকামী আমার দ্বার তাঁহারা রুদ্ধ করিলেন—উহা যেন মহা

কারুণিক বুদ্ধের করুণা বশতই হইল। এইরূপ উপকারী যাঁহারা তাঁহাদের উপর আমার বিদ্বেষ হয় কি রূপে?

ইহা দ্বারা আমার পুণ্যের বা সৎকার্যের বিঘ্ন হইল, এইরূপ মনে করিয়াও কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। কেননা ক্ষমার সমান পুণ্য বা সৎকার্য নাই, এবং এই ব্যক্তির জন্যই সেই পুণ্য বা সৎকার্যের সুযোগ উপস্থিত হইল।

"অসহিষ্ণু আমি তখন যদি নিজের দোষে তাহাকে ক্ষমা না করি, তবে আমার দ্বারাই আমার পুণ্যের বা সৎকার্যের বিঘ্ন হইল। পুণ্যের বা সৎকার্যের সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আমি পুণ্য অর্জন করিলাম না। •

"দাতার যখন দান করিবার ইচ্ছা হয়, তখন যাচক উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা দানের বিঘ্ন হইল—ইহা যেমন বলা যায় না, সেইরূপ যখন আমি পুণ্য অর্জন করিতে চাই, তখন সেই ক্ষমারূপে মহা পুণ্যের কারণ অপরাধী উপস্থিত হইলে তাহার দ্বারা পুণ্যের বিঘ্ন হইল, এমন কথা কেমন করিয়া বলি?

"দানেচ্ছু ব্যক্তির যাচকের অভাব হয় না, যাচক সংসারে সহজেই লাভ করা যায়। কিন্তু যে-ব্যক্তি কখনো কাহারো প্রতি কোনো অপরাধ করে না; সকলকে যে ভালবাসে, সকলের যে উপকার করে, তাহার অপকারী পাওয়াই দুর্লভ।

"সেই দুর্লভ বস্তু অ-শ্রম-উপার্জিত নিধির ন্যায় স্বয়ং গৃহে আবির্ভূত হইয়াছে। বোধিচর্যার সহায় হেতু রিপু আমার পরম আকাঙ্ক্ষার ধন।" (বোধি, ৬।৯৮—১০৭। মৈত্রী, পৃ. ৪১-৪৪)।

এই মহা-কারুণিক মহা মানবগণের চরিতসমূহ অপূর্ব, অলৌকিক! শত্রু যখন হত্যার উদ্দেশ্যে আচার্য আর্যদেবের মর্মস্থলে মারাত্মক অস্ত্রাঘাত করিল, তখনও সেই পরম শত্রুর জীবন রক্ষার জন্য তিনি প্রশান্ত মুখে তাহাকে পরামর্শ দিলেন—"বৎস! আমার কাষায় বস্ত্র ও ভিক্ষাপাত্র লইয়া শীঘ্র ঐ পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন কর। আমার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই এখনো অজ্ঞান, তাহারা তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়া রাজদ্বারে প্রেরণ করিবে।"

মুমূর্ষু আচার্যকে দেখিয়া শিষ্যগণ যখন রোদন করিতে করিতে প্রশ্ন করিল—"কে হত্যা করিল?" "এমন নৃশংস অত্যাচার করিল কে?" তখন গুরু বলিয়া উঠিলেন:—

নাহি প্রাণ—নাহি প্রাণী, নাহি হত্যা, নাহি অত্যাচার,
জন্ম নাহি, মৃত্যু নাহি, নাহি সুখ দুঃখ হাহাকার।
কে তোমার প্রিয় জন? কার তরে কর অশ্রুপাত?
কে মারিল? কে মরিল? কে করিল কারে অস্ত্রাঘাত?
ছিন্ন হোক মোহবন্ধ সব? মিথ্যাদৃষ্টি হোক তিরোহিত
মহা ব্যোম-সমান-শূন্যতা! শান্ত, শিব, প্রপঞ্চ-অতীত!

Vide Chinese Catalogue by B. Nanjio,
No. 1340, 1462.

শূন্যবাদের ভিত্তির উপর এই মহা করুণাকে—এই মহা মৈত্রীকে দেখিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার মহত্ত্ব, গভীরত্ব ও মধুরত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে। শূন্যবাদের অনাসক্তিরসেই—এই মহাকরুণা, এই মহামৈত্রী সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ প্রেমে যেমন সুখ পাওয়া যায়, তেমনি দুঃখও পাইতে হয়। তাহার কারণ উহা আসক্তিযুক্ত, প্রেম যদি আসক্তিমুক্ত হয় তবে তাহা দুঃখ বর্জিত আনন্দরস ঘন হইয়া উঠে। শূন্যবাদীর প্রেমে আসক্তি নাই, তাই উহা পরম আনন্দের উৎস।

কর্মক্ষেত্রে আসক্তিহীনতার কী প্রয়োজন কী মূল্য তাহা কর্মী ও জন-সেবকগণ অবগত আছেন। ফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে না পারিলে প্রায়ই ভগ্ন হৃদয়ে কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই দিক হইতেও শূন্যবাদ কর্মীর জীবনে অপরূপ বল সঞ্চার করে।

সর্বশেষে আর একটি কথা বলিবার আছে, উহা আমার নিজের কথা সুতরাং অতি ভয়ে ভয়েই বলিতেছি। জীব প্রেম, জীব সেবা অতি মহৎ, অতি উচ্চ। ইহার তুলনা নাই, কিন্তু ইহা কর্ম। কেননা প্রেমের অভিব্যক্তি সেবায় এবং সেবা কর্ম ব্যতীত আর কিছু নহে।

আমার বক্তব্য হইতেছে এই যে—কেবল কর্ম লইয়া মানুষ থাকিতে পারে না। সে আরও কিছু চায়। তাহা ছাড়া কর্মের মধ্যেও মাঝে মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন। সৃষ্টিতেও দেখিতে পাই, দিনের পর আসে রাত্রি

মানব দেহের ন্যায় মানব মনও সুপ্তিতে মগ্ন হইতে চায়। যোগ সমাধিই হইল এই সুপ্তি।

সেইজন্য এই প্রপঞ্চময় জগৎ হইতে সেই প্রপঞ্চাতীত পরমতত্ত্বে নিমগ্ন হইবার প্রয়োজন আছে।

বুদ্ধের সেবাধর্ম ও উপনিষদের অধ্যাত্ম-ধর্মের অপূর্ব মিলন হইয়াছে এই শূন্যবাদে। এই শূন্যবাদ জগতের বহু শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতেছে।

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার

"One day I shall have to fight my way out of my own reputation." (Letters from Abroad).

১৯১৩ সালটি সব দিক দিয়েই ছিল সাধারণ—বৈশিষ্ট্যহীন। শুধু ইংল্যাণ্ডেই বারো হাজারের উপর বই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালের প্রথম ভাগে একজন সাংবাদিক পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন "এমন কোনো বই-ই এ সময় বেরোয়নি যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (১)।" এই ঘটনাবাহুল্যহীন বৎসরে সব চেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছিল—The Diary and Antartic Journals of Captain Scott এবং Roald Amundsen-এর The South Pole। এ থেকেই বোঝা যায় এ সময়ে য়ুরোপীয় পাঠক-সমাজে বৃহত্তর জগৎকে জানবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠছিল। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে তা'রা তাদের বিশ্বাস হারায়নি। কিন্তু তা'দের সাহিত্যিক রুচির সম্পূর্ণ অভাব এই ঘটনায় বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এই বৎসরেরই অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বই-এর মধ্যে আমরা পাই—Trevelyan-এর John Bright, A. E. W. Mason-এর The Witness for the Defence, Theodore Roosevelt-এর Autobiography, August Bebel-এর My Life এবং E. T. Cook-এর Life of Florence Nightingale। Cardinal Newman-এর Sermon Notes, Thomas Hardyর Tales এবং Winston Churchil-এর The Inside of the Cupও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। ১৯১৩ সালের শ্রেষ্ঠ বইগুলির মধ্যে কবিতার বই ছিল মাত্র একটি—রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" (২)। এই নির্বাচন প্রণালীটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই; রাজনৈতিক ও জীবনী সাহিত্যই প্রাধান্য লাভ করেছিল এই নির্বাচনে, অবশ্য ভ্রমণ কাহিনী দুটো ছাড়া। তার পরে ক্রমে হালকা উপন্যাস, ধর্ম সম্বন্ধে ছোটো এক খণ্ড বই ও সকলের শেষে ইংরাজ পাঠক সমাজের প্রায় অজ্ঞাত এক লেখকের ইংরাজিতে অনূদিত মাত্র এক খণ্ড কবিতার বই

(১) The Scotsman, 3. 1. 1914.

(২) Book Monthly, December, 1913.

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিকে পরে এই ভাবে অনেকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলেন যে আলোচ্য বৎসরটি ছিল বিশেষভাবে ঘটনাবিহীন এবং এ জন্যই য়ুরোপীয় শিক্ষিত সমাজ যে কোনো রকম বৈদেশিক সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। জনসাধারণের কাছে জীবন ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে উঠছিল: বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে একটা ফাঁকা আশাবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা আত্ম-প্রবঞ্চনায় অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল। ১৯১৩ সালটি ছিল তাদের মতে—"a good average year for fiction, rather less so for the drama, and rather more so for science. The distinctive achievements of the year have been in the science and art of aviation, which is acquiring mastery of the air with triumphant acceleration of speed. In politics our finest achievements of the year is the maintenance of the peace of Europe, with a good second to it in the notable improvement of our relations with Germany." (১)

এটা কিছুটা ঠিকই যে এই সময়ে শুধু ইংল্যাণ্ডেই নয়, সমগ্র য়ুরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে কোনো রকম প্রাচ্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। সাহিত্যে, দর্শনে, ভাস্কর্যে, অঙ্কনে এবং সংগীতে—ভারতের বাইরে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রচারিত হবার অনেক আগেই—এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু তবুও একজন ভারতীয়কে হঠাৎ নোবেল পুরস্কার দেওয়াতে উচ্চশিক্ষিত-সম্প্রদায়ও চমকে গিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁরা ঘটনাটা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না, পরে যখন সংবাদপত্রে এই অদ্ভুতনামা (২) ভারতীয় নোবেল পুরস্কার বিজেতার জীবনী প্রকাশিত হ'ল [illegible] তারা রবীন্দ্রনাথের কবিতার দোষগুণ সম্বন্ধে দীর্ঘ এবং জটিল আলোচনা আরম্ভ করলেন। এই আলোচনা-গুলির সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে বিশেষ দু'টি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত "Who's Who"তে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রকাশিত হয় নি—ইংল্যাণ্ডের অনেক সংবাদপত্রই এ বিষয়ে উল্লেখ করেছিল। এবং Cambridge History of English Literature, Vol.

(১) Daily Telegraph, 26. 2. 1914.

(২) য়ুরোপীয়দের রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

XIV-এ (১৯১৬তে প্রকাশিত) "Anglo-Indian" সাহিত্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ আছে তা'তে অতীতের অনেক বিখ্যাত ভারতীয় লেখকের নাম আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উল্লেখও নেই :

"But until its full results are made manifest, Anglo-Indian literature will continue to be mainly what it has been with few exceptions, in the past, literature writen by Englishmen and Englishwomen who have devoted their lives to the service of India." (১)

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাবার পরেও অনেকেই এই ঘটনায় মনোযোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিল, যদিও রবীন্দ্রনাথের বই এ সময়ে "best-seller" হয়ে উঠেছিল।

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ডে, য়ুরোপে ও আমেরিকায় প্রধান সংবাদপত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। পুরোপুরি সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোনো প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথকে বিচার করেনি। কারণ অনেক লেখকই রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে—এমন কি তা'র ইংরাজী অনুবাদের সংগেও পরিচিত ছিল না। অনেকেই W. B. yeats-এর "গীতাঞ্জলির" জন্য লেখা ভূমিকা থেকে কোনো কোনো অংশ পুণর্মুদ্রিত করেছিল মাত্র নিজস্ব কোনো সমালোচনা যোগ না করেই। ইংরাজী সংবাদপত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম এবং জাত সম্বন্ধে আশ্চর্য রকম নীরব ছিল : এটা প্রশংসনীয় যে এরা—রবীন্দ্রনাথ যে "শ্বেতজাতির" অন্তর্গত নন, একজন "পরাধীন ভারতীয়" মাত্র—এ বিষয়ে কোনো রকম উচ্চবাচ্য করেনি। এটা তাদের নিরপেক্ষতারই নিদর্শন কিনা পরে আলোচনা করা যাবে। আমেরিকা ও ক্যানাডার সংবাদপত্রগুলি অনেক বেশী স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়েছিল। এই পত্রিকাগুলিতে ককেসিয়ানদের" "ভারতীয়দের" থেকে বড় বলেই প্রচার করা হয়। এই মনোভাবের জন্য Kipling-এর লেখাই দায়ী না আমেরিকার বর্ণসংঘর্ষ দায়ী তা' বলা কঠিন।

---

(১) Cambridge History of English Literature, Vol. XIV. Chap. X : Anglo-Indian Literature, by Prof. E. F. Oaten, M.A., LL. B., I. E. S., 1916.

যাই হোক, এই মনোভাবটি আমেরিকায় বিশেষ প্রাধান্যলাভ করেছিল। একটা উদাহরণ দিলে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে:

"The awarding of the Nobel prize for literature···to a Hindu has occasioned much chagrin and no little surprise among writers of the Caucasian race. They cannot understand why this distinction was bestowed upon one who is not white." (১)

প্রায় দশ বৎসর পরে জার্মানিকেও এই রকম অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে দেখা গিয়েছিল। তবে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময়ে শুধু সংকীর্ণমনা আমেরিকান ও ক্যানাডিয়ানরাই জগৎ সাহিত্যে একজন বিদেশীর অনধিকার প্রবেশ লাভ করাতে অপমানিত বোধ করেছিল।

"It is the first time that the Nobel prize has gone to any one who is not what we call 'white'. It will take time, of course, for us to accommodate ourselves to the idea that any one called Rabindranath Tagore should receive a world prize for literature. (Have we not been told that the East and the West shall never meet ?) The name has a curious sound. The first time we saw it in print it did not seem real." (২)

১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান সম্বন্ধে মন্তব্যগুলি পড়লে এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে য়ুরোপীয় জনসাধারণ এবং রাজনীতিকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ একটি রাজনৈতিক ও ভৌগলিক সংজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। প্রায় রাতারাতিই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন ভারতের—যে ভারতবর্ষ প্রাগ্ যুদ্ধ য়ুরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে কম গুরুতর অংশ গ্রহণ করেনি। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ এত গভীর যে কখনো কখনো রবীন্দ্র-সাহিত্যের অতি খাঁটি সমালোচনা থেকেও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঔপনিবেশিক নীতি, অথবা ইংলণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা অথবা জাপান কর্তৃক ভারতবর্ষের বাজার (Indian market) দখল ইত্যাদি পৃথক্ করা কঠিন হয়ে পড়ে। পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি অর্জন সম্বন্ধে আলোচনা

(১) News, Macon, Ga, 20. 11. 1913.

(২) The Globe, Toronto, Canada, 16. 6. 1914.

করতে গেলে সমালোচকদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়, কারণ তা'হলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে য়ুরোপে যত প্রবন্ধ অথবা মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে সবেরই উল্লেখ করতে হবে, আর তখনকার আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, (গত তিরিশ বছরে এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে) ঔপনিবেশিক নীতি ও Stock Exchange সম্বন্ধেও আলোচনা করতে হবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে নোবেল পুরস্কার প্রদান সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হয়। কারণ ১৮৯৩ সালে দৈনিক পত্রিকাগুলি রবীন্দ্রনাথকে যে প্রশংসা করেছিল এবং W. B. Yeats লিখিত "গীতাঞ্জলি"র ভূমিকা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেকগুলি মন্তব্যে—যেগুলি বেশীর ভাগই এসেছিল Continent থেকে—সর্ব প্রথম রবীন্দ্রনাথকে য়ুরোপের পঙ্কিল রাজনীতিতে জড়ান হয়েছিল। পাঁচটা দেশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : হল্যাণ্ড, জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে এবং তখনকার অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র চেক প্রদেশ।

জনসাধারণ ও রাজনীতিকদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল—রবীন্দ্রনাথকে কেন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হ'ল? রবীন্দ্রনাথ "ককেশিয়ান" ছিলেন কিনা Continent-এ এ প্রশ্নের কোনো মূল্য ছিল না। কিন্তু তিনি যে একজন ভারতীয় অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী—এই তথ্যের যথেষ্ট তাৎপর্য ছিল। এক বিখ্যাত উদারনৈতিক পত্রিকা এ বিষয়ে লিখেছিল :

"Has the award of the prize been due to the exotic Buddhistic fashion or has England's policy in India not been, perhaps, in favour of the crowning of the Bengali poet? This will remain the secret of the judges in Stockholm." (১)

প্রত্যুত্তর দিতে ইংল্যাণ্ডও অবশ্য দেরি করেনি।

জার্মান বংশের একজন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান যুবরাজ Prince William of Sweden ১৯১২ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এই সময়ে জোড়াসাঁকোতে তিনি কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন। পরে য়ুরোপে ফিরে গিয়ে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে একখানা বই লেখেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

(১) Neue Freie Presse, Vienna, Nov. 1913.

(জার্মান ও ফ্রেঞ্চ অংশের অনুবাদ লেখকের)

তাঁর সাক্ষাতের কথাও এতে উল্লেখ করেন। কিন্তু, নরওয়ে-বাসীরা সম্রাট এডোয়ার্ডের কন্যা ও জামাতাকে তাদের রাজা ও রাণীরূপে অভিষিক্ত করবার পর থেকেই সুইডেনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সখ্যভাব চলে যায়। সুইডেন-বাসীদের মতে ডেনমার্কের রাণী লুইসার জন্যই এই নির্বাচন সম্ভব হয়েছিল।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজপরিবারের এই জটিল ইতিহাস থেকেই Prince of Sweden-এর ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্যের অর্থ বোঝা যায়। উপরোক্ত বইটি থেকে একটু অংশ তুলে দেওয়া হ'ল; জোড়াসাঁকোর শিল্প সংগ্রহের প্রশংসা প্রসঙ্গে ও ভারতীয় সংগীত শোনবার সময়ে যুবরাজের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের রাজনৈতিক আলোচনাও হয়েছিল।

"Now and then contemporary India was mentioned in our conversation. And then it always seemed as though a painfully repressed fire bagan burning in the heart of the brothers. Their eyes were glowing, and they spoke of hatred, hatred against Englishmen. And with dread and awe I thought of the time when this hatred will express itself in deeds." (১)

এই বর্ণনা দিয়ে বিচার করলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের প্রতি নয় জার্মানির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে। অনেকেই তখন বিশ্বাস করতেন যে Prince of Sweden-এর জন্যই রবীন্দ্রনাথ পুরস্কারটা পেয়েছিলেন। ইংরাজদের পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে যা' বক্তব্য—Prince Williams-এর ভারত ভ্রমণের এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজ-পরিবারের সমালোচনায় তা' ফুটে উঠেছে :

"Prince William's visit to Calcutta, Swedes have said, brought about the award of the Nobel Prize to Rabindranath Tagore. This Bengali poet, in the opinion of the French and other Orientalist scholars, is hardly a typical Oriental, but rather an Anglo-Indian hybrid—at any rate as a poet....After descanting on his host's loathing of British rule, Prince William

(১) Prince William of Sweden: Wo die sonne scheint (Where the sun shines), 1913. (Extract quoted in Leipziger Neneste Nachsichtez Leipzig, 18. 12. 13).

writes : 'In all my life I never spent moments so poignant as at the house of the Hindoo poet Rabindranath Tagore." (১)

জার্মানি কিন্তু ইতিমধ্যে তার উদ্দেশ্য বাঁচিয়ে চলছিল। কারণ জার্মানি থেকে Rosegger নামে একজন কবি ও ঔপন্যাসিক নোবেল পুরস্কার প্রার্থী-রূপে দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ দেশভক্ত, যদিও ঠিক জার্মানিতে তিনি বাস করতেন না। তিনি বাস করতেন Austriaর একটা অংশে, যেখানে অনেক জাতি একসঙ্গে বাস করতো ; সংখ্যায় অবশ্য 'চেক'রাই বেশী ছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে নোবেল পুরস্কার প্রদানের ঘোষণার ঠিক একদিন আগে, অর্থাৎ ১৩ই নভেম্বর, ১৯১৩, এক জার্মান খবরের কাগজ সমস্ত ভেস্তে দিল :

"It is still in our memory how Czechoslovakian associations protested with the Academy at Stockholm against the coming award of the prize to Rosegger because he belongs to the most ardent well-wishers of the German schools in those parts of Austria with a mixed population, and because, should it be awarded to him, he will use it as a means of attack against Slavonic culture. This overhasty interference makes the award of the prize for literature to the young (sic !) Indian poet altogether insignificant." '

তখনকার জার্মানদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নোবেল পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা তাঁদের প্রার্থীরই সব চেয়ে বেশী—ইংলণ্ডে তখন Thomas Hardy ও France-এ Anatole France থাকা সত্ত্বেও। সারা ফেব্রুয়ারী (১৯১৩) ধরে "চেক"দের অনধিকার চর্চা সম্বন্ধে কথা চললো ; একটা খবরের কাগজে বেরলো, যে যদিও অল্প সংখ্যক এক জাত Rosegger-এর বিরুদ্ধতা করছে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সমগ্র য়ুরোপ। ("The protest of all European nations will be raised against Rabindranath Tagore.") (২)

(১) Truth, London, 24. 11. 1913.

(২) Basler Anzeiger, Basel, 15. 11. 1913.

জার্মানদের এরকম পরাজয়ে ফ্রান্স ও বেলজিয়ম যে উল্লসিত আনন্দে মেতে উঠবে, এ সহজেই অনুমেয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্যই প্রকাশিত হয়নি, হয়তো তারা ভেবেছিল Rosegger-এর জন্য এত কষ্ট করবার প্রয়োজন নেই।

"The press notice which announced a few days ago that the fortunate winner of the Nobel prize would be the German novelist in Styria, Mr. Peter Rosegger, who is an ardent defender of the German cause in that country, was in too great a hurry". (১)

কিন্তু শুধু জার্মানিই হতাশ হ'ল না। তখনকার সাহিত্যিক মহলে দেখা গেল Stockholm সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। তারা ভাবলেন—একজন "Hindu poet whose name few people can pronounce, with whose work few in America are familiar, and whose claim for that high distniction still fewer will recognize"-কে (২) নোবেল পুরস্কার দিয়ে বিচারকবৃন্দ আমেরিকা ও য়ুরোপের নবীন সাহিত্যিকদের অনুৎসাহিত করেছেন। এ ছাড়াও দেখা গিয়েছিল অনেক সুসাহিত্যিকই Swedish Academyর দ্বারা সম্মানিত না হয়েই মারা গিয়েছেন অথবা যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরাও এত বৃদ্ধ যে তাঁদেরও একই দশা ভোগ করবার সম্ভাবনা ছিল। ইটালির Carducci ও জার্মানির Paul Heyse-এর নাম খুব কম লোকই শুনেছিল, কাজেই এরা যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হ'ল: Tolstoy, Zola এবং Strindberg তাঁদের প্রাপ্য সম্মান Stockholm থেকে পেলেন না। ১৯১৩ সালে সকলের মুখে Thomas Hardy এবং Anatole France-এর নামই লেগে ছিল। যদিও এঁরা দু'জনেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আদর্শে গঠিত অনেক প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকই Hardyর "নৈরাশ্যবাদ" ও Anatole France-এর Scepticism সহজে মেনে নিতে পারলেন না।

(১) L' Independence Belge, Bruxelles, 24. 11. 1913.

(২) Times, Los Angeles, 15. 11. 1913.

এর ফলে Hardy কখনও নোবেল পুরস্কার পেলেন না, এবং Anatole France-কেও তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল নোবেল পুরস্কারের জন্য। যেদিন Nobel Prize Committeeর সিদ্ধান্ত ইংল্যাণ্ডে ঘোষণা করা হয়েছিল সেদিন একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। এই প্রবন্ধে বলা হয়:

"Perhaps there is here evidence of a change of the temper of thought, for the opinions and tendencies of writers are not disregarded by the Nobel Committee when they are weighing their literary merits. On no other hypothesis can be explained the persistence with which the claims of Anatole France, assuredly the living writer with the most universal reputation, have been passed over. Or, again, their blindness to Hardy's pre-eminence, for Hardy is no longer a purely insular classic: no continental critic worth his salt or heedful of his reputation now dares ignore Hardy. The Nobel Committee is a conservative body, and the scepticism of Anatole France and the pessimism of Hardy are too unorthodox to find favour." (১)

কিন্তু এই নোবেল পুরস্কার প্রদানের ফলে শুধু বিদ্রূপাত্মক সমালোচনাই যে দেখা গিয়েছিল—এই ধারণা পোষণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। উদ্ধৃত মন্তব্যগুলিতে শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন সমগ্র ভারতের প্রতি য়ুরোপের যে মনোভাব ফুটে উঠেছে সেটা বিশেষ অর্থপূর্ণ। কয়েকজন নবীন লেখক যে বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন, তা' সত্যি; বিশেষ করে যখন দেখা গেছে এঁদেরই একজন সিদ্ধান্ত করেছেন—"any one of us could write such stuff ad libitum but nobody should be deceived into thinking it good English, good poetry, good sense or good ethics." (২) কিন্তু, অন্যদিকে আবার দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথকে যে সম্মান দেওয়া হ'ল তা বিশেষভাবে সর্তের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। রবীন্দ্র-প্রতিভা যাচাই করা হয়েছিল কয়েকটি রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সাহিত্যিক 'পূর্ব ধারণা'র মাপকাঠিতে।

(১) Daily News and Leader, London, 14. 11. 1913.

(২) New Age, London, 20. 11. 1913.

একটা বিষয় সব চেয়ে বেশী বিবেচ্য। নোবেল পুরস্কারের ফলে য়ুরোপের পাঠক সমাজ মেনে নিতে বাধ্য হ'ল যে অন্য আরো একটা সংস্কৃতি আছে, যা গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ স্বকীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে, তারা বুঝলো যে য়ুরোপীয় প্রভাবের গণ্ডীর বাইরেও অনেক নতুন শক্তি চলাফেরা-করছে— তাদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি হারালে চলবে না। এর পরের দশ বছরের যে সমস্যাগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুসম্বন্ধকে প্রতিহত করেছিল সেগুলি ঠিকমত বোঝা সম্ভব হয়েছিল তখনই যখন একজন দক্ষ ফরাসী সাহিত্যিক এই নতুন বোধশক্তির সঞ্চার করেছিলেন ১৯১৩ সালে।

"That the very name of a poet who in his country enjoyed such a reputation should have been almost ignored by the whole of Europe until these last few years, goes to prove the limits of human glory. It also proves the narrowness of our civiliza-tion and points out—whatever one may say—its provincialism. The knowledge that these ideals are different from ours, at least makes us aware of the relativity of our European concepts. We do not sufficiently realize that millions of human beings are fed on different ideas from ours and yet live." (১)

এই কথাগুলি যে সারা য়ুরোপের বুদ্ধিজীবীদের মনে প্রতিধ্বনি জাগাবে সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য ঐতিহ্যকে আঁকড়ে যে প্রত্যয়গুলি ছিল তা'দের 're-valuation'-এর এই সূচনা। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের পুনর্মিলনের পথে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল এই তার পুনরুক্তি। হঠাৎ ভারতবর্ষ তাদের কাছে আর একটা রাজনৈতিক সংজ্ঞা থাকল না। লোকের মন জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলো। তারা ভাবলো—"প্রাচ্য কী? কী রকম সে দেশটি যা এমন একজন প্রতিভাবান কবির জন্ম দিল যা'র তুলনা আমাদের দেশের Dante, Shakespeare ও Goethe-এর সঙ্গেই করা চলে?"

এই নতুন আবহাওয়ায় খাপ খাইয়ে চলার কাজ সুরু হ'ল যুদ্ধের অবসানে। তবে এই প্রণালীটি ক্রমেই জটিল ও কষ্টকর হয়ে উঠছিল, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের

---

(১) Jean Guehenno: Le Message de 'L'Orient.—Rabindranath Tagore,' (In: La Revue de Paris, 1. 9. 1919). রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাপ্য প্রশংসার কথা বাদ দিতে হবে। ফলে অনেক বিভিন্ন মতাবলম্বী দল গড়ে উঠলো য়ুরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে। একদল স্বেচ্ছায় নিযুক্ত হ'ল য়ুরোপের স্বার্থ বজায় রাখবার কাজে ; অন্যদল প্রাচ্যের আলোকে বরণ করে নিল য়ুরোপের মুক্তির একমাত্র নিদর্শনরূপে। কোনটা নিশ্চিত, কোনটা প্রকৃত এর খোঁজেই কাটলো ব্যর্থ বিশটি বছর—এতে রবীন্দ্রনাথের ও ভারতের প্রভাব অপরিমেয়।

[ডক্টর এ. এ্যরনসন্‌, এম. এ. (ক্যান্টাব), পি-এইচ. ডি. অধ্যাপক, বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ("Rabindranath through Western Eyes" নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপির একটি অংশ হইতে শ্রীযুক্ত অমর সিংহ ও শ্রীযুক্ত সুভাষ সেন কর্ত্তৃক অনূদিত।]

ইঁদুর

আমাদের বাসায় ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেঁকা যাচ্ছে না। তাদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায়, দেয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে-বেয়ে তর্ তর্ করে ছুটোছুটি করে। যখন সেই নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক কোনো বিপদ এসে হাজির হয়, অর্থাৎ কোনো বাক্স বা কোনো ভারী জিনিসপত্র সেখানে পথ আগলে বসে, তখন সেটা অনায়াসে টুক্ করে বেয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু রাত্রে আরও ভয়ংকর। এই বিশেষ সময়টাতে তাদের কার্যকলাপ আমাদের চোখের সামনে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুরু হয়ে যায়। ঘরের যে কয়েকখানা ভাঙা কেরোসিন কাঠের বাক্স, একটা কেরোসিনের অনেক পুরনো টিন, কয়েকটা ভাঙা পিঁড়ি আর কিছু মাটির জিনিসপত্র আছে, সেখান থেকে অনবরতই খুট্ খুট্ টুং টাং ইত্যাদি নানারকমের শব্দ কানে আসতে থাকে। তখন এটা অনুমান করে নিতে আর বাকি থাকে না যে এক ঝাঁক ন্যুব্জদেহ অপদার্থ জীব ওই কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে এখন রাতের আসর খুলে বসেছে।

যাই হোক, ওদের তাড়নায় আমি উত্যক্ত হয়েছি, আমার চোখ কপালে উঠেছে। ভাবছি ওদের আক্রমণ করবার এমন কিছু অস্ত্র থাকলেও সেটা এখনো কেন যথাস্থানে প্রয়োগ করা হচ্ছে না? একটা ইঁদুর-মারা কলও কেনার পয়সা নেই? আমি আশ্চর্য হবো না, নাও থাকতে পারে!

আমার মা কিন্তু ইঁদুরকে বড়ো ভয় করেন। দেখেছি একটা ইঁদুরের বাচ্চাও তাঁর কাছে একটা ভালুকের সমান। পায়ের কাছে দিয়ে গেলে তিনি তার চার হাত দূর দিয়ে সরে যান। ইঁদুরের গন্ধ পেলে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, ওদের যেমনি ভয় করেন, তেমনি ঘৃণাও করেন। এমন অনেকেই থাকে। আমি এমন একজনকে জানি যিনি সামান্য একটা কেঁচো দেখলেই ভয়ানক শিউরে ওঠেন, আবার এমন একজনকেও জানি যাঁর একটা মাকড়সা দেখলেই ভয়ের আর অন্ত থাকে না। আমি নিজেও জোঁক দেখলে দারুণ

ভয় পাই। ছোটোবেলায় আমি যখন গরুর মতো শান্ত এবং অবুঝ ছিলাম, তখন প্রায়ই মামাবাড়ী যেতুম, বিশেষত গভীর বর্ষার দিকটায়। তখন সমুদ্রের মতো বিস্তৃত বিলের ভিতর দিয়ে যেতে বর্ষার জলের গন্ধে আমার বুক ভরে এসেছে, ছই-এর বাইরে এসে জলের সীমাহীন বিস্তার দেখে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছি, শাক্‌লা ফুল হাতের কাছে পেলে নির্মমভাবে টেনে তুলেছি, কখনো উপুর হয়ে হাত ডুবিয়ে দিয়েছি জলে, কিন্তু তখনি আবার কেবলি মনে হয়েছে, এই বুঝি কামড়ে দিলো।—আর ভয়ে-ভয়ে অমনি হাত তুলে নিয়েছি। সেখানে গিয়ে যাদের সঙ্গে আমি মিশেছি, তারা আমার স্বশ্রেণীর নয় বলে আপত্তি করবার কোনো কারণ ছিল না, অন্তত সে রকম আপত্তি, আশঙ্কা বা প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগে নি।

সেই ছেলে বেলার বন্ধুরা মাঠে গরু চরাতো। তাদের মাথার চুলগুলি জলজ ঘাসের মতো দীর্ঘ এবং লালচে, গায়ের রং বাদামী, চোখের রংও তাই, পাগুলি অস্বাভাবিক সরু-সরু—মাঝখান দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা, পরণে একখানা গামছা, হাতে একটা বাঁশের লাঠি, আঙুলগুলি লাঠির ঘর্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। তাদের মুখ এমন খারাপ, আর ব্যবহার এমন অশ্লীল ছিল যে আমার ভিতর যে সুপ্ত যৌনবোধ ছিল, তা অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে উঠতো, অথচ আমি আমার স্বশ্রেণীর সংস্কারে তা মুখে প্রকাশ করতে পারতুম না। তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতো, আমার মুখ লাল হয়ে যেতো। তাদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম ছিল ভীম। সে একদিন খোলা মাঠের নতুন জল থেকে একটি প্রকাণ্ড জোঁক তুলে সেটা হাতে করে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললে, খুকু, তোমার গায়ে ছুঁড়ে মারবো ?

আমি ওর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলুম, ভয়ে আমার গা শিউরে উঠলো, আস্তে-আস্তে বুদ্ধিমানের মতো দূরে সরে গিয়ে বললাম, ছাখ্‌ ভীম, ভালো হবে না বলছি, ভালো হবে না ! ইয়ার্কি, না ?

ভীম হি হি করে বোকার মতো হাসতে হাসতে বললে, এই দিলাম, দিলাম—।

সেদিনের কথা আজো মনে পড়ে, ভীমের সাহসের কথা ভাবতে আজো অবাক লাগে। অনেকের অমন স্বভাব থাকে—যেমন অনেকে কেঁচো

দেখলেও ভয় পায়। আমি কেঁচো দেখলে ভয় পাইনে বটে, কিন্তু জোঁক দেখলে ভয়ে শিউরে উঠি। এসব ছোটখাটো ভয়ের মূলে বুর্জোয়া রীতিনীতির কোনো প্রভাব আছে কিনা বলতে পারি নে।

একথা আগেই বলেছি যে আমার মা-ও ইঁদুর দেখলে দারুণ-ভীত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে ওঠে। ইঁদুর যে কাপড় কাটবে সেদিকে নজর না দিয়ে তখন তাঁর দিকেই নজর দিতে হয় বেশী। একবার তাঁরই একটা কাপড়ের নীচে কেমন করে জানিনে একটা ইঁদুর আটকে গিয়েছিলো। সে থেকে-থেকে কেবল পালাবার চেষ্টা করছিলো, ছড়ানো কাপড়ের ওপর দিয়ে সেই প্রয়াস স্পষ্ট চোখে পড়ে। মা পাঁচ হাত দূরে সরে থেকে ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করে বললেন, সুকু, সুকু।

প্রথম ডাকে উত্তর না দেওয়া আমার একটা অভ্যাস। তাই উত্তর দিয়েছি এই ভেবে চুপ করে রইলাম।

সুকু ? সুকু ?

এবার উত্তর দিলুম, কেন ?

মা তাঁর হলুদ-বাটায় রঙিন শীর্ণ হাতখানা ছড়ানো কাপড়ের দিকে ধরে চোখ বড়ো করে বললেন, ওই ছাখ।

আমি বিরক্ত হলুম। ইঁদুরের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে আর কি। এত ইঁদুর কেন ? পরম শত্রু কি কেবল আমরাই ? আমি কাপড়টা ধরে সরাতে যাচ্ছি অমনি মা চেঁচিয়ে উঠলেন, আহা, ধরিসনে, ওটা ধরিসনে।

খেয়ে ফেলবে না তো !

আহা, বাহাদুরি দেখানো চাই-ই।

মা, তুমি যা ভীতু !—ইঁদুরটা অনবরত পালাবার চেষ্টা করছিলো, বললাম, আচ্ছা মা, বাবাকে একটা কল আনতে বলতে পারো না ? কোনদিন দেখবে আমাদের পর্যন্ত কাটতে সুরু করে দিয়েছে।

আহা, মেরে কী হবে ? অবোধ প্রাণ, কথা বলতে পারে না তো। আর কল আনতে পয়সাই বা পাবেন কোথায় ? মা'র গলার স্বর কিছুমাত্র কাতর হলো না, কোনো বিশেষ কথা বলতে হলেও তাঁর গলার স্বর এমনি অকাতর

থাকে এবং অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হয়ে যায়। শেষ হওয়ার পর আর এক মিনিটও তিনি সেখানে থাকেন না। তিনি এমনি চলে গেলেন।

একটা ইঁদুর-মারা কল কিনতে পয়সা লাগবে, এটা আমার আগে মনে ছিল না। তাহলে আমি বলতুম না। কারণ এই ধরণের কথায় এমন একটা বিশেষ অবস্থার ছবি মনে জাগে যা কেবল একটা সীমাহীন মরুভূমির মতন। মরুভূমিতেও অনেক সময় জল মেলে, কিন্তু এ-মরুভূমিতে জল মিলবে, এমন আশাও করিনে। এই মরুভূমির ইতিহাস আমার অজানা নয়। আমার পায়ের নীচে যে বালি চাপা পড়েছে, যে বালুকণা আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে, তারা ফিস্ ফিস্ করে সেই ইতিহাস বলে। আমি মন দিয়ে শুনি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আঠারো বছর বয়েস অবধি এগিয়ে আবোল-তাবোল অনেক ভেবেছি, কিন্তু আবোল-তাবোল ভাবনা মস্তিষ্কের হাটে কখনো বিক্রি হয় না। ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ এবং বিশ্বাস, দুই-ই প্রচুর ছিল, তাই ঈশ্বরকে কৃষ্ণ বলে নামকরণ করে ডেকেছি, হে কৃষ্ণ, এ পৃথিবীর সবাইকে যাতে একেবারে বড়লোক করে দিতে পারি তেমন বর আমাকে দাও। রবীন্দ্রনাথের পরশমণির কবিতা পড়ে ভেবেছি, ইস্, একটা পরশমণি যদি পেতুম! সঙ্গে-সঙ্গে অনেক লোককে সত্যই জিজ্ঞেস করে বসেছি, আচ্ছা, পরশমণি পাথর আজকালও লোকে পায়? কোথায় পাওয়া যায় বলবে?

আমি যখন ছোটো ছিলুম, আমাদের বৃহৎ পরিবারের লোকগুলির নির্মল দেহে তখনো অর্থহীনতার ছায়াটুকু পড়েনি। বুর্জোয়ারাজের ভাঙনের দিন তখনো ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায় নি। শুরু না হওয়ার আমি এই মানে করেছি যে তখনো অনেক জনকের প্রসারিত মনের আকাশে তার ছেলের ভবিষ্যৎ স্মরণ করে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। আমাকে আশ্রয় করেই কম আশা জন্ম নিয়েছিল! অথচ সে সব আশার শাখা-প্রশাখা এখন কোথায়? আমি বলতে দ্বিধা করবো না, সে সব শাখা-প্রশাখা তো ছড়ায়ই নি, বরং মাটির গর্ভে স্থান নিয়েছে। একটা সুবিধা হয়েছে এই যে পারিবারিক স্বেচ্ছাচারিতার অক্টোপাস থেকে রেহাই পাওয়া গেছে, আমি একটু নিরিবিলি থাকতে পেরেছি।

কিন্তু নিরিবিলি থাকতে চাইলেই কি আর থাকা যায়? ইঁদুররা আমায়

পাগল করে তুলবে না ? আমি রোজ দেখতে পাই একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স বা ভাঙা টিনের ভিতর ঢুকে ওরা অনবরত টুং টাং শব্দ করতে থাকে, ক্ষীণ হলেও অবিরত এমন আওয়াজ করতে থাকে যে অনতিকাল পরেই সেটা একটা বিশ্রী সংগীতের আকার ধারণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুধু আমার কেন অনেকেরই বিষম বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটা কুকুর যখন কঁকিয়ে-কঁকিয়ে আস্তে-আস্তে কাঁদতে থাকে, তখন সেটা কেউ সহ্য করতে পারে ? আমি অন্তত করিনে। অমন হয়। যখন একটা বিশ্রী শব্দ ধীরে-ধীরে একটা বিশ্রী সংগীতের আকার ধারণ করে তখন সেটা অসহ্য না হয়ে যায় না। ইঁদুরগুলির কার্যকলাপও আমার কাছে সেরকম একটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আর একদিন মা চীৎকার করে ডেকে উঠলেন, সুকু ! সুকু !

বলেছি তো প্রথম ডাকেই উত্তর দেওয়ার মতো কঠিন তৎপরতা আমার নেই।

মা আবার আর্তস্বরে ডাকলেন, সুকু ?

আর তৃতীয় ডাকের অপেক্ষা না করে নিজেকে মার কাছে যথারীতি স্থাপন করে তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশে যা দেখলুম তাতে যদি বিস্মিত হবার কারণ থাকেও তবুও বিস্মিত হলুম না। দেখলুম, আমাদের ক্বচিৎ-আনা দুধের ভাঁড়টি একপাশে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে আর তারই পাশ দিয়ে একটি শাদা পথ তৈরি করে এক প্রকাণ্ড ইঁদুর দ্রুত চলে গেল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, কোনো বিশেষ খবর শুনে কোনো বিশেষ উত্তেজনা বা ভাবান্তর প্রকাশ করা আমার স্বভাবে নেই বলেই বার-বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। কাজেই এখানেও তার অভিনয় হবে না, একথা বলাই বাহুল্য। দেখতে পেলুম, আমার মা'র পাতলা কোমল মুখখানি কেমন এক গভীর শোকে পাণ্ডুর হয়ে গেছে, চোখ দুটি গরুর চোখের মতো করুণ, আর যেন পদ্মপত্রে কয়েক ফোঁটা জল টল্ টল্ করছে, এখুনি কেঁদে ফেলবেন। দুধ যদি বিশেষ একটা খাদ্য হয়ে থাকে এবং তা যদি নিজেদের আর্থিক কারণে কখনো দুর্লভ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটা যদি অকস্মাৎ কোনো কারণে পাকস্থলীতে প্রেরণ করবার অযোগ্য হয়, তবে অকস্মাৎ কেঁদে ফেলা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মা অমনি কেঁদে ফেললেন, আর আমি চুপ করে

দাঁড়িয়ে রইলুম, এমন একটা অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই। মার ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না আর বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা আমার চোখের দৃষ্টিপথকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে দিলো, আরও গভীর করে তুললো। আমি দেখতে পেলুম আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য প্রচুর অগ্নিবর্ষণ করছে, নীচে পৃথিবীর ধূলিকণা আরও বেশী অগ্নিবর্ষী। আমার হৃদয়ের ক্ষেতও পুড়ে-পুড়ে খাক হয়ে গেল। একটি নীল উপত্যকাও দেখা যায় না, দূরে জলের চিহ্নমাত্র নেই, জলস্তম্ভও নেই, মরীচিকাও দিয়েছে ফাঁকি। ভাবলুম স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য গ্রন্থরাজি কোথায় পাওয়া যায়? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী অমূল্য। সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণব্রতী শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ (তখনো ভাবতুম না দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কখনো সুরু হবে)। আমার মুখভঙ্গি চিন্তাকুল হয়ে এলো, হাঁটু দুটি পেটের কাছে এনে কুকুরের মতো শুয়ে আমি ভাবতে লাগলুম—ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে নিয়েছি ভালো করে ভাবার জন্যে—ভাবতে লাগলুম, এমন কোনো উপায় নেই যাতে এই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

সন্ধ্যার পর বাবা এলেন, খবরটা শুনে এমন ভাব দেখালেন না যাতে মনে হয় তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন অথবা কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েছেন, বরং তাড়াতাড়ি বলতে আরম্ভ করলেন—যদিও তাড়াতাড়ি কথা বলাটা তাঁর অভ্যাস নয়,—বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে! আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলুম এমন একটা কিছু হবে। আরে, মানুষের জান নিয়েই টানাটানি, দুধ খেয়ে আর কী হবে বলো!

দেখতে পেলুম, বাবার মুখটি যদিও শুকনো তবু প্রচুর ঘামে তৈলাক্ত দেখাচ্ছে, গায়ের ভারী জামাটিও ঘামে ভিজে ঘরের ভিতর গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন একটা বিপর্যয়ের পরেও তাঁর এই অবিকৃতপ্রায় ভাব দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম। এই ভেবে যে ক্ষতি যা হয়েছে হয়েছেই, তার আলোচনায় এমন একটা অবস্থা যার কোনো পরিবর্তন নেই বরং একটা মস্ত গোলযোগের সূত্রপাত হবে, সেই থেকে রেহাই পাওয়া গেল, খুব শীগ্‌গির আর আমার মানসিক অবনতি ঘটবে না।

কিন্তু বাবা কিছুক্ষণ পরেই সুর বদলালেন : তোমরা পেলে কী ? কেবল ফূর্তি আর ফূর্তি ! দয়া করে আমার দিকে একটু চাও। আমার শরীরটা কি আমি পাথর দিয়ে তৈরি করেছি ? আমি কি মানুষ নই ? আমি এত খেটে মরি আর তোমরা ওদিকে ফূর্তিতে মেতে আছো ! সংসারের দিকে একবার চোখ খুলে চাও ? নইলে টিঁকে থাকাই দায় হবে।

আমার কাছে বাবার এই ধরণের কথা মারাত্মক মনে হয়। তাঁর এই ধরণের কথার পেছনে অনেক রাগ ও অসহিষ্ণুতা সঞ্চিত হয়ে আছে ব'লে আমি মনে করি।

সময়ের পদক্ষেপের সঙ্গে স্বরের উত্তাপও বেড়ে যেতে লাগলো। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই কঠিন উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যে অদ্ভুত নগ্নতা প্রকাশ পাবে, তাতে আমার লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। এমন অবস্থার সঙ্গে আমার একাধিকবার পরিচয় হলেও আমার গায়ের চামড়া তাতে পুরু হয়ে যায় নি, বরং আশঙ্কার কারণ আরও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। যে পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় তার ব্যর্থতার মাঝখানে এই নগ্নতার দৃশ্য আরও একটি বেদনার কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাবা বললেন, আর তর্ক করো না বলছি ! এখান থেকে যাও, আমার সুমুখ থেকে যাও, দূর হয়ে যাও বলছি !

মা বললেন, অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। চেঁচামেচি করে পৃথিবী-শুদ্ধ লোককে নিজের গুণপনার কথা জানানো হচ্ছে, খুব সুখ্যাতি হবে !

শুনতে পেলুম, এর পরে বাবার গলার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বোমার মতো ফেটে পড়লো !—তুমি যাবে ? এখান থেকে যাবে কিনা বলো ? গেলি তুই আমার চোখের সামনে থেকে ? শয়তান মাগী···! বাবা বিড়্ বিড়্ করে আরও কতো কী বললেন, আমি কাণে আঙুল দিলুম, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম একটি অসার মৃতদেহ হয়ে, আমার চোখ ফেটে জল বেরুলো, বিপর্যয়ের পথে বর্ধিত হলেও আমার মনের শিশুটি আজন্ম যে শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছে তাতে এমন কোনো কথা লেখা ছিল না। মনে হলো যেন আজ এই প্রথম বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলি চরম প্রহরী সেজে আমার দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। আগে এমন দেখিনি বা শুনি নি। তবু আমার অনুভূতির

এই শিক্ষা কোত্থেকে এলো ? বলতে পারি আমার এই শিক্ষা অতি চুপি-চুপি জন্মলাভ করেছে, মাটির পৃথিবী থেকে সে এমনভাবে শ্বাস ও রসগ্রহণ করেছে যাতে টুঁ শব্দও হয় নি। ফুলের সুবাস যেমনি নিঃশব্দে পাখা ছড়িয়ে থাকে তেমনি ওর চোখের পাখা দুটিও নিঃশব্দে এই অদ্ভুত খেলার আয়োজন করতে ছাড়ে নি। আরও বলতে পারি আমার মনের শিশুর বাঁচবার বা বড়ো হবার ইতিহাস যদি জানতে হয় তবে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু সেই শিক্ষা আজ কাজ দিলো কই ? বরং আরও কর্মহীনতার নামান্তর হলো, আমার কাঁচা শরীরের হাত দুটি কেটে ভাসিয়ে দিলো জলে, দুই চোখকে বাষ্পাকুল করে কিছুক্ষণের জন্য কানা করে দিলো। আমি কী করবো ? আমার কিছু করবার আছে কি ?

শয়তান মাগী, যা বেরিয়ে যা।

আবার ভেসে এলে সেই অদ্ভুত কথাগুলি। এসব আমি শুনতে চাইনে তবু শুনতে হয়। বাতাসের সঙ্গে খাতির করে তা ভেসে আসবে, জোর করে কাণের ভিতর ঢুকবে, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার মনের মাটিতে সজোরে লাথি মারবে।

যা বলছি।

গোলমাল আরও খানিকটা বেড়ে গেল।

কিছু পরে মা বাষ্পাচ্ছন্ন স্বরে ডাকলেন, সুকু ! সুকু।

ঠিক তখুনি উত্তর দিতে লজ্জা হলো, ভয় করলো, তবু আস্তে বললাম, বলো ?

মা বললেন, দরজা খোল্।

ভয়ে-ভয়ে দরজা খুলে দিলুম, ভয় হলো এই ভেবে যে এবার অনেক বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, যা শুনতেও ভয় পাই ঠিক তারই সামনে এক গম্ভীর বিচারপতি হয়ে সমস্ত উত্তেজনাকে শূন্যে বিসর্জন দিয়ে রায় দিতে হবে।

কিন্তু যা ভেবেছিলুম তা আর হলো না। মা ঘরের ভিতর ঢুকেই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা কাস্তের আকার ধারণ করলো। কেমন অসহায় দেখালো ওঁকে। ছোটো বেলায় যাঁকে পৃথিবীর মতো বিশাল ভেবেছি, তাঁকে

এমন ভাবে দেখে এখন কতো ক্ষীণজীবী ও অসহায় মনে হচ্ছে। যাকে বৃহত্তম ভেবেছি, সে এখন কত ক্ষুদ্র, সে এখনো শৈশব অতিক্রম করতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে। আর আমি কত বৃহৎ, রক্তের চঞ্চলতায়, মাংসপেশীর দৃঢ়তায়, বিশ্বস্ত পদক্ষেপে কত উজ্জ্বল ও মহৎ, ওই হরিণের মতো ভীরু ছোটো দেহের রক্ত পান করে একদিন জীবন গ্রহণ করলেও আজ আমি কতো শক্তিমান! আমাকে কেউ জানে? এমনও তো হতে পারতো, আজ লণ্ডনের কোনো ইতিহাস-বিখ্যাত য়ুনিভার্সিটির করিডরের বুকে বিশ বছরের যুবক সুকুমার গভীর চিন্তায় পায়চারি করছে, অথবা খেলার মাঠে প্রচুর নাম করে সকল সহপাঠিনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অথবা ত্রিশ বছরের নীলনয়না কোনো খাঁটী ইংরেজ মহিলার ধীর গভীর পদক্ষেপ ভীরুর মতো অনুসরণ করে একদিন তাঁর দেহের ছায়ায় বসে প্রেম যাজ্ঞা করেছে! এমন তো হতে পারতো, তবে সোণালী চুল, দীর্ঘ পক্ষ্মাবৃত চোখ, দেহের সৌরভ—আহা, কে সেই ইংরেজ মহিলা? সে এখন কই?......আর সেই স্বর্ণাভ রাজকুমার সুকুমারের মা ওই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর সামান্য কাপড় বিছিয়ে শুয়ে? এখান থেকে কতো ছোটো আর অসহায় মনে হয়। এক অর্থহীন গর্বে বুকটা প্রশস্ততর করে আমি একবার মার দিকে তাকালুম। ডাকলুম, মা? ও মা?

কোনো উত্তর নেই। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোনো ভগ্ন নারীকণ্ঠই আমার কাণের দরজায় এসে আঘাত করলো না। ঘুমিয়ে পড়েন নি তো?

পরদিনও আবহাওয়ার গভীরতা কিছুমাত্র দূর হলো না। মার এমন অস্বাভাবিক নীরবতা দেখে আমার ছোট ভাইবোনেরা প্রচুর আস্কারা পেয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। তারা নগ্নগাত্র হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করতে লাগলো। স্কুলহীন ছোটো বোনটি তার নিত্যকার অভ্যাস মত প্রেমকুসুমাস্তীর্ণ এক প্রকাণ্ড উপন্যাস নিয়ে বসেছে, অন্যদিকে চাইবারও সময় নেই। সেদিন অনেক রাত্রে সারা বাড়ী গভীর ধোঁয়ায় ভরে গেল, সকলের নাক মুখ দিয়ে জল বেরুতে লাগলো, দম বন্ধ হয়ে এলো। ছোটো ভাইবোনদের খালি মাজিতে পড়ে ঘুমুতে দেখে রান্নাঘরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলুম, এখনো রান্না হয়নি, মা?

চোখের জলে ভিজে উনানের ভিতর প্রাণপণে ফুঁ দিতে দিতে মা বললেন, না। এখন চড়াচ্ছি।

এত দেরি হলো কেন ?

মা চুপ করে রইলেন।

বুঝতে পারলুম। সেই পুরনো কাসুন্দি। বুঝতে পারলুম এ জিনিষ এড়াতে চাইলেও সহজে এড়াবার নয়,—ঘুরে-ফিরে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়, পাশ কাটাতে চাইলে হাত চেপে ধরে, কোনো রকমে এড়িয়ে গেলেও হাত তুলে ডাকতে থাকে। এই ডাকাডাকির ইতিহাসকে যদি আগাগোড়া লিপিবদ্ধ করি তবে সারা জীবন লিখেও শেষ করতে পারবো না, কেউ পারবে না, তাতে কতকগুলি একই রকমের চিত্র গলাগলি করে পাশাপাশি এসে দাঁড়াবে, আর সৌখিন পাঠকের বিরক্তিভাজন হবে। আমি তো জানি পাঠকশ্রেণী কে ? তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে কান্নাকাটির ন্যাকামি চলবে না, কিংবা কিছুটা লিখলেও টাকার হিসাবটাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে হবে বা হাসিমুখে বরণ করতে হবে। যেমন আমার বাবা অনেক সময় করেন—প্রচুর অভাবের চিত্রকেও এক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে পরম আনন্দে ঘাড় বাঁকিয়ে হাসতে থাকেন। কিংবা যেমন আমাদের পাড়ার প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা রক্ষিতমশাই করেন— ঘরে অতি শুকনো স্ত্রী আর একপাল ছেলেমেয়েদের অভুক্ত রেখেও পথে-ঘাটে রাজা-উজির মেরে আসেন। বা আমাদের প্রেস-কর্মচারী মদন—শূন্যতার দিনটিকে উপবাসের তিথি বলে গণ্য করে, কখনো পদ্মাসন কেটে বসে নিমীলিত চোখে দুই শক্ত দীর্ঘ বাহু দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঈশ্বরকে সশরীরে ডেকে আনে। এমন হয়। এ ছাড়া আর উপায় কী ? স্বর্গের পথ রুদ্ধ হলে মধ্যপথে এসে দাঁড়াই, জীবন আমাদের কুক্ষিগত করলেও জীবনকে প্রচুর অবহেলা করি, প্রকৃতির করাঘাতে ডাক্তারের বদনাম গাই, অথবা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করি। এসব দেখে আমি একদিন সিদ্ধান্ত করেছিলুম যে দুঃখের সমুদ্রে যদি কেউ গলা পর্যন্ত ডুবে থাকে তবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্তের নাম করতে গিয়ে যাদের জিহ্বায় জল আসে সেদিন আমি তাদেরই একজন হয়েছিলুম। বন্ধুকে এক ধোঁয়াটে রহস্যময় ভাষায় চিঠি লিখলুম : "এরা কে জানো ? এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান

বটে, কিন্তু না খেয়ে মরে। যে ফুল অনাদরে শুকিয়ে ঝ'রে পড়ে মাটিতে এরা তাই। এরা তৈরি করছে বাগান, অথচ ফুলের শোভা দেখে নি! পেটের ভিতর সূঁচ বিঁধছে প্রচুর, কিন্তু ভিক্ষাপাত্রও নয়। পরিহাস! পরিহাস!...” ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অজ্ঞতায় নিজের মনে যে কল্পনার সৌধ গড়ে তুললুম, তাতে নিজের মনে-মনে প্রচুর পরিতৃপ্ত হলুম। যে উপবাসকৃশ বিধবারা তাদের সক্ষম মেয়েদের দৈহিক প্রতিষ্ঠায় সংসার যাত্রার পথ বেয়ে-বেয়ে কোনোরকমে কালাতিপাত করছেন, তাদের জন্যে করুণা যেমন হলো, মনে-মনে পূজো করতে লাগলুম আরও বেশী।

কিন্তু সে সব ক্ষণিকের ব্যাপার। শরতের মেঘের মতো যেমনি এসেছিলো তেমনি মিলিয়ে গেল, মগজের মধ্যে জায়গা যদিও একটু পেয়েছিলো বেশীদিন থাকবার ঠাঁই পেলো না। আজ ভাবছি আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। নইলে এক অসম্পূর্ণ সংকীর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে থাকতো, তখন সে ভাবনা নিয়ে মনে-মনে পরিতৃপ্ত থাকতুম বটে, কিন্তু গতির বিরুদ্ধে চলতুম, এক ভীষণ প্রতিক্রিয়ার বিষে জর্জরিত হতুম।

এমন দিনে এক অলস মধ্যাহ্নের সঙ্গে আমি সাংঘাতিক প্রেমে পড়ে গেলুম। সেই দুপুরটিকে যা ভালো লেগেছিলো কেবল মুখে বললে তা যথেষ্ট বলা হবে না। সেদিন যতটুকু আকাশকে দেখতে পেলুম তার নীলকে এত গভীর মনে হলো যে চোখের ওপর কে যেন কিছু শীতল জলের প্রলেপ দিয়ে দিলে। ভাবনার রাজ্যে পায়চারি করে আমি আমার মীমাংসার সীমান্তে এসে পৌঁছলুম সেই মধ্যাহ্নে, সেখানে রাখলুম দৃঢ় প্রত্যয়। আকাশের নীলিমায় দুই চোখকে সিক্ত করে আমি দেখতে পেলুম চওড়া রাস্তার পাশে সারি-সারি প্রকাণ্ড দালান, তার প্রতি কক্ষে সুস্থ সবল মানুষের পদক্ষেপ সিঁড়িতে নানারকম জুতোর আওয়াজ, মেয়েপুরুষের মিলিত চীৎকার ধ্বনি, পৃথিবীর পথে-পথে বলিষ্ঠ নিঃশ্বাস বলিষ্ঠ দুয়ারে হানা দেয়, বলিষ্ঠ মানুষ প্রসব করে, আমি দেখতে পেলুম ইলেকট্রিক আর টেলিগ্রাফ তারের অরণ্য, ট্রাক্টর চলেছে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে—অবাধ্য জমিকে ভেঙে-চুড়ে দলে-মুচড়ে, সোনার ফসল আনন্দের গান গায়, আর যন্ত্রের ঘর্ষণে ও মানুষের হর্ষধ্বনিতে এক অপূর্ব সংগীতের সৃষ্টি হলো। একদা যে-বাতাস মাটির

মানুষের প্রতি উপহাস করে বিপুল অট্টহাসি হেসেছে, সেই বাতাসের হাত আজ করতালি দেয় গাছের পাতায়-পাতায়। কেউ শুনতে পায়? যারা শোনে তাদের নমস্কার।—তাই অলস মধ্যাহ্নকে মধুরতম মনে হলো। দেখলুম এক নগ্নদেহ বালক রাস্তার মাঝখানে বসে এক ইঁটের টুকরো দিয়ে গভীর মনোযোগে আঁক কষছে। কোন্ বাড়ী থেকে পচা মাছের রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে বেশ, এক সঙ্গীত-পিপাসুর বেসুরো গলার গান শোনা যাচ্ছে হারমনিয়ম-সহযোগে এই অসময়ে, রৌদ্র প্রচণ্ড হলেও হাওয়া দিচ্ছে প্রচুর, ও বাড়ীর এক বধূ রাস্তার কলে এইমাত্র স্নান করে নিজ বুকের তীক্ষ্ণতাকে প্রদর্শনের প্রচুর অবকাশ দিয়ে সংকুচিত দেহে বাড়ীর ভিতর ঢুকলো, কারখানার দুটি মজুর কোনরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে কয়লা-মলিন বেশে আবার দৌড় দিচ্ছে। এ দৃশ্য বড়ো মধুর লেগেছে—অবশ্য কোনো বুর্জোয়া চিত্রকরের চিরন্তনী চিত্র ব'লে নয়। এ চিত্র যেমন আরাম দেয়, তেমনি পীড়াও দেয়। আমার ভালো লেগেছে এই স্মরণীয় দিনটিতে এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রাজত্বে খানিকটা পায়চারি করতে পেরেছি বলে। চমৎকার! চমৎকার!

অনেক রাত্রে ইঁদুরের উৎপাত আবার সুরু হলো, ওরা টিন আর কাঠের বাক্সে দাপাদাপি সুরু করে দিলো, বীরদর্পে চোখের সামনে দিয়ে ঘরের মেঝে অতিক্রম করতে লাগলো, কোথাও কোনো বাক্সের ভেতর থেকে লেজ বার করে দারুণ উপহাস করতে লাগলো।

রান্না শেষ করে এসে মা সকলকে ডাকাডাকি সুরু করে দিলেন, ওরে মণ্টু, ওরে ছবি, ওরে নারু, ওঠ বাবা, ওঠ!

মণ্টু উঠেই প্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করে দিলো। ছবি যদিও এতক্ষণ তার উপন্যাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ছিলো, এখন বই-টই ফেলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লো।

ওরে ছবি, খেতে আয়, খাবি আয়!

বার বার ডাকেও ছবি টু শব্দটি করে না।

মা ভগ্ন কণ্ঠে ব'ললেন, আমার কী দোষ বল্? আমার ওপর রাগ করিস কেন? গরিব হয়ে জন্মালে……

মার চোখ ছল্ ছল্ করে উঠল, গলা কেঁপে গেল। আমি রাগ হয়ে বললুম, আহা, ও না খেলে না খাবে, তুমি ওদের দাও না ?

মধ্যরাত্রির ইতিহাস আরও বিস্ময়কর।

এক অনুচ্চ কণ্ঠের শব্দে হঠাৎ জেগে উঠলুম। শুনতে পেলুম বাবা অতি নিম্নস্বরে ডাকছেন, কনক, ও কনক, ঘুমুচ্ছো ?

বাবা মাকে ডাকছেন নাম ধরে! ভারি চমৎকার মনে হলো, মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলুম, আর আমার প্রতি ভালোবাসা কামনা করতে লাগলুম তাঁর কাছ থেকে। যুবক সুকুমার একদিন তার বৌকেও এমনি নাম ধরে ডাকবে, চীৎকার করে ডেকে প্রত্যেকটি ঘর এমনি সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত করে তুলবে।

কনক ? ও কনক ?

প্রৌঢ়া কনক-তা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো উত্তর দিলেন না, কোনোবার কঁকিয়ে উঠলেন, কোনোবার উঃ, আঃ করলেন। আমি এদিকে রুদ্ধনিঃশ্বাসে নিম্নগামী হলুম। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে হারিয়ে যাবার কামনা করতে লাগলুম। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলুম, শরীর দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটলো।

ওদিকে মধ্যরাত্রির চাঁদ উঠেছে আকাশে, পৃথিবীর গায়ে কে এক শাদা মসলিনের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে এনেছে ঠাণ্ডা জলের স্রোতের মতো বাতাস, আমার ঘরের সামনে ভিখিরী কুকুরদের সাময়িক নিদ্রামগ্নতায় এক শীতল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও বাড়ীর ছাদে নিদ্রাহীন বানরদের অস্পষ্ট গোঙানি শোনা যায়। মধ্যরাত্রের প্রহরী আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবে কখন ?

অবশেষে প্রৌঢ়া কনকলতার নীরবতা ভাঙ্গলো, তিনি আবার আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, অল্প একটু ঘোমটা টেনে কাপড়ের প্রচুর দৈর্ঘ্য দিয়ে নিজেকে ভালো ভাবে আচ্ছাদিত করলেন, তারপর এক অশিক্ষিতা নববধূর মতো ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলেন। অঙ্গ-ভঙ্গির সঞ্চালনে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় সেই সঙ্গীতের আয়নায় আমার কাছে সমস্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমি লক্ষ্য করলুম দুই জোড়া পায়ের ভীরু অথচ স্পষ্ট আওয়াজ আস্তে আস্তে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে বাবা গুন্ গুন্ সুরে গান গাইতে লাগলেন। চমৎকার মিষ্টি গলা বেহালার মতো শোনা যাচ্ছে। সেই গানের খেলায় আলোর কণাগুলি আরও শাদা হয়ে গেছে, মনে হয় এক বিশাল অট্টালিকার সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে সেই গানের রেখা পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ রাত্রির বাতাস অপূর্ব স্নেহে মন্থর হয়ে এসেছে। একটা কাক বোকার মতো ডেকে উঠেছে। বাবাকে গান গাইতে আরও শুনেছি বটে, কিন্তু আজকের মতো এমন মধুর ও গভীর আর কখনো শুনিনি। তাঁর মৃদু-গম্ভীর গানে আজ রাত্রির পৃথিবী যেন আমার কাছে নত হয়ে এলো। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন কার প্রাণ খোলা হাসিতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠলুম। হাসির ঐশ্বর্যে বাড়ীর ইটগুলিও কাঁপছে। বাবা বললেন, পণ্ডিত মশাই, ও পণ্ডিত-মশাই, উঠুন? আর কতো ঘুমুবেন? সকালে না উঠলে বড়লোক হওয়া যায় কি? উঠুন?

আমি অনেক কষ্টে চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম, কখন ভোর হয়ে গেছে। বাবার স্নেহময় কথায় আমি কখনো হাসিনে, কেমন বাধে, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে কিনা, এক কুড়ি বছর তো পেরিয়ে চললুম।

মশারির দড়ি খুলতে-খুলতে বাবা বললেন, পৃথিবীতে যত গ্রেট মেন দেখতে পাচ্ছো, সকলেরই ভোরে ওঠার অভ্যাস ছিল। আমার বাবা, মানে তোমার ঠাকুরদারও এমনি অভ্যাস ছিল। আমরা যতো ভোরেই উঠি না কেন, উঠেই শুনতে পেতুম বাইরের ঘরে তামাক খাওয়ার শব্দ হচ্ছে। অমন অধ্যবসায়ী না হলে আর একটা জীবনে অত জমি-জমা অত টাকা পয়সা করে যেতে পারেন! তিনি তো সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমরাই কিছু রাখতে পারলুম না। কিন্তু উঠুন পণ্ডিত মশাই, যারা ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে জীবনে তারা কক্ষনো উন্নতি করতে পারে না।

অতটা মাতব্বরি সহ্য হয় না, জীবনে একদিন মাত্র সকালে উঠেই বাড়ী-শুদ্ধ লোক মাথায় তুলেছেন।

সমস্ত বাড়ীটা খুশির বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠল। ওদিকে মণ্টু সেলুনে চুল ছাটবার জন্য পয়সা চাইতে সুরু করেছে, ঘণ্টাখানেক পরেও পয়সা না

পেলে মেঝেয় আছাড় খেয়ে তারস্বরে কাঁদবে। নারু পক-পক বাক্য বর্ষণ করে সকলের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টায় আছে। ছবি এইমাত্র তার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় নায়িকার শয়ন ঘরে নায়কের অভিযান দেখে মনে-মনে পুলকিত হয়ে উঠছে।

বাবা দারুণ কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন, এঘর ওঘর পায়চারি করতে লাগলেন।

এক সময় আমার কাছে এসে বললেন, তোমরা থিয়োরিটা বার করেছো ভালোই, কিন্তু কার্যকরী হবে না. আজকাল ওসব ভালোমানুষি আর চলবে না। এখন কাজ হলো লাঠির। হিটলারের লাঠি, বুঝলে পণ্ডিত মশাই?

আমি মনে-মনে হাসলুম। বাবা যা বলেন তা এমন ভাবে বলেন যে মনে-মনে বেশ আমোদ অনুভব করা যায়। তাঁর কি জানি কেন ধারণা হয়েছে, আমরা সব ভালোমানুষের দল, নিজের খেয়ে পরের চিন্তা করি, শুষ্কমুখ হয়ে শীতল জল বিতরণ করতে চাই, নিজেরা স্বর্গচ্যুত, অথচ পরের স্বর্গলাভের পথ আবিষ্কারে মত্ত!

আবার বললেন, তোমাদের রাশিয়া কেবল সাধুই জন্ম দিয়েছে, অসাধু দেয় নি। কেবল মার খেয়ে মরবে। লেনিন তো মস্ত বড় সাধু ছিলেন, যেমনি টলষ্টয় ছিলেন। কিন্তু ওঁরা লাঠির সঙ্গে পারবেন কি? কক্ষনো নয়!

বলতে ইচ্ছা হয়, চমৎকার! এমন স্বকীয়তা, এমন নতুনত্ব আর কোথাও চোখে পড়েছে? এমন করে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না, এটা জোর করে বলতে পারি। তিনি একবার যা বললেন তা ভুল হলেও তা থেকে একচুল কেউ তাঁকে সরাবে, এমন বঙ্গ সন্তান ভূ-ভারতে দেখিনে। এক হিটলারি দম্ভে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কিন্তু একমাত্র আশার কথা এই যে এসব ব্যাপারে তিনি মোটেই সীরিয়স্ নন, একবার যা বলেন দ্বিতীয়বার তা বলতে অনেক দেরি করেন। নইলে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। পৈত্রিক অধিকারে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তার অপব্যবহার করতেন সন্দেহ নেই।

ওদিকে কর্মব্যস্ত মাকে দেখতে পাচ্ছি। গভীর মনোযোগে তিনি তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, কোথাও এতটুকু দৃষ্টিপাত করবার সময় নেই যেন।

কাঁধের ওপর দুই গাছি খড়ের মতো চুল এলিয়ে পড়েছে, তার ওপর দিয়েই ঘন-ঘন ঘোমটা টেনে দিচ্ছেন, পরণে একখানা জীর্ণ মলিন কাপড়, ফর্সা পা-দুটি জলের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত শীর্ণ হয়ে এসেছে। পেছনে-পেছনে নারু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ছেড়ে বাবা এবার ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিলেন। নারুকে ডেকে বললেন, নারু, বাবা, তোমার কী চাই বলো?

নারু তার ছোটো-ছোটো ভাঙ্গা দাঁতগুলি বের করে অনায়াসে বলে ফেললো, একটা মোটর-বাইক। সার্জেন্টরা কেমন সুন্দর ভট্ ভট্ করে ঘুরে বেড়ায়, না বাবা?

কিন্তু মন্টুর কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে। সে হঠাৎ পেছন ফিরে মুখটা নীচের দিকে নিয়ে কামানের মতো হয়ে বললে, বাবা, এই ত্যাখো?

দেখতে পাওয়া গেল, তার পেছনটা ছিঁড়ে একেবারে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, বাঃ বেশ তো হয়েছে, মন্টুবাবুর যা গরম, এবার থেকে দুটি জানালা হয়ে গেল, বেশ তো হলো। এবার থেকে হু হু করে কেবল বাতাস আসবে আর যাবে, চমৎকার, না?

মন্টু সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে বুদ্ধিমানের মতো হেসে উঠলো; নারু তার ভাঙ্গা দাঁত বের করে আরও বেশি করে হাসতে লাগলো, বাবাও সে হাসিতে যোগ দিলেন। আমাদের সামান্য বাসা এক অসামান্য হাসিতে নেচে উঠল, গুম্ গুম্ করতে লাগলো।

হাসলুম না কেবল আমি। শুধু মনে-মনে উপভোগ করলুম। ভাবলুম আনন্দের এই নির্মল মুহূর্তগুলি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে খুশির আর অন্ত থাকে না। মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে।

বাবার পরবর্তী অভিযান হলো রান্নাঘরে। একখানা পিঁড়ি পেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হাসিমুখে বাবা বললেন, আজ কী রাঁধবে গো?

মুখ ফিরিয়ে অজস্র হেসে মা বললেন, তুমি যা বলবে!

বাবাকে এবার ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসলো—আমি যা বলবো, ঠিক তো? বলি, রাঁধবে মাংস, পোলাও, দই, সন্দেশ? রাঁধবে চাটনি, চর্চরি রুই মাছের মুড়ো? রাঁধবে? রাঁধবে আরও আমি যা বলবো?

ও মাগো! থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না! মা দুই হাত তুলে মাথা নাড়তে লাগলেন, খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন।

ব্যাপার দেখে নারু দৌড়ে গেল, দুজনের দিকে দুইবার চেয়ে তারপর মাকে মুচ্‌কে হাসতে দেখে বললে, মাগো কী হয়েছে? অমন করে হাসছো কেন? বাবা তোমায় কাতুকুতু দিয়েছে?

আরে, নারে না, অত পাকামি করতে হবে না। খেল গে যা—বাঁ হাত তুলে মা বাইরের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বাবা আবার বললেন, আচ্ছা, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখতে গিয়েছিলুম সেদিনের কথা মনে পড়ে?

একটুও চিন্তা না করে মা বললেন, আমার ওসব মনে-টনে নেই!

আহা, বিলের ধারে মাঠে সেই যে গরু চরাচ্ছিলে?

মার চোখ বড়ো হয়ে গেল—ওমা, আমি কি ভদ্দরনোক নই গো যে মেয়েলোক হয়েও মাঠে-মাঠে গরু চড়াবো?

গরু চরানোটা কি অপরাধ? দরকার হলে এখানে-সেখানে একটু নেড়ে-চেড়ে দিলে দোষ হয়? আসল কথা তোমার সবই মনে আছে, ইচ্ছে করেই কেবল যা-তা বলছো।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব মনে আছে, সব মনে আছে।

মৃদু-মৃদু হেসে বাবা বললেন, নৌকো থেকেই দেখতে পেলুম বিলের ধারে কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার রাত্রে একটি মাত্র দীপশিখার মতো, নৌকো থেকে নেমেও দেখলুম, সেই মেয়ে তার জায়গা থেকে এতটুকুও সরে দাঁড়াচ্ছে না বা পাখির মতো বাড়ীর দিকে উড়ে চলে যাচ্ছে না বরং আমাদের দিকে সোজাসুজি চেয়ে আছে, অপরিচিত বলে এতটুকু লজ্জা নেই, কাছে গিয়ে দেখলুম ঠিক যেন দেবী প্রতিমা, খোলা মাঠে জলের ধারে মানিয়েছে বেশ, গভীর বর্ষায় আরও মানাবে। তারপর এক ভাঙা চেয়ারে বসে ভাঙা পাখার বাতাস খেয়ে যাকে দেখলুম সে-ও সেই একই মেয়ে, কিন্তু এবার বোবা, লজ্জাবতী লতার মতো লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।—বাবা হা হা করে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। কতক্ষণ পরে বললেন, তোমার কী চাই—বললে না?

আমার জন্যে একখানা রান্নার কাপড় এনো।

লাল রঙের ?

হাঁ।

তারপর কার জন্যে কী এনেছিলেন খবর রাখিনি, কিন্তু নিজের জন্যে ছ' আনা দামের এক জোড়া চটি এনেছিলেন দেখেছি। মাত্র ছ'আনা দাম। বাবা এ নিয়ে অনেক গর্ব করেছেন, কিন্তু একেবারে কাঁচা চামড়া ব'লে কুকুরের আশঙ্কাও করেছেন।

কুকুরের কথা জানিনে তবে কয়েকদিন পরেই জুতো জোড়ার এক পাটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ বলতে পারে না। আশ্চর্য!

পরদিন দুপুরবেলা রেলওয়ে ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে যেতে কার ডাকে মুখ ফিরে তাকালুম। দেখি শশধর ড্রাইভার, হাত তুলে আমায় ডাকছে। এখানে ইউনিয়ন করতে এসে আমার একেবারে প্রথম আলাপ হয়েছিলো এই শশধর ড্রাইভারের সঙ্গে। সেদিন সঙ্গে কমরেড বিশ্বনাথ ছিল। তখন গভীরভাবে শশধর বলেছিলো, দেখুন বিশ্ববাবু, সায়েব সেদিন আমায় ডেকেছিলো।

কেন ?

শালা বলে কিনা, ড্রাইভার, ইউনিয়ন ছেড়ে দাও, নইলে মুস্কিল হবে বলছি। শুনে মেজাজটা জবর খারাপ হয়ে গেল। মুখের ওপর বলে এলুম, সায়েব আমার ইচ্ছে আমি ইউনিয়ন করব। তুমি যা করতে পারো করো। এই বলে তখুনি ঠিক এইভাবে চলে এলুম। আসবার ভঙ্গীটা দেখাবার জন্যে শশধর হেঁটে অনেকদূর পর্যন্ত গেল, তারপর আবার যথাস্থানে ফিরে এলো। আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় সেদিনের দৃশ্যটি আমার চমৎকার লেগেছিল। আমার সেই মধ্যাহ্নের ট্রাক্টর-স্বপ্নের ভিৎ পাকা করতে আরম্ভ করলুম সেই দিন থেকে। একথা বলাই বাহুল্য যে ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে, তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম। তাদেরো ধন্যবাদ, যারা আমাকে আমার এই অসহায়তার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! সেবাব্রত নয়, মানবতা নয়, স্বার্থপরতা অথচ শ্রেষ্ঠ উদারতা নিয়ে এক ক্লান্তিহীন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন।

আমি শশধরের কাছে গেলুম। শশধর বললে, উঠুন। সে আমাকে তার এঞ্জিনে উঠিয়ে নিলো। তারপর একটা বিড়ি হাতে দিয়ে বললে, খান, সুকুমারবাবু।

বিকেলের দিকে একটা গ্যাঙের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। একটা মীটিং অ্যারেঞ্জ করবার ছিল। ওরা আমার দিকে কেউ তাকালো, কেউ তাকালো না। অদূরে এঞ্জিনের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। পয়েণ্টস্‌ম্যান-গানারদের চীৎকার আর হুইসিল শোনা যাচ্ছে।

ইয়াসিন এতদিন পরে ছুটি থেকে ফিরেছে দেখলুম। আমাকে দেখে কাজ থামিয়ে বললে, ওরা কী বলছিলো জানেন?

হেসে বললুম, কী?

বলছিলো আপনি একটা ব্যারিষ্টর হলেন না কেন?

সকলে হো হো করে হেসে উঠলো, আমিও হাসতে লাগলুম।

মেট্‌ সুরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বললে, তোমার কাছে আমাদের আর একটি নিবেদন আছে, ইয়াসিন মিঞা! আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে তোমায় ইস্কুলে পড়াতে চাই।

এবার হাসির পালা আরও জোরে। কাজ ফেলে সবাই বসে পড়ল।

ইয়াসিন রেগে গেল, বললে, বাঃ, বাঃ, বাঃ, খালি ঠাট্টা আর ঠাট্টা, ঠাট্টা, না? চারটে পয়সা দিয়েই খালাস, না? চারটে পয়সা দিলেই বিপ্লব হবে, না? বিপ্লব আকাশ থেকে পড়বে, না?—একটু শান্ত হয়ে ইয়াসিন শেষে একটা গল্প বললে। গল্পটি হচ্ছে এই: সে এবার বাড়ী গিয়ে তার গাঁয়ের চাষীদের একটা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলো। সেই বৈঠকে যে-লোকটা বক্তৃতা করেছিলো, সে হঠাৎ তার দিকে চেয়ে বললে, ভাই ইয়াসিন, তোমাদের ওখানে ইউনিয়ন নেই? ইয়াসিন বুক ঠুকে বললে, আলবৎ আছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুক পকেট থেকে একখানা রসিদ বের করে দিলো। লোকটা তখন ভয়ানক খুশী হয়ে বলেছিলো, তুমি যে আমাদের কমরেড, ভাই ইয়াসিন! তুমি যে আমাদেরই। ইয়াসিন তখন বিচক্ষণের মতো হেসেছিলো।—দুনিয়ার সবাই এরকম একজোট হচ্ছে, আর আমরাই কেবল চুপ করে বসে থাকবো, না? চারটে পয়সা দিলেই খালাস, না? বলতে বলতে ইয়াসিনের ঘর্মাক্ত

মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে কাজে লেগে গেল, গভীর মনোযোগে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে কাজ করতে লাগলো।

আমি ফিরে এলুম। সাম্যবাদের গর্ব, তার ইস্পাতের মতো আশা, তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঝির্ ঝিরে বাতাসের সঙ্গে শেড-ঘর থেকে তেল আর কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ আসছে বেশ। আমি বাঁ দিকে শেড-ঘর রেখে পথ অতিক্রম করতে লাগলুম। একটু এগিয়ে দেখি লাইনের ওপর অনেকগুলি এঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় গভীর ধ্যানে বসেছে যেন। আমার কাছে ওদের মানুষের মতো প্রাণময় মনে হলো। এখন বিশ্রাম করতে বসেছে। ওদের গায়ের মধ্যে কতো রকমের হাড়, কতো কলকব্জা, মাথার ওপর ওই একটি মাত্র চোখ, কিন্তু কতো উজ্জ্বল। মানুষ ওদের সৃষ্টিকর্তা! হাসি নেই, কান্না নেই, কেবল কর্মীর মতো রাগ। এমন বিরাট কর্মী পুরুষ আর আছে! সত্য কথা বলতে কি, এত কলকব্জার মাঝে, এতগুলি এঞ্জিনের ভিতর দিয়ে পথ চলতে আমার শরীরে কেমন একটা রোমাঞ্চ হলো। আমি হতভম্ব হয়ে তাদের মাংসহীন শরীরের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম।

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বাসায় ফিরে এলুম।

কয়েকদিন পরে কোনো গভীর প্রত্যুষে একটি ইঁদুর-মারা কল হাতে করে আমার বাবা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাসতে লাগলেন। দারুণ খুশিতে নারু আর মন্টুও তাঁর দুই আঙুল ধরে বানরের মতো লাফাচ্ছিলো। কয়েক মিনিট পরেই আরও অনেক ছেলেপেলে এসে জুটলো। একটা কুকুর দাঁড়াল এসে পাশে। উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ লাঠি, কেউ বড়-বড় ইঁট নিয়ে বসলো রাস্তার ধারে।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, কয়েকটা ইঁদুর ধরা-পড়েছে।

সোমেন চন্দ

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৮)

ভারতব্যাপী বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পর বৌদ্ধদের আর সংবাদ পাওয়া যায় না। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, তাহারা কোথায় গেল? পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে তাহারা হয় এই উদার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হইল, না হয় মুসলমান হইয়া গেল। অনেকের মতে মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধেরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ও নির্ম্মূল হয়। বোধ হয়, বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্যবাদীয়দের ন্যায় মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহারা সর্ব্বত্র রাজশক্তি বিহীনতার জন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণ ও মুসলমান উভয়ের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। লামা তারানাথ বলেন, মুসলমান তুরস্কের আক্রমণের পর, গোরক্ষনাথের যোগী শিষ্যেরা (নাথ-সম্প্রদায়) তীর্থিক (ব্রাহ্মণ্যবাদী) রাজাদের নিকট সম্মান পাইবার জন্য 'ঈশ্বর-পূজক' হয়, যেহেতু তাহাদের মতে এতদ্বারা তাহারা তুরস্কদের অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে। তিনি আরও বলেন যে, কেবল নটেশ্বরের ক্ষুদ্র দলটি বৌদ্ধমতে অটুট ও অটল রহিল। ("Geschichte des Buddhism"—translated by Schiefner, Pp 255 256)। তারানাথ তাঁহার অন্য পুস্তকে বলিয়াছেন, তীব্বতীয় ভাষায় গোরক্ষনাথের জীবন বৃত্তান্ত বিশদ-ভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। গোরক্ষনাথও তাঁহার সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদীয় মতের দিকে ঝুঁকিয়াছিল বলিয়াই কি লামাদের এই ক্রোধ? ("Edelsteinmine"—translated by A. Gruenwedel, P 123)।

বৌদ্ধ গণ-সমূহের মুসলমান হওয়া সম্পর্কে, প্রত্যক্ষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই; মুসলমানেরা ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখে নাই; সকলেই তাহাদের নিকট বুৎপরস্ত (পৌত্তলিক) হিন্দু।

কিন্তু বৌদ্ধ সাধারণ যে উদীয়মান বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে আশ্রয় লইয়া আত্ম-গোপন করে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের কালে ইহা দৃষ্ট হইতেছে যে বৌদ্ধ গণ-সমূহ হিন্দু সমাজের নানাস্থানে নানাভাবে লুকাইত আছে ; আর যেখানে পতিত বা অস্পৃশ্য জাতিদের মধ্যে নূতন ধর্ম্ম-আন্দোলন হইয়াছে সেখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় (১)। মহারাষ্ট্র দেশে এবং গোদাবরী তীরবর্ত্তী জনপদ সমূহে "বিঠোবা" এবং "বিঠ্‌ঠল" দেবতার পূজা ৺অক্ষয়কুমার দত্তের মতে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ-চিহ্ন রূপে বিদ্যমান আছে। অবশ্য এই দুই ঠাকুর বৈষ্ণব মতে পুজিত হয় (২)। এই প্রকারে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ুরভঞ্জে গুরুবাদী মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিশিষ্ট একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন (৩)। তাহা ছাড়া, কটক ও পুরী জেলার সরাকী ও রাঢ়ের তাঁতিরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়। উড়িষ্যার বৌদ্ধেরা রাজা প্রতাপ রুদ্রের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকে চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে ; কিন্তু তাহারা অন্তরে অন্তরে বৌদ্ধই ছিল। অচ্যুতানন্দ, বলরাম দাস, জগন্নাথ, এবং চৈতন্যদাস প্রভৃতি বড় বৈষ্ণব সাধক এই প্রকারেরই ছিলেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-নেতা সনাতন গোস্বামীর শিষ্য অচ্যুতানন্দ তাঁহার শূন্য সংহিতায় নিজেই বলিয়াছেন দণ্ড-কারণ্যে ভ্রমণকালে রাত্রিতে বুদ্ধ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলেন, "কলিযুগে আমি আবার বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। কলিযুগে তোমাদের মনের বৌদ্ধ সংস্কার প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে (৪)।

১। Nagendranath Vasu—"Modern Buddhism and its followers in Orissa"—Introduction by H. P. Sastri দ্রষ্টব্য।

২। পাণ্ডারপুরের বিঠ্‌ঠল দেবতার পূজা নামদেব ও জ্ঞানেশ্বরের ভক্তিমার্গ অনুযায়ী হয় এবং জাতিভেদ রাখিয়াও বিঠোবার পূজায় সকলের অধিকার আছে ; ঠাকুরের কাছে সকলে সমান ও ভক্তিদ্বারা মুক্তিলাভ হয়—ইহাই এই পূজা-পদ্ধতির বিশ্বাস। এই দেবতার পূজা পুরীর জগন্নাথের ন্যায়। (C. V. Vaidya—Vol. II, P 427)।

৩। Nagendranath Vasu—Modern Buddhism and its followers in Orissa, P 26.

৪। 'H. P. Sastri—Introduction to Nagendranath Vasu's "The Modern Buddhism and its followers in Orissa", P 126.

উড়িষ্যার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম খৃঃ ১৮৭৫ সালে পুরীর দিব্যসিংহের সময়ে "মহিমাধর্ম্ম" নামে ভীমভইয়ের নেতৃত্বাধীনে আবার মাথা তোলে। এই ভীমভই নিম্নজাতীয় লোক ছিল এবং দাস্যবৃত্তি করিত। ইনি বলিতেন, "তিনি স্বর্গ হইতে বাণী শ্রবণ করিয়াছেন যে মহিমা ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইলে জগন্নাথ যে যথার্থ বুদ্ধ ইহা লোকের নিকট পুনঃ প্রচারিত হইবে।" এইজন্য তিনি ত্রিশটি গ্রামের লোক সমূহকে সশস্ত্র দলবদ্ধ করিয়া পুরী আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। পুরীর রাজা দিব্যসিংহ সংবাদ পাইয়া নিজ লোকজন ও পিপলীর ইংরেজ পুলিশ লইয়া ভীমের অপেক্ষায় রহিলেন। ভীম পুরীতে পদার্পণ করায় উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে ভীম তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা যে অসম্ভব তাহা বুঝিতে পারেন এবং তাঁহার শিষ্যদের ঘোষণা করিয়া দিলেন—অহিংসাই তাঁহার ধর্ম্মের প্রথম মন্ত্র, এইজন্য তাহারা অপরকে হিংসা করিয়া পাপ করিবে না; আর জগন্নাথ বুদ্ধরূপে পুরী ত্যাগ করিয়াছেন এবং এখন তিনি বুঝিয়াছেন যে বুদ্ধের অভিপ্রায় নয় যে তাঁহার মূর্ত্তি আবার লোক-গোচর হয়। এই উক্তির ফলে মহিমাধর্ম্মীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে, কতকগুলি কয়েদ হয়, কয়েদীগুলি ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয় (৫)। ইহার পর তাহারা অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়া গড়জাৎ মহলগুলির পর্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই ধর্ম্মের একটি আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, স্বজাতিরা (ভিক্ষু) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও চণ্ডালদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিবে না, কারণ শাস্ত্র তাহাদের অপবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে (৬)। ইহারা ছোট ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু "নব (নয় প্রকার) শূদ্রেরা" প্রভুর বিশ্বাসী ভক্ত, তাহাদের ঘর হইতে সিদ্ধ ভাত ভিক্ষা নিলে পাপ হয় না (৭)। সর্ব্বশেষ বসু মহাশয় বলেন, 'আমরা ইহা দেখাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছি যে উড়িষ্যার গড়জাৎ মহলগুলির

৫। Nagendranath Vasu—The Modern Buddhism and its followers in Orissa, Pp 165—166.

৬। "যশোমতি মালিকা" গ্রন্থ, ১৫২—১৫৩ পৃঃ।

৭। "যশোমতি মালিকা" গ্রন্থ, ১৫৪—১৫৬ পৃঃ।

মহিমাধর্ম্মীরা বৌদ্ধ। মহাযানীদের মতন তাহারা, 'বুদ্ধ আবার অবতীর্ণ হইবেন'—এই বিশ্বাসে দিন কাটাইতেছে" (৮)।

এই প্রকারে দেখি, মুসলমান আক্রমণের পর ভারতের চতুর্দ্দিকে হিন্দু সমাজের ভিতরেই একটা অপেক্ষাকৃত সাম্যবাদীয় আন্দোলন উত্থিত হয়। এই আন্দোলন ভক্তি দ্বারা উপাসনা, ভগবানে নির্ভর, সকলের মুক্তি, জাতিভেদ অস্বীকার, অন্ততঃ ধর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অস্বীকার, অহিংসা প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত। ভারতব্যাপী এই আন্দোলনটি বিভিন্ন প্রদেশে বাহ্যতঃ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকার ধারণ করিলেও, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আসলে এক। পাঞ্জাবের বাবা নানকের আন্দোলন উত্তরে রামানন্দের কর্ম্মফলের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলেও তথায় ভারতব্যাপী বৈষ্ণব আন্দোলনের ধাক্কা (১০০০—১২০০ খৃঃ) পৌঁছিয়াছিল (৯)। এই আন্দোলন বৌদ্ধ ও জৈনদের আপত্তির নিরাকরণ জন্য অহিংসাবাদ গ্রহণ করে, এবং তজ্জন্য পশু হত্যা দ্বারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও মাংস ভোজন নিষিদ্ধ করে। এইজন্য পাঞ্জাবে আজও নিরামিষ খাদ্যকে "বৈষ্ণব খাদ্য" বলা হয় এবং মাংসকে "মহাপ্রসাদ" (শাক্তের খাদ্য।) বলা হয়।

আর একটি লক্ষণ দ্বারা এই আন্দোলন বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়—উহা হইল ভক্তিতে উপাসনা। এই আন্দোলন সগুণ ব্রহ্মকে (Personal God), বিষ্ণু নামে বৈদিক নামকরণ করে, কিন্তু আসলে পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তের ভগবান রূপে খাড়া করে। এই দেবতা সগুণ, অর্থাৎ ভক্তের প্রার্থনা শুনিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই আন্দোলন শঙ্করাচার্য্যের 'নির্গুণ ব্রহ্ম' মতবাদকে খণ্ডন করিয়া সাধারণের জন্য একটা Fighting God, অর্থাৎ ক্রিয়াশীল এবং যুধ্যমান দেবতা সৃষ্টি করে। এইজন্যই বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ বা বিষ্ণু, মুরারে মধুকৈটভারে, কংস বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ, রাবণ-নিধনকারী রাম, নবদ্বীপের কাজীর ত্রাস সঞ্চারী নৃসিংহ প্রভৃতি রূপে কল্পিত হইতে লাগিল। তৎপর এই ঠাকুর ভক্তের জাতি বা বংশ গরিমা গ্রাহ্য করে না ; যে তাঁহাকে অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করে ঠাকুর তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। বোধ

৮। N. N. Vasu—P 180.

৯। C. V. Vaidya—Vol. II, P 418.

হয়, ইসলামের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই ভক্তিবাদ উদ্ভূত হয় (১০)। ইসলামের অর্থ—ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কার্য্য করা, মুসলমান প্রত্যেক কথার জবাবে "ইনসল্লা" (যদি আল্লা ইচ্ছা করেন) বলেন, বৈষ্ণবও গীতোক্ত "ত্বয়া হৃষিকেষেন হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলেন। এই প্রকারে নব-বৈষ্ণবধর্ম্ম আক্রমণকারী ইসলামের প্রতি প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া হিন্দু সাধারণকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য উদ্ভূত হইল।

এই নব-বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের গণসমূহকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া নিতে পারে নাই; কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদের গণ্ডী ইহা সম্পূর্ণভাবে ছাড়িতে পারে নাই। এই আন্দোলন উদার বুর্জ্জোয়াদের দ্বারা সৃষ্ট আন্দোলন; মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও পেটি-বুর্জ্জোয়াশ্রেণী (গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণী) ইহার দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবের নানক সাহেবের শিখ ধর্ম্ম তত্রস্থ ইসলামের প্রতি

১০। অধুনা Archer নামীয় এক ইংরেজ লেখক ও জনকতক খৃষ্টান মিশনারী বলিতেছেন —দক্ষিণের "ভক্তিবাদ" তত্রস্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে গল্প, চতুর্ব্যূহ, 'তংভাব' ও 'তংসম' মত, কল্কি অবতার মত প্রভৃতির সঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভক্তিবাদ (devotion), খৃষ্টের জন্ম বৃত্তান্ত এবং মধ্যযুগীয় খৃষ্টান ধর্ম্ম যাজকদের—'Homoisin বা Homonisin' (ভগবান, যীশু ও পবিত্রাত্মা এক ভাবের বা এক কিনা) জগতের শেষদিনে খৃষ্টের শ্বেত-অশ্বারোহণপূর্ব্বক পৃথিবীতে পুনরাগমন প্রভৃতি মতের সহিত সাদৃশ্য আছে। মালাবার কূল সিরিয় খৃষ্টীয় মণ্ডলী বহু পুরাকাল হইতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। উপরোক্ত মিশনারীদের মতে তাহাদের মত ও ভাব গ্রহণ করিয়াই দক্ষিণে বৈষ্ণব ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। পুনঃ, কেনেডি নামে এক ব্যক্তি বলেন, শকদের সহিত মধ্য এসিয়া হইতে খৃষ্টীয় গল্পগুলি ভারতে আসিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে বৈষ্ণবদের মতগুলি ধার করা নয়, ভারতীয় ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। এই বিষয়ে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'Narada's Visit to Swetadwip' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। এলবার্ট এডওয়ার্ড নামক জনৈক আমেরিকান লেখক বলেন, খৃষ্ট ধর্ম্মের অনেক মত, খৃষ্টের অনেক উপদেশ ও তাঁহার জীবন সম্পর্কিত অনেক গল্পও বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধীয় প্রচলিত গল্প হইতে ধার করা। Hopkins (India—Old and New) ইহা অস্বীকার করেন। আমাদের বোধ হয়, বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়া কতকগুলি বিষয়ে ইসলামের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হয়, অর্থাৎ কতক বিষয়ে তাহার সাদৃশ্য অবলম্বন করে।

বেশী প্রতিক্রিয়াশালী হইয়া বিষ্ণুপূজার বদলে "অলখ নিরঞ্জন" (নিরাকার ভগবান) উপাসনা করিতে শিখে এবং গুরু গোবিন্দের সময়ে জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়া উহা পাঞ্জাবের জাঠ-কৃষকদের মধ্যে প্রচারিত হয়।

এতদ্দ্বারা ইতিহাসে এই দেখা যায় যে, যে-স্থানে ভক্তিবাদ জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়াছে সেখানেই ভক্তিমার্গীয় ধর্ম্ম কৃষকাদি গণসমূহের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। দক্ষিণের কৃষক "লিঙ্গায়েৎ" ও উত্তরের জাঠ "শিখ" উহার প্রমাণ। আর ইহাও এস্থলে দ্রষ্টব্য যে ভক্তিবাদ, এই দুইস্থানে বৈষ্ণবমার্গীয় রূপ ধারণ না করিয়া অন্য আকার ধারণ করিয়াছে।

নূতন ধর্ম্মের আন্দোলনের অর্থ

মুসলমান আক্রমণ হইতে ভারতের সর্ব্বত্র একদিকে যেমন হেমাদ্রি, বিজ্ঞানেশ্বর, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্থিতিশীল (Conservative) স্মৃতিকারেরা হিন্দু সমাজকে বাঁচাইবার জন্য কমঠ বৃত্তি অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা করিলেন, অন্যদিকে একদল নেতা সমাজের বন্ধন কতকটা শিথিল করিয়া পতিতদের, এমন কি অহিন্দুকেও তাহার মধ্যে গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, বনিয়াদী স্বার্থের দল গোঁড়ামী অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা উদার মতকে আদৌ আমল দেন নাই। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে—বীর-শৈবদের একটা সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল ; বাসবের চরমপন্থীয় মত (লিঙ্গায়ৎ) তাহারা গ্রহণ করিল না, আবার বাঙ্গলায় রঘুনন্দনের ব্যবস্থা (১১) বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যেই গণ্ডীভূত হইয়া আছে ; বাকী হিন্দু বাঙ্গলা অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা বা বৈষ্ণব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। আবার পাঞ্জাবে চরম মত কৃষক জাঠেরাই গ্রহণ করে।

১১। অনেকের ধারণা নবদ্বীপের রঘুনন্দনের আচার ব্যবস্থা সমগ্র বাঙ্গলায় চলিতেছে ; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে উহা আদৌ সত্য নহে। পশ্চিম বাঙ্গলার উপরোক্ত তিন জাতি-মাত্র রঘুনন্দনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গলায় স্থানীয় ব্যবস্থা চলে—আবার বৈষ্ণবদের ব্যবস্থা আলাদা।

ইহার দ্বারা সামাজিক শ্রেণীগুলি কিভাবে এই সব অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রম আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। দক্ষিণে বিজয় নগর সাম্রাজ্য তখন ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্ম্মের প্রতিভূ হইয়া উঠে। উৎকলের প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের শিষ্য হইলেও ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রমী ধর্ম্ম আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন এবং সাম্যবাদী বৌদ্ধদের উপর উৎপীড়ন করেন। রাজপুতনায় ব্রাহ্মণ্যবাদ সুদৃঢ় থাকে। ইহার বাহিরে অভিজাতশ্রেণী সর্ব্বত্র সাধারণভাবে বর্ণাশ্রমের গণ্ডীর ভিতর থাকে—ইহা বনিয়াদী স্বার্থকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। বরং মুসলমান আক্রমণের জন্য "হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা" ও নিজেদের স্বার্থকে একীভূত করে। তখন হইতে জাতীয়তাবাদ অর্থে ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামীকে বজায় রাখা হয়। কিন্তু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বা গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের মধ্য হইতে সংস্কারকগণ উদ্ভূত হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার কার্য্যে লিপ্ত হন। ইহাদের অনেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের বনিয়াদী স্বার্থের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইসলামীকরণ হইতে হিন্দুকে বাঁচাইতে হইবে, সেইজন্য যতটা সম্ভব তাহার spiritকে অনুকরণ করিয়া তদ্দ্বারা হিন্দুকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হয়, এবং সাধারণকে মুসলমানীকরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। আবার নিজেদের দল বাড়াইয়া সংখ্যাধিক্যের জোরে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বৌদ্ধ ও জৈনদের হজম করিবার চেষ্টা করা হয়। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথায় তখন "ভিক্ষু-শূন্য বৌদ্ধ-সমাজ এক প্রকার বে-ওয়ারিশ মাল। যে যাহাকে পারে আপন দলভুক্ত করিতে লাগিল" (১২)। আর পতিত গণসমূহের অবস্থা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তাহারা হয় মুসলমান হইতে লাগিল অথবা লিঙ্গায়েৎ, শিখ বা চরমপন্থীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল; অথবা এ-সবের অভাবে পতিত হইয়াই রহিল এবং অনেকস্থলে "অস্পৃশ্য" শ্রেণীসমূহের দল বৃদ্ধি করিল।

মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ইতিহাস

ঐতিহাসিকেরা ভারতের মধ্যযুগকে দুইভাগে বিভক্ত করেন—হিন্দু

(১২) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ষট্‌ত্রিংশ ভাগ, ১ম ভাগ "সভাপতির অভিভাষণ"।

রাজত্বের শেষকাল এবং মুসলমান রাজত্বকাল। মুসলমান শাসনকালকে আমরা আবার দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি—মুঘল-পূর্ব্ব যুগ এবং মুঘল-শাসন যুগ। বস্তুতপক্ষে হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে যখন রাজপুতদের অভ্যুত্থান হয় সেই যুগ ও মুঘল-পূর্ব্ব মুসলমান যুগকে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক এবং মধ্যযুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে সামন্ততন্ত্র পূর্ণমাত্রায় প্রকট ছিল এবং জাতীয় অভিব্যক্তিও মধ্যযুগীয় ছিল। রাজপুতদের উৎপত্তি (১২ক) যাহাই হউক না কেন তাহারা কৌম প্রথার উপরে উঠিতে পারে নাই; কৌমগত বদলী প্রথা ('tribal feud), ব্যক্তিগত বদলী প্রথা (blood feud) ও মৈত্র (blood-bond), কৌমগত রাষ্ট্র (tribal state) এবং কৌমগত নীতির (moral code) উপরে উঠিয়া রাজপুতেরা একটা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করিতে অক্ষম ছিল (১২খ)। অতি প্রাচীন বৈদিক আর্য্যেরা যে-প্রকারে কৌমগত রাষ্ট্র সংস্থাপন করিয়াছিল এবং কৌম পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, রাজপুতেরাও তদ্রূপ সভ্যতার সেই স্তরে গণ্ডীভূত ছিল। ইহার অর্থ এই যে, ভারতের শাসকশ্রেণীগুলি সভ্যতার পথে পশ্চাদগামী হইয়াছিল। ভারত কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য গঠন করিয়া একজাতীয়তা উপলব্ধি করিবার পর পুনঃ বর্ব্বরযুগের কৌম প্রথায় ফিরিয়া যায়।

এইস্থলে ইউরোপের ইতিহাসের সহিত ভারতের ইতিহাসের সৌসাদৃশ্য আছে। ইউরোপ গ্রীসের সহর-রাষ্ট্রের বিবর্ত্তনের পর ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের উত্থান দেখে; পরে সভ্যতার কেন্দ্র পশ্চিমে অপসারিত হইলে রোমের কেন্দ্রীভূত "আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যের উত্থান দেখে। ইহার পর, উত্তরের বর্ব্বরেরা দক্ষিণে অভিযান করিয়া রোমের সাম্রাজ্য ও সভ্যতা বিনষ্ট করে। তাহার ফলে ইউরোপে "অন্ধকার যুগ" (Dark age) আসে। সভ্যতার উপর হইতে অন্ধকারের আবরণ অপসারিত হইলে ইউরোপে উত্তরাগত বর্ব্বরদের দ্বারা কৌম প্রথা ও কৌমগত রাজনীতি বিরাজ করিতে দেখা যায়; ইহার

১২ক। এই বিষয়ে Dr. B. N. Datta—"The Rise of the Rajputs" in J. B. O R. S. Vol. XXVII, 1941, Pt. 1 দ্রষ্টব্য।

১২খ। এই বিষয়ে Dr. Ishwari Prasad—"History of Mediaeval India," Pp. 199—200 দ্রষ্টব্য।

পর, প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া যে নূতন রাষ্ট্রীয় সংগঠন হয় তাহাকে সামন্ততন্ত্রীয় সমাজ বলা হয়। এই সামন্ততন্ত্রীয় যুগের পর ইউরোপের পুনঃ জাগরণ হয় এবং তাহা হইতে আজিকার ইউরোপের বিবর্ত্তন হয়।

ভারতের ক্ষেত্রে প্রাচীন কৌম-রাষ্ট্র পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া মৌর্য্যদের কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য গঠিত হয়; পরে মধ্যে মধ্যে ভারত খণ্ড আকার ধারণ করিলেও হর্ষ-বর্দ্ধনের সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত কৌম-রাষ্ট্র পদ্ধতি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে নাই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে ও পরে উত্তর হইতে বর্ব্বর আক্রমণ হইলেও অন্ধকার যুগ আসে নাই। এবং কৌম প্রথারও পুনঃ উদয় হয় নাই। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর দুই শতাব্দী বা ততোধিক কাল ভারতের "অন্ধকার যুগ" আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ এই সময়ের ইতিহাস বিশেষ পরিষ্কার নহে; সমাজে কি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল তাহাও অজ্ঞাত। কিন্তু নবম শতাব্দী হইতে আমরা ভারতের সর্ব্বত্র খণ্ড রাজ্যের উত্থান লক্ষ্য করি। রাজপুত নামে একটি জাতি উত্তর ভারতে উদয় হয় এবং তাহা নানাস্থানে বিভিন্ন কৌমের নামে কৌম-রাষ্ট্র সমূহ স্থাপন করে। পরে এই রাষ্ট্র সমূহে আমরা সামন্ততন্ত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখি। এই পরিবর্ত্তনের যুগে নূতন ভাষা সমূহ ও নূতন ধর্ম্ম ভারতে উদ্ভূত হয়। ভারতের ইহা একটি সন্ধিক্ষণ; এই সন্ধিক্ষণেই তুর্ক-মুসলমানের আক্রমণ হয়। তাহারা, অর্থাৎ মুঘল-পূর্ব্ব মুসলমান শাসকেরা পূর্ব্বের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল রাখে। কিন্তু পরে মুঘল যুগে কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়, হিন্দু ও মুসলমানকে এক অর্থ-নীতিক পদ্ধতি, এক রাষ্ট্র, এক দরবারী প্রথা, এমন কি এক ভাষা (এই যুগেই হিন্দী ও ফার্সী মিলিয়া "উর্দ্দু" ভাষার সৃষ্টি হয়), সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্রে এক স্বার্থ, এমন কি সম্রাট আকবরের "দীন-ইলাহি" (১৩) নামে একটি নূতন ধর্ম্মমত দ্বারা ভারতে পুনঃ একজাতীয়তা বিবর্ত্তিত করার প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামীর জন্য হিন্দুর পুনঃ জাগরণ হয়। পূর্ব্ব-কল্পিত হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার আন্দোলন এই পুনঃজাগরণের সহায়তা করে। হিন্দুর এই পুনঃ জাগরণের ফলে এবং তৎকালীন মুসলমান শাসকদের অনুদারতার জন্য

১৩। আবুল ফজলের "আকবর-নামা" দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় একজাতীয়তা বিবর্তিত হইবার পরিবর্তে হিন্দু জাতীয়তার উদয় হয়। ইহার ফল—বাঙ্গলায় হিন্দু জমিদারদের ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা, পাঞ্জাবে শিখদের, মধ্যদেশে 'সত্নরামী' সম্প্রদায়ের এবং মহারাষ্ট্রে শিবাজীর অধীনে এবং রাজপুতনায় চিতোরের রাজসিংহ ও মাড়ওয়ারের দুর্গাদাস ও অজিত সিংহের অধীনে, মধ্যভারতে ছুর্জ্জন শালের অধীনে স্বাধীনতার সংগ্রাম। ইহার মধ্যে ছুর্জ্জনশাল অজেয় ছিল; শিবাজী একটি স্বাধীন হিন্দু মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান।

হিন্দুর এই পুনরুত্থানের পর সম্রাট ফররোকসায়ারের সময়ে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মুঘল সাম্রাজ্যকে "জাতীয়" রাষ্ট্র করিবার শেষ চেষ্টা করে। তজ্জন্য তিনি মহারাষ্ট্রকে শাহুর অধীনে স্বাধীন বলিয়া মানিয়া নেন; রাজপুতনার স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং এই সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের একত্রিত করিয়া বিদেশাগত "মুঘল" আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। কিন্তু বিদেশী মুঘলদের প্রতিনিধি চিন কিলিচ খাঁ (হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশের স্থাপয়িতা) সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হত্যার পর মুঘল সাম্রাজ্যকে "জাতীয়" রাষ্ট্ররূপে বিবর্তিত করিবার শেষ আশা নির্ম্মূল হয় (১৪)। পরে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতে অপ্রতিহত শক্তিশালী হয়; শেষে ভারতে ইসলামের ভবিষ্যত রক্ষার জন্য উত্তরের মুসলমান অভিজাতেরা সংঘবদ্ধ হন এবং আফগানীস্থানের আহমদশাহ আবদালীর সাহায্যে মুসলমান সংঘ পানিপথে মহারাষ্ট্রীয়দের নিখিল-ভারতীয় মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন প্রচেষ্টা বিফল হয়। কিন্তু ইহার সাত বৎসর পর, উত্তর-ভারত মাধোজী সিন্ধিয়ার অধীনে আবার মহারাষ্ট্রীয়দের করতলগত হয়; দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলম সিন্ধিয়ার হস্তের পুতুল হয়। কিন্তু সেই সময়ে 'মহারাষ্ট্রীয়েরা' পাছে মুসলমান সংঘের পুনরুদয় হইয়া মহারাষ্ট্র শক্তির প্রতিরোধ করে তাহার ভয়ে পুরাতন উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া সাহ আলমের নামেই উক্ত শাসন করিতে থাকে। এই সময়ে ইংরেজ ভারতে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। প্রবাদ আছে, মাধোজী সিন্ধিয়া দক্ষিণের টিপু সুলতানের সহিত সন্ধি করিত: একটা নিখিল-ভারতীয়

১৪। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম বিষয়ে কাফী খাঁ, Rapson এবং সরকারের "History of Aurangzeb" দ্রষ্টব্য।

সংঘ সংগঠন করিয়া ইংরেজদের বিপক্ষতাচরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত। কিন্তু তিপুর মৃত্যুতে সিন্ধিয়া নিরাশ হইয়া পড়েন এবং তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে-চেষ্টাও অন্তর্হিত হয় (১৫)।

অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত হিন্দু-মহারাষ্ট্রীয়দের ভারতের আধিপত্য লইয়া সংগ্রাম চলে (১৬)। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাজিত হইয়া "মৈত্র" রাজত্বে পরিণত হয়। ইহার পর থাকে পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের রাজ্য, তাঁহার মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতার অভাবে ইংরেজের সহিত সংগ্রামে সেই রাজত্বের ধ্বংস হয়। ইহার পর, ইংরেজ ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু তথাকথিত "সিপাহী বিদ্রোহ" দ্বারা ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতেরা নিজেদের নষ্ট শক্তি পুনরায়ত্ব করিবার জন্য প্রয়াস পায়। অবশেষে পরাজিত হইয়া ভারতের অভিজাতেরা ইংরেজ-সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করে এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের একটি অংশেতে পরিণত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী ঘটনা হইতেছে ১৮৮৪ খৃঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন। এই সময় হইতে নবোত্থিত ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী জাতীয় কংগ্রেসকে নিজের রাজনীতিক মুখপাত্র করে। এ-বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৫। Malleson—"Last fight of the French in India."

১৬। Ramsay Muir—Making of British India.

ত্রিধারা

শুধু ভোর হলো, এখনি অঙ্ক সুরু ?
সূর্য্যের আলো সময়েরে গুণ করে।
অবোধ শিশুর কলম চলেছে দ্রুত,
কালের খাতায় উর্দ্ধকরণ হবে।
দ্রুত যে কলম চলে,
রৌদ্রের রঙ্ ফলে,
ভ্রমরের ভিড় কমেছে কখন ফুলে ?

তুমি কি এসেছো ? আরবার বলো, শুনি—
আমারেই চাও প্রাণান্ত-উত্তাপে ?
আদিম পৃথিবী,—উভার সমান তুমি।
ঈশ্বর দেন ভোগের সরঞ্জাম।

বেলা বুঝি হলো—দিবসের মাঝামাঝি,
আয়ত রৌদ্রে হেন উত্তাপ-শিখা।
থরোথরো করে কাঁপে এই শূন্যতা।
অবোধ শিশুর অঙ্ক হলো কি শেষ ?
হে আদিম সহচরি,
আমারে রেখেছো ধরি ?
শিহরিত লাজ অরণ্য পথ ভরি'।

ছায়া-সঙ্কোচ বনস্পতির মূলে,
তমালের ডালে অচেতন দুই পাখী,
শিমূলের চূড়া ডালে ফুলে গ্রন্থিল,
ফুলছাড়া ডাল, কাঁটাঘেরা কঙ্কাল।

ঁআধারের ঢেউ শূন্যতা ভরি' উঠে।
মাথার সূর্য্য প্রৌঢ় কখন হলো ?
অবোধ শিশুর খাতায় নূতন আঁক,
লঘুকরণের আয়ত্ত কৌশল।
আলোক মিইয়ে আসে,
গোধূলিতে দিন ভাসে,
কে ফেলেছে ছায়া উদাসীন মেঠো ঘাসে ?
　　আনাচে-কানাচে দেখেছো আগন্তুক ?
　　এলো যে আঁধার, জমে উঠে কার্ণিশে।
　　জ্বান যায় আলো—আঁধার-তাড়ানো আলো
　　প্রতি বাঁকে বাঁকে দিবস মিইয়ে আসে।

হে আদিম সহচরি,
আমারে রেখো না ধরি,
আমি যেতে চাই তোমারেও পরিহরি।
　　এলো সঙ্কেত, সে কি দিলো হাতছানি ?
　　সন্ধ্যা হয়েছে, ফুটে মালতীর ফুল।
　　বলাকার শ্রেণী আবাস-প্রত্যাগত।
　　তুমি ঘরে যাও—আমি যাবো পথে ফিরে।

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

একটি প্রেমের কবিতা

জানি তুমি মনে সিন্ধু এবং গিরিশিখর-কে

ভয় করো

যদি হেমন্তে ঝরেই একদা কুঞ্জবন,

সবুজে তখন হলুদ ছিট

কুসুমে প্রবেশ করেছে কীট

তখন চমকে করপল্লবে দেখবে শির্‌

স্ফীত প্রগলভ ধমনী,—মিনারে লাগবে চিড়।

তাই বলে আজ সূর্যকে বলো কেবা ডরায়

কোন নাবালক হাতের লক্ষ্মী পায়ে সরায়

আজ সকালের নব মুকুলের সৌরভে

তোমাকে পেলাম ফের দ্বিধাহীন গৌরবে।

পৃথিবীতে নেই কোথাও সত্য সর্বশেষ

তারও আছে কাল এবং সসীম আছে প্রদেশ।

আমি খুঁজি নাকো কোনো সুষুপ্ত নীল বিরাম

অঞ্জলি ভরে কিছু মন কিছু দেহ নিলাম।

কোনো গণিতের ফাঁকে মাথা দিয়ে

করি না ধ্যান,

চলি পথে তবু সরণী আমার নহে শ্মশান।

এখন আমার সবুজ লতায় ফোটে অসংখ্য

রাঙা কুসুম,

অনেক গভীর সমুদ্রে ফের শৈবালে ঢাকে

অতল ঘুম।

খর সূর্যের দাহন জানি যে অবগুণ্ঠনে ঢাকে না
মার্তণ্ডকে ভয় যদি করো, ভীরুতে জীবন
　　　　রাখে না ।
অতএব আমি সন্ধিসূত্রে বাঁধি শত্রু ও মিত্রে
অপরূপ এই বিশ্বকে দেখি কিছু রূপে
　　　　কিছু চিত্রে । •
সম্প্রতি খুঁজি সমাধি তোমার অতল মদির গন্ধে,
ফের যদি ফিরি কোনো দিন আমি
　　　　ফিরবো গো নির্দ্বন্দ্বে ।

মৌমাছি যদি গুঞ্জন করে সারোবরে ফোটে পদ্ম,
সবলে ধরুক যুগলের বাহু সেই অখণ্ড অদ্য ॥

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

দশা

নাচে বাম চোখ টিকটিকি পড়ে
ভাগ্য বাম
বায়ুমণ্ডলে বিষাক্ত যেন গন্ধ বয়
সাম্যের খাতে বিষমজোড়
গ-সা-গু পাইনা খুঁজে—
মনের ঘনাঙ্ক যায় বেড়ে,
কাটেনাকো নির্বিরোধ যাম
ভাগ্য বাম।

*

ঘড়ির দোলক চলে দুলে,
দুধ মরে নটক্ষিরে
ডাগর মেয়ের আইচাই
হাঁড়ি-কলে ডাহুক গোঙায়
কালসাপ ঘোরে পায়পায়
দুকূলে আগুন জ্বলে অকূলপাথার—
দারুণ শৈত্যের মাঝে ঘাম,
ভাগ্য বাম।

*

বাসনার নিদারুণ চাপ,
দিন-গুজরাণ নিয়ে হাঁপ,
উদরে নিত্তিই স্থিতি বাড়বানল,
—চলে বাহবাহবি ,
মন ভরা হেথা গ্লানিমায়
ফেল কড়ি মাখ তেল বুলি সবাকার
নৈমিষারণ্যের পথ আমি স্মরিলাম—
ভাগ্য বাম।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—শ্রীরমাপতি দত্ত। মূল্য তিন টাকা।

আমাদের দেশে নাট্য সংক্রান্ত যত আলোচনা হয়েছে তার দৃষ্টিকোণ প্রধানত সাহিত্যের। একেই আমাদের লেখকরা রঙ্গালয়ের দর্শকমাত্র (তাও পাস্-এ), তার ওপর আমরা বাঙালী, অর্থাৎ আমাদের দেখবার ভঙ্গীটাই কথাগত, যেমন সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, পলিটিক্স ও ইকনমিক্স-এ ত' বটেই। ফলে কোনো বাঙালী নাট্যকারের ভাগ্যে গ্র্যানভিল-বার্কার জোটে নি। আমাদের ধারণাই নেই যে সাজ-সরঞ্জাম যাকে stage-properties বলে, আলো, পোষাক, মাখবার রঙ, মাথার চুল এবং দৃশ্য, বসবার স্থানও আকার প্রভৃতি নিতান্ত অ-সাহিত্যিক সামগ্রী নাট্যের নাট্যত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। ঝোলা ও কাটা সীন্, লপেটা ও পম্প শু, জ্যাকেট কাঁচুলি, ঘাঘরা সাড়ি, ফুট-লাইট স্পট-লাইট ব্যবহারের মধ্যেকার পার্থক্যটুকু কেবল বাস্তব জগতের নয়, নাট্য-রূপেরও বটে। সাহিত্যিক আধিপত্যের আরেক কুফল হয়েছে এই যে আমরা চাই যেন নাটকমাত্রই নায়ক-নায়িকাপ্রধান এবং অভিনয় দেখাবার সুযোগও তাই নায়ক-নায়িকার অংশেই হোক। অবশ্য নাটক বললেই আমরা বিয়োগান্ত কিংবা ঐ ধরণের গুরু-গম্ভীর একটা কিছু বুঝি, বাকি সব অপেরা কিংবা লাইট কমেডি, যেগুলি বিচারের বাইরে রাখাই যেন ভদ্রতা। অথচ ঠিক এই সব হাল্‌কা জিনিষগুলোই আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চের যথার্থ 'প্লে'। আলিবাবা, আবুহোসেন, চিরকুমার সভা, মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল, বিবাহ-বিভ্রাট প্রভৃতিতে একটা চলন্ত ভাব আছে যেটা প্লে-র প্রাণবস্তু। ঐ সব নাটকের নায়ক-নায়িকা প্রাধান্য লাভ করেনা, সব ক'টি চরিত্রের সমাবেশে ও আদান-প্রদানে নায়ক-নায়িকা, তথা অভিনেতার স্বাতন্ত্র্য ভেসে যায়। রমাপতি বাবু নাট্যের এই মর্ম্ম কথাটি বুঝেছেন বলেই আমি তাঁর বইখানিকে নাট্য-সাহিত্যে একটি মূল্যবান দান বিবেচনা করি। অবশ্য তাঁর বিষয় তাঁকে খুবই সাহায্য করেছে। অমরবাবু নায়কের অংশে প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন, তাঁর চেহারা, তাঁর ভঙ্গী, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ সবই অনুকূল ছিল। তৎসত্ত্বেও

তিনি প্লে-র সমবেত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারতেন এইটাই ছিল তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। আমি কয়েকটি প্রমাণ দিচ্ছি। তাঁর রচিত অপেরা ও গান উচ্চ সাহিত্য পদবাচ্য না হয়েও অদ্ভুত রকমের সার্থক হত। তাঁর serio-comic অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, যা দেখলে মনেই হত না যে অভিনেতা একজন সহজাত নায়ক। তাঁর রঙ্গমঞ্চ, বিশেষত ক্লাসিকের রঙ্গমঞ্চ ও auditorium এমন ধরণের ছিল যেটা নট ও দর্শকের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করত। অধীন অভিনেতাদের সম্মান ও মাইনে বাড়াবার অর্থও তাই। তাঁর হ্যাণ্ডবিল, তাঁর থিয়েটারে দর্শকের অনাড়ষ্টভাব (ফষ্টি-নষ্টি পর্য্যন্ত সেখানে হত) যাঁদের স্মরণ আছে তাঁরাই বলবেন যে তিনি দর্শককে ঠিক দর্শক হিসেবে দেখতেন না। বয়োবৃদ্ধরা ভীষণ চটতেন, তাঁদের মতে অমরবাবু রঙ্গালয়ের গাম্ভীর্য্য ও ভদ্রতা নষ্ট করছেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে ঐ রুচি বৈলক্ষ্যণ্যের যথার্থ হেতু ধরা পড়বে। একবার অমরবাবু হ্যাণ্ডবিলে লিখেছিলেন যে তিনি বনের মধ্যে থিয়েটার করলেও লোকে কাতারে কাতারে আসবে। এর মধ্যে দম্ভ নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সেটা কেবল রক্তের নয়। তার মূলে ছিল দর্শকের মনের ওপর তাঁর সহজ অধিকার। সহজ অধিকার বড় অভিনেতার মাত্রেরই থাকে। এটা তার চেয়েও বেশী অহঙ্কার। সে অহঙ্কারের প্রেরণা এই যে তিনি জন-সাধারণের মন জয় করেছিলেন। জন-সাধারণ দর্শকের চেয়ে ব্যাপক সংজ্ঞা, দর্শক রঙ্গমঞ্চের মধ্যেকার সমষ্টি জন-সাধারণ দর্শনের পরেও থাকে। এই জন-সাধারণ গোটাকয়েক জিনিষ চায়, রঙ্গমঞ্চের কাছ থেকে সেই সব জিনিষের তীব্রতর অভিজ্ঞতা প্রত্যাশা করে, এবং এই সব প্রত্যাশা নিয়ে তারা রঙ্গালয়ে আসে। সাধারণের তীব্রতা আনে 'play'। লোকের play-sense থাকতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু তারা যখন দর্শক হয়, তখন তাঁরা play-ই প্রত্যাশা করে। যে নট কিংবা নাট্যকার সেটা পূরণ করে তারই play-sense আছে। বড় অভিনেতাদেরও মধ্যে অনেকের এটি থাকে না। অমর বাবুর ছিল। রমাপতি বাবু অমর দত্তের অতুলনীয় সার্থকতা ও জনপ্রিয়তার মুখ্য কথাটি ধরেছেন। রমাপতি বাবুর জীবন চরিত 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ,' অভিনেতা কিংবা নটরাজ অমরেন্দ্রনাথ নয়।

এমন কথা বলছি না যে ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনায় লেখক কৃতিত্ব দেখান নি। সেটা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। সব চেয়ে বাহাদুরী এই যে লেখক অমর বাবুর জীবনের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করেন নি, অনাত্মিক নিরপেক্ষতা ও সুবিচার সর্ব্বপ্রকার জীবন চরিতেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রাণবান পুরুষের বেলা তার প্রয়োজন বেশী, কারণ প্রলোভনও বেশী। অন্য আরেক রকমের পক্ষপাতিত্ব আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটা একটা কোনো বিশেষ সূত্র ধরে, যেমন মনোবিজ্ঞান কিংবা শ্রেণীবোধের সাহায্যে বিষয়কে আপন দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেবার প্রয়াস। তাও রমাপতি বাবু করেন নি। অথচ মেজদার হাতে মার খাওয়া কিংবা বড় মানুষের আদুরে ছেলের কুশিক্ষা দিয়ে অমর বাবুর দোষস্খালন যে খানিকটা চলত না তা নয়। অন্য ধারে বিপক্ষের দলকে দোষী সাব্যস্ত করে অমর বাবুর বিবেচনাহীনতাকে সহৃদয়তা প্রমাণ করিবারও সুযোগ ছিল। তা না করে রমাপতি বাবু পুরো মানুষটিকে গ্রহণ করেছেন। আমার পূর্ব্বেকার মন্তব্য ও এই মন্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ অমর বাবুর সমগ্র ব্যবহারে, অতএব রঙ্গালয়ে একটা প্রতিভার ছাপ ছিল। রঙ্গালয়ের অমরেন্দ্রনাথ ও বাইরের জগতের অমরেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি, তেজে, আত্মবিশ্বাসে, সরলতায়, উদারতায়, যেমন অসংযম, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি অসদগুণে। জীবনের ঐক্যটি রমাপতি বাবুর বই পড়বার পরে মনে গেঁথে যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অমর বাবুর খেদোক্তি, দু'জনের যুগল ছবি, তাঁর মাকে লেখা চিঠি, প্লেগের সময় সেবা, অঘোর ও হরিরাজ অভিনয় একই জীবনের বিকাশ।

ঠিক এই ভাবে, খোলাখুলি, রমাপতি বাবু লেখেন নি। তার বদলে ঘটনাকে স্বাধীনোক্তির অধিকার দিয়েছেন। রচনার দিক থেকে বোধ হয় এই পদ্ধতিটাই ভাল। কিন্তু পড়বার সময় মনে হয়েছে হয়ত বা কথাটা স্পষ্টভাবে লিখলেই চলত। কারণ, তাঁর আবৃত্তির ভদ্র উচ্চারণে, তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনায় যেমন তাঁর ব্যক্তিগত আভিজাত্য ধরা পড়ত, তেমনই নট-নটীদের প্রতি সক্রিয় ভালবাসার, ঘোষণাপত্রের ভাষায়, রঙ্গালয়ের সাজ-সজ্জার আড়ম্বরে, তাঁর 'বাবু' নামে, তাঁর প্রতি অন্যের ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধায় যেটা ছিল সেটা তাঁর নিজস্ব, অর্থাৎ দিলদরিয়া মেজাজ। আরেকটি কথা—তার প্রমাণ

আমার নিজের কাছে—তাঁর সমগ্র অভিনয় দেখে আমার মনে হত—একটা অতিরিক্ত শক্তি—ঐশী নয়, নিয়তি বোধ হয়, তাঁর ওপর কাজ করছে। একটা অন্ধভাব, স্বপ্নমাখা জড়তা তাঁর অভিনয়ে ছিল। মধ্যে মধ্যে জেগে উঠতেন, তখন কণ্ঠে হুঙ্কার আসত, সেটা বেশী হত একটু, কিন্তু ঝোঁকটা যেন স্বপ্ন ভাঙবার পরের, কোনো অদৃশ্য শক্তিকে যুদ্ধং দেহি আহ্বানের। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁর চ্যালেঞ্জ, defiance, অভিমান প্রভৃতি মনোভাবমূলক অভিনয় অত্যন্ত ভাল হত। জীবনেও ঠিক দেখি···যেন একটা অদৃশ্য শক্তি তাঁকে নিয়ে চলেছে, তিনি কখনও সজ্ঞান, কখনও অজ্ঞান। সম্পূর্ণ জ্ঞানী নন, তাই তিনি মহান নন, আবার নিয়তি তাঁকেই বেছে নিলে এবং তিনিও বিদ্রোহ করছেন এই জন্যই তিনি অ-সাধারণ। সে যাই হোক, অমর বাবুর জীবনে ও কর্ম্মে কোনো ভেদ ছিল না, তাই ভদ্র সংস্কার ভেঙেও তিনি ভদ্র, যদিও দুঃসাহসী। জীবিত থাকলে এই অসাবধানী পুরুষ অ-সহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতেন এবং পরে ওয়ার্দ্ধা কিংবা কাশীবাসী হতেন।

আমাদের বয়সী লোকেরা এক রকম অমর দত্তের যুগের লোক। মুস্তাফী মহাশয়, গিরীশ বাবু, অমৃত মিত্তিরকে আমরা অভিনয় করতে দেখেছি বটে, কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহের পরিচয়ে তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একটু দূরই ছিল। অমৃতলাল বসুকে আমরা প্রধানত নাট্যকারই জানতাম, যদিও তাঁর নিমচাঁদ, ঠাকুর্দ্দা প্রভৃতির অভিনয় খুবই ভাল লাগত। আমাদের সময় দু'জন মাত্র নট দর্শকের মন জয় করেছিলেন, দানি বাবু ও অমর বাবু। নটীদের মধ্যে প্রথমে তিনকড়ি, পরে তারাসুন্দরী, এঁরাই সত্যকারের প্রথম শ্রেণীর, অন্যের পটুত্ব ছিল বিশেষ অংশের। সহরের যুবক-সম্প্রদায়, গ্রামের লোক —ডেলী প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে তর্ক উঠত দানি বাবু বড় না অমর বাবু বড়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরে অনেক ভাল অভিনেতা ছিলেন, তাঁরাও হয় অমরবাবু না হয় দানি বাবুর ঢঙে অভিনয় করতেন। আরেক জন নট ছিলেন সবার বাইরে—রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য খুব অল্পলোকের হত আমাদের ছেলে বয়সে। অতএব রঙ্গালয়ে মোটামুটি অভিনয়ের দুটি ধারাই চলে আসছে বলতে হয়। এতদিন, অন্ততঃ, কারণ, শিশির বাবুর পর অনেক কিছুই বদলেছে।

অভিনয়ের দুটি ধারার প্রথমটি আবৃত্তিমূলক, দ্বিতীয়টি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা-প্রধান। আবৃত্তির প্রাণ সুর, যার সাঙ্গীতিক অংশ কণ্ঠস্বরের এবং নাটকীয় অংশ ছন্দ, গতি ও বিরামের সাহায্যে ফোটে। একে একপ্রকার সাহিত্যিক অভিনয় বলা চলে। উপাদানের তারতম্য অবশ্য থাকে, যেমন অমৃত মিত্রের কণ্ঠস্বরে বেগ ছিল বেশী, অমর দত্তের ছিল জোয়ারী। অমৃত মিত্রের আবৃত্তি যেন অবিরাম শ্রাবণ ধারা, অমর দত্তের যেন শরতের প্লাবন। অর্থাৎ অমর বাবু আবৃত্তির বাহিকতা ভাঙ্গতেন গমক ও বিরামের সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের স্বর বাঁশির মতন, তাঁর অভিনয় আবৃত্তি-প্রধান, এবং সে-আবৃত্তি নানা কারণে লিরীক ধর্ম্মী, অর্থাৎ সুর-ঘেঁষা বেশী। বাঁশির আওয়াজের ডিমেন্‌সন্ যেন দুটি, তারের যেন তিনটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের রেঞ্জ অত্যন্ত বেশী হওয়ার দরুণ ক্ষতিপূরণ হত সহজে। অন্যদিকে গিরীশ বাবু, দানি বাবুর অভিনয় দেহ ও মুখভঙ্গীর ওপর বেশী নির্ভর করত। গিরীশ বাবুর স্বর বজ্রগম্ভীর, এবং উচ্চারণ পদ্ধতি যেন গৈরীশী ছন্দেই ঢালা। (সেটা কতটা হাঁপানির জন্য বলা যায় না।) দানি বাবুর আওয়াজ গম্ভীর, কিন্তু উচ্চারণ নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল। সেই জন্য অভিনয়টাই তাঁর মূলধন হয়ে উঠত, এবং সেটা তিনি খুব উঁচু হারেই খাটাতেন। আবৃত্তিতে অমর বাবুর বিশ্বাস ছিল অসীম, তাই স্থির শান্ত ভঙ্গিমা ও বীর সঞ্চারণই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হত। অর্দ্ধেন্দু বাবুর অভিনয় যা দেখেছি তাতে আবৃত্তি বেশী ছিল না, তাই বোধ হয় আমার মনে গোটা কয়েক মূর্ত্তিই সাজান আছে। সেটা কি তাঁর প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী সূক্ষ্মতম ভাব পরিবর্ত্তনের আদেশবাহী ছিল বলেই? যদি তাই হয় তবে তিনিই ছিলেন আমাদের 'শুদ্ধ' অভিনেতা, এবং তাঁর অভিনয় নৃত্যাঙ্গের। সে যাই হোক, শিশির বাবুর অভিনয় বিচার করলে মনে হয় যে তাতে পূর্ব্বোক্ত ধারা কয়টি মিশেছে, তাই তাঁর আবেদন সমৃদ্ধতর। মেশবার ফলে ধারাগুলিও বদলেছে। আবৃত্তি তাঁর সংযত, অথচ এমন সংযত নয় যে সেটি গদ্য-ছন্দ হয়ে উঠে। অনেকটা যেন পূরবী ও পূরশ্চ-এর পার্থক্য। তাঁর কাটা-কাটা আবৃত্তিতে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। ঘনতা, অর্থাৎ অবান্তর ও নিরর্থককে পরিত্যাগ, যেমন, সুরের সাহায্য তিনি নেন না; এবং স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের সুষ্ঠু ব্যবহার, যার ফলে

অর্থই যে কেবল স্পষ্টতর ও গভীরতর হয় তা নয়, সুর অন্তর্মুখী ও ব্যাপক হয়, বাক্যের টেক্‌স্‌চার খাপি হয়। আমি যা বলছি তার উপমা বীণায় (দক্ষিণী ঢঙে) ও বিদেশী সঙ্গীতে এবং সাহিত্যে sprung rythm-এ পাওয়া যাবে। আবৃত্তির অভিনবত্বের সঙ্গে মিশে থাকে শিশির বাবুর অভিনয়-দক্ষতা। শিশির বাবুর চেহারা ও মুখের মাংসপেশী তাঁকে গিরীশ বাবুর অভিনয়ের দিকে টেনে আনে। কিন্তু নানা কারণে, প্রধানত একপ্রকার বিদগ্ধজন সুলভ পরিচ্ছন্নতার ও শুদ্ধতার জন্য তাঁর মানসিক আত্মীয়তা অর্দ্ধেন্দু বাবুর সঙ্গে। সবার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। আমি পুংশ্চের ছন্দের উল্লেখ করেছি, তা ছাড়া শিশির বাবুর হাতের ব্যবহার রবীন্দ্র-নাথের দান। হাত নিয়ে আমরা কেন বড় অভিনেতারাও মুস্কিলে পড়েন। এই ধরণের দোটানার নিষ্পত্তি করেন শিশির বাবু দুটি উপায়ে। প্রথম, চোখ ও ঠোঁটের দ্বারা। তাঁর চোখ ও ঠোঁটের গড়ন এমন যে তাতে একত্রে বিপরীতভাব এবং সূক্ষ্ম অস্পষ্ট fugitive ভাব সহজে খোলে, যেজন্য শ্লেষ বিদ্রূপ প্রভৃতিতে তাঁর সমকক্ষ আমাদের রঙ্গমঞ্চে কেউ নেই। আমি ছিবলে ঠাট্টা বলছি না, satire বলছি। দ্বিতীয় উপায়, movement ; তাঁর প্রবেশ, সঞ্চারণ ও প্রস্থান নাটুকে নয়, কেবল উপযোগী। আবৃত্তির সময় তাঁর অবয়ব-সঞ্চালন লক্ষ্য করা দর্শকের চরম আনন্দ, বিশেষত হাত ও চিবুক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অমর দত্তের অভিনয় বিচার করতে চাই। ফলে দেখি অমর বাবুর অভিনয় আবৃত্তিপ্রধান ছিল। তাঁর অঘোরের অভিনয় আমি একাধিকবার দেখেছি। অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাতেন সেখানে। তবু, সেখানেও, তাঁর মুখের মাংসপেশীতে আলো ছায়ার খেলা থাকত না, কেবল mood-এর ছায়াপাত হত। অর্থাৎ প্রাণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধিই, তার দিক পরিবর্তনই থাকত। অন্যদিকে হরিরাজ, প্রতাপে তাঁর গাম্ভীর্যের প্রকাশ পেতাম।

রমাপতি বাবু আমার স্মৃতি ও বিচারকে সমর্থন করেছেন বলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সেটা অবশ্য বড় ব্যাপার নয়। আসল কথা, রঙ্গালয়ের ওপর ঝোঁক দেওয়াটা, এবং তার পটভূমিতে অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথকে দেখা, যে অমরেন্দ্রনাথের প্রাণশক্তি সামাজিক বাধা বিপত্তিকে ছাপিয়ে তাঁকে রঙ্গমঞ্চে টেনে এনেছিল। আমার বিশ্বাস এই দৃষ্টিভঙ্গীটাই ঠিক হয়েছে বিষয়ের পক্ষে।

আমার অনুরোধ রমাপতি বাবু এইবার বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করুন। তাঁর হাতে রঙ্গালয়ের ইতিহাস সম্মান পাবে, সাহিত্যের তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে না। এই কাজের জন্য যতগুলি গুণের প্রয়োজন সবগুলিই তাঁর প্রথম বইখানিতে পেয়েছি।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

TO HELL WITH CULTURE—Herbert Read. Kegan Paul.

বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় মহৎ কাব্য কেন জন্মাচ্ছে না রীড তাঁর Poetry and Anarchism গ্রন্থে সে-প্রশ্ন বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য হ'লো, এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিজম্-এর প্রতিষ্ঠা ছাড়া কাব্যের প্রগতি অসম্ভব। এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিজম্-ই তাঁর কাছে প্রকৃত গণতন্ত্রের সমার্থক, সোশ্যালিজম্ বা কম্যুনিজম্ নয়। এই মতবাদের জের টেনে আলোচ্য বইয়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক শিল্পী এরিক জিল্-এর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন, সংস্কৃতি রসাতলে যাক। ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতি মানে তো বাহ্যিক চাকচক্য। শিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ কোথায়? শিল্পীরাও যাক জাহান্নমে। সংস্কৃতির স্বতন্ত্র সত্তা বর্ত্তমান ব'লেই শিল্প হ'য়ে দাঁড়িয়েছে জীবিকা-বিশেষ। গণতান্ত্রিক সমাজে যেমন সংস্কৃতির স্বতন্ত্র সত্তা যাবে মিলিয়ে, তেমনি অদৃশ্য হবে শিল্পী নামধারী সুবিধাভোগী মানুষও।' থাকবে কেবল শ্রমিক। অথবা জিল্-এর প্যারাডক্সে বলা যেতে পারে, গণতান্ত্রিক সমাজে অবজ্ঞাত ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিক থাকবে না, থাকবে কেবল শিল্পী। কারণ শিল্পীকে কখনো বিশেষ জাতের মানুষ বলা যায় না, বরং মানুষই বিশেষ জাতের শিল্পী। অবশ্য শিল্পীদের মধ্যে লেখকগোষ্ঠী হবে এর ব্যতিক্রম। গণতান্ত্রিক সমাজে সাহিত্যিকদের জন্যে তাই থাকবে গিল্ড বা অনুরূপ ঐকতন্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যেমন রাশিয়ায় আছে।

এখন দেখা যাক গণতন্ত্র বলতে রীড কি বোঝেন। এ-সম্পর্কে তাঁর তিনটি প্রস্তাব আছে। প্রথমত, সকল উৎপাদনের লক্ষ্য হবে প্রয়োজন, লাভ নয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে এবং তার বিনিময়ে পাবে প্রয়োজন মতো পারিশ্রমিক। তৃতীয়ত, উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর শ্রমিকদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে। এই তিনটি সর্ত্ত পালিত হ'লে তবেই গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'তে পারে, নচেৎ নয়। রীড-এর মতে গণতন্ত্রের এই ধারণা ধ্রুপদী যা ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়েছে রুশো, জেফারসন, লিনকলন্, প্রুধোঁ, ওয়েন, রাস্কিন, মার্ক্স, মরিস, ক্রোপটকিন প্রমুখ দার্শনিকদের মতবাদ থেকে সার সংগ্রহ করে। এবং এই গণতন্ত্র থেকেই একদিন উদ্ভূত হবে নতুন সভ্যতা।

বস্তুত মানুষের সমস্যা শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সৌন্দর্য্য আনন্দ ও এই রকম আরো অনেক কিছুর জন্যে মানুষের তৃষ্ণা অনস্বীকার্য্য। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা হ'লেই গণতন্ত্রের কাজ ফুরোচ্ছে না। মানুষের বৃহত্তর প্রশ্নকে এড়িয়ে নতুন সভ্যতা সার্থক হ'বে কি ক'রে? রীড-এর কথাতেই শুনুন :—(১) The values * * were not invented in ancient Athens or anywhere else. They are part of the structure of the universe and of our consciousness of that structure. (২) If an object is made of appropriate materials to an appropriate design and perfectly fulfils its function then we need not worry any more about its aesthetic value : it is *automatically* a work of art. Fitness for function is the modern definition and this fitness for function is the inevitable result of an economy directed to use and not to profit.'

গণতন্ত্রের তৃতীয় সর্ত্ত নিয়েই কিন্তু যতো গোলমাল। উৎপাদন-ব্যবস্থা শ্রমিকদের দখলে থাকবে, না রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে—এই হচ্ছে সমস্যা। এ-বিষয়ে লেখক বলতে চান, রাষ্ট্র থেকেই যখন ব্যুরোক্রাটদের অভ্যুত্থান, এবং ব্যুরোক্রাসী থেকেই যখন গণতন্ত্রবিরোধী সমাজের কথা প্রচার করা হয়—তখন যে উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রের অধিকার কুফলপ্রসূ তাতে আর সন্দেহ কি। হিটলারী নব বিধানের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নীতি যে

একেবারে নেই, নাৎসীরা যে আদৌ সংস্কৃতি-সচেতন নয়...এমন মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। 'But whatever it gives in the way of social security, it takes away in the form of spiritual liberty.' নাৎসী বিপ্লবের পর কোনো মহৎ শিল্প না জন্মাবার কারণস্বরূপ রীড্ উদ্ধৃত করেছেন উদারনৈতিক দার্শনিক গিয়োভানি জেন্টিল্-এর এই মত :— 'Spiritual activity works only in the plentitude of freedom.' বলা বাহুল্য, এই spiritual activity তথাকথিত যোগ-বিলাসের সগোত্র নয়।

লেখকের তৃতীয় প্রস্তাব যে ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত তার নজির সাম্প্রতিক ইতিহাসেই রয়েছে। গণতান্ত্রিক স্পেনে স্বল্প কালের জন্যে হ'লেও শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদন-ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিতই হয়েছিল। কিন্তু আসল কথা, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জড় না মরলে প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব নয়। এই কারণে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির স্বরূপ যে কি হবে সে-বিষয়ে সঠিক কিছু নির্দ্দেশ করা রীড্-এর পক্ষে এখন কঠিন। তবে এই সংস্কৃতি অনুকূল সমাজে স্বচ্ছন্দে গড়ে উঠবে ব'লেই লেখকের বিশ্বাস। "A democratic culture is the journey a democratic society will make when once it has been established.'

বইখানার পৃষ্ঠা-সংখ্যা কম হ'লেও ভাববার খোরাক কিছু কম নেই।

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ—শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ। কুলজা সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচসিকা।

জাতীয় জীবনকে মহিমান্বিত ক'রে তোলার পক্ষে মনীষীদের জীবনালোচনা বা গুণকীর্ত্তন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ বিশেষ। কারণ এই আলোচনার ফলে আমরা প্রায়শই মহত্তর জীবনের সন্ধান লাভ করি, এবং তার দ্বারা উক্ত জীবনীর আদর্শ ও গুণাবলীর সংক্রামতা আমাদের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভের সুযোগ পায়। তত্বজ্ঞ মনীষী রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্পর্কে ইহা যেমনই

অমোঘ তেমনই অকাট্য। সে কারণ, তাঁর সম্বন্ধে যতই বহুল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, জাতির কৃতজ্ঞতা ততই সেই সকল গ্রন্থকারিকের নিকট অধিকতর ভাবে উপাগত হওয়া স্বাভাবিক।

একটি মানুষের ব্যক্তিত্বে সমগ্র জাতির জীবন প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হ'তে পারে সত্য, বা একটি মানুষের অসাধারণ শক্তিতে জাতির জাতীয় জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাও কিছু অসম্ভব নয়; কিন্তু সেই একটি মানুষের শক্তিপ্রভাবে সমগ্র বিশ্বমানবের অন্তর জয় করা বহুযুগের মধ্যে বোধ হয় স্বল্পসংখ্যক মনীষীদের দ্বারাই সম্ভব। এক্ষেত্রে তাঁরা নিতান্তই ক্ষণজন্মা ও নিঃসন্দেহে মহামানবপর্য্যায়ভুক্ত। ঐশী শক্তির প্রভাবে ভারতের ভাগ্যেতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নির্ব্বিচারে উক্ত গুণেরই গুণাধিকারী। তাঁর গৌরবে ভারতীয় আমরা আজ পৃথিবীর দরবারে সম্মানিত ও পরিচিত হবার সুযোগ পাই। কাব্যে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে; ধর্ম্মে, সমাজে ও রাজনীতিতে তাঁর দানের পরিমাণ যে কত গভীর, সুদূরপ্রসারী ও কার্যাকরী তার তুলনা করা সাধারণের পক্ষে সাধ্যাতীত। জীবনের অতি কৈশোর থেকে বার্দ্ধক্যের শেষ সীমানা পর্য্যন্ত তিনি নানা বিষয়ে বেগবতী মন্দাকিনীর ন্যায় তাঁর রচনাস্রোতে বিশ্বের বহু অনুর্ব্বর মনভূখণ্ডকে উর্ব্বর করেছেন, বহু নিষ্ফল জীবনকে ফলবান্ করেছেন। এই পুণ্য স্রোতধারায় অবগাহিত আমরা নানা ভাবে অনুপ্রাণিত ও অনুবাসিত হয়েছি—দুঃখে, জ্বালায়, বিরহে শান্তি পেয়েছি; জীবনের বহু নৈরাশ্যজনক মুহূর্ত্তে তাঁর বাণী আমাদের আশার জ্যোতির্লোকে পৌঁছে দিয়েছে। তিনি আমাদের জাতিকে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও দার্শনিক করেছেন, আমাদের রাজনৈতিক বোধকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেবলমাত্র কাল্পনিক স্বপ্নলোকেই তিনি বিচরণ করেন নি; মাটির পৃথিবীতেও নেমে এসে আমাদের সুখ দুঃখের কথা চিন্তা করেছেন—অবিচার, মহামারী ও অনশন প্রভৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করেছেন—তাঁর গুণাবলী সীমাহীন ও অফুরন্ত। এবং সে কারণেই তাঁর সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থের অজস্রতা কোন দিনই তাঁর অসীমতাকে সীমার আবেষ্টনে আবদ্ধ করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি এককথায় রবীন্দ্র-জীবনের ঘটনাপঞ্জী। এর মধ্যে

গ্রন্থকারের নিজস্ব গবেষণা বা মৌলিক চিন্তার কোন কৃতিত্ব নেই। কলিকাতায় ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পৈত্রিক বাসভবনে ১৮৬১ সালের ৭ই মে, কবির জন্মগ্রহণের তারিখ থেকে ১৯৪১ সালের ৭ই অগষ্ট মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি ক্রমপর্য্যায় অনুযায়ী এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রকার ঘটনাপঞ্জী সংগ্রহও যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ব্যাপার এবং ইহার মধ্যেও যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এর পুরা কৃতিত্ব গ্রন্থকার দাবি করতে পারেন না। কারণ ইতঃপূর্ব্বে বাংলায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী'র দুই খণ্ড এবং ইংরেজীতে অমল হোম সম্পাদিত ১৯৪১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংখ্যায় প্রকাশিত 'A Chronicle of Eighty Years' নামক প্রবন্ধটি থেকে গ্রন্থকার নিশ্চয়ই সাহায্য পেয়েছেন। গ্রন্থকারের বলার ভঙ্গি সরল হলেও সরস নয়। তাছাড়া এরূপ গ্রন্থের নাম কেবলমাত্র 'রবীন্দ্রনাথ' রাখাতেও আমার আপত্তি আছে; কারণ এরদ্বারা এই গ্রন্থটি যে কেবলমাত্র রবীন্দ্র-জীবনের ঘটনাপঞ্জী তা বুঝবার সুযোগ হয় না। গ্রন্থের শেষ দুই পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র রচনাবলীর যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেও কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্র-সংখ্যায় ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী'র সাহায্যে উক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হবেন।

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

কঙ্কিকুহু হিন্দু।—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য—দেড় টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রফুল্লবাবুর এই বইটি যে জনপ্রিয় হয়েছে তার প্রমাণ প্রথম সংস্করণের কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার দরকার হয়। আমাদের দেশে যে-কোনো বইর পক্ষে এই রকম প্রবল চাহিদা বিরল। সংখ্যাতত্ত্বের দক্ষ

সমাবেশের ও লেখকের মূল বক্তব্যের পরিষ্কার বিবৃতির গুণে এই জনপ্রিয়তা "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" পুরোপুরি অর্জন করেছে। কিন্তু এই বইটি জনপ্রিয় হবার প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মন লেখক গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন—তাদের স্বার্থচিন্তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে। কেননা, একথা স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চিন্তা তাদের স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ আর "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু"তে যে সমস্যা আলোচিত হয়েছে—বইর নামেই যা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে—তা' পড়ে হিন্দু ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের উৎসাহিত হবার বিশেষ কারণ নাই। সুতরাং "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" নিঃসন্দেহ সাম্প্রদায়িক বই। কিন্তু এর সাম্প্রদায়িকতা সেকেলে সঙ্কীর্ণ হিন্দুয়ানির সাম্প্রদায়িকতা নয়—লেখক সনাতনী হিন্দুয়ানির ঘোর বিরোধী। তাঁর মতে সনাতনপন্থীরা হিন্দুসমাজের বর্তমান দুর্গতির জন্যে বহুলত দায়ী। এই মত যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে লেখক অত্যন্ত পরিষ্কার ও জোরালো ভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই সনাতনী সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আরও এক জাতীয় সাম্প্রদায়িকতা কিছুকাল থেকে ভারতবর্ষে উগ্র হয়ে উঠেছে—হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। এর রূপ রাজনৈতিক, এর মূল অর্থনৈতিক ও এর স্থূল কারণ ভারতশাসন আইনের সাম্প্রদায়িক বিধিবিধান। এই বিধিবিধানের ফলেই নিজেদের "ক্ষয়িষ্ণু"তা সম্বন্ধে হিন্দুরা আজ এতটা সচেতন, হিন্দুমহাসভা আজ এতটা প্রভাবশালী। এই চেতনা ও প্রভাব বইটির মধ্যে সুস্পষ্ট।

কিন্তু মূলত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা হ'লেও বইটিতে এমন একাধিক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সুযোগ্য আলোচনা হয়েছে যা পড়লে বিশেষ শিক্ষালাভ করা যায়। যথা—জনসংখ্যার সমস্যা। বর্তমান ভারতবর্ষের প্রায় সব অর্থনীতিবিশারদ পণ্ডিতই এই বিষয়টি নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। লেখক তাঁদের ও বিদেশী পণ্ডিতদের মতামত আলোচনা ক'রে ও সংখ্যাতথ্যের বিশ্লেষণ ক'রে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন চরমপন্থী প্রগতি-বাদীরাও তাতে সায় দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। কিন্তু ভিন্ন কারণে। হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে হ'লে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছাড়া উপায় নাই—এ কথা বাংলাদেশের হিন্দুরা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। এ কথাও বুঝেছে যে রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া আর্থিক সমৃদ্ধি, বিশেষত, নিজ নিজ

সম্পত্তির নিরুদ্বেগ ভোগ সম্ভব নয়। অতএব জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা উঠলে স্বচ্ছন্দ সম্পত্তিভোগী রাজনৈতিক অধিকার-প্রত্যাশী হিন্দুরা স্বভাবতই চঞ্চল হ'য়ে আপত্তি জানায়, কেননা তাদের শ্রেণীস্বার্থচেতনায় ঘা লাগে। অপর পক্ষে, প্রগতিবাদীরাও জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী—কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের নয়, সমষ্টিগত ভাবে। গান্ধিজি বা রোমান ক্যাথলিকদের মতন জন্মনিয়ন্ত্রণে নৈতিক আপত্তি তাদের বিন্দুমাত্র নাই। তাদের বক্তব্য শুধু এই যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পথে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানের চেষ্টা ক্ষীণ সংস্কার চেষ্টামাত্র—মূল সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে। এই জাতীয় সংস্কার চেষ্টায় যাঁরা উৎসাহিত হ'য়ে ওঠেন—যেমন ডক্টর জ্ঞানচাঁদ, বা ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি একাধিক অর্থনীতিবিশারদ পণ্ডিত হয়েছেন—তাঁরা শোষক ও এক্ষেত্রে শাসক সম্প্রদায়ের সহায়তাই করেন। (একাধিক আই-এম-এস ও আই-সি-এস মহারথী জন্মনিয়ন্ত্রণের বড় পাণ্ডা।) এঁদের অনেক ভুয়ো যুক্তির অসারতা প্রফুল্লবাবু দেখিয়েছেন। সেজন্যে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁকে এই কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে হিটলার বা মুসোলিনিও জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী এবং যে কারণে বিরোধী তা' হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য থেকে খুব বেশী তফাৎ নয়।

আসল কথা—দৃষ্টিভঙ্গী। প্রফুল্ল বাবুর দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কারকের, সুতরাং তা যুগধর্ম বিরোধী। কেননা এখন প্রগতির পথ সংস্কারের পথ নয়, বিপ্লবের পথ। বিপ্লবের প্রয়োজন প্রফুল্লবাবু স্বীকার করেন: "আমাদের মতে এখন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—হিন্দু সমাজের মধ্যে সামাজিক সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার এবং সাহসের সঙ্গে তদনুযায়ী সংস্কার প্রচেষ্টা" (ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু—১৩৮ পৃ:)। পুনশ্চঃ "পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, হিন্দু সমাজের আজ যে শোচনীয় দুর্গতি, তাহাতে আমূল সংস্কার বা পুনর্গঠন না করিলে বর্ত্তমান যুগে এই প্রাচীন সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব এবং তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে সমাজে বৈপ্লবিক মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে" (ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু—১৭৭ পৃ:)। এমন কি মার্কস-বাদ যে বিজ্ঞানসম্মত এ কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংস্কারের মোহ তিনি কাটাতে পারেন নি, তাও শুধুমাত্র হিন্দু সমাজের সংস্কার। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের দান

স্বীকার ক'রে তিনি শেষ কালে বলেছেন : "আমাদের মতে ব্রাহ্মসমাজ একটা মারাত্মক ভুল করিয়াছিল। তাহারা হিন্দু সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বাহির হইতে সংস্কার-আন্দোলন চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার ফলেই হিন্দু সমাজের সহানুভূতিলাভে তাহারা বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে।"

ব্রাহ্মসমাজ ভুল করেছিল কিনা তা' বিবেচ্য, কেননা ব্রাহ্মসমাজ যে-আদর্শ দেশের সামনে ধরেছিল—অর্থাৎ মধ্যবিত্তদের সামনে, তখনকার দিনে তারাই ছিল "দেশ"—হিন্দু বা মুসলমান কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত নয় ব'লেই এই আদর্শ অত প্রভাবশালী হয়েছিল, ব্যক্তিস্বাধীনতার মহিমা অত উজ্জ্বল ভাবে তার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল। ব্যক্তিত্ববাদের ও উদারনৈতিক সংস্কারের যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবও কমে এসে প্রায় বিলীয়মান হয়েছে। কিন্তু হিন্দু-মহাসভার প্রভাবও সাময়িক, আর যদিও ভোটদাতাদের মাথা গুণতিতে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক তবু আদর্শের দিক দিয়ে অনেক বেশী সঙ্কীর্ণ। কেননা, ব্রাহ্মসমাজের চাইতেও অনেক বড় মারাত্মক ভুল হিন্দু-মহাসভা করেছে—এক নতুন সংস্করণের পলিটিক্যাল হিন্দুয়ানীর উদ্ভাবন ক'রে। ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে এর যোগ নাই। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজেরও নাই; কিন্তু তবু মনে রাখতে হবে ভারতীয় প্রগতির ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের অনেক নিচে হিন্দু-মহাসভার স্থান—বৈষ্ণব বিপ্লব বা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রচেষ্টার সঙ্গে হিন্দু-মহাসভার তুলনা করা তো বাতুলতা।

হিন্দু-মহাসভার আদর্শের প্রভাব প্রফুল্ল বাবুর বইটিতে সুস্পষ্ট। এই আদর্শের প্রথম ও শেষ কথা 'হিন্দু'। এই জাতীয় সাম্প্রদায়িক বিশেষণ প্রগতির শত্রু। ভারতীয় জনসাধারণের আজ প্রধান লক্ষ্য দেশে ও বিদেশে এই সব শত্রুর নিপাত।

হিরণকুমার সান্যাল

নানা কারণে এ সংখ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'মোহানা' প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। 'মোহানা' আগামী সংখ্যায় যথাযথ ভাবে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

পরিচয়

উপনিষদে জড়তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

উপনিষদে জড়ের স্থান

(২)

উপনিষদে জড়ের স্থান নির্দেশ করিতে আমরা গত মাসের 'পরিচয়ে' দেখিয়াছি যে, বিশ্বের চরম তত্ত্ব ব্রহ্ম কেবল এক নন—তিনি অ-দ্বিতীয়—শুধু Unit নন, তিনি Unique.

একমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য, ৬৷২৷১

অর্থাৎ, ব্রহ্ম ভিন্ন কোন কিছু নাস্তি—

তস্মাৎ হান্যৎ ন কিঞ্চ নাস—ঋগ্বেদ, ১০৷১২৯৷২

এক কথায়,—

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ

—ছা, ৭৷২৫৷১-২

ঋষিদিগের দৃষ্টিতে ব্রহ্মই যখন একমাত্র পরমার্থ, তখন দ্বৈত (জড় ও জীব) —'মায়ামাত্রং তু' এবং নানাত্বের বস্তুতঃ সত্তা নাই—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

অথচ প্রতিমুহূর্তে বিশ্বের বিবিধ বৈচিত্র্য আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে। অতএব বিশ্বকে, 'ইদং'কে একেবারে প্রত্যাখ্যান করা যায় কিরূপে? সেজন্য

উপনিষদ্ দ্বৈতকে কথঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিয়া বলিয়াছেন—এই যে 'ইদং' তোমার সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে ঐ 'ইদং' বস্তুতঃ ব্রহ্ম —

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্—মুণ্ডক, ২।২।১১

পুরুষ এবেদং সর্বম্—ঋগ্বেদ, ১০।৯০।২

আমরা গত মাসের 'পরিচয়ে' দেখিয়াছি যে বিশ্বের ঐ ব্যাবহারিক সত্তা প্রতিপন্ন করিবার জন্ম উপনিষদ্ কোথাও কোথাও বিশ্বকে ব্রহ্মের বিবর্ত—আবার কোথাও কোথাও বিশ্বকে ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

উপনিষদের ঋষিরা বিশ্বকে কি ভাবে ব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়াছেন গত বারের 'পরিচয়' আমরা তাহা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিশ্ব কি ভাবে ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার—বর্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব। দেখা যায় এ প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেৎ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদ্ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—বৃহ, ২।১।২০

"যেমন ঊর্ণনাভি হইতে তন্তু নির্গত হয়, যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত বেদ নির্গত হইয়াছে।"

সেইজন্ম ঐতরেয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

এষ ব্রহ্মা এষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতি রেতে সর্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি ইতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।—ঐতরেয়, ৫।৩

'এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমস্ত দেবতা, এই পঞ্চমহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ্ ও জ্যোতিঃ, এই সকল ক্ষুদ্র মিশ্র বীজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, যাহা কিছু প্রাণী, জঙ্গম, পক্ষী, স্থাবর—সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞাই লোকের নেত্র, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।'

সমস্ত জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকার—চিৎ-অচিৎ-প্রকারং ব্রহ্ম—এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্ম বৃহদারণ্যক কয়েকটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন,—

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।—বৃ, ২।৪।৭

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।—বৃ, ২।৪।৮

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।—বৃ, ২।৪।৯

অর্থাৎ, 'যেমন দুন্দুভি বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ।'

অর্থাৎ, যেমন একই বাদ্য হইতে নানা প্রকার শব্দ উত্থিত হয়,—সে নানাত্ব-ভেদ এক বাদ্যেরই প্রকার বা বিধা মাত্র; সেইরূপ এক ব্রহ্ম হইতে জগতের এই নানাত্ব প্রতিভাত হইতেছে। এই নানা তাঁহারই বিধা বা প্রকার-ভেদ। অতএব তাঁহাকে জানিলে তাঁহার প্রকারও বিজ্ঞাত হয়। *

আমরা দেখিয়াছি যে the obtrusive reality of the manifold universe is merely 'maya'; আমরা আরও দেখিয়াছি যখন 'there is no second outside of Him, no other distinct from Him— ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ (বৃহ, ৪।৩।২৩)'—তখন 'there can be no question of a universe in the proper sense of the term.' †

অর্থাৎ, there is not and never can be for us reality outside of the Atman, a universe outside of our consciousness! তথাপি উপনিষদের ঋষিরা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন কেন?

---

* This is also the meaning of the illustrations in Brih. 2. 4. 7-9. The Atman is the musical instrument (Drum, Conch, Lyre), the phenomena of the universe are its notes. Just as the notes can only be seized, when the instrument is seized, so the world of plurality can only be known when the Atman is known.—Deussen p. 76.

† From this point of view, no creation of the universe by the Atman can be taught, for there is no universe outside of the Atman. (Deussen p. 133).

যাহা অসৎ, অ-বস্তু, যাহা ব্রহ্মের বিবর্ত বা বিধা মাত্র, তাহার প্রতিপাদনের জন্য এত বাক্য ব্যয় করেন কেন? যখন মাথা নাই তখন মাথা ব্যথা কেন? অধ্যাপক ডয়সন্ এ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন—It is a concession to the empirical consciousness of man * * an unconscious (?) accomodation to the 'forms' of our intellectual capacity. অর্থাৎ, মানবের পঙ্গু চিত্তবৃত্তিকে চলৎ-শক্তি দিবার জন্য।

অধ্যাপক ডয়সনের উক্তি এই :—

The inquiring mind of man could not however rest here (উৎসুক নিপট অদ্বৈতে); and inspite of the *unreality* of the universe outside of the Atman, it proceeded to concern itself with the universe, as though it were real.—236.

পুনশ্চ—The sacred texts teach a creation of the universe only by way of concession to man's faculty of understanding. p. 185.

—এবং প্রমাণ স্বরূপ ডয়সন বাদরায়ণ, গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্যের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাদরায়ণের সূত্র এই—

তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪

অর্থাৎ, এই যে বিশ্বে ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত ভোক্তা ভোগ্যের বিভাগ—ইহা ব্যাবহারিক (pragmatic) মাত্র, পারমার্থিক নহে—ন তু অয়ং বিভাগঃ পরমার্থতঃ অস্তি। ইহা 'অভ্যুপগম' মাত্র—ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিৎ অস্তি। * * এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ সর্বে। * * সূত্র-কারোপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ 'তদনন্যত্বম্' ইত্যাহ, ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু 'স্যাৎ লোকবৎ' (ব্র, সূ, ২।১।১৩) ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি (শঙ্কর)

শারীরক-ভাষ্যের অন্যত্র আচার্য শঙ্করের আরও স্পষ্ট উক্তি এই :—

জগদুৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়-হেতুত্ব-শ্রুতেঃ অনেকশক্তিত্বম্ ব্রহ্মণ ইতি চেৎ ন। বিশেষ নিরাকরণ-শ্রুতীনাম্ অনন্যার্থত্বাৎ। উৎপত্ত্যাদি শ্রুতীনামপি সমানম্ অনন্যার্থত্বম্ ইতি চেৎ ন তাসাম্ একত্ব-প্রতিপাদন-পরত্বাৎ। মৃদাদি দৃষ্টান্তৈর্হি সতো ব্রহ্মণ একস্য সত্যত্বম্, বিকারস্য চ অনৃতত্বং প্রতিপাদয়ৎ শাস্ত্রং ন উৎপত্ত্যাদিপরং ভবিতুম্ অর্হতি।

—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।১৪ সূত্রের ভাষ্য।

অর্থাৎ, "ব্রহ্মকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু বলাতে তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে বিবিধ শক্তিমান্ বলা হয় না, কারণ অন্যত্র শ্রুতি তাঁহার সবিশেষত্ব নিরাকরণ করিয়াছেন।

সে সকল শ্রুতি-বাক্যের কি গতি হইবে ? যদি বল, সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্বন্ধীয় শ্রুতিরই বা কি গতি হইবে ? তাহার উত্তরে বলি, তাহারা ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ; ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে যে মৃত্তিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে একমাত্র সৎ ব্রহ্মই সত্য এবং অন্য সমস্ত বিকার অর্থাৎ জড়-জগৎ অসত্য। অতএব এ সকল শ্রুতির দ্বারা জগতের বাস্তবিক সৃষ্টি স্থিতি লয় উপদিষ্ট হয় নাই।"

ইহার ভাবার্থ এই যে, অ-তত্ত্বজ্ঞানীর ব্রহ্মতত্ত্বে বুদ্ধি-প্রবেশের জন্য এই সকল উপদেশের অবতারণা। এ সম্বন্ধে শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য মাণ্ডূক্য-কারিকায় আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন,—

মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥—৩।১৫

অর্থাৎ, "উপনিষদে যে মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের সৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় মাত্র। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা নানাত্ব উপদিষ্ট হয় নাই।" কারিকার অন্যত্র গৌড়পাদ বলিয়াছেন,—

বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥—১।১৮

অর্থাৎ, "শিষ্যের উপদেশের জন্যই সৃষ্টিবিষয়ে উপদেশ কল্পিত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানের পর তাহা নিবৃত্ত হইবে, তখন আর কোন দ্বৈতই থাকিবে না।"

মোট কথা এই—উপনিষদের ঋষিরা 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এই বলিয়া যখন 'ইদং'কে স্বীকার করিলেন, তখনই দ্বৈতকে প্রশ্রয় দেওয়া হইল। একবার প্রশ্রয় দিলে আর কি রক্ষা আছে ? আমরা জানি কুকুরকে 'নাই' দিলে সে মাথায় চড়িয়া বসে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল॥

More and more far-reaching concessions were made to the empirical consciousness of the reality of the universe that could never be entirely cast off ; and then the universe disowned by the fundamental idealistic view of the sole reality of the Atman was yet again partially rehabilitated. —Deussen p 161.

এইরূপে জগতের আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকৃত হইলে, ঋষিরা ইহাকে 'সত্য' বলিতে আরম্ভ করিলেন—

যদ্ ইদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্ আচক্ষতে—তৈত্তি, ২।৬

অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্—মুণ্ডক, ১।১।৮

'অন্ন (অব্যাকৃত) হইতে প্রাণ, মনঃ ও 'সত্যে''র আবির্ভাব হইল ? সত্য কি ? সত্যাখ্যম্ আকাশাদি-ভূতপঞ্চকম্ (শঙ্কর)।

আদিতে ব্রহ্মের নাম ছিল 'সত্য'।

তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্ ইতি—ছা, ৮।৩।৪

তৎ সত্যং স আত্মা—ছা, ৬।৮।৭

কিন্তু এখন জগতের সত্যতা হইতে ব্রহ্মের সত্যতা বিশেষিত করিবার জন্য তাঁহার নাম হইল 'সত্যস্য সত্যম্'—

তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যম্—বৃহ, ২।১।২০

This was the case already in the definition of Brahman as সত্যস্য সত্যং ('the reality of reality'). The universe is reality (সত্যম্) but the real in it is Brahman alone.—Deussen, p 162.

সঙ্গে সঙ্গে যদিও ব্রহ্ম দেশকাল ও নিমিত্তাতীত—তথাপি making a further concession to the empirical consciousness ব্রহ্মকে বিশ্বের কারণ এবং বিশ্বকে ব্রহ্মের কার্য বলা হইতে লাগিল—

A causal relation was framed between the Atman as first cause and the universe as its effect and a theory was formulated to explain how the universe as effect had proceeded from or been created by the Atman. (Deussen, p 184).

তখন ব্রহ্ম 'ভূতযোনি' হইলেন—

তদ্ অব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—মুণ্ডক ১।১।৬

শুধু ভূতয়োনি কেন – ব্রহ্ম ভূত-নিধানও হইলেন।

তস্মিন্ ইদং সং চ বি চৈতি সর্বম্—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩২।৮

'বিশ্বের তাঁহা হইতে জনন এবং বিশ্বের তাঁহাতেই নিধন'—

এক কথায় তিনি 'প্রভবাপ্যয়ৌহি ভূতানাম্' (মাণ্ডুক্য, ১।৬) হইলেন। অধিকন্তু তিনি 'তজ্জলান্' হইলেন—'সৃজন পালন লয়—তাঁহা হতে সমুদয়।'

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎ ব্রহ্ম —তৈত্তিরীয়, ৩।১

—এবং আমরা ঋষিদিগের মুখে শুনিলাম, ব্রহ্ম জড় সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ—তৈত্তি, ২।৬

অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য—ছা, ৬।৩।২

এ সকল কথার আমরা যথাস্থানে সম্প্রসারণ করিব। কিন্তু এই জড়তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠক যেন সর্বদা উপনিষদের নিপট অদ্বৈতবাদের (uncompromising Idealism-এর) কথা স্মরণে রাখেন। নহিলে তাঁহার বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ধাঁধা

কয়েকটা বছর ক্রমাগত আশ্চর্য্য হ'য়ে হ'য়ে ঠিক সমাধানের সামনে এসে অতুল খেল একটা ধাক্কা। তারপর বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠে যেই আবার নতুন ক'রে আশ্চর্য্য হ'তে যাচ্ছে, সামনে তাকিয়ে দেখল, সমস্ত পরিষ্কার। বিনতা দেবী প্রবোধবাবুকে ভালবাসেন। তাঁর ব্যাগে ওঁর ফটো।

মাত্র চকিতের জন্য। তারপরই সচেতন হ'য়ে কাগজপত্রের মধ্যে ফটোখানিকে মিশিয়ে ফেললেন বিনতা দেবী। কিন্তু অতুলের চোখকে নাকি ফাঁকি দেওয়া কিছু শক্ত, ওর মধ্যেই চিনে ফেলেছে বস্তুটীকে। তাই বিনতা দেবী যখন তার মনের দিঙ্‌নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ঈষৎ হাসির সঙ্গে কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'কত আজে-বাজে জিনিস জমেছে দেখেছ?' তখন সে-হাওয়ায় গা' না-ভাসিয়ে অন্য দিকে চেয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল।

বিনতা দেবী হাসলেন। এদিকে না-চেয়েও সেটা বুঝতে পারল অতুল। মনস্তত্ত্বের সাহায্যে নয়, হাসির সময় শব্দ হয়েছিল। অথবা, হঠাৎ অতুলের মনে হ'ল, হয়ত বিনতা দেবী হাসতে চাননি; চেয়েছেন কেবল মাত্র এইটে জানাতে যে, তার বর্ত্তমান ব্যবহার হাস্যকর; নাহ'লে হাসবার সময় শব্দ করবার কোনো মানে হয় না, বিশেষত বর্ত্তমান অবস্থায়, যখন নিঃশব্দে হাসলে অতুলের তা জানবার উপায় ছিল না। ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঠিক বিনতা দেবীর মুখোমুখী ব'সে চোখ বুজে জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল অতুল।

ব্যাগ বন্ধ ক'রে একটুক্ষণ কী ভেবে, আবার হাসলেন বিনতা দেবী। কিন্তু এবার আর শব্দ ক'রে নয়। অতুলের চোখ বন্ধ; সুতরাং সে জানতে পারল না।

* * *

কী ক'রে প্রথমে আলাপ হ'য়েছিল, মনে নেই। বিনতা দেবী ছিলেন নবীনা হেড্‌ মিষ্ট্রেস, আর অতুল ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। কী ক'রে যেন হঠাৎ

আলাপ হ'য়ে গেল ; যতদূর মনে হয় জায়গাটা ছিল কোনো রাজনৈতিক সভা ; আর, তারপর থেকে গোটা পাঁচটি বছর যখনই দেখেছে তাঁকে অতুল আশ্চর্য্য না হ'য়ে পারে নি। পাঁচ বছরের প্রাণপাত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে একটা চলনসই ধারণা পর্য্যন্ত সে খাড়া করতে পারল না। এবং এরই ফলে তার নিজের জীবনের যে-অংশটা বিনতা দেবীর সঙ্গে জড়িত হ'য়ে উঠছিল, সেটাও র'য়ে গেল অনাবিষ্কৃত। সেইটেই পীড়া দিত তাকে।

অবশ্য একথাটা প্রথমেই ব'লে নেওয়া ভাল যে কলেজ জীবনের পাশাপাশি একটা রাজনৈতিক জীবনও অতুলের ছিল। সেই সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা হয় তার প্রবোধবাবুর সঙ্গে, যিনি ছিলেন তৎকালীন ছাত্রনেতাদের অন্যতম। রোগা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, গায়ের রঙ তামাটে, বিরলকেশ প্রশস্ত ললাটের নিচে চোখ দুটো বড়-বড় : দেখলে ভক্তির চেয়ে মমতা হয় বেশী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বেড়া ডিঙিয়ে তিনি তখন হাইকোর্টের উকিল-জীবনের শিক্ষানবীশ। মা বাবা আর বোনকে নিয়ে তাঁর যে ছোট্ট সংসার, তার ব্যয়সঙ্কুলান হয় অধ্যাপক পিতার সামান্য পেন্‌সনে। নবীন ছাত্রকর্ম্মীদের ছিল সেখানে অবারিত দ্বার।

একদিন সন্ধ্যার পর কী একটা কাজে সিঁড়ি বেয়ে সোজা প্রবোধবাবুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল অতুল। ভেতর থেকে কথা ভেসে এল, 'শরীরের দিকে একটু তাকাও। এমন করলে আর বাঁচবে ক'দিন ?'—কণ্ঠস্বর পরিচিত। তথাপি ঘরের ভেতর ঢুকে অতুল আশ্চর্য্য হল : আরাম-কেদারায় শায়িত প্রবোধবাবুর পাশে মোড়ায় উপবিষ্ট বিনতা দেবী।

'এস অতুল।' তাকে দেখতে পেয়ে মোড়া থেকে না-উঠে বললেন বিনতা দেবী।

অতুলের মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। সন্দেহ জিনিসটা তার আসে না কিন্তু, তবু কেন জানি নে, এদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখে মনে মনে সে খুশী হ'ল। আরেকটা মোড়া টেনে অদূরে ব'সে জিজ্ঞাসা করল, 'শরীর অসুস্থ নাকি প্রবোধ দা ?'

কপালে হাত বুলিয়ে প্রবোধবাবু বললেন, 'না, এই একটু সর্দ্দি মত হয়েছে। খবর কি ?'

একখানা চিঠি ছিল, অতুল পকেট থেকে বের ক'রে তাঁর হাতে দিল। চিঠিখানা না-প'ড়ে বিনতা দেবীর হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'বস, চা দিতে বলি।'

অতুল মনে মনে পুনরায় খুশী হ'য়ে ভাবল, ওঁর চিঠিটা পর্য্যন্ত ইনি আগে দেখবার অধিকারিণী। কিন্তু আশ্চর্য্য, প্রবোধবাবু বেরিয়ে যেতে-না-যেতেই ঈষৎ হাসির সঙ্গে বিনতা দেবী তার দিকে চেয়ে বললেন, 'চশমা না থাকলে দেখছি রাত্তিরে কিছুই দেখতে পান না। চিঠি তো ওঁরই নামে।' ব'লে অক্ষতদেহ লেফাফাটিকে পাশের টিপয়ের ওপর রাখলেন।

তারপর কিছুক্ষণ নীরবে চা-পানের পর যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল অতুল। বেশীক্ষণ এখানে থাকা যেন তার কাছে কেমন অনুচিত ব'লে মনে হ'ল। বলল, 'কাল তবে আপনার আর মিটিঙে গিয়ে কাজ নেই প্রবোধ দা। সেই কথাই ওদের বলি গে।'

প্রবোধবাবু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কিন্তু বিনতা দেবীর কোনো ভাব পরিবর্ত্তন হ'ল না, ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি হাল্‌কা সুরে বললেন, 'না না, তা কেন? মিটিঙে নিশ্চয়ই যেতে হবে ওঁকে।'

অথচ ইনিই নাকি ঘণ্টা খানেক আগে শরীর সম্বন্ধে লক্ষ্যবান হ'তে উপদেশ দিচ্ছিলেন। অতুল গোলমেলে মন নিয়ে তাঁর পিছু-পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে পথ ধরল; এবং পথেও এই বিষয় নিয়েই মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কিন্তু কোনো দিকেই যখন স্বাভাবিক উপায়ে কোনো পথ মিলল না তখন মনস্তত্ত্বের শরণ নিয়ে এই ভাবে ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করল যে, প্রবোধবাবুর সম্বন্ধে বিনতা দেবীর মন এত সজাগ যাতে তিনি একটা দিন সভায় না যাবার জন্যও যতটুকু গুরুত্বভ্রষ্ট হন ততটুকু পর্য্যন্ত ক্ষতি তিনি সহ্য করতে পারেন না,—সামান্য শারীরিক ক্লেশ একেবারেই নগণ্য। খুশী হ'য়ে তাঁর সঙ্গে সে এসে বাস্‌-ষ্টপের কাছে দাঁড়াল।

বাসে উঠে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও তিনিই টিকিট কাটলেন দুজনের। বললেন, 'উনি থাকলে তো উনিই কাটতেন টিকিট; আর তাতে তোমাদের কোনো আপত্তিই হ'ত না। আমার বেলায় কি তবে আপত্তিটা মেয়েমানুষ ব'লে?'

উত্তর না দিয়ে বাইরে চোখ ফেরাল অতুল। ভেবে পেল না, ইনি প্রবোধবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী কিনা, এবং তাই যদি হয় তবে তার ইতিপূর্ব্বের মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত কতখানি সত্য।

এর কিছুদিন পর বিনতা দেবীর বাসায় গিয়ে অতুল দেখল, খাটের উপর হেলান দিয়ে কী একটা বইয়ের পাতা ওল্‌টাচ্ছেন প্রবোধবাবু, আর মেঝেয় ষ্টোভ জ্বেলে চা করছেন গৃহকর্ত্রী। বাসায় অন্য প্রাণী নেই; তাঁর যে ভাইপো এখানে থেকে ইস্কুলে পড়ে, খোঁজ নিয়ে জানা গেল ক্রিকেট-খেলা দেখতে গেছে সে। খবর জানিয়ে ঈষৎ হাসির সঙ্গে বিনতা দেবী বললেন, 'ওটার পড়াশোনা কিছু হবে না। এবারও ফেল করবে। আর করবেই বা না কেন, আমি তো আর ওকে পড়াবার জন্য আনি নি, এনেছি নিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। কী বল?'

কথাটা মিথ্যে নয়। বলতে গেলে খোকাই তাঁর পুরুষ অভিভাবক। তারই ভরসায় বাসা ভাড়া ক'রে আছেন। অতুল বলল, 'তা বটে। তবে মুস্কিল এই যে, তোমার বাসা আবার মানুষ ছাড়া হয় না কিনা। ও' বেচারা নিরালায় অভিভাবকগিরি করবার সুযোগই পায় না।'

চা ঢালতে ঢালতে বিনতা দেবী বললেন, 'মোটেও ভেব না তা। দশটার পর বাড়ী একেবারে সাফ। তখন সারারাত আমি আর ও'।...কাল রাতে ইস্কুলের কয়েকটা খাতাপত্র দেখছি, আদুল গায়ে বিছানা থেকে উঠে এসে বলল, রাত জাগলে তোমার শরীর কিন্তু খারাপ হ'য়ে যাবে পিসী।...পারবে তোমরা এ রকম শাসন করতে?'—ব'লে এক কাপ চা অতুলের হাতে দিলেন।

তারপর প্রবোধবাবুকে আরেকটা কাপ ধ'রে দিয়ে উঠে বললেন, 'দাঁড়াও অতুল, শুধু চা খায় না। ডালমুটের বয়ামটা আনি।'

বিনতাদেবী পাশের ঘরে চলে যেতে অতুল বলল, 'অদ্ভুত চা বানান, কিন্তু, না?'

'কে ?' না-ভেবেচিন্তে জিজ্ঞাসা করলেন প্রবোধবাবু। তারপর বুঝতে পেরে একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আরেকটু মিষ্টি দিলে আরো ভাল হ'ত !'

'তার চেয়ে বরং সরবৎ গরম ক'রে খেলেই হয় !'—বলতে বলতে ঘরে ঢুকে বিনতা দেবী প্লেটে ক'রে ডালমুট এগিয়ে দিলেন অতুলের দিকে।

'ওঁকে দিলে না ?' প্রবোধবাবুকে দেখিয়ে অতুল বলল।

কপালে ভুরু তুলে বিনতা দেবী বললেন 'বাবা, নরঘাতিকা হব না কি ! যে আমার লিভার, ডালমুট আর খায় না।' ব'লে নিজের জন্য চা ঢেলে চুমুক দিলেন।

'ও তোমার মিথ্যে নয় বিনা দি, সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম, খিদিরপুরের এক টিনের চেয়ারওয়ালা রেস্তরাঁয় আস্ত তিনটি কাটলেট খেলেন প্রবোধ দা। তার চেয়েও কি তোমার ডালমুট গুরুপাক ?'

শুনে খিল্‌খিল ক'রে রীতিমত ছেলেমানুষের মত হেসে উঠলেন বিনতা দেবী। বল্‌লেন, 'তাই তো ? জিজ্ঞাসা কর ওঁকে, রাত্তিরে কতক্ষণ গরম জলের ব্যাগ্‌ চেপে রাখতে হয়েছিল পেটে !'

'সত্যি ?' অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল অতুল।

মাথা নেড়ে প্রবোধবাবু বললেন, হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে হাসলেন।

'কিন্তু তুমি কি ক'রে জানলে ? বলেছিলেন বুঝি ?' বিনতা দেবীর দিকে চেয়ে বলল অতুল।

'তা তো বটেই। নিজে ব'সে থেকে সেঁক দিয়েছিলাম কি না !'

'ও।' খুশী হ'য়ে অতুল আরো এক চাম্‌চে ডালমুট তুলে নিল।

প্রবোধবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর জানালার কাছে কিছুক্ষণ পায়চারী ক'রে বারান্দায় গেলেন।

অতুল বলল, 'আমার মাঝে মাঝে কি ইচ্ছে হয় জানো বিনা দি, মেস ছেড়ে তোমার এখানে এসে উঠি, তারপর কাজের অবকাশে সারা সময় ধ'রে আড্ডা জমাই,—আমি, তুমি, আর প্রবোধ দা। বেশ হয়, না ?'

'রোমান্টিক ছেলে !···ব'লে দেখো ওঁকে,' বিনতা দেবী মিটিমিটি হেসে বললেন, 'প্রথমটুকুর জন্যে আমি প্রস্তুত আছি। ইচ্ছে করলেই তুমি আমার এখানে চলে আসতে পার।'

'ওঁকে আর বলব কি? আমরা থাকলেই উনি আসবেন!'

'মনে হয় না। আর যদিও বা আসেন, আড্ডা জমবে না। আড্ডা উনি দিতে জানেন না।'

'না, জানেন না আবার! এই তো দিব্যি আড্ডা দিচ্ছিলেন!'

'কিন্তু কটা কথা ব'লেছেন?'

'তা বটে!' অতুল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'গেলেন কোথায়?'

'বাসায়।'

'তার মানে? চুপ ক'রে চ'লে গেলেন?'

'চুপ ক'রে যাবেন কেন?' বিনতা দেবী সরলভাবে হেসে বললেন, 'তোমার সামনে দিয়েই তো গেলেন, দেখতে পাও নি?'

অর্থাৎ সে না জানলেও, বিনতা দেবী জানতেন। এবং সেটা জানা সত্বেও নির্ব্বিকারভাবে তার সঙ্গে এতক্ষণ ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতার আমেজে আড্ডা দিচ্ছিলেন। অতুল শুধু বলল, 'ও!' কিন্তু এবার আর সঙ্গে সঙ্গে চামচে দিয়ে ডালমুট তুলে নিল না, চামচেটা রেখে দিল প্লেটের ওপর আড় ক'রে। তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

পরের কয়েকটা বছরের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য নয়। সময়ের আবর্ত্তনে যদিও অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে, তবুও এ গল্পের দিক থেকে সেগুলোকে অবজ্ঞা করলেও কিছু এসে যায় না। অতুলের মন বিনতা দেবীর ব্যবহারের কোনো নতুন অর্থ খুঁজে পায় নি; অনায়াসে ওপরের ঘটনার সঙ্গে নিচের ঘটনাকে জুড়ে দেওয়া যায়।

অবশ্য ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছিল যা উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর ম্যাজমেজে ঝিমুনীর পর হঠাৎ এই সময়টাই দেশের জাতীয় জীবনে একটা উদ্দামতার আভাস পাওয়া গেল। ছোঁওয়া লাগল তার ছাত্রসমাজেও; এবং প্রবোধবাবু তো বটেই, ভূতপূর্ব্ব ছাত্রকর্ম্মী হিসেবে অতুলও সে স্রোতের আবর্ত্তের মধ্যে এসে পড়ল।

প্রথমে ক'টা দিন আর নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্য্যন্ত ছিল না। আজ মিটিঙ, কাল ডিমনস্ট্রেশান, তারপরের দিন হয়ত ষ্ট্রাইক; এখানে ছেলেরা গোলযোগ পাকিয়েছে, ওখানে হয়ত স্থরু হ'য়েছে দল-ভাঙাভাঙি, আরেকটা জায়গায় হয়ত হ'য়ে গেল মৃদু যষ্টিচালনা। সে যে কী উত্তেজনা তা ব'লে বোঝানো কঠিন।

তারপর স্থরু হ'ল ধরপাকড়। আন্দোলনের স্রোতে পড়ল ভাঁটা। স্বাভাবিক প্রকাশে বাধা পেয়ে নেতারা হয়ে পড়লেন অন্তঃশীল।

ঠিক এই সময়টায়।

রাত প্রায় এগারোটার সময় বিনতা দেবীর বাসায় এসে অতুল কড়া নাড়ল। ভোরের দিকে হয়ত' মেসে সার্চ্চ হ'তে পারে। জরুরী কয়টা চিঠিপত্র সরিয়ে রাখতে চায় তাই।

বিনতা দেবী দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'আবার রাত ক'রে বেরিয়েছ? একটা কথাও কি শুনতে নেই?'

'কি করব? কাল হয়ত ওরা এসে পড়বে, জিনিসগুলো মারা পড়বে মাঝ থেকে।' ব'লে কাগজে মোড়া প্যাকেটটা তাঁর হাতে দিয়ে বলল, 'রাখ।'

'রাখছি। তুমি ঘরে ওঠ। খাওয়া হয়েছে তোমার?'

'না, ফিরে গিয়ে সে,...আরে, আপনি কতক্ষণ?' বলতে বলতে অতুল ঘরের মধ্যে এগিয়ে গেল।

আহারে বসেছেন প্রবোধবাবু। রুক্ষ চুল, প্রশস্ত কপালে কয়েকটা কুঞ্চন-রেখা। হেসে বললেন, 'খিদের তাড়ায় চ'লে এলাম। বাড়ীতে গেলে শুধু শুনতে হ'ত মা'র কান্না আর দীর্ঘশ্বাস। তুমিও ব'সে পড় না?...আর চারটে ভাত পাওয়া যাবে?'

বিনতা দেবী ভাত দিলেন। তারপর পাশে জায়গা ক'রে অতুলকেও খাবার বেড়ে দিলেন।

খেতে খেতে অতুল বলল, 'জানো বিনা দি, প্রবোধ দা'র ধারণা, উনি খুব বুদ্ধিমান লোক। তাই সেদিন বলছিলেন।'

বিনতা দেবী হেসে বললেন, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ সেদিন বিশ্বাস করি নি'। আজ স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস হ'ল।'

'কি রকম ?'

'এই যেমন মা কাঁদেন ব'লে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ান।... তোমার হাতের রান্নাটা যে বিশেষ লোভনীয় জিনিস, সে কথাটা উনি বেমালুম চেপে যেতে চান।'—ব'লে অতুল হা হা ক'রে হাসতে লাগল।

প্রবোধবাবু কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

বিনতা দেবী তার সে-হাসিতে যোগ দিলেন না। তথাপি মুখখানা যথা-সম্ভব হাসি-হাসি ক'রে বললেন, 'বোকা মানুষের নিয়মই যে অমনি! যারা সত্যিই বুদ্ধিমান তারা নিজের বুদ্ধির মাপই করতে পারে না, মাঝারি ধরণের বুদ্ধিমানেরাই শুধু বুঝতে পারে তারা বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা প্রায়ই বোকামী করে।'

কথাটার তাৎপর্য্য যা-ই হোক, উদ্দেশ্য যে শ্লেষ, এবং তার সবখানি যে প্রবোধবাবুর ওপর বর্ষিত হ'য়েছে অতুল তা স্পষ্ট বুঝতে পারে। আর, সে-ই এ প্রসঙ্গের উত্থাপক, এ কথা মনে ক'রে তার মাথা কেমন যেন থালার দিকে ঝুঁকে এল।...

নিরুত্তরে খাওয়া শেষ ক'রে প্রবোধবাবু হাত মুখ ধুয়ে বললেন, 'রাত বারোটা তো বাজল। বাড়ী যাওয়াই এখন এক হাঙ্গামা।'

আশেপাশেই হয়ত কারো জাগ্রত চক্ষু শিকারের সন্ধানে অপেক্ষা করছে, এত রাত্রে পথে বিচরণ করবার বিপদটা হৃদয়ঙ্গম করতে অতুলের দেরী হ'ল না। এ অবস্থায় একেবারে কঠিন হৃদয় না হ'লে কেউ কাউকে ছাড়তে পারে না,—প্রবোধবাবু যে এ রাত্রের মত এইখানেই র'য়ে গেলেন সে বিষয়ে আর অতুলের মনে সন্দেহমাত্র রইল না।

কিন্তু, বিনতা দেবী বললেন, 'যেকালে বেঁচে থাকাটাই একটা মহা হাঙ্গামা, তখন আর এসব ছোটখাট হাঙ্গামাকে স্বীকার না ক'রে উপায় কি?'

আহত হ'য়ে অতুল বলল, 'তুমি হয়ত ঠিক বুঝতে পারছ না বিনু দি, প্রবোধ দা'র যাওয়া এখন উচিত নয়।'

'কেন বল তো? ধরা পড়তে পারেন ব'লে? উনি তো আর আত্মগোপন করেন নি, ধরবার ইচ্ছে থাকলে তো যে কোনো সময়েই ওঁকে ধরা যায়। নয় কি?'

শেষের প্রশ্নটা ছিল প্রবোধবাবুর উদ্দেশ্যে। একটু আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে তিনি বললেন, 'তা বটে। কিন্তু খেয়ে-দেয়ে আর নড়তে ইচ্ছে করছে না।'

হেসে উঠে বিনতা দেবী বললেন, 'রিক্সা ডাক তাহ'লে।'

প্রবোধ বাবুও হাসলেন। তারপর আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অতুলের মনের ওপর কিন্তু ঘটনাটা অত সহজে গড়িয়ে গেল না। আশ্চর্য্য হ'য়ে সে ভাবতে লাগল, এই রান্না ক'রে খাওয়ানো এবং নির্দ্দয়ভাবে বাড়ী থেকে বিদায় দেবার মধ্যে যোগ কোথায়? তবে কি মনে করতে হবে, বিনতা দেবী পাগল, ব্যবহার পরম্পরায় সামঞ্জস্য রক্ষা করবার কোনো দায়িত্বই তাঁর নেই?

ব্যথিত, অপ্রসন্ন মনে আহারশেষে যাবার জন্যে তৈরী হ'ল অতুল। বিনতা দেবী আন্তরিক বিস্মিত হ'য়ে বললেন, 'যাচ্ছো কোথায়? ভোরে না সার্চ্চ হবে তোমার মেসে?'

আঘাত দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারল না অতুল। বলল, 'তা আর কি, আমি তো আর আত্মগোপন ক'রে নেই। দেখেশুনে আপত্তিজনক কিছু পেলে কাল না হোক পরশুই ধরতে পারবে।'

'যা-যাঃ, ফাজলামী করতে হবে না। যা বলছি তাই শোনো।'—বিনতা দেবী তার হাত থেকে জামা কেড়ে নিলেন।

তল্লাসের সময় উপস্থিত থাকবার হাঙ্গামা অনেক। মনে মনে যারপরনাই বেঁচে গিয়ে অতুল এসে বিছানার ওপর ব'সে পড়ল। এবং অধিকতর আশ্চর্য্যের সঙ্গে ভাবতে লাগল, এত সহানুভূতিশীল যার বিবেচনা, পাগলই বা তাকে বলা যায় কী ক'রে? অথচ···!

ব'সে থাকতে থাকতে অনেকক্ষণ পর হঠাৎ তার মনে হ'ল, সমস্ত ব্যাপারটার অন্য রকম ব্যাখ্যা করাও কঠিন নয়। বিনতাদেবী যে সবকিছুর গুরুত্ব বোঝা সত্ত্বেও প্রবোধবাবুকে যেতে বাধ্য করলেন, আর অতুলকে রাখলেন ধ'রে, এর এ রকম মানে হওয়াও বিচিত্র নয় যে, প্রবোধবাবুর চেয়ে অতুলকে তিনি ছোট মনে করেন, তাঁকে তাই বিপদ বরণের বৈশিষ্ট্য দিয়ে এ'কে ক'রে রাখলেন সাধারণ, এ'র থেকে যাতে তাঁকে মহিমাময় মনে করা

যায়, সেই কামনায়।—সঙ্গে সঙ্গেই মনে এল তার খুশী, গলায় এল গুন্‌গুনিয়ে গান, তারপরেই জ্বলল সিগারেট।

শোবার পর ওপাশের শয্যা থেকে বিনতাদেবী বললেন 'তুমি একটা আস্ত বোকা, অতুল।'

'কেন?'—বোকার মতই প্রশ্ন করে অতুল।

'না হ'লে ওঁকে আবার থাকতে বলছিলে কেন এখানে? পিণ্টুটা যে আমার সমস্ত আশঙ্কাকে জব্দ ক'রে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে এবার দেখে গিয়ে ব'সেছে তা তো তুমি জানতে বাপু?

'তাতে কী হ'য়েছে?' অতুল উত্তরোত্তর অবাক হ'তে থাকে।

'হ'য়েছে এই যে, আমি এখন অভিভাবকহীন। সুতরাং বয়স্ক পুরুষ মানুষকে আশ্রয় দেবার অযোগ্য। বুঝলে?'

'ও।' বোকার মত উচ্চারণ করল অতুল। এতটা তলিয়ে বেচারা ভাবতে পারে নি।

কিন্তু, এ কথাটা এত ঘটা ক'রে তাকে জানানোর অর্থ কী? বিনতাদেবীর কাছে প্রবোধ বাবুর চেয়ে সে কম ভয়ের বস্তু এইটে জানানো (অর্থাৎ তাঁর চেয়ে তাকে বেশী আপন জ্ঞান করেন,) না, কেবল একটা চাল মাত্র,—তার দিক থেকে যাতে কোনো বিপদ না ঘটে আগ্-বাড়িয়ে আস্থা দেখিয়ে তারই মুখ মেরে দেওয়া?···মশারীর জালির মধ্যে দিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল সে।

পরদিন সন্ধ্যার পর খবর পাওয়া গেল, ভোরে নাকি কর্তৃপক্ষ ফতোয়া জারী ক'রেছেন, চব্বিশঘণ্টার মধ্যে প্রবোধ বাবুকে শহরের এলাকা ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। শুনে হঠাৎ যেন কী ক'রে অতুলের মনে হ'ল, কাল অমন ক'রে বাড়ী থেকে বিদায় দেবার সঙ্গে, বিনতাদেবীর ঐ হৃদয়হীনতার সঙ্গে, কোথায় যেন এ ব্যাপারটার যোগ আছে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই কেমন

একটা বিতৃষ্ণার ভাব এল তার মনে,—এই যদি ভালবাসা হয়, তবে এ রাক্ষসের ভালবাসা, মানুষের এতে কল্যাণ নেই।

কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, প্রবোধবাবুর ঘরে ঢুকে অন্ধকারে যেই সুইচ টিপেছে অমনি চোখে পড়ল এক অচিন্তনীয় দৃশ্য,—প্রবোধবাবু শুয়ে আছেন বিনতা-দেবীর কোলে, আর উনি ঝুঁকে প'ড়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন তাঁর।

অতুলকে দেখে অল্প ন'ড়ে শুয়ে প্রবোধবাবু বললেন, 'এস। শুনেছ বোধহয়?'

'হ্যাঁ।' অতুল একটা মোড়া টেনে ব'সে একটু থেমে বলল, 'কখন যাচ্ছেন?'

'সাড়ে দশটায়। নর্থ বেঙ্গলে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মাথা উঁচু ক'রে বিনতাদেবী বললেন, 'মাথাটা ছেড়েছে তো? ওঠ এইবার, সময় হ'ল।' একটু থেমে হালকা হাসির সঙ্গে আবার বললেন, 'কেমন দেখাচ্ছে অতুল বল তো? ঠিক যেন একটা খাঁটি-খাঁটি বিচ্ছেদের ছবি, নয়? সিনেমায় তুলবার উপযুক্ত।'

অতুল সহসা একবার হোঁচট খেয়ে কেঁপে উঠল। তারপর ফাঁকা চোখে চেয়ে রইল দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে। আশ্চর্য্য!

ষ্টেশানে গিয়ে হঠাৎ একটা ফুলের তোড়া বের ক'রে প্রবোধবাবুর হাতে গুঁজে দিলেন বিনতাদেবী। বললেন, 'বিখ্যাত হবার প্রথম ধাপে এই রইল পুরস্কার। কবে যে তোমার নামে জিন্দাবাদ দিয়ে ষ্টেশনে ফটো তোলবার অবস্থা ঘটাব, তাই ভাবছি। যাক এইবার গাড়ীতে ওঠ, আর দুমিনিটও নেই।'

ঘণ্টা পড়ল।

গার্ড নিশান দেখালো।

গাড়ীতে মোশান দিল। হঠাৎ বিনতাদেবী ব্যস্ত হ'য়ে বলে উঠলেন,

'ও হো অতুল, কী করি ? চট্ ক'রে উঠে পড় তো ট্রেণে। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি ওঁকে। ব্যারাকপুরে গিয়ে না হয় নেমে পড়ব। ওঠো !'

আধঘণ্টা সময় যে মুখের সাহায্য না নিয়ে কী কথা হ'ল তা অতুল জানে না, কিন্তু ওদিকের বেঞ্চ থেকে সে দুজনকে কেবল বাইরে মুখ ফিরিয়ে ব'সে থাকতেই দেখতে পেল। এবং দেখতে পেয়ে বিরক্তের বদলে খুশীই হ'ল। মন যখন বেদনায় পরিপূর্ণ, ভাষা তখন মূক। আজ আর তার কোনো সন্দেহই রইল না, বিনতাদেবী নিশ্চয়ই ভালবাসেন ওঁকে। নইলে এই বিধুর আন্তরিকতার অর্থ কী ?......

ব্যারাকপুরে তাদের দুজনকে নামিয়ে দিয়ে ট্রেণ আবার ছুটল। বিনতা দেবী বললেন, 'শেষ রাত্রের আগে আর ট্রেণ নেই। ওয়েটিং রুমে চলো।'

ষ্টেশান মাষ্টারকে বলতে উঁচুশ্রেণীর বিশ্রামাগারের দখল দিয়ে গেল। মশা তাড়িয়ে তারই মধ্যে এসে বিনতাদেবীর সঙ্গে অতুল বসল।

সময় আর কাটে না। তারপর আবার সদ্যপ্রিয়বিরহিত সময়। তথাপি অনেকদিন পর মনে একটা শান্তি পেয়েছে অতুল, বসে বসে তাই নিবিষ্ট মনে সিগারেট ধরাল।

হঠাৎ হাই তুলে বিনতাদেবী বললেন, 'এক-একটা লোক এমন যে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়।'

আরেকটু হ'লেই অতুলের হাত থেকে সিগারেটা পড়ে যেত আর কি। কিন্তু বিস্ময় চাপা রেখে সে সন্তর্পণে প্রশ্ন করল, 'কী রকম ?'

'এই যেমন ধর, তোমাদের প্রবোধদা। দেখলেই কেমন ইর্ষে হয়। না ?' —বলে আবার হাই তুলে খোঁপা ঠিক করলেন বিনতাদেবী।

অতুল বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। তারপর ভীষণ রেগে উঠে জিজ্ঞাসা করল সোজাসুজি. 'তবে কি তুমি বলতে চাও, প্রবোধদাকে তুমি ভালবাস না ?'

'কই আর বাসলাম !' নিরীহ নিস্তেজ গলায় উত্তর দিলেন বিনতাদেবী, ভালবাসলে কি আর এইভাবে আজ ছেড়ে দিতে পারতাম ? তুমিই বল ?'

'হ্যাঁঃ, ছেড়ে আবার দিতে না ? তোমার ইচ্ছেয় কি না ?'

'তা নয় বটে ! কিন্তু ভেবে দেখ, কত বছর আমার চাকরী হ'ল, টাকাও

জমিয়েছি কিছু,—ওঁকে আটকানোর মত ব্যবস্থা হয়ত করতে পারতাম অনেক আগেই, নয় কি ?'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল অতুল। তারপর পূর্ব্ব সূত্র ধ'রে অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী, করতে কী, শুনি ?

'বিয়ে।'—ব'লে বিনতাদেবী উঠে গিয়ে ফ্যানটা খুলে দিলেন। বললেন, 'মশা কম লাগবে। তুমি বরং আমার এই চাদরটা ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে বস।'

অতুল চাদর নিল না। মনে অশান্তি পুষে গুম্ হয়ে ব'সে রইল।

কতক্ষণ পরে বলা কঠিন, হঠাৎ এদিকে চোখ ফিরিয়েই দেখতে পেল, বিনতাদেবীর ব্যাগে প্রবোধ বাবুর ফটো।

'যত আজে-বাজে জিনিস জমেছে দেখেছ ?' সামান্য একটু হেসে নিয়ে বললেন বিনতাদেবী।

কোনো জবাব না দিয়ে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে অতুল একটা সিগারেট ধরাল। আজ আর কোনো ফাঁকিতেই পা দেবে না সে, সব বুজরুকি তার জানা আছে।

বিনতাদেবী হাসলেন।

রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। সিগারেট টেনে টেনে শ্রান্ত হ'য়ে অতুল বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিনতাদেবী তার গায়ে নাড়া দিয়ে বললেন, 'ওঠ, ট্রেন আসছে।'

অতুল চোখ রগড়ে একটা হাই তুলল।

বিনতাদেবী অল্প একটু হেসে কেমন দ্বিধার সঙ্গে বললেন, 'আমি ভেবে দেখলাম অতুল, তোমার ধারণাটা সত্যিই ভুল। প্রবোধ বাবুকে আমি ভালবাসি নে।'

'কেন ?'—ঘুমের চোখে প্রশ্ন ক'রে ফেলল অতুল।

'তাতো বলতে পারি নে। তবে, কেমন যেন দম আটকে আসে আমার কাউকে ভালবাসতে গেলে। আদর করতে পারি, যত্ন করতে পারি, এমন

কি মনটাও কেমন-কেমন করে। কিন্তু ভাল আমি কিছুতেই বাসতে পারি নে। ভালবাসার কথা মনে হ'লেই কেবল হাসি পায় আর গা বমি-বমি করে।'

অতুলের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। চেয়ারের হাতল দুটো দু হাতে শক্ত ক'রে ধ'রে অস্ফুটস্বরে সে শুধু বলল, 'আশ্চর্য্য!'

পরমুহূর্ত্তে দারুণ শব্দ ক'রে ট্রেণ এসে দাঁড়াল শেডের নিচে। একটা কুলি চিৎকার ক'রে উঠল, 'বারাকপোর!'

বিনতাদেবী ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তবে একটা কথা। উনি আমাকে নাকি ভালবাসেন। আজ বলছিলেন।'

'ও!'

'হ্যাঁ। সেই কথা শুনেই ভাবছিলাম, আমি তাঁকে ভালবাসি কিনা … চল এই কামরাটায় ওঠা যাক, ফাঁকা আছে।'

কী ক'রে যে সে গাড়ীতে চাপল, আর কখনই যে গাড়ীটা ছেড়ে দিল, তা অতুল স্পষ্ট ক'রে জানে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন তার হুঁস ফিরল, সামনে চেয়ে সে দেখতে পেল, বিনতাদেবী তার মুখের ওপর চোখ রেখে মিটিমিটি হাসছেন। অথচ, কী ভ্রান্তি, এঁকেই সে মনে করেছিল সন্তপ্রিয়-বিরহিতা। একটা মশা অনেকক্ষণ থেকে তার কানের কাছে আপন অস্তিত্ব প্রচার করছিল, হঠাৎ ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে অতুল ঠাস ক'রে নিজের কানের ওপর একটা চড় ক'যে দিল। বলা বাহুল্য মশাটা মরল না।

বিনতাদেবী অতুলের কাছে স'রে ব'সে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'শুধু-শুধু রাগছ কেন অতুল। ভাল আমি বাসতে পারি নে, সত্যি। কিন্তু আমারো তো মন আছে। তোমার প্রবোধদা যে ভালবাসার যোগ্য লোক তা আমি আর দশজনের মতই রীতিমত বুঝতে পারি। আমার অসুবিধে এই যে, সমস্ত বুঝেও আমি ভালবাসতে পারি নে!'

গাড়ী চলতে লাগল। আর অতুলের মাথার মধ্যে সেই সুরে সুরে মোটা সরু নানারকম রেখা ঘুরপাক খেতে লাগল। সব যেন ধাঁধা।

শ্রীমণীন্দ্র রায়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৯)

মধ্যযুগীয় শ্রেণীদের পরিস্থিতি

মধ্যযুগীয় অর্থনীতিক, সামাজিক, ধর্ম্মীয় ও রাজনীতিক ইতিহাসের আলোচনার পর প্রয়োজন শ্রেণীসমূহ এই পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে অবস্থিত ছিল তাহার অনুসন্ধান।

হিন্দুযুগের শেষে আমরা সামন্ততন্ত্র বিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়াছি। তখন ভারত কয়েকটি রাজত্বে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, দক্ষিণের দ্রাবিড়ভাষা দেশসমূহ প্রাদেশিক একজাতীয়তা লাভ করিয়াছিল, অর্থাৎ এই সকল প্রদেশের ভাষার পার্থক্যসহ এক একটি পৃথক্ রাষ্ট্রও উদ্ভূত হয়। তখন শাসকবর্গও সংশ্লিষ্ট দেশের লোক ছিল; যেখানে ইহার অন্যথা হইয়াছে সেখানে রাজা বিপদের সময় লোকসাধারণের সহানুভূতি পায় নাই (১)। এইসব স্থানের অভিজাতশ্রেণী স্থানীয় লোক ছিল; কাজেই তাহাদের স্বার্থও স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অভিজাতবর্গ সামন্ততন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখিতেছিল। অতঃপর মুসলমানদের দ্বারা উত্তর ভারত বিজিত হয়; মুসলমানেরা নিজেদের শাসক-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্বভাবতঃ বিজেতৃবর্গ নিজেদের একটা অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে।

এই পরিস্থিতিতে দেশীয় শ্রেণীসমূহ কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অনুধাবনের বস্তু। ইতিহাসে দেখা যায় যে, তুর্ক ও পাঠান শাসনের যুগে, অর্থাৎ মুঘল রাজত্বের পূর্ব্বে ভীষণভাবে মুসলমানকরণ চলিয়াছিল। তখন

১। গৌড়ের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য

অনেক রাজপুত ও ব্রাহ্মণ মুসলমান হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, স্বয়ং পৃথ্বীরাজের এক পুত্র (কেহ বলে ইনি জারজ ছিলেন) মুসলমান হইয়া তুর্কদের অধীনে আজমীরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। (কেহ কেহ বলেন যে তিনি মুসলমান হন নাই—করদরাজা হইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে Dr. Iswari Prasad—History of Mediaeval India দ্রষ্টব্য।) আজ দেখা যায় পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজপুতেরা প্রায় সবই মুসলমান হইয়াছে। কাহার কাহার মতে রাজপুত জাতির অর্দ্ধেক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। পরলোকগত আমীর আলী বলিয়াছেন, রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের পাঠানদের সহিত চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকায় তাহারা পাঠান কৌম-পদ্ধতির মধ্যে গৃহীত হয় (২)।

মুসলমান শাসনের যুগকে অখণ্ডভাবে ধরিলে শ্রেণী-সংঘর্ষের এই অবস্থা দেখা যায় যে দেশীয় অভিজাত ও উচ্চ জাতীয় অনেকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া ইসলামীয়-পদ্ধতি মধ্যে পুরাতন স্থান পরিগ্রহণ করে। ইহার অর্থ—বিজিত হিন্দু-অভিজাত শ্রেণীয় লোক পরাধীনতার শৃঙ্খল এড়াইবার জন্য ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে স্থান পায়। ভারতের সর্ব্বত্র ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ইসলাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই প্রথা অবলম্বন করে, বিজিত দেশের বিধর্ম্মী (জিম্মি) রাজা বা অভিজাতেরা মুসলমান হইলে তাহারা স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিত (৩)। এই প্রকারে হিন্দু অভিজাতশ্রেণীর অনেকে মুসলমান হইয়া নিজেদের বাঁচায়৷ ইহারা বিজাতীয় অভিজাতদের সহিত নিজেদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে একীভূত করিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে, কতকগুলি পরাক্রান্ত মুসলমান "সুলতানাৎ" (রাজত্ব)

২। Syed Amir Ali—The Mussalmans of India.

৩। পারস্যের পাহাড়ী "জারটুস্তি দিকানেরা" (সামন্ত জমিদার) প্রথমে আরবদের নিকট অজেয় ছিল। পরে একটি বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া খলিফা হারুণ-উল-রসিদ তাহাদের জয় করিয়া বলেন যে, যদি তাহারা মুসলমান হয় তাহা হইলে তাহারা স্বীয় জমিদারী ভোগ করিতে পারিবে ও পদ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। "দিকানেরা" এই পথ অবলম্বন করিয়া স্বীয় জমিদারী ও পদ রক্ষা করে। ইউরোপের বোসনিয়া, হার্জিগোভিনার স্লাভ ব্যারণেরা এই উপায়ে তুর্কীদের হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইয়াছিল। ভারতে অনেক রাজপুত রাজাও এই প্রকারে নিজেদের বাঁচাইয়াছে।

উদ্ভূত হইয়াছিল ; ইহাদের স্থাপয়িতারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণকারী হিন্দু ছিল। তৎপর একদল হিন্দু অভিজাত মুসলমান শাসনে চাকুরী করিয়া মুসলমান রাজার আমলাতন্ত্রের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার প্রমাণ বক্তিয়ার খিলিজির সময় হইতে মুসলমান রাজত্বের শেষকাল পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মানসিংহ, টোডরমল্ল, যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ প্রভৃতি খাপছাড়া উদাহরণ নয়। বিজাপুর সুলতানের অধীনে ভোঁসলে, ঘোড়পড়ে প্রভৃতি পরাক্রান্ত মারাঠা কর্ম্মচারী-গোষ্ঠী ছিল। এই শ্রেণী হিন্দুজাতির স্বার্থ দেখিত না, কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থই দেখিত। ইহারা "চাচা আপন বাঁচা" পন্থা অবলম্বন করিত। যখন প্রতাপ সিংহ স্বীয় রাজত্বের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল তখন মানসিংহ, বীরবল বা টোডরমল্ল তাহার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করে নাই। যখন বিজাপুর কর্ম্মচারী সাহাজী ভোঁসলার পুত্র বিখ্যাত শিবাজী স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুরাজত্ব স্থাপনের প্রয়াস পায় তখন সেই বংশের প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোড়পড়ে বংশ তাহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল ; মানসিংহ ও টোডরমল্ল হিন্দু বাঙ্গলার ক্ষাত্র-শক্তির সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়াছিল। এই শ্রেণীর স্বার্থ ছিল,—গোলমালে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা ; তখন "স্বজাতি," "স্বধর্ম্মীয়" প্রভৃতি কথার কোন মূল্য ছিল না। ভবানন্দ মজুমদার এবং চাঁচড়া ও সুসঙ্গের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতারা ও দিঘা-পাতিয়ার 'দয়ারাম স্বাধীনতা-প্রয়াসী বাঙ্গলার হিন্দু ভৌমিকদের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর ছিল। তখন স্বধর্ম্মীয় সমশ্রেণীর সমস্বার্থ ছিল না ; তখন এই সব লোকদের মতলব ছিল "ছিন্ন ভিন্ন করে দে মা, লুটে পুটে খাই"। তৎপর বাকী থাকে যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই বা মুসলমান আমলাতন্ত্রের লোক বা অনুগ্রহপ্রার্থী হয় নাই। ইহারাই স্বীয় ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া হিন্দু-জাতীয়তাবাদী হইয়াছিল এবং সুবিধা পাইলে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টিত হইত। প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, সীতারাম এই শ্রেণীর লোক ছিল। অবশ্য ইহাদের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (৪)। ধর্ম্ম তাহার আবরণ মাত্র ছিল।

এই প্রকারে দেখা যায়, হিন্দু অভিজাতেরা মুসলমান যুগে একীভূত হইয়া

৪। ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—'মধ্যযুগের বাঙ্গলা' দ্রষ্টব্য

কার্য্য করে নাই—হিন্দু অভিজাতেরা সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করে নাই। এই যুগের হিন্দুর রাজনীতিক পরিস্থিতি বিষয়ে Lane-Poole বলেন—Thus the Moslems fought for a cause, while the Hindus had nothing better than class or class interests to uphold.... National interests were frequently sub-ordinated to the interests of a section or class....The military system of the Hindus was out of date and old-fashioned....The war between the two peoples was really a struggle between two different social systems. (Quoted by Dr. Iswari Prasad, Pp 199—200) এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তৎকালীন এই দুই ধর্ম্মাবলম্বীদের যুদ্ধ দুইটি বিভিন্ন সামাজিক এবং তৎপ্রসূত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশিষ্টভাবে ছিল না—একথা ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের কার্য্যের কোন ইতিহাস নাই। আর পতিত গণশ্রেণী জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকিত; এবং মুসলমান শাসকের উৎপাতে হয় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত, না হয় অদৃষ্ট ও পূর্ব্বজন্মকে ধিক্কার দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিত। আর হিন্দু শাসকের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নিকট পূর্ব্বজন্মের কৃত ফল, প্রাক্তন রাজা ভগবানের প্রতিনিধি প্রভৃতির ব্যাখ্যার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে পরিপ্লুত হইয়া স্থানুবৎ অবস্থান করিত। তবে অত্যাচার অসহ্য হইলে যে তাহারা "Jacquerie" (কৃষক-বিদ্রোহ) করিত তাহার প্রমাণ আছে (৫)। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ বা গণসমূহ কখনও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বিপ্লব সাধন করে নাই। ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে সত্নরামী সম্প্রদায়; তাহারা গণশ্রেণীয় লোক ছিল, তাহাদের বিদ্রোহ ধর্ম্মের ব্যাপার ছিল। এই বিষয়ে (৫ক) জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল (Hegel) বলিয়াছেন, 'ভারত কখন রাজনীতিক বিপ্লব করে নাই (৬)। ভারতীয়দের মনে anti-

৫। চেতোবর্দ্দার শোভা সিংহের বাগদীদের নিয়া বিদ্রোহের মূলে জমিদারের প্রতি অসন্তোষ ছিল।

৫ক। কাফি খাঁ এবং Jaharlal Nehru—"Glimpses of World History" দ্রষ্টব্য।

৬। Hegel—Philosophy of History, ভারত-অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

thesis (দ্বন্দ্বভাব) নাই বলিয়াই এই জড়ত্ব আসে। এই উক্তি যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা অন্যত্র বিচার্য্য ; তবে ইহা ঠিক যে ইহকালের সকল দুঃখকষ্ট ও সুখ পূর্ব্বজন্ম, প্রাক্তন ভাগ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করে এবং কর্ম্ম দ্বারা মানব তাহার জীবনের চেষ্টায় সীমাবদ্ধ—এই মত দ্বারা ভারতীয় হিন্দুর মনে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার বিপক্ষে কোন বিদ্রোহ উদয় হয় না, সে উপরোক্ত মতগুলি দ্বারা নিজের জীবনকে মানাইয়া নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বহুদিন ধরিয়া পড়িয়া আছে। হেগেলের কথার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তাহার মনে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বভাব উদয় হয় না বলিয়াই সে নিশ্চেষ্ট থাকে।

এতদ্বারা আমরা দেখিলাম যে হিন্দু অভিজাতশ্রেণী জাতীয়ভাবে বা স্বীয়ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে বিজাতীয় বা বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই। তাহারা স্বীয় শ্রেণী-স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া একযোগে কখনও কাজ করে নাই। পরাধীনতার জন্য শ্রেণীগত সংঘবদ্ধতার ভাবের অভাব হইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দুস্বার্থের রক্ষক (champion) ক্ষত্রিয় স্থলাভিষিক্ত রাজপুত বীর ; কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশ প্রেম বা জাতীয়ভাব ছিল না। 'যে-মনিবের নুন খাই তাহার গুণ গাই'—একমাত্র ভাব কার্য্যকরী ছিল। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত বৈদ্য বলিতেছেন,— even among the Rajputs, neither patriotism nor nationality remained, but only the sentiment of loyalty···The only sentiment that remained or was appealed to in the Rajput soldiers, was that of loyalty or service of the master who paid him." (৭)।

এই স্বামী-ধর্ম্ম বা 'নিমক হালালী' (noblesse oblige) ভাবটি ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি পৃথিবীর সকল দেশেই সামন্ততন্ত্রীয় প্রথায় উদ্ভূত হয় ; সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির ইহা একটি লক্ষণ। কিন্তু ভারতে এই লক্ষণটিকে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত করিয়া তাহাকে হিন্দুর মনে বদ্ধমূল করা হইয়াছে। এই লক্ষণটি অন্যান্য সামাজিক অথবা জাতীয় কর্ম্মের লক্ষণ হইতে বিচ্যুত করিয়া কেবল "নিমক হালালী" ভাবটি মনে জাগাইয়া রাখিলে তাহা ভাড়াটিয়া মনিবের কর্ম্মের পক্ষে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহা স্বজাতির বা

৭। C. V. Vaidya—Vol. III, P 451.

স্ব-সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। এইজন্য ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রাচীন পারস্য সম্রাট দারায়ুসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় যোদ্ধারা ভাড়াটিয়া (mercenary) হইয়া কর্ম্ম করিয়াছে। ইহারা যে-মনিবের নুন খায় তাহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে বলিয়াই বিদেশীয়েরা ইহাদের ভাড়াটিয়া রূপে স্বীয় সৈন্যদলে রাখে। এমন কি, গজনীর মহমুদ যখন ক্রমাগত ভারত আক্রমণ করিতেছিল তখন মধ্য এসিয়ায় তাহার যুদ্ধে লড়িবার জন্য পাঞ্জাব হইতে হিন্দু সৈন্যদল তথায় প্রেরণ করিয়াছিল।

ভারতে হিন্দুযুগে সামন্ততন্ত্র বিবর্ত্তিত হইবার সময়ে শাসকবর্গের যথেচ্ছচারিতা কায়েমী রাখিবার জন্য রাষ্ট্র ও পুরোহিতশ্রেণী একত্র সম্মিলিত হইয়া গণশ্রেণীদের শোষণ ও দাবাইয়া রাখিবার জন্য যে-সব ফন্দি, অর্থাৎ ধর্ম্মমত অজ্ঞ লোকদের মধ্যে প্রচার করে তাহাই কালে হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হয়! এই মতগুলি শাঁকের করাতের ন্যায় উভয় দিক দিয়াই কাটে! জনসাধারণকে নিবর্বীর্য্য করিবার জন্য যে-সব মত উদ্ভূত করা হয়, সেইগুলিই হিন্দুর জাতীয় বিপদের দিনে বিপরীত ফল প্রসব করে। পরাজিত জাতির লোকদের জাতীয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টায় উপরোক্ত মত দ্বারা প্রভাবান্বিত মনস্তত্ত্ব "যাহা হইবার তাহাই হইবে," "ঘোর কলি, প্রাক্তন কে খাণ্ডাইবে" ? (৮) প্রভৃতি বুলি দ্বারা নিবর্বীর্য্য জাতিকে আরও অধিক নিশ্চেষ্ট

৮। লক্ষ্মণ সেনকে শাস্ত্র দেখাইয়া ব্রাহ্মণদের ভয় দেখাইবার কথা বাঙ্গলার ইতিহাসে খ্যাত আছে। এই যুগে তথাকথিত হিন্দু ধর্ম্মের কুসংস্কার রাজনীতিতে কতটা প্রতিবিম্বিত হয় তাহা সিন্ধুর দুইটি দৃষ্টান্তে জাজ্বল্যমানরূপে প্রতীয়মান হয়। সিন্ধুতে মহম্মদ-বিন-কাসেমের সঙ্গে রাজার ভাই ও অনেক ঠাকুর (ক্ষত্রিয়) ও ব্রাহ্মণদের মিলিত হইবার একটি কারণ। ইতিহাস বলে যে রাজা দাহিরকে জ্যোতিষেরা বলে যে, তাহার বৈমাত্রেয় ভগ্নী কর্ত্তৃক তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা (আশঙ্কা) আছে। সেই বিপদ খণ্ডন করিবার জন্য দাহির বৈমাত্রেয় ভগ্নীকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করে যদিচ তাহার সহিত বাস করিত না। ইহাতেই দাহিরের ভ্রাতা ও অন্যান্যেরা চটিয়া পরে কাসেমের সঙ্গে মিলে যাহাতে দাহির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ("চাক-নামা" দ্রষ্টব্য)। অপর একটি দৃষ্টান্ত এই—মুসলমান বিজয়ের পর সিন্ধুর কোন রাজপুত রাজার সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হইতেছিল। সেই সময় রাজা এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে, মুসলমানেরা তাহার তাঁবুতে ঢুকিয়া তাহাকে কয়েদ করিবার জন্য আসিয়াছে! পাছে 'যবন' স্পর্শে তাহার জাতি নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় রাজা স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে

করিয়াছিল। এতদ্বারা অবস্থাভেদ-জনিত কোন দ্বন্দ্বভাব হিন্দুর মনে উঠে নাই ; সে বর্ত্তমানকে মানিয়া লইয়াছিল।

পুনঃ মধ্যযুগের হিন্দু আমলে যথেচ্ছাচার ও একটি বিশিষ্ট যোদ্ধৃ ও শাসক জাতি বিবর্ত্তিত হওয়ায় গণসমূহ রাজ্যের উলট-পালট ও রাজবংশের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনকে নির্ব্বাকভাবে দেখিয়াছিল। (এই বিষয়ে লেন-পুলের অভিমত দ্রষ্টব্য—Dr. I. Prasad Pp 199—200) আমরা রাজপুত যুগে পূর্ব্বেকার গিল্ডগুলিকে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে অংশ গ্রহণ করিতে দেখি না, রাজত্ব তখন রাজার সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইত ; রাজ্য পরিচালনা করা রাজা ও তাঁহার বেতনভোগী মন্ত্রীদের কার্য্য, রাজত্ব রক্ষা করা, রাজ পরিষদ, রাজার প্রসাদভোগী সামন্তবর্গ ও ভাড়াটিয়া সৈন্যদের কার্য্য, গণ-সমূহের সঙ্গে এই সব বিষয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাহারা রাজকর দিবার জন্যই জন্মিয়াছে ; যে বলবান হইয়া তাহাদের নিকট কর আদায় করিবে সে-ই রাজা। যথেচ্ছাচার-শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া লোকদের মনকে এই প্রকারে রাজনীতি বিষয়ে উদাসীন করিয়াছিল। হিন্দু-রাষ্ট্রনীতি অনুসারে রাজা চিরকালই নির্ব্বাচিত হইত ; যথেচ্ছাচারী হইবার কোন ক্ষমতা তাহার ছিল না (৯)। কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখি "জোর যার মুল্লুক তার" প্রথাই চলিতেছিল, রাজা যথেচ্ছাচারী হইয়াছিল। এইজন্যই দিল্লী বা গৌড়ের সিংহাসনে কে বসিল ও তাহাকে কে তাড়াইল তাহার সহিত প্রজার কোন সম্পর্ক ছিল না,—এ বিষয়ে কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করিত না। সামন্ততন্ত্রীয় যুগে প্রজার রাষ্ট্রনীতিক সমস্ত অধিকার বঞ্চিত করিয়া তাহাকে শোষণের বস্তু করিয়া রাখিবার জন্য কেবল তাহার ধর্ম্মোন্মাদনা জাগাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে সে আজ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র-নীতিক জীব না হইয়া ধর্ম্মোন্মত্ত জীব হইয়া আছে। মুসলমানেরা আসিয়া সেই ধর্ম্মেই আঘাত করে। নগরকোট, সোমনাথ, কান্যকুব্জ ও বেনারসের মন্দিরগুলি লুণ্ঠিত ও দেবমূর্ত্তি সমূহ বিচুর্ণীকৃত হইলেও কোন অনৈসর্গিক কাণ্ড

দৌড়াইয়া গিয়া পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে (Elliot-এর পুস্তক দ্রষ্টব্য)। ৺নিখিলনাথ রায়ের "প্রতাপাদিত্য চরিত"-এ প্রতাপাদিত্যকে মানসিংহ 'ঘোর কলি,' 'দিল্লীতে আসুন এবং বাদশাহের সহিত ভাব করুন' কথা আছে।

৯। K. P. Jayaswal—Study of Hindu Polity.

হইল না দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। ইহার ফলে, অনেকের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে আস্থা শিথিল হইয়া পড়ে (মুষ্টিমেয় আরব সৈন্য কর্তৃক কাসেমের সিন্ধু-বিজয় দেখিয়া একদল ব্রাহ্মণ ইসলামে আত্ম-সমর্পন হয় এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। হিন্দুর ধর্ম্মের মধ্যে অনেক নিরাকারবাদী সম্প্রদায় উত্থিত হয় (১০)।

এই প্রকারে হিন্দু-উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যখন বিভিন্ন স্বার্থের অনুসরণ করিতে থাকে তখন নির্জ্জীব গণশ্রেণী সমূহ নিশ্চেষ্ট থাকে। অবশেষে ধর্ম্ম সংস্কারের আন্দোলনের ফলে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ধর্ম্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ করিয়া "সত্নরামী" বলিয়া একটি সম্প্রদায় আওরঙ্গজেবের শাসন কালে উদয় হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত হাঙ্গামা করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা পরাভূত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে গরীব ও নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর রাজনীতিক পুনঃজাগরণ। এই সময়ে কোন কোন স্থলে ধর্ম্ম ও রাজনীতি সংমিশ্রণ করিয়া হিন্দুজাতীয়তাবাদ সৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রে শূদ্র তুকারাম যখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার দ্বারা গণসমূহকে আলোড়িত কবিতেছিল তখন ব্রাহ্মণ বংশীয় স্বামী রামদাস হিন্দুজাতীয়তা সৃষ্টিকল্পে "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" পরিকল্পনা করিতেছিল। ইনি শিবাজীকে এই মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম সংস্থাপনের শাণিত অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। প্রবাদ আছে, এই কর্ম্মে সহায়তার জন্য তিনি পাহাড়িয়া মাওলেদের শিবাজীর দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যরূপে বিবর্ত্তিত করেন। এই যোগাযোগের ফলে মহারাষ্ট্রে হিন্দুজাতীয়তাবাদের

১০। হিন্দু দেব মন্দিরগুলি জনসাধারণকে শোষণের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা এই প্রতারণা ও শোষণ কার্য্যের লাভের ভাগী হইত; ইহা আলবেরুনীর "Prologomena to India" পাঠে অবগত হওয়া যায়। সোমনাথের শিবলিঙ্গের অলৌকিকত্বের বুজরুগী মাহমুদের লোকেরা উহা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই ধরিয়াছিল (Elliot—History of India দ্রষ্টব্য)। পরে সোমনাথ পুনঃ নির্ম্মিত হয়, আবার তাহা মুসলমানেরা ধ্বংস করে (Elliot দ্রষ্টব্য) সোমনাথের মন্দিরের দেবতার অলৌকিক কর্ম্ম পারসিক কবি সেখ সাদী ধরিয়া ফেলিয়াছিল। যে-ব্রাহ্মণ এই প্রতারণা করিত তাহাকে সাদী মারিয়া ফেলে ("বোস্তান" দ্রষ্টব্য)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই সাক্ষ্য দেয় যে মন্দিরের লভ্যাংশের একাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল।

মহারাষ্ট্রীয় রূপ পরিগৃহীত হয়। শিবাজীর সহিত সকল জাতির লোক সম্মিলিত হয়। কিন্তু ইতিহাস বলে—অনেক বিশিষ্ট মারাঠা সামন্ত শিবাজীর বিপক্ষে ছিল, তাঁহারা শিবাজীর কর্ম্মকে ভোঁসলে বংশের রাজত্ব সংস্থাপন প্রচেষ্টা বলিয়াই মনে করে। পরে শিবাজী কৃতকার্য্য হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহার কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য শিবাজী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে জোটে! শিবাজীর অথবা তাহার গুরুর নিখিল ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ ছিল কিনা তাহা সন্দেহের কথা! শিবাজীর মুখ্য উদ্দেশ্য কি ছিল--তাহার স্বাধীন সিংহাসন স্থাপন বা হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা তাহা তর্কের বিষয়। অবশ্য এই সময়ে মহারাষ্ট্রের বাহিরের কোন কোন হিন্দু ভাবুক ইহাকে হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা কল্পে অভিযান বলিয়া মানিয়া নিয়াছেন। শিবাজীর গুণমুগ্ধ হিন্দী-কবি ভূষণ তাহার কবিতায় শিবাজীর কর্ম্ম-কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "কাশীকা কলাযাতি, মথরা মসজিদ হোতি, সুন্নত হতি সবাকার, আগর শিবাজী মহারাজ না হোতা প্রকাশ।"

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, শিবাজীর কার্য্য যদি হিন্দু জাতীয়তাবাদের অঙ্গ হইত তাহা হইলে তাহার সৈন্য শ্রেণীতে পাঠান সিপাহীর দল থাকিতে পারিত না (১১)। এই সময় হইতে মহারাষ্ট্র প্রাধান্যের শেষকাল পর্য্যন্ত পাঠানেরা মহারাষ্ট্র সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়। অন্যদিকে শিবাজীর বিপক্ষদলে হিন্দু রাজপুতেরা ছিল। সিংহগড়-বিজয় হইতেছে মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল কীর্ত্তি, তানাজি মালস্থরে যখন এই দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন যে-মোগল সৈন্যেরা প্রাণপণ করিয়া তাহার প্রতিরোধ করিয়াছিল তাহারা ছিল রাঠোর কৌমের রাজপুত।

আজকাল মহারাষ্ট্রীয় লেখকেরা বলিতেছেন, শিবাজী প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিখিল ভারতীয় হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের policy ছিল, এবং তাহাদের "হিন্দু-পদ-পাতসাহী" (১২) স্থাপনের পরিকল্পনার কথা শুনা যায়; কিন্তু ইতিহাস তাহার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে। সত্য বটে, শিবাজীর পৌত্র

১১। S. N. Sen—'Administrative System of the Marhattas,' Pp 144-145.

১২। Savarkar—"Hindu Pada Padshahi" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

রাজা সাহুর দরবারে পেশওয়া বাজীরাও 'কুসতুন তুনিয়া' (কন্সটান্টি নোপল) পর্য্যন্ত হিন্দু পতাকা এককালে উড়িবে—এই আদর্শ সাহুর দরবারের হওয়া উচিত বলিয়া বক্তৃতা করিয়াছিল (১৩)। কিন্তু তাহারা শেষ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুর আধিপত্যের চেষ্টা করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুকে তাহাদের সঙ্গে সামিল করে নাই, বরং তাহাদের উপর বেশী অত্যাচার করিয়াছিল (১৪)। রাজনীতিক প্রয়োজনের জন্য তাহারা মুসলমানদের সহিত খুব ভাব করিয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধের প্রাক্কালে মহারাষ্ট্রীয়েরা জাঠ ও রাজপুতদের চটাইয়া তাহাদের সহানুভূতি হারাইয়াছিল। তৎপর মহারাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ ও মারাঠার দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। শূদ্র কৃষক মারাঠারা সৈন্য হইয়া শিবাজীর অধীনে রাজত্ব স্থাপন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে, তখন হইতে ব্রাহ্মণ ও মারাঠার শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিশেষভাবে জাগিয়া উঠে। অনেক ঐতিহাসিক বলেন, পাণিপথের যুদ্ধে হারিবার ইহা একটি মূল-কারণ। হোলকার ও গাইকোয়াড় এবং আরও অনেক মারাঠা সেনাপতি, প্রধান সেনাপতি ব্রাহ্মণ সদাশিব রাও (ইঁহার গুণগ্রাহীরা ইঁহাকে 'পরশুরাম' অবতার বলিত) ভাওয়ের উপর রাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় ছিল (১৫)। তাহাদের মনোভাব ব্রাহ্মণেরা মরুক! ভাও পূর্ব্বে হোলকারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ঘৃণাভরে বলিয়াছিল—Who cares to hear a goat-herd? (১৬) রাণাডের মতে এই উভয় জাতির দ্বন্দ্ব মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের 'কাল' হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠে ইহা বোঝা যায় যে, মহারাষ্ট্রীয় রাজত্ব ভারতীয় হিন্দুজাতীয়তার প্রতীক ছিল না।

উত্তরে নানক প্রতিষ্ঠিত "শিখধর্ম্ম" মোগলের অত্যাচারে গুরুগোবিন্দ সিংহ কর্ত্তৃক জাতিভেদ-বিহীন "খালসা" সংঘে পরিবর্ত্তিত হয়। এই নূতন সম্প্রদায়

১৩। ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর—"বাজীরাও"।

১৪। নবাবিষ্কৃত বাঙ্গলার লিখিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' বর্গি হাঙ্গামার ভীষণত্ব বর্ণনা করিয়াছে।

১৫। J. N. Sarkar—Fall of Moghul Empire, Vol. II দ্রষ্টব্য।

১৬। Ranade—Rise of the Marhatta Power; Hindu Re-conquest of India দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে,—কিন্তু মোগলের অত্যাচারের জন্য মুসলমান বিদ্বেষ পোষণ করে। জনশ্রুতি এই যে, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্যই আক্রমণশীল খালসা সংঘ সংগঠিত হয়। শিখদের মধ্যে প্রবাদ আছে, "আগর গুরু গোবিন্দ সিংহ নাহি হোতা প্রকাশ, হিন্দু ধর্ম্মকা হো যাতা নাশ।" আসলে হিন্দু-সমাজের মধ্য হইতে অস্ত্রধারী ধর্ম্মোন্মও খালসা দল উদ্ভূত হইয়া মুসলমান সমাজের ধর্ম্মোন্মত্ত গাজীর দলের পাল্টা জবাব দিতে থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই দলকে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের প্রতীক বলা যায় না, কারণ শিখেরা বরাবর নিজের সম্প্রদায়ের জন্য কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। শিখদের একটি পুরাতন প্রবাদ বাক্যে উক্ত আছে—"রাজ করেগা খালসা, ইয়াগী স্থানে (১৭) বাকি (আগী) না রহে কোই" (শিখ খালসাই রাজত্ব করিবে এবং স্বাধীন আফগান কৌমদের দেশে সকলে ধ্বংস হইবে)। এতদ্বারা এই সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তির স্বরূপটি প্রকাশ পায়। রামদাস স্বামীর "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম"-এর ন্যায় গুরু গোবিন্দের খালসার শিখধর্ম্ম হিন্দুজাতির স্বাধীনতার প্রতিনিধি স্থানীয় হয় নাই, বরং প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতীক হইয়াছিল।

জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়া গুরুগোবিন্দ শিখ ধর্ম্মকে কৃষক জাঠদের মধ্যে গ্রহণ করাইতে পারিয়াছিলেন এবং শিখধর্ম্মের আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া এই শিখ গণশ্রেণীর মধ্যে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের আকাঙ্খা জাগিয়াছিল। পরে রণজিৎ সিংহ তাহার ফলভোগী হয়, কিন্তু তখন শিখ সমাজে একটি অভিজাত-শ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছে। এই অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে হিন্দুর জাতি মর্য্যাদার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সময়ে পাঞ্জাবে শিখ-জাঠ ও মধ্য প্রদেশে হিন্দু জাঠদের রাজনীতিক অভ্যুত্থানে কৃষক জাঠ-জাতি পূর্ব্বে শূদ্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিলেও রাজনীতিক ক্ষমতা পাইয়া বা ক্ষেত্রী জাতীয় শিখ সর্দ্দারেরা সমাজে যে সম্মান পাইত, অন্য নীচু জাতি-সমুদ্ভূত সর্দ্দার সে সম্মান পাইত না। প্রবাদ আছে, রণজিৎ সিং জাতিতে

১৭। বর্ত্তমান স্বাধীন আফগান রাষ্ট্র ও ভারতের সীমানায় মধ্যবর্ত্তী স্থান—যেখানে আফ্রিদি, মাহ্‌সুদ প্রভৃতি স্বাধীন পাঠান কৌমসমূহ বাস করে, তাহাকে "ইয়াগীস্থান" বলে।

নিম্নশ্রেণীয় "সাঁসি" (১৮) (মদ্য প্রস্তুতকারী জাতি, কিন্তু সুঁড়ির চাইতেও নীচু) ছিল ; সেইজন্য ইহা লইয়া সামাজিক কটাক্ষপাত এখনও চলে।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৮। Ibbetson—"Glossary of Punjab Tribes" পুস্তকে রণজিৎ সিংহকে জাট্টী রাজপুত এবং তাহাকে মহারাজ সাঁসির বংশধর বলা হইয়াছে। এবং শিখদের নিকট হইতেও লেখক উপরোক্ত কথাই শুনিয়াছেন। কেহ কেহ সাঁসিদের 'thievish tribe' বলেন।

পোষাক ছাড়া সভ্যতা

মানব সভ্যতার গোড়া থেকে মানুষ বরাবর চেষ্টা করে এসেছে কেমন করে প্রকৃতির খেয়াল-খুসীর উপর নির্ভর না করে নিজের উপর নির্ভর করবে। এই চেষ্টা সফল হয়েছে, আরো হবে। এর ফলে মানুষ আজ তার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে পাহাড়ের গুহা আর আকাশের বৃষ্টির মুখ চেয়ে বসে থাকে না ; বরং প্রকৃতির নানা শক্তিকে নিজের কাযে লাগানোর ফলে তার জীবন ধারা এত উন্নত এবং সম্পদশালী এবং মহত্তর হয়েছে যে তার আদিম যুগের জীবনের সঙ্গে আজকের অতি-বিরাট প্রভেদ। একদিকে এই হয়েছে বটে, কিন্তু অন্যদিকে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করার অভ্যাস ছাড়তে ছাড়তে মানুষ প্রকৃতি থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে। এইভাবে আত্মনির্ভর হতে গেলেই যে মানুষের পক্ষে প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করা অনিবার্য্য এ যুক্তি চলে না। কিন্তু তবুও মানুষ ঠিক তাই করেছে। মানুষ নিজেকে সভ্য করতে করতে শুধু যে প্রকৃতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে এনে ফেলেছে তা নয়—জীবনের অনেক কিছু সুন্দর জিনিসও সে হারিয়েছে।

মানুষ যখন সভ্য হয়নি সে-ও ছিল অন্যান্য প্রাণীরই মতো নগ্ন। কিন্তু আজকের মানুষ যেমন এই কৃত্রিম সভ্যতার এবং যন্ত্রের দাস হয়ে পড়েছে, তেমনি তার বস্ত্রেরও দাস হয়ে পড়েছে। পোষাক মানুষকে আজ এমন ভাবে গ্রাস করেছে যে সে সত্যিই ভিতরে-ভিতরে নগ্ন প্রাণীবিশেষ তা আর মনে হয় না। বরং মনে হয়, পাখীদের পক্ষ-মোচনের মতো মানুষের পক্ষে পোষাক পরাটাই একটা নৈসর্গিক বিধি। নগ্ন মানুষ কেমন করে পোষাক পরতে শিখল এবং পোষাক কেমন করে তাকে পেয়ে বসল এর আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি *। এবারে, এই পোষাকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আধুনিক যুগের মানুষ—যারা ভাবতে জানে এবং বহিঃ প্রকৃতিকে ভালবাসে—তারা কি করেছে দেখা যাক।

---

* পরিচয়—চৈত্র ১৩৪৮

নিউডিষ্ট আন্দোলন খুব বেশী দিনের নয়। এই আন্দোলন ইয়োরোপে এবং বিশেষ করে জার্ম্মাণীতে আরম্ভ হয়েছিল তরুণদের স্বাস্থ্য এবং দেহকে উন্নততর করার উদ্দেশ্য নিয়ে। খোলা গায়ে রোদ আর বাতাসের ক্রিয়া যে কত উপকারী তা যখন দেখতে পাওয়া গেল, তাই থেকে নগ্ন দেহে খোলা জায়গায় ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন হল। যদিও এই থেকেই ক্রমে নিউডিষ্ট আন্দোলন বেড়ে ওঠে এবং ছড়িয়ে পড়ে—তবু এর চর্চ্চা করতে করতে মানুষ এর মধ্যেকার আরো অনেক গুণ আবিষ্কার করলে যা প্রথম অবস্থায় তাদের জানা ছিল না। আন্দোলন যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগল, দেখা গেল নিউডিজমের চর্চ্চায় শুধু যে মানুষের স্বাস্থ্যই ভাল হচ্ছে তা নয়, তার সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি এবং নীতিবোধ উন্নততর হচ্ছে, শিশুদের শিক্ষায় মস্ত একটা সাহায্য হচ্ছে। মোটের উপর শুধু দেহের নয়, নিউডিজ্‌মে মনেরও উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে।

কিন্তু নিউডিজ্‌মের অভ্যাস যতই কল্যাণকর হোক না কেন এর অনুগামীর সংখ্যা অতি ক্ষুদ্র। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এর কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না। উপরন্তু অধিকাংশ লোকই মনে করে অপর কোন ব্যক্তির সামনে নিজেকে নগ্ন করা নীতিবিরুদ্ধ, বিশেষতঃ অপর ব্যক্তি যদি অপর sex-এর মানুষ হন। অধিকাংশ দেশের আইনেই সর্ব্বসমক্ষে নগ্ন হতে বাধে; কাজেই নিউডিজ্‌মে যাঁদের আস্থা আছে তাঁদের একত্র হয়ে ক্লাব বা উপনিবেশ স্থাপন করতে হয়, যেখানে তাঁরা পুলিস ও জন-সাধারণের চোখের আড়ালে তাঁদের অনুষ্ঠান চালাতে পারেন।

নিউডিষ্ট আন্দোলন সকলের চেয়ে অগ্রসর হয়েছে জার্ম্মাণীতে। বস্তুতঃ ঐ দেশেই এই আন্দোলনের জন্ম বলা যেতে পারে। ওখানে নিউডিষ্টদের ক্লাবে বা উপনিবেশে ছুটির সময় অথবা শনি-রবিবারে সভ্যেরা মিলিত হয়। সহরের বাইরে অথবা ভিতরে উপনিবেশ গড়া হয়; সেখানে জিমনাষ্টিক, খেলা, সাঁতার ও আরো নানা রকম বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশুরা সকলেই এখানে আসে এবং সকলেই সমস্ত বস্ত্র ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ায়। অধিকাংশ নিউডিষ্ট কেন্দ্রের নিয়ম হচ্ছে এই যে যদি কোন অভ্যাগত ক্লাব দেখতে আসেন, তিনি যতক্ষণ ভিতরে থাকবেন সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে থাকবেন। এই সকল কেন্দ্রের অবস্থান গোপনীয় নয়—আইন এবং শাসনের

কর্ত্তা এবং জনসাধারণ এদের খবর রাখে। যাদের নিউডিজ্‌মে আস্থা নেই, তারা এদের দলে যোগ দেয় না, এদের নিয়ে কিছু মাথাও ঘামায় না এবং শাসকবর্গও নিরপেক্ষ থাকেন। এর ফলে জার্ম্মাণীতে আন্দোলনটা এতটা ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছে। সেখানে একে বলা হয় Nackt Kultur।

অধুনা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে; যেমন ফ্রান্স, সুইট্‌সারল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, এমন কি ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত।

বিভিন্ন দেশের শাসকবর্গ এই আন্দোলনের প্রতি বিভিন্ন ভাব পোষণ করেন। তা উৎসাহ দান থেকে আরম্ভ করে সোজাসুজি উৎপীড়ন পর্য্যন্ত আছে। বার্লিনে যেমন দুটি সর্ব্বসাধারণের সাঁতার ঘর আছে যা মাসের কোন কোন বিশেষ দিনে নিউডিষ্টদের হাতে দেওয়া হয়। সুতরাং বার্লিনের মিউনিসিপ্যালিটি ও সরকার নিউডিজ্‌মকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফ্রান্সে অথচ নিউডিজ্‌ম্ প্রপীড়িত। Merrill ও Merrill-পত্নী একবার কেমন করে গোপনে ফ্রান্সের একটি নিউডিষ্ট কেন্দ্রে গিয়েছিলেন এবং কেমন করে তাঁদের এই কেন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলা বা লেখা নিষেধ ছিল, তা তাঁরা Among the Nudist নামক বই-এ লিখেছেন।

আমেরিকার কয়েকটি ক্লাব আছে সেগুলি কিছু একাধিকৃত এবং ব্যয়-সাধ্য। জার্ম্মানীতে আবার এগুলি সর্ব্বসাধারণের জন্যেই বেশী, এবং কয়েকটি কেন্দ্র তো সোশালিষ্টরা চালান। Nackt-Kultur আন্দোলন যে কতদূর বিস্তৃত হয়েছে তা এই বল্লেই বোঝা যাবে যে ত্রিশ লক্ষ জার্ম্মান নগ্নতার অভ্যাস করে। ওখানে বিভিন্ন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের প্রত্যেকের অধীনে কতকগুলি করে ক্লাব দেশের চারিদিকে ছড়ানো। এদের মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান Reichsverband fuer Freikoerper-Kultur। শুধু এদেরই অধীনে বার্লিনে এগারটি ক্লাব আছে, যার মোট সভ্য-সংখ্যা পাঁচ হাজারের উপর। এই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশের উপর ক্লাব, কলোন্, ড্রেসডেন্, লাইপৎসিগ, ডেস্‌লাউ, মিউনিখ্, নূর্ণবার্গ এবং জার্ম্মানীর অন্যান্য জায়গায় ছড়ানো আছে। জার্ম্মানীতে এমন বিশিষ্ট নগর খুব কমই আছে যেখানে কোন-না-কোন-রকম Nackt-Kultur মণ্ডলী নেই।

কয়েকটি পত্রিকা আছে, যাদের আলোচ্য বিষয় শুধু নিউডিজ্ম্। এদের অন্যান্য পত্রিকারই মতো সাধারণ জায়গায় প্রদর্শন এবং সাধারণের কাছে বিক্রি করা হয়। নাম-করা পত্রিকার অনেকগুলিই সম্প্রতি ইয়োরোপের প্রধান প্রধান সহরের নিউডিজ্ম্ আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সেন্ট পলসের Dean Inge "Costume and Custom" নামে একটি প্রবন্ধ Evening Standard-এ প্রকাশ করেছেন। তিনি নিউডিজ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং এই আন্দোলন অনুমোদন করে অনেক কথা বলেছেন।

উপরি উক্ত দেশগুলিতে নিউডিষ্ট আন্দোলন হচ্ছে একটি সুবিবেচিত অবহিত আন্দোলন যা মানব জাতির উন্নতি সাধনের জন্য পরিকল্পিত। এর উদ্দেশ্য মানুষকে পোষাকের বন্ধন থেকে মুক্ত করা, যাতে সে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পারে, শরীর এবং মনকে উন্নত করতে পারে এবং আধুনিক মানুষ যে সকল যৌন-কমপ্লেক্সে ভোগে তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া অন্য দেশ আছে যেখানে নিউডিজ্ম্ স্বাভাবিক। রাশিয়ায় স্ত্রী ও পুরুষে একত্রে নগ্ন অবস্থায় কৃষ্ণসাগরে স্নান করেছে; স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়ও এই অভ্যাস প্রচলিত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে নীতিভ্রষ্ট হবার আগে পর্য্যন্ত জাপানেও স্ত্রী পুরুষে একত্রে স্নান করত।

কোন প্রকৃতির কোন শ্রেণীর লোক নিউডিষ্ট ক্লাবে যোগ দেয়, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। নিউডিষ্ট শ্রেণী বলে কি কোনো বিশেষ শ্রেণী আছে, যারা সাধারণ লোকের থেকে পৃথক? এর উত্তর, মস্ত একটি "না"! নিউডিষ্টদের সংগঠন সাধারণ মানব-জন-সমাজেরই মতো। Parmelee-র মতে নিউডিষ্টরা সমাজের প্রত্যেক পর্য্যায় থেকেই আসে, সুতরাং নিউডিষ্ট বলে কোন 'টাইপ' নেই। কোন কোন নিউডিষ্ট চরম সংস্কারপন্থী, কেউ রক্ষণশীল। এদের মধ্যে রাজনৈতিক সকল রকম দলের নমুনা আছে এবং সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সকল রকম পর্য্যায়ের মানুষ আছে। এদের মধ্যে বড় লোকের সংখ্যা কম এবং খুব দরিদ্রও বেশী নেই—অধিকাংশই মধ্যবিত্ত। অবশ্য কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্র আছে যেগুলি শুধু মজুরদের জন্য। প্রায় সকল রকম পেশার লোকই নিউডিষ্টদের মধ্যে পাওয়া যায়। Julian Strange নামক

এক আমেরিকান লেখক ইয়োরোপের বহু নিউডিষ্ট কেন্দ্রে ঘুরেছিলেন। তিনি হায়বুর্গের কাছে Freilicht-park (মুক্ত আলোর পুরোদ্যান) নামক যে নিউডিষ্ট পার্ক আছে তাতে দিন পনের কাটাবার সময় গণনা করে দেখেছিলেন সেখানকার ৬৭ জন লোকের মধ্যে ছিল—এক ব্যবসায়ী আর তার পরিবারবর্গ, একজন পেশাদার নর্ত্তকী, এক আমেরিকান কোটিপতি ও তাঁর পরিবার, একটি ব্রিটিশ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল করপোরেশানের সহকারী সভাপতি, একজন ইংরেজী কলেজের ছাত্র, একজন জার্ম্মাণ সমর বিভাগের পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী, দুজন ফরাসী, একজন মিশরীয়, একজন রুশ সংগীতজ্ঞ, সস্ত্রীক একটি সুইস্ দাঁতের ডাক্তার, একটি ডেনিশ মহিলা ও তার ছেলে, দুজন জার্ম্মাণ প্রোফেসার, দুজন ইঞ্জিনীয়ার ও আরও অনেক পেশার লোক।

এই আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় যাঁরা নিউডিজ্‌ম পরিগ্রহ করেছিলেন তাঁদের যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কারণ সে সময় এই আন্দোলনকে নানা বিরোধ এবং বাধা কাটিয়ে উঠতে হয়েছে। যেমন অন্য সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের বেলায় অগ্রনায়কদের ভাগ্য বরাবর কঠিন হয় Nackt-Kultur-এর বেলায় তার ব্যতিক্রম হয় নি।

নগ্নতার স্পৃহা নানা ধরণের মানুষকে নিউডিষ্ট উপনিবেশের মধ্যে এক করে টেনে আনে। নিউডিষ্টদের সকলের মধ্যে যদি কিছু সাধারণ থাকে, তা হচ্ছে তাদের প্রকৃতির প্রতি টান আর খোলা জায়গার মোহ। এঁদের মধ্যে কেউ নিরামিষাসী, কেউ বা মদ্য এবং ধূমপান ছেড়ে দেবার জন্যে সকলকে জেদ করেন। কিন্তু এটা নিউডিষ্টদের মূল উপাদান নয়—যদিও অধিকাংশ নিউডিষ্টই বোধহয় জীবনকে সহজ এবং সরল করে আনাই বিশ্বাস করেন।

পল্লীর লোকের চেয়ে সহুরে লোকেদের মধ্যে নিউডিজ্‌ম্ জনপ্রিয় হয়েছে। জনসঙ্কুল সহরের মধ্যে যারা বাস করে তারা কৃত্রিম জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়, সুতরাং তারাই নিউডিজ্‌ম্ ও খোলা জায়গায় জীবন কাটাবার প্রয়োজন গ্রামের লোকের চেয়ে ঢের বেশী করে অনুভব করে। উপরন্তু সহরের লোকেরা কম রক্ষণশীল। নিউডিজ্‌মের অভ্যাস অনেককে তাদের সহানুভূতিহীন আত্মীয় বা মনিবদের ভয়ে গোপন রাখতে হয়। এটা পল্লীতে

—যেখানে সকলের খবর সকলে রাখে—প্রায় অসম্ভব। এই সব কারণে নিউডিজ্‌ম্‌ সহরের বাসিন্দাদের মধ্যে বেশী বিস্তৃতি লাভ করেছে।

(২)

যদিও এই পৃথিবীতে আজ লক্ষ লক্ষ লোক নিউডিজ্‌মে অভ্যস্ত এবং তাদের পক্ষে নিউডিজ্‌ম্‌ খুবই সহজ জিনিস, তবু যে কোন সাধারণ লোক নগ্ন অবস্থায় অপরের চোখের সামনে আবির্ভাব হওয়ার কথা অতি কঠিন বলে মনে করবে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নিউডিজ্‌মের প্রত্যেক নতুন আগন্তুকই অতি সহজে নগ্নতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে—এতে তার কয়েক মিনিট মাত্র সময়ও লাগে না। Merrill ও Merrill-পত্নী তাঁদের প্রথম অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, এবং আরো অনেকে লিখেছেন, যদিও ছেলেবেলা থেকে তাঁদের নগ্নতার প্রতি বিরাগ ছিল তবু কি সহজে তাঁরা পোষাক ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছিলেন।

পোষাক যদিও আমরা পরি শ্লীলতা রক্ষার জন্যে, তবু শ্লীলতাবোধ মানুষের সহজাত নয়। বরং এই বোধ যে প্রথাজাত তার বহু উদাহরণ আমরা আমাদের অন্য প্রবন্ধে দেখিয়েছি *। সমাজ যে-শিক্ষা শিশুকাল থেকে আমাদের উপর প্রয়োগ করে তারই ফলে আমাদের মধ্যে শ্লীলতার জন্ম হয়। পোষাকের উৎপত্তি হল কেমন করে, কবে থেকে মানুষ পোষাক পরতে আরম্ভ করলে, পোষাক কি করে মানুষকে এমন পেয়ে বসল যাতে তা সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে এ সকলের আলোচনা উক্ত প্রবন্ধেই করা হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি বস্ত্রের উৎপত্তির একটা কারণ যৌন নির্ব্বাচন। অন্য একটা কারণও পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে—যৌনের সঙ্গে যাদুবিদ্যার একটা অনুষঙ্গ আছে বলে আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল, যার ফলে যৌন হয়েছিল taboo এবং আত্ম যৌন চিহ্নগুলিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখার প্রয়োজন হয়েছিল।

লোকে যে বিশ্বাস করে, পোষাক পরে লজ্জা নিবারণের জন্যে এবং দেহ অনাবৃত করার মধ্যে পাপ আছে, আসল কিন্তু ঠিক উল্টো। যে সকল

* পরিচয়—চৈত্র ১৩৪৮

অসভ্য জাতি নগ্নতায় অভ্যস্ত তাদের পোষাক পরালে তারা বিষম বিব্রত হয়ে পড়ে। মানুষের শীলতাবোধ হচ্ছে একটা উগ্র আত্মসচেতনতা যার উৎপত্তি হয়েছে অস্বাভাবিক সাজে সাজার থেকে ; অর্থাৎ শীলতাবোধ হচ্ছে কাপড় পরার ফল এবং কাপড় পরাটা এর ফল নয়।

(৩)

Nackt Kultur আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকে যে সূর্য্যের আলো এবং বাতাস মানুষের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করে। রোদের রোগঘ্নতা-গুণ বহু বহু কাল ধরে জানা ছিল এবং সম্প্রতি চিকিৎসা শাস্ত্র সূর্য্যালোক সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু তথ্য উদ্ঘাটিত করেছে। রক্তোত্তর রশ্মির সাহায্যে চিকিৎসা করার কথা সবাই জানে, তা ছাড়া আজকাল কৃত্রিম রৌদ্র তৈরী করে নানা রোগের চিকিৎসা হয় এবং দেহের উপর tonic হিসেবে ব্যবহার করা হয়। "While properly applied insolation exercises a tonic effect on the body, it has been demonstrated that it is equally stimulating to the mind. The exposed subject is notably more cheerful and exhilarated and evidence has been adduced to show that mental responses are pronounced.······Such light treatment has its greatest therapeutic value in increasing and maintaining bodily tone and energy—its stimulating effect is seen in increasing fecundity." *

নগ্ন দেহের উপর সূর্য্যের আলো আর বাতাসের উপকারিতা বহু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আর পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে কিন্তু তা মেনে নিলেও এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এর জন্যে নিউডিজ্‌মের কি প্রয়োজন ? যদি দরকার হয় মানুষ'গুলো একা-একাই নিরালাভাবে রোদে বসে থাকতে পারে। এর জবাবে নিউডিজ্‌মের অন্যান্য উপকারিতার কথা এসে পড়ে।

(৪)

নিউডিজ্‌মের দ্বারা মানব সভ্যতার যে সকল মঙ্গল সাধিত হয়েছে তার মধ্যে নীতির দিকটাই বোধ করি সব চেয়ে বড়।

---

* Encylopaedia Britannica.

আধুনিক সভ্য মানুষের নিউডিজ্‌মের বিরুদ্ধে প্রধান যে আপত্তি তা হচ্ছে, এতে করে তার শ্লীলতাবোধকে আহত করা হয়। কিন্তু আগেই আমরা দেখিয়েছি শ্লীলতাবোধ মানুষের সহজাত নয়—প্রথাজাত এবং অতি শীঘ্রই এর হাত এড়ানো যায়। নিউডিষ্টরা নিঃসন্দেহ ভাবে এর প্রমাণ দিয়েছেন। বস্ত্রময় সভ্যতায় নগ্নতাকে যৌন এবং কাম-বিষয়ের আনুষঙ্গিক করা হয়। কেন তা সহজেই বোঝা যায়। সব সময়ে কাপড় দিয়ে লুকিয়ে রাখার ফলে মানবদেহ যৌন-আকর্ষণ-গুণবিশিষ্ট হয়ে পড়ে—যে গুণ সত্যি সত্যিই তার মধ্যে নেই। নগ্ন জাতির মধ্যে দেহের নগ্নতার দৃশ্যে কোন যৌন-উদ্দীপনা জন্মায় না। সভ্য সমাজে কৃত্রিমভাবে নগ্ন দেহের প্রতি যে কৌতুহল ও আকর্ষণ জন্মিয়ে দেওয়া হয় তারই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় অশ্লীল ছবির বাজারে এবং ইয়োরোপের music hall-এর মঞ্চে। আমাদের সমাজে লোকে প্রস্তুত নগ্ন চিত্র কিনে থাকে—কোন কোন বিখ্যাত খবরের কাগজে এর বিজ্ঞাপনও দেখা যায়। অনেকে স্ত্রীলোকের নগ্ন দেহ দেখবার ঔৎসুক্যে গণিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

মানুষের মধ্যে অপর sex-কে দেখবার একটা স্বাভাবিক স্পৃহা আছে। এই কৌতূহল শুধু যে স্বাভাবিক তা নয়—স্বাস্থ্যকর। ছেলেবেলা থেকেই এই কৌতূহল মানুষের মধ্যে আছে—যা সমাজে সহজ স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ হয় না। তার ফল হয় অতি বিপজ্জনক। মানুষের মনে একটা অস্বাস্থ্যকর কামনা জন্মায় যা দাঁড়ায় obsession রোগে। নগ্ন দেহ অযথা হয়ে দাঁড়ায় কামোদ্দীপক বস্তু। মানুষ হয়ে পড়ে লালসাপর, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, কামুক। সে লজ্জা অথবা লালসাকে বাদ দিয়ে মানব দেহের প্রতি তাকাতে পারে না। নগ্ন দেহের যে যৌন-আকর্ষণ, তা যে কৃত্রিম এবং হানিকর, এবং পুরুষ ও মেয়েদের একত্রে নগ্নতার অভ্যাস যে একটা সুস্থ সবল মনোবৃত্তি গড়ে তোলে এটা প্রমাণ করেছেন বলে নিউডিষ্টরা দাবী করেন।

এখনকার দিনে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক যৌন সম্বন্ধের উপর স্থাপিত। পুরুষ ও নারীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক—বিশেষতঃ প্রাচ্য দেশগুলিতে খুবই বিরল। এই একটা দিক যেদিকে নিউডিজ্‌ম্ মস্ত সাহায্য করবে। মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক তার ভিত্তি আর যৌন রইবে না। পোষাকের একটা মস্ত বড় গুণ

পুরুষ এবং মেয়ের যে যৌন-জনিত পার্থক্য তাকে অনর্থক বাড়িয়ে তোলা—এটা অবলুপ্ত হলে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক নিকটতর হবে।

কেউ কেউ আবার ভয় পান নিউডিজ্‌মের ফলে যৌন-আকর্ষণ হঠাৎ কমে গিয়ে মানব সমাজে জন্ম-সংখ্যা হ্রাস পাবে। এ যুক্তির প্রথম অংশটা ঠিক কিন্তু শেষেরটা নয়। শুধু পশু জগতের দিকে তাকালেই এটা চোখে পড়বে। নিউডিজ্‌ম্ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে জগৎ থেকে ভালোবাসা লুপ্ত হবে এর কোনো ভিত্তি নেই। ভালোবাসা বরং পবিত্রতর এবং বাস্তবতর হবে।

শিশু শিক্ষার "জন্যে নিউডিজ্‌ম্ অপরিহার্য্য। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর On Education নামক বইয়ে ছোটদের যৌন বিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন "A child should, from the first, be allowed to see his parents and brothers and sisters without their clothes whenever it so happens naturally." দেহকে অস্বাভাবিক ভাবে গোপন করায় শিশুদের মনে নানা-রকম ক্ষতিকর complex-এর সৃষ্টি হয়। মানব দেহ নিয়ে এবং বিশেষতঃ যৌন প্রদেশ ঘিরে যে একটা রহস্যের বেড়া তোলা হচ্ছে এটা শিশুদের বুঝতে একটুও দেরী হয়না—কারণ স্বভাবতঃই তারা নিজেদের এবং অপরের দেহ সম্বন্ধে জানতে উৎসুক। এই রহস্যের taboo থেকে শিশুদের মনে যে সকল complex-এর উৎপত্তি হয় তা দাঁড়ায় গিয়ে লালসাপর এবং অস্বাস্থ্যকর কৌতূহলে।"

(৫)

মানুষ-পোষাক আবিষ্কার করেছিল তার দেহকে সজ্জিত করে তার আকর্ষণ বাড়াবার জন্য। এই এক কারণে মানুষ পোষাক ত্যাগ করতে বিষম আপত্তি করে। পোষাক ত্যাগ করলে নাকি তাকে দেখতে অসুন্দর হবে। মানুষের দেহ যে সুন্দর নয়—তাকে ঢেকে রাখাই ভাল এ ধারণা খুব বিরল নয়। কিন্তু এটা অত্যন্ত ভুল। গ্রীক ভাস্কর্য্য যে কুশ্রী এ কথা কে বলবে? তাই বলে অবশ্য ঐ রকম সুশ্রী দেহ সকলেরই কিছু নেই। আসলে কারো কারো দেহ নিখুঁৎ সুন্দর, কেউ কেউ এমন আছে যার দেহ সত্যিই অসুন্দর; কিন্তু

অধিকাংশ মানব দেহই সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়। নগ্ন জগতে বহু সৌন্দর্য্য, যা আজ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তা প্রকাশিত হবে। যাদের দেহ অসুন্দর তারা চেষ্টা করবে তাদের দেহ যাতে সুন্দর হয়—তাকে দামী এবং সৌখিন কাপড়ের আড়ালে ঢেকে নয়, স্বাস্থ্যকর এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। এখন আমরা যা দিয়ে সৌন্দর্য্যের বিচার করি সে মাপকাঠি বদলে যাবে। এখনকার জগতে যার মুখ রম্য এবং পোষাক ফিটফাট তাকেই আমরা বলি সুন্দর। কিন্তু নগ্ন জগতে প্রশংসা পেতে হলে সমস্ত দেহকে সুন্দর করে তুলতে হবে। মানবতাকে সুন্দর করে তোলবার কাযে নিউডিজ্‌ম্ বৃহৎ একটা শক্তি যোগাবে।

মানুষের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে নিউডিজ্‌ম্ মস্ত সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ যদিও গত চল্লিশ পঞ্চাশ শতকের মধ্যে উন্নতির পথে বিরাটভাবে এগিয়ে গেছে, তবু যে পরাকাষ্ঠা তার পক্ষে সম্ভব তার থেকে সে এখনও অনেক দূরে। শ্রমশিল্পের সভ্যতা তাকে যন্ত্র করে তুলেছে এবং জীবন এত ঝুটো হয়ে গেছে যে সে ভুলে গেছে কেমন করে প্রকৃতিকে উপভোগ করা যায়। তার কর্ম্মের অবসর বেড়েছে বটে, পূর্ব্ব যুগের মতো উপবাসের ভয় তার নেই, সারা পৃথিবীতে সে আজ ঘুরে বেড়াতে পারে এবং বহু দূরের মানুষের সঙ্গে সে আজ কথা বলতে পারে, কিন্তু তার সংস্কৃতি এর তুলনায় কতটুকুই বা এগিয়েছে! সে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে 'মানুষ' হয়ে ওঠেনি। যন্ত্র এসে তার জীবনের আনন্দের পথে বাধা দিয়েছে, তাকে গ্রাস করেছে, সে হয়েছে যন্ত্রের ক্রীতদাস। কিন্তু মানুষের জীবনের আনন্দের উৎস আসা উচিত প্রকৃতি থেকে—যন্ত্র থেকে নয়।

শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্যে নারী-চরিত্রের ক্রমবিকাশ

বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের দান যে অতুলনীয়, এ কথা অনস্বীকার্য। তবে তাঁদের সাহিত্যের সৃষ্টি-ধারায়, চরিত্র-বর্ণনার কারু-কার্যে, মানব মনের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণে প্রত্যেকের সৃষ্টির গতি ও দৃষ্টির ভঙ্গিমা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মহিমায় বিভিন্নমুখী। এবং নিজস্ব আদর্শ ও রুচিতে পৃথক। এর কারণ সাহিত্য সমাজেরই প্রতিচ্ছবি, এবং চলিষ্ণু যুগেরই প্রভাব সাহিত্য-মুকুরে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, কালের বিবর্তন ধারায় তাই সাহিত্য পরিবর্তিত, মার্জিত ও উন্নত হয়।

শিক্ষার সহিত রস পরিবেশনই বঙ্কিম সাহিত্যের মুখ্যতম লক্ষ্য ছিল, তাই তাঁর চরিত্র সৃষ্টির অন্তরালে, একটি আদর্শের ফল্গুধারাই নিরন্তর প্রবাহিত, এই বিশিষ্ট বিকাশ নারী চরিত্রেও মূর্ত হয়ে রয়েছে।

কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের উপাসক। তাই তাঁর কাব্যের লীলা প্রাঙ্গনে সৌন্দর্যের পরিবেশই আমরা দেখতে পাই, গল্প উপন্যাস, নাট্য প্রভৃতির নারী চরিত্রে কোনও নির্দিষ্ট ইঙ্গিত সুস্পষ্ট নহে, প্রগতিশীলাই প্রধান নায়িকা-গুলির চরিত্র।

শরৎ-সাহিত্যের ভিত্তি গণতন্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত। মানুষ তাই মানুষের অধিকার, মানুষের মর্যাদা পেয়েছে তাঁর সৃষ্টিলিপিতে, বাস্তব রাগিণীতেই তাঁর চরিত্রগুলি অনুরণিত, যেন দরদেরই উৎস সে সাহিত্য। তাই তিনি অন্তর দিয়ে নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্তর্রহস্য, মনস্তত্ত্ব আপন অন্তরে অনুভব করেছেন, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বাঙ্গালী মেয়ের চরিত্র চিত্রিত করেছেন। সেবা, যত্ন, স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমা, নিষ্ঠা, সংযম, ত্যাগ এইগুলি নারী স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এবং শরৎ-সাহিত্যেও প্রত্যক্ষ বিকশিত হয়ে উঠেছে।

তাহলেই বোঝা যায় সাহিত্যের অঙ্গনে এই ত্রয়ী সাহিত্যরথীর সৃষ্টি কালের বিবর্তের ধারায় বিভিন্নমুখী। নারী চরিত্রেও সেই দৃষ্টি ভঙ্গিমা বিবৃত এবং চিত্রিত।

মানব স্বভাবে কতকগুলি বৃত্তি অত্যন্ত সহজাত ও স্বাভাবিক। যেমন যৌবনের প্রেম, প্রত্যেক সাধারণ মানুষের জীবনে তা আসে এবং প্রেমমূলক উপন্যাসই গল্প-সাহিত্যের মুখ্যতম বিষয়বস্তু। তবে এই প্রেমের দুইটি দিক আছে; একটি স্বচ্ছন্দ, অপরটি আবর্তিত ছন্দে প্রবাহিত। সমাজের সমর্থন নেই যে প্রেমে, সেই প্রেমই আবর্ত্তিত ছন্দে প্রবাহিত এবং নর-নারীর পরস্পরের প্রতি সেই চিত্তানুরাগকেই বলে পরকীয়া প্রেম, যে পরকীয়া প্রেম উপন্যাস-সাহিত্যের অন্যতম রসপরিপুষ্ট প্রাণবস্তু।

আর পুরুষের প্রতি বিধবার চিত্তানুরাগ, সমাজের চোখে দোষণীয় হলেও স্বভাব সুলভ সময়ের সান্নিধ্যে সমাজের চেয়ে হৃদয়প্রেরণাই বড় হয়ে উঠে। তাই বঙ্কিমের কুন্দ এবং রোহিণী, নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালকে ভালোবেসেছিল, শরৎচন্দ্রের রমা, রাজলক্ষ্মী ও বড়দিদি রমেশ, শ্রীকান্ত ও মাষ্টার মশাইকে ভালোবেসেছিল, বিনোদিনীর চিত্তানুরাগ মহেন্দ্রের কেন্দ্রেই উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু নারী চরিত্রের ক্রম-বিকাশে এই ত্রয়ী শিল্পীর তুলিতে নারীর সেই প্রেমের পরিণতি বিভিন্ন স্তরে রূপায়িত হয়েছে। আদর্শবাদী বঙ্কিম-সাহিত্যে বিধবার আত্মসমর্পণ সমর্থন যোগ্য হয়নি ব'লে মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্তের মধ্যেই এই দুইটি নারীর কলঙ্কিত জীবন পরিসমাপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রগতিশীলা বিনোদিনীর অতৃপ্ত প্রেম বেহারী ও মহেন্দ্রের কেন্দ্রে অকুণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল, আশাকে সে চোখের বালি নামে ডাকতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি।

গণতান্ত্রিক শরৎ-সাহিত্যে সেবা, স্নেহ এবং কল্যাণের জীবন্ত প্রতিমা রমা, রাজলক্ষ্মী এবং বড়দিদির নিঃসঙ্কোচ প্রেম রমেশ, শ্রীকান্ত ও সুরেনের লক্ষ্যে প্রবাহিত হয়েছে, তাই শ্রীকান্ত গ্রামে ফিরে এসে রোগশয্যায় নির্ভীক কণ্ঠে গ্রামের আত্মীয় বন্ধুদের সম্মুখে কুণ্ঠিতা রাজলক্ষ্মীকে বলেছে—"তুমি তোমার স্বামীর সেবা করতে এসেছ এর জন্য ভয় কী?" অন্তরের অকৃত্রিম যোগ ছিল বলেই বড়দিদির সঙ্গে সুরেনের পুনর্বার সাক্ষাৎ হয়েছিল। নারী চরিত্রের অবিসম্বাদী সত্য পরিচয়ই শরৎ-সাহিত্যের বাস্তব চরিত্র অঙ্কনে বিধবার প্রেমে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের হীরা, রবীন্দ্রনাথের রুক্মিণী ও শ্যামা, শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখী,

বিজলী ও সাবিত্রী যে-ধরণের মেয়ে, সমাজে তাদের স্থান গৌরবের নয়, নিম্নস্তরে; সমাজের পঙ্কিল স্রোতে তারা আবর্তিত, অর্থাৎ লোকচক্ষে তারা চরিত্রহীনা নারী। কিন্তু স্রষ্টার চরিত্র-সৃষ্টির বিভিন্নতায় তাদের হৃদয়বৃত্তির পরিণতি আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষায় বিভিন্নতর হয়েছে।

বঙ্কিমের হীরা কুন্দর সর্বনাশ সাধনে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে কুকার্যের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কৃতকার্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের দুর্বিষহ মৃত্যু হীরার মস্তিষ্ক বিকৃতিতে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রুক্মিণীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিকৃত-মস্তিষ্ক ঘটলেও যে তার প্রিয়তম উদয়-দিত্যর যোগ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করেছিল সেই সুরমাকে হত্যা করতে সে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়নি, শয়তান ওর মনে যে বাসা বেঁধেছিল, উন্মুখ প্রতিশোধের আত্মতৃপ্তিতে তা জয় লাভ করেছিল। শ্যামার হৃদয়বৃত্তিও অনুরূপ, কিন্তু যে তার কামনার বিজয় অভিযানে সাফল্য লাভ করেছিল ব'লে শান্ত ও সংযত ছিল।

পতিতা নারীর চরিত্র চিত্রনে বঙ্কিম দেখলেন ব্যর্থতাই তার চরম পরিণতি, রবীন্দ্রনাথ দেখালেন শয়তান-প্রভাবান্বিত শক্তি অসৎ কার্যেও সার্থকতা লাভ করতে পারে। বাস্তব জীবনে এই দুইটি চিত্রই সত্য।

কিন্তু সাহিত্যের ক্রম-বিবর্তন-ধারায় শরৎচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কনে আমরা ভিন্ন রূপ দেখতে পাই। মানুষ মাত্রই ভুল, দোষ, পাপ সব কিছুই করে, কিন্তু তার পাশেও যে চরিত্র মহিমা থাকতে পারে, এরই প্রকাশ শরৎ-সাহিত্যের লিপিচাতুর্যের বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর পতিতা নারীর কলঙ্কিত চরিত্রেও মহিমান্বিত অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রমুখী দেবদাসের সাহচর্যে এসে তার ঘৃণিত জীবন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে দেবদাসকে ভালোবেসেছে। সত্যেনের সংস্পর্শেই বিজুলী তার বাইজী জীবন পরিত্যাগ করেছিল। সাবিত্রীর চরিত্রেও যথেষ্ট মহত্ত্বের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কণ্টকিত গোলাপের সুন্দর সমাবেশ, কলঙ্কিত চাঁদের মিষ্টি জ্যোৎস্না যেন শরৎ-সাহিত্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

বঙ্কিমের সূর্যমুখী ও ভ্রমর, রবীন্দ্রনাথের মৃণাল, কুমু, বিভা, শর্মিলা, বিমলা, চারু, হরসুন্দরী, নীরজা এবং শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী ও কমল নানারূপ

আবর্তিত ঘটনার বিপর্যয়ে স্বামী প্রেম পরিত্যক্তা নারী। ভালোবাসার কাঙাল ছিল ওদের রিক্ত অন্তর, সংসার প্রাঙ্গণে ওরা সত্যই বঞ্চিতা।

কিন্তু ত্রয়ী শিল্পীর সৃষ্টির বিভিন্নতায় এদের মনঃবিশ্লেষণ বিভিন্ন চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। বঙ্কিমের সূর্যমুখী ও ভ্রমর স্বামীর প্রেম সম্ভারে একদিন পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু ভাগ্য পরিহাসে তারা সে ভালোবাসা হারিয়েছিল, তবে তার জন্য বিবাদ প্রতিবাদ কিছুই করেনি, যে ব্যথা তারা পেয়েছিল, তা শুধু তাদের অন্তর আকাশে পুঞ্জিত অভিমানে স্তূপীকৃত হয়েছিল। সূর্যমুখী স্বামীকে একদিন ফিরে পেয়েছিল, কিন্তু ভ্রমরের সে বিরাট অভিমান মৃত্যুর তুহিন সান্নিধ্যেই পরিসমাপ্তি হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের নীরজার ভাগ্যলিপি কতকটা এই ধরণের। স্বামীর ভালোবাসা হারিয়ে তার অনাদির সয়ে নিতে পারেনি ব'লে তিলে তিলে সে মৃত্যুকে বরণ কোরে নিয়েছিল। বিভা, শর্মিলা, হরসুন্দরী স্বামীর সম্বন্ধে সবই উপলব্ধি করতো, তবে প্রতিবাদও করেনি তারা, মৃত্যুও বরণ করেনি, বিরাট সহিষ্ণুতা দিয়ে চঞ্চল অন্তরকে আয়ত্তাধীন করতে সমর্থ হয়েছিল। তবে কালের বিবর্তনে প্রগতিপরায়ণা কুমু এবং মৃণাল বঞ্চিত স্বামীপ্রেমে শুধু সঞ্চিত অভিমানে গুমরে মরেনি, অন্তরের বিতৃষ্ণায় স্বামীর প্রতি ওরা বিক্ষিপ্তা ও বিদ্রোহী হয়েছিল। তবে সন্তানের অভ্যাগমে শেষ পর্য্যন্ত কুমুকে স্বামীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু বিমলা ও চারুর স্বামী-প্রেম-রিক্ত মন, অভিমানে গুমরে মরেনি, অথবা বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি, সঙ্গোপনে তারা অন্য পথে প্রবাহিত হয়েছে। চারু তার স্বামীকে যথেষ্ট সেবা যত্ন করলেও ওর অতৃপ্ত চিত্ত অমরকে ভালোবেসেছিল, তারই সঙ্গে সে স্বর্গ রচনা চেয়েছিল। বিমলার ব্যর্থ জীবন সন্দীপের প্রতি লুব্ধ হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী ও কমল কতকটা এই ধরণের মেয়ে। কিরণময়ী রুগ্ন স্বামী সাহচর্যে আত্মতৃপ্তি পায়নি ব'লে দিবাকরের সঙ্গে সে গৃহ ত্যাগ করেছিল, তবে সেখানেও সে আত্মার সার্থক সন্ধান পায়নি, শিল্পী শেষ পর্যন্ত তাই দেখালেন।

ব্যর্থ কমলের পিপাসিত আত্মা মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ বিচরণে অবাধ ছিল, তার

জন্য সে কুণ্ঠিত হয়নি। অথচ আচারে বিচারে সংযম সাধনাকেও সে তুচ্ছ করেনি, এই লিপিচাতুর্যই শরৎ-সাহিত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

স্বামীকে ভালোবাসতে যে নারীর মনে দ্বন্দ্ব ওঠে, তার চিত্র বঙ্কিমের শৈবলিনী ও কপালকুণ্ডলার চরিত্রে, রবীন্দ্রনাথের কমলার অন্তর-বিশ্লেষণে, শরৎচন্দ্রের অচলা, সৌদামিনী, পার্বতীর হৃদয়-পরিচয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মন কোথাও বাঁধা থাকলে আবার ভালোবাসার কারবারে বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে সে। তাই বনবালা কপালকুণ্ডলা আশৈশব প্রকৃতির আবেষ্টনে মানুষ হয়েছিল, ভালোবেসেছিল বনজঙ্গলের লতাপাতা পশুপক্ষীকে, তাই সে স্বামীকে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি, সুবিধে যেদিন পেলো হাল্কা বাঁধন খুলে চলে গেল, মৃত্যুকে নিল বরণ করে। শৈশবের সহচর প্রতাপকে শৈবলিনী ভালোবেসেছিল বলে স্বামীকে খুশী অন্তরে গ্রহণ করতে পারেনি, প্রতাপকে পাওয়ার ব্যর্থতায় সে কী না করেছে, কিন্তু আদর্শবাদী বঙ্কিমের সৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত তাকে স্বামী-অনুরাগ-সম্পন্নই হতে হয়েছিল। এই চরিত্র অঙ্কনই বঙ্কিম সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, আদর্শবাদী সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথের কমলা দৈব দুর্বিপাকে রমেশকে স্বামী ব'লে জেনেছিল ব'লে তাকে ভালোবেসেছিল, তবে রমেশের কাছে সে স্ত্রীর অধিকারের সম্পূর্ণ সমর্থন পায়নি বলে ব্যর্থ অন্তর ওর ছিল বিতৃষ্ণা, ব্যথিত। কিন্তু কবি শেষ পর্যন্ত কমলার স্বামীর সঙ্গেই তার মিলন ঘটিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের অচলা মহিমকে বিবাহ করলেও, তাকে ভালোবাসতে পারেনি বলে পূর্ব বন্ধু সুরেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত তাকে মহিমের আশ্রয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। স্বামীকে প্রত্যাখ্যান ক'রে পূর্ব প্রেমিক নরেনকে সৌদামিনী ভালোবাসলেও স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেমে ওকে একদিন আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল, সেই মহান অন্তরের আবর্তে নরেনের প্রতি ওর চিত্তানুরাগ দূরে ভেসে গেছলো। পার্বতীর মনের মণি-কোঠায় দেবদাস চিরজাগ্রত ছিল, কিন্তু সে কর্তব্যের দিক থেকে স্বামীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো, দেবদাসের মৃত্যু ওর সে পথ আরও প্রশস্ততর কোরে দিয়েছিল।

কালের বিবর্তন ধারায় সাহিত্যও যে পরিবর্তিত হয় এ কথা যথার্থ; কিন্তু

বড় লোকের চিন্তার ধারা সত্যই যে একরূপ তার প্রত্যক্ষ পরিচয় এই ত্রয়ী শিল্পীর পূর্ব রাগ সম্পন্ন নারী চরিত্র অঙ্কনে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

বিবাহিতা রমণীর পূর্বরাগ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম কারও কল্পনাতেই সমর্থনযোগ্য হয় নি। তবে কুমারী মেয়ের পুরুষের প্রতি অনুরাগ ত্রয়ী শিল্পীর তুলিতে ভিন্ন রূপে বিকাশ লাভ করেছে। বঙ্কিমের রাধারাণী, রজনী, রবীন্দ্র-নাথের ললিতা, সুচরিতা, উর্মিলা, লাবণ্য, শরৎচন্দ্রের বিজয়া, বন্দনা, ললিতা, মৃণাল ও জ্ঞানদা নিজ রুচিমত পুরুষকে ভালোবেসেছিল, বিবাহের পূর্বে প্রেম-বিপর্যস্ত ওদের চিত্ত হয়েছিল।

বৃষ্টি-আপ্লুত সন্ধ্যার এক শুভ লগ্নে যে যুবকটা রাধারাণীর কিশোর মনে ছাপ দিয়ে গেছলো, সেই মধুর স্মৃতিটি বুকের নিভৃত কন্দরে চির জাগ্রত রেখে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সে তার প্রিয়তমের প্রতীক্ষা ক'রেছিল এবং দীর্ঘ আট বৎসর পর সেই দেবেন্দ্রনাথকেই আত্মসমর্পণ ক'রে ধন্য হয়েছিল। অন্ধ রজনী ওর অজান্তেই শচীন্দ্রনাথকে ভালোবেসেছিল এবং চিত্তের একনিষ্ঠতা দিয়ে তাকে জয় ক'রেছিল। এই কুমারী মেয়ের প্রেমের সার্থকতাই বঙ্কিম সাহিত্যের আদর্শ রক্ষার বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের সুচরিতা, ললিতার সু-অদৃষ্ট অনেকটা এই ধরণের, নবীন চিত্ত যাদের তারা সমর্পণ ক'রেছিল, হৃদয়ের একাগ্রতা দিয়ে সেই বিনয় ও গোরাকে তারা লাভ ক'রেছিল। তবে উর্মিলা ও লাবণ্যর প্রেম সার্থকতা পায়নি, কতকটা তাদের ভুল ভালোবাসার দরুন, কতকটা খেয়ালী মনের আবেগে।

উর্মিলা ভুল ভালোবেসেছিল তার ভগ্নীপতি শশাঙ্ককে, ও তার অপরাধী প্রেমকে বুঝতে পারতো, কিন্তু মনকে আয়ত্ত করতে পারতো না বলে ওর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো, শেষ পর্য্যন্ত সে শশাঙ্কর গৃহত্যাগ ক'রে মুক্তি পেয়েছিল। অমিত রায়কে জয় করতে কে টি মিটার, বি সি বোস পরাস্ত হয়েছিল, সেই অমিতকে জয় করলো লাবণ্য কিন্তু প্রেম প্রাত্যহিকের হয়ে যাবে ব'লে সে তাকে বিবাহ করলো না। চরম আধুনিকতায় তাদের প্রেম বিকশিত হয়েছে, সম্পূর্ণ চলিষ্ণু যুগেরই নারী তারা। শরৎচন্দ্রের বিজয়া, বন্দনা, ললিতা ও জ্ঞানদা অত্যন্ত প্রগতিশীলা মেয়ে নয়, তবে তাদের একটা

স্বাধীন সত্তা ও মত ছিল। তাই বন্দনা অশোককে বিয়ে করেনি, বিপ্রদাসের প্রতি অনুরাগ সে চেপে নিয়ে দ্বিজদাসকেই বিবাহ করেছে। এই তিনটি পুরুষ ওকে প্রেম-সায়রে কূলহারা ক'রেছিল কিন্তু ও অত্যন্ত সংযত চিত্তে উপযুক্ত পথ বেছে নিয়েছে। বিজয়া জানতো বিলাস তাকে ভালোবাসে, কিন্তু সে নরেনকে বিবাহ করলো, কারণ সে তাকেই আত্মসমর্পণ ক'রেছিল। মৃণাল জানতো ওর প্রেম ব্যর্থ তাই সে সঙ্গোপনে নিজেকে চেপে নিয়েছিল। শেখরের প্রতি ললিতার সঞ্চীয়মান প্রেম ওর একনিষ্ঠ তপস্যাতেই সাফল্য লাভ কোরেছিল। পল্লীগ্রামের অরক্ষণীয়া বালিকা জ্ঞানদার মূক অনুরাগ ব্যর্থ হয়নি, অতুলকে সে স্বামীরূপে পেয়েছিল।

বঙ্কিমের ইন্দিরা, রবীন্দ্রনাথের সুরমা, শরৎচন্দ্রের সরযূর ভাগ্যলিপি কতকটা এক ধরণের, কালের বিবর্তনে তাদের চরিত্রে কোনও পার্থক্য অনুভূত হয় না। এদের পতী পত্নীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অকৃত্রিম একনিষ্ঠতা ছিল কিন্তু সংসারের নানারূপ সংঘর্ষে এরা স্বামী প্রেম বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তবে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর মিলনও আবার তাদের হয়েছিল। শুধু সুরমাকে শত্রু নিহত করেছিল।

ভালোবাসা ছাড়াও আর দুটি দিকে মেয়েরা বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, একটি কর্মের, অপরটি জননীর। বঙ্কিমের দেবী চৌধুরাণী, শান্তি, রবীন্দ্রনাথের এলা, শরৎচন্দ্রের ভারতী কর্মী নারী। একটি আদর্শের মধ্যে দিয়ে দেবী চৌধুরাণী জনসেবা করেছিল, আনন্দমঠের উন্নতিই ছিল শান্তির জীবনের ধ্যান জ্ঞান স্বপন, বিরাট ত্যাগের সঙ্গে মাতৃসেবায় সে আত্মোৎসর্গ করেছিল। দেশ নায়ক অতীন্দ্রের যোগ্যা সহকর্মিনী ছিল এলা। শরৎচন্দ্রের ভারতী দেশের জন্যই আত্মসমর্পণ ক'রেছিল, সব্যসাচীকে অনেক প্রেরণা দিয়েছিল, অপূর্বকে সে যথেষ্ট ভালোবাসলেও দেশের প্রতি তার একনিষ্ঠতা ছিল না ব'লে, তাকে সে অবজ্ঞা করতো।

জননী মাত্রই মাতৃত্বের গরিমায় মহিমান্বিতা। শুধু প্রকাশ ভঙ্গিমায় যা একটু পার্থক্য দেখা যায়, সে পার্থক্য শুধু চলিষ্ণু যুগেরই প্রভাব। তাই বঙ্কিমের মাতৃচিত্রে নীরব অপত্য স্নেহ তার অন্তরকে উদ্বেল করেছে, ক্রন্দসী করেছে তবু প্রতিবাদ ও প্রতীকারের পথ হয়নি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মাতৃস্নেহ অকুণ্ঠিত এবং নির্ভীক, নীরব নয়।

নীরবতা এবং নির্ভীকতা এই দু'এর সংমিশ্রণে যে বাৎসল্য প্রেম'অনির্বচনীয় মধুর হয়ে ওঠে সেই সন্তান স্নেহই শরৎচন্দ্রের চিত্রিত মাতৃত্বকে গরিমাময় করেছে, পরিপূর্ণ জননীর গৌরবই এই সৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য যুগের প্রতিচ্ছবি, সমাজের মুকুর, তাই কালের বিবর্তন ধারায়, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির চরিত্রলিপি ও দৃষ্টিভঙ্গিমায় প্রচুর বিভিন্নতা ও পার্থক্যের সমাবেশ হয়েছে; এর মূলে রয়েছে স্রষ্টার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, শিল্পীর রুচির পার্থক্য, এবং কালের চলিষ্ণু প্রভাব।

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

আধুনিক বিজ্ঞান ও জনগণ

ঐতিহাসিকরা বলেন, মানব সভ্যতার প্রথমাংশ ছিল প্রকৃতির যুগ; তারপর এলো দর্শনের যুগ এবং আমাদের যুগটা হচ্ছে বিজ্ঞানের। ব্যবহারিকবাদ যে আধুনিক-মনের একাংশে নিজের অধিকার বিস্তৃত করেছে, এর মূলে আছে আমাদের জীবনের সর্ব্ববিভাগে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাব, সভ্যতার মধ্য অবস্থায়, অর্থাৎ দর্শনের যুগে, প্রথমে ছিল বিস্ময়—বিস্ময় থেকে এলো বোধ—এবং সর্ব্বশেষে যখন সন্দেহ ও বিচার মনকে অধিকার করল তখনই হ'ল বিজ্ঞানের জন্ম।

একশো বছর আগে ডারউইন যখন প্রমাণ করলেন—মানুষ শাপভ্রষ্ট স্বর্গদূত নয়, তখন ধর্ম্মের সংস্কারে বাঁধা মন যে ঘা খেল তারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তখনকার চিন্তাশীলদের উগ্র নাস্তিক্যবাদের মধ্য দিয়ে। অতঃপর বস্তুরহস্য ভেদ করতে গিয়ে বোঝা গেল যে স্থূল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের বিভিন্ন ব্যবহার যেমন বৈজ্ঞানিক নিয়মের সূত্রে বাঁধা যায়, সূক্ষ্ম অণু পরমাণুর প্রকৃতি কিন্তু সে নিয়ম মেনে চলে না। এই আবিষ্কারে বিজ্ঞানের চড়া সুর কিঞ্চিৎ মোলায়েম হ'ল।—তখন কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সূক্ষ্মের বিকৃতিই হ'চ্ছে স্থূল—কারণ সমষ্টির মধ্যে এমন অনেক গুণ দেখতে পাওয়া যায় যা এককের গুণের সম্পূর্ণ বিপরীত: এবং সূক্ষ্মের সমষ্টিই হচ্ছে স্থূল। অতএব পরমাণুর অন্তর্প্রদেশে ইলেকট্রন্, প্রোটনের গতি যদি নিউটনের ব্যবহারিক গতির নিয়ম না মানে তবে সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।—এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই কথা বলে সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন। আসলে কিন্তু সমাধান করার চাইতে প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে যাবার দিকেই তাদের লক্ষ্য বেশী ছিল।

জনসাধারণ কিন্তু এদের কথায় তৎক্ষণাৎ অভিভূত হল এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়বাদের মিতালি পাতিয়ে দিয়ে পুলকিত হ'ল—কারণ তাদের অবচেতনায় ধর্ম্মের সংস্কার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। যদিও যুক্তিবাদের প্রতি আধুনিক মনের ঝোঁক বেশী, বিশ্বাস করবার আদিম ইচ্ছাটাকে সে কিছুটা

সংহত করতে পারলেও সম্পূর্ণভাবে যে কাটিয়ে উঠতে পারেনি সেটা মনস্তাত্বিক মাত্রই জানেন। অবশ্য এখানে জনসাধারণ বলতে প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত সমাজই বোঝাচ্ছে। বিগত যুদ্ধের বেহিসাবী ধনক্ষয় এবং প্রাণক্ষয়ের বীভৎস স্মৃতি লোকের মনকে যে ধাক্কা দিয়েছিল তার থেকে তারা সামলে উঠতে পারেনি. এবং বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের এই নিরর্থকতা, অসারতা ও মহাক্ষতিময় পরিণামের জন্যে উত্তর সামরিক নিরালম্ব সমাজমন মুখ্যতঃ বিজ্ঞানকেই দায়ী করেছিল, কারণ আধুনিক বোমাবর্ষী বৈমানিক যুদ্ধের সাফল্য বিজ্ঞানেরই প্রয়োগে। যুদ্ধের টেক্‌নিক যে ক্রমশই ভয়াবহ রকমের নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠছে, সেটা বিজ্ঞানেরই ক্রমোন্নতির ফলে। সুতরাং গণমন অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে তা স্বাভাবিক। হিসেব খতিয়ে দেখতে গেলে মোটের উপর অবশ্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান মানুষের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই বাড়িয়েছে,—চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফলিত রসায়ন ও বিদ্যুৎ-যন্ত্রের হাজারতর উৎপাদন বাদ দিয়ে আধুনিক জীবনযাত্রা অসম্ভব। তবু বিজ্ঞানের সামরিক প্রয়োগ মানুষের জীবন থেকে স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে বলতেই হবে। সুতরাং দুই দশকের মহা উপনিপাতের পর রক্তক্ষরণক্লান্ত ও অর্থক্লিষ্ট পৃথিবী যে বিজ্ঞানের ব্যর্থতার প্রতি সচেতন হয়ে উঠল, সেই সচেতনতা রূপ পেল এডিংটনের The Scietific Analysis, সালিভ্যানের Limitations of Science. জীন্‌সের Into the Deep Waters প্রভৃতি রচনায়। সঙ্গে সঙ্গে এঁরা জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তাছাড়া যুদ্ধে আহত প্রিয়জনের বিয়োগ-বিধুর জনসাধারণ স্বভাবতই সান্ত্বনা খুঁজছিল ধর্ম্ম-সঙ্ঘ-শরণচ্ছায়ে, যার ফলে এই সময়কার ইউরোপ আমেরিকায় নতুন করে ধর্ম্মের স্রোত বয়ে গেল এবং Christian Science প্রভৃতি মতবাদের জন্ম হল, যে মতবাদ খৃষ্টের পরাতত্ত্ব ও ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম্ তত্ত্বের হাস্যকর সংমিশ্রণ।

অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের মিষ্টিসিজ্‌মের প্রতি খানিকটা প্রবণতা আছেই। সুতরাং এইদিক দিয়ে যদি তাদের কাছে বিজ্ঞানকে পরিচিত করিয়ে দেবার পথ বেছে নেওয়া হয় তবে অচিরে তাদের মনোহরণ করা যাবে সন্দেহ নেই ;—সম্পূর্ণ এই কারণেই না হলেও খানিকটা অন্ততঃ এই কারণে আমাদের সময়ের একদল বৈজ্ঞানিক—যারা বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে

পরিচিত করে তুলবার ভার নিয়েছেন—তাঁরা স্বভাবতই বিজ্ঞানের Objective দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রহস্য অবৈজ্ঞানিক জনগণের কাছে প্রকাশিত করে দেবার জন্যে তাদের কেউ কেউ এক অদ্ভুত আধা-বৈজ্ঞানিক আধা-দার্শনিক ধরণের রীতি প্রচলন করেছেন। আবার কেউ বা সম্পূর্ণ Subjectivity-র উপর নির্ভর করেছেন।—এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, জনসাধারণের মনে বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাতে পারছে না। দার্শনিকতার ছোঁয়াচ লেগে তাদের মনে অবজ্ঞাত আইডিয়াগুলি রীতিমত পুষ্টিলাভে বাধা পাচ্ছে এবং তাদের চিন্তাধারাটা বিজ্ঞানে অনুসরণে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই অপরিপক্ক দার্শনিকতার ধোঁয়াটে আবছায়ার মধ্যেই বিলুপ্ত হচ্ছে। উপরি উক্ত বৈজ্ঞানিক শ্রেণী অবশ্য এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন যে, বিজ্ঞানকে ক্রমশই তাঁরা সুলভ করে তুলেছেন;—আসলে কিন্তু তাঁরা জনসাধারণকে যা দিচ্ছেন তার মধ্যে দুধের ভাগ সামান্য আর জলের ভাগ পরিমাণ প্রচুর। অবশ্য একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ রকম করা ছাড়া উপায় নেই; কারণ জন-সাধারণের ক্ষুধা প্রবল হলেও হজমশক্তি এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাদের এই হজমশক্তির দুর্ব্বলতা দূর করার দুরূহ ভার বিশেষ কেউ গ্রহণ করছেন না; জুলিয়ান্ হাক্স্লী, হাইম্যান্ লেভী, ল্যান্সিলট্ হগ্‌বেন্ প্রমুখ কয়েকজন নবীন জীবতত্ত্ববিদ কিছুদিন থেকে এই দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন,—অত্যন্ত ভরসার কথা, সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি যতক্ষণ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম না করতে পাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জনগণের কাছে এই মরমী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হবার ফল বিপরীত হতেই হবে। যারা পদার্থের গুণাবলী সম্বন্ধে গোড়াকার কথা সম্বন্ধেই অজ্ঞ, তাদের কাছে পরমাণুবাদের মত পদার্থাতীত (abstract) তত্ত্বকথা দুষ্পাচ্য হতে বাধ্য। আমি এখানে পরিণত বুদ্ধি জনসাধারণের কথাই বলছি যারা স্কুলজীবনে প্রাথমিক বিজ্ঞানের শিক্ষা পেলেও উচ্চতর বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ। সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে খুব কম জনাই অঙ্কে রীতিমত অভ্যস্ত। অথচ শতকরা একশ' জনাকেই আইনষ্টাইনের 'সম্বন্ধবাদ' বোঝাতে গিয়ে জেমস্ রাইস্, বোল্‌টন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা নিজেরা ত' গলদঘর্ম্ম হয়েছেনই

পাঠকবর্গের মস্তিষ্কও সেই সঙ্গে একেবারে ঘোলাটে ক'রে তুলেছেন। একজন সাধারণ ব্যক্তিকে সম্বন্ধবাদ বোঝাবার আগে তাকে যে অঙ্ক সম্বন্ধে কিছুটা অন্ততঃ যোগ্য ক'রে তুলতে হবে সে কথাটার বিস্মৃতি প্রায়ই ঘটে এবং যদি বা এই বিভ্রম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অকস্মাৎ সচেতন হন তবে তিনি এটা পূরণ ক'রে নেবার চেষ্টা করেন সেই অবশ্যম্ভাবী দার্শনিকতার মধ্যে ফিরে গিয়ে। ফলে পাঠক 'সম্বন্ধবাদ' সম্বন্ধে শেখে সামান্য কিছু অর্দ্ধসত্য এবং অনেকখানি মিথ্যা ; এই রকম প্রমাদযুক্ত জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে যে যখন তাকায়, তখন বিশ্বপ্রকৃতির বিকৃত রূপটাই সে দেখে। অঙ্ক বাদ দিয়ে 'সম্বন্ধবাদ' বোঝানও যা বিনা যন্ত্রণায় দাঁত উপড়ে ফেলাও তাই—এই কথাটা যে বৈজ্ঞানিকের মনে আসে না সেটাকে জনগণের পক্ষে একটা রীতিমত দুর্ভাগ্য বলতে হবে। এই দুর্ভাগ্যের চরম কুফল ফলে তখনই যখন দেখা যায় যে কোনও পথ-চলতি লোকও প্রাক্-আইনষ্টাইনীয় সব কিছু বিশ্বগাণিতিক হিসাবকেই ভুল এবং পুনরপি অব্যবহার্য্য বলে সরবে ঘোষণা করে। একথা খুব কম জনাই জানেন যে আইনষ্টাইন্ আধুনিক চিন্তার জগতে একটা বিপ্লব এনে থাকলেও তাঁর পরে অঙ্কশাস্ত্রের, জ্যোতিষ্ক-বিজ্ঞানের অথবা পদার্থতত্ত্বের পুরাতন অধ্যায়গুলো খুব সামান্যই বদলেছে এবং যা বদলেছে তাও আবার কেবলমাত্র সম্বন্ধবাদের প্রভাবেই নয়, তাদের নিজস্ব গবেষণা ও উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান সঞ্চয়ের ফলেই।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতের যে আবিষ্কারগুলি মানবিক প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক হিসাবে উল্লিখিত হতে পারে সেইগুলি সম্বন্ধেই জনসাধারণ সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ। আণবিক-তত্ত্ব, কোয়াণ্টাম থিয়োরী, সংখ্যাতত্ত্ব (theory of, numbers), ষ্ট্যাটিস্টিক্স, প্রভৃতি বিষয়গুলি সাধারণ বুদ্ধির এক রহস্যঘেরা অস্পষ্ট প্রদেশে বিরাজমান, অথচ এই বিদ্যাগুলি সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তুলবার চেষ্টা কম হয়নি। তবুও এইগুলি সম্বন্ধে জনগণের ধারণা অত্যন্ত আব্‌ছা এবং ক্ষীণ কেন ? এই 'কেন'র উত্তর হচ্ছে এই যে, উক্ত বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে সাধারণ বুদ্ধির-মধ্যে প্রবেশ করবে তখনই, যখন বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু সাধারণের মনে একেবারে পাকাপাকি ভাবে জমাট বাঁধবে। বুদ্ধির ভিত্তিকে আগে শক্ত

করতে হবে প্রাথমিক সূত্রগুলির মালমশলা দিয়ে এবং তার উপর গেঁথে তুলতে হবে বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞার মর্ম্মর-প্রাসাদ; ভিত্তিই যদি কাঁচা রয়ে যায় তবে অধীত বিজ্ঞানের মননক্রিয়া বিরূপ জনসাধারণের দ্বারা অপব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক।

আমাদের সময়ে যারা বিজ্ঞানকে জনগণের মধ্যে প্রসার ও পরিবেষণ করবার মহৎ কর্ম্মভার নিয়েছেন তাঁরা ধন্যবাদার্হ; তবে এইদিকে তাঁদের দৃষ্টি কিছু কম—তার ফলে তাঁদের কাছে সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না। বিজ্ঞানচর্চ্চার-ক্ষেত্র জনগণের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রসারিত করে দিতে হবে, কারণ প্রসার লাভ না করলে কোন জ্ঞানই গভীরতার পথে অগ্রসর হ'তে পারে না।

রবীন্দ্র মজুমদার

ছড়া

আয় বৃষ্টি হেনে
ছাগল দেব মেনে
বোমা যাবে ডুবে'
ডাকাতের দল উবে'।

সুন্দরবনে ভীষণ বাঘ
তাদের চোখে দেশের রাগ
নখে তাদের বেজায় ধার
খাঁড়ার মত দাঁতের সাঁর।

আয় বৃষ্টি হেনে,
ধান বিচালি মেনে
জবাব দেব বোমায়
ডাকাত যেথা ঘুমায়।

মরা গাঙেও যা কুমীর
নৌকা হবে চৌচির,
গোখরো সাপের দেশরে ভাই
মারবে শেষে ফণার ঘাই।

আয় বৃষ্টি হেনে,
চরকা দেব মেনে,
বোমা যাবে কেঁসে,
এ দেশ সর্বনেশে।

সূর্যে আছে অগ্নিবাণ,
হিমালয়ের কঠিন প্রাণ,
সাগরঘেরা বালির বাঁধ,
হাতের দড়ি চোখের চাঁদ।

আয় বৃষ্টি হেনে,
পরমায়ু দিই মেনে,
কামানদাগার বাজে
চোরা পালায় লাজে।

উড়োজাহাজের নোঙর তোল্
ডাকাতদলের ফাটক্ খোল্
এগিয়ে চলি হুঁশিয়ার
তিরিশ কোটির হাতিয়ার

দুনিয়া দেখে অবাক আজ
তিরিশ কোটি তীরন্দাজ
সঙ্গে আছে নানান্ দেশ।
ঘরের খেয়ে বনেই শেষ,

ঘরের ছেলে ঘরেই যা,
দো-দো-আনা করে' ভাতই খা।
ছপণ ছ কুড়ি
নিয়ে পালায় বুড়ী

বৃষ্টি আসে হেনে
সব দিয়েছি মেনে॥

বিষ্ণু দে

হে ভারতী, খোলো

বিমানে বিমানে ছিন্নভিন্ন স্বপ্নপালক ওড়ে।
আকাশের নীলে শকুনের লোভ এলোমেলো উদ্দাম।
গৃধ্র, গৃধিনী ভিড় করে নাকি অলকার মোড়ে মোড়ে!
কেলিকদম্ব নির্মূল করে এ কোন্ পরশুরাম!

স্বদেশ আমার! আমরা দেখেছি রামের রাজ্য আর
কুরুক্ষেত্রে পৌরুষ ঢেলে দিয়েছি দুহাত ভরে'।
অনেক অতিথি বহু অনাহুত এসেছে বারম্বার,
শত্রুমিত্র সবাকে নিয়েছি বিরাট বাহুর জোরে।

আকবরশাহী দীনএলাহিতে আমাদের ইতিহাসে
একে ও অনেকে কালোয় শাদায় ঊর্ধ্বায়মান সুর।
আজকে এসেছি দুর্গশিখরে যুগান্ত উল্লাসে—
বহু সাধনার গৌরীশৃঙ্গ ডাকাতে করবে চুর!

হে ভারতী খোলো তিরিশ শতক তিরিশ কোটির দ্বার।
চেতনার মহাসহিষ্ণুতা যে মৃত্যুতে সঞ্জীন—
তুচ্ছ খর্ব বর্বর যতো আমাদের ক্ষুরধার
বিশ্বজনের পর্বত স্রোতে সমুদ্র হবে লীন॥

বিষ্ণু দে

সভ্যতা

ট্যাবুলার‍্যাজার মতো উলঙ্গ পৃথিবী অনুনয়
করেছিল একদিন—বিস্তৃত অরণ্য নিয়ে বুকে,
যে অরণ্য যুগযুগ প্রতিদিন অধীর উৎসুকে
আপন বৃক্ষের মেদে সূর্য্যতেজ করেছে সঞ্চয়।
সেদিনের সে পৃথিবী চেয়েছিল এই আমাদের,—
সৃষ্টিশীল চিত্ত তার বার বার কেঁদে উঠেছিল।
কোনক্ষণে গুটিকত সূর্য্যমুখী ফুল ফুটেছিল,
আমাদেরো জন্ম হলো : আমরা তা পাইনিক টের।

তারপর ? যে অরণ্য সূর্য্যতেজ করেছে সঞ্চয়,
প্রাগৈতিহাসিক বনভূমি গর্ভে হয়েছে বিলীন,
রূপান্তরিত হয়ে বহুযুগই ছিল যারা ঢাকা,
সহসা মানুষ তাকে খুঁড়ে তোলে—অসীম বিস্ময় !
তাই দিয়ে সৃষ্টি করে গ্রন্থিল ধরণী একদিন ;
প্রশস্ত ললাটে দেখি জয়ের তিলক হয় আঁকা।

* * * *

আমাদের পৃথিবীতে গীত হ'ল জীবনের গান :—
ইথারেরো আরো ঊর্দ্ধে কত চাঁদ কতবার জাগে,
কতস্বপ্ন লেখা হ'ল গোধূলির মেঘ-রক্ত রাগে ;
কতদিন কত পুষ্প বিলায়েছে স্বপ্ন-লীন ঘ্রাণ।
তারপর অকস্মাৎ সৃষ্টি হ'ল নূতন বিধান,
নূতন শিবির হ'ল, সভ্যতার দুর্গ হ'ল গড়া,—
যে দুর্গের ইঁটগুলি তেজোদীপ্ত রক্ত-রঙ করা,
যে দুর্গের বেদীমূলে ডুবে আছে অগণন প্রাণ।

ভূমিকম্প এল ; তাই প্রাচীন ভিটার ভিত্তি নড়ে,
পুরাণো চলার পথে অবাঞ্ছিত আগাছার ভীড় :
ভেঙে গেল প্রভাতের বর্ষীয়সী চাঁদের ফানুস।
যে নারী ইসারা করে ছোট হাতে পরম আদরে
ডাক দিয়েছিল তার প্রিয়তমে, আকাঙ্ক্ষা-অধীর :
তারাও মিলিয়ে গেল,—বে-আব্রু সে আদিম মানুষ।

*　　*　　*　　*

আজো মোর আয়ু আছে, বেঁচে আছি আমি কোনরূপে,
এখনো আমার দেহে, ধমনীতে, শিরায় শিরায়,
হৃৎপিণ্ড হতে বয় উষ্ণরক্ত ঢিমে তেতালায়,
এখনো এ দেহভার মিলায়নি মৃত্তিকার স্তূপে।
ম্লান ঘামে আজো আমি চলাফেরা করি চুপে চুপে ;
এখনো বুকের তলে পুরাতন স্মৃতি চমকায়—
বিষণ্ণ আহ্বান কত, আজ যার সবই আবছায়,—
তারি তীরে, ঘোলাটে আঁধার মাঝে আছি আমি ডুবে।

এখানে দেখেছি আমি কত দেহ হয়েছে বিলীন,
এই পৃথিবীতে কত হাসি-গান চূর্ণ হয়ে গেছে,—
মাটির মলিন রঙে মিশে গেছে পীতাভ কঙ্কাল ;
ঝরেছে অজস্র ফুল, মরে গেছে তৃপ্তিময় দিন।
আমি শুধু ধুকধুকে প্রাণ নিয়ে বসে আছি বেঁচে
দেখে যেতে অনাগত ভবিষ্যের নতুন সকাল।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

মোহানা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

খবরটা অতি শীঘ্র রাষ্ট্র হল যে মালিকরা নতুন মজুর দিয়ে হরতাল ভাঙ্গতে চেষ্টা করে, হরতালীরা যখন বাধা দেয়, তখন লরি তাদের বুকের ওপর দিয়ে চালাবার চেষ্টা হয়, এবং গোলমালে একটা ছেলে চাপা পড়েছে। যখন অন্য পাড়া থেকে মজুররা ছুটে এল তখন গোলমালে চাপা পড়া-টা খুনে পরিণত হয়েছে। সফীক কিষণকে বল্লে চৌধুরীকে সরিয়ে ফেলতে। মহবুব সফীককে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওস্তাদ, এখন ?'

স—'এখন ? এখনও গুর্খারা ভেতরে আছে, অতএব অহিংসাই ধর্ম্ম। তবে, এদের ঠাণ্ডা রাখতে হবে, সেই সঙ্গে মোড় ফেরান চাই। একটা বাচ্ছা খুন হয়েছে এই দেশে, এই সহরে, যেখানে জন্মাবার পূর্ব্বেও মরে, পরেও মরে, যেখানে কেউ বাঁচে না—একি ঠাট্টার ব্যাপার। দাও ঘুরিয়ে ভগবানের আশীর্ব্বাদকে মানুষের কাজে।'

ম—'ও-সব বুঝি না। দু'চারটে কথা কও, নয়ত' মারপিট বাধবে।'

স—'পরে, প্রয়োজন এলে দেখা যাবে এই যে খাঁ সাহেব, দেখলেন কাণ্ডটা, চৌধুরীর বাড়ির মেয়েরা কাঁদছে, একবার নিজে না হয়...'

খাঁ—'ও-কাজ আমার নয়, বিবিদের, তারা শকুনের মতন এতক্ষণ হাজির হয়েছে। কিন্তু লাস কোথায় ?'

স—'পবিত্র হিন্দুর আশ্রয়ে।'

মহবুব সফীকের কাণের কাছে মুখ এনে বল্লে, 'ওস্তাদ, মেয়েদের কি বলা হবে ?'

স—'কেন ? কেন ? খাঁ সায়েব, এখনই আসছি, একটু জরুরী বাৎ আছে, কেন, কেন ? বলা হবে খাঁটি মিথ্যে কথা, যা তারা চায়, যা তাদের প্রাপ্য, লরি চাপা দিয়েছে খোকাকে। কেমন ?'

ম—'ওস্তাদ, এমন কিছু লাভ হবে না তাতে। তাছাড়া আমার সাধ্য নয়।'

স—'বল কি ! মেয়েদের শক্তি ভিন্ন কি কোনো, কখনও বড় কাজ হয় ! তুমি হলে কমরেড, তোমার মুখে ঘাবরার ভয় শোভা পায় না। ওটা বিজনের উপযুক্ত।'

ম—'যদি পুলিশে লাস নিয়ে যায়, আর পরীক্ষার পর প্রমাণ হয় যে…'

স—'খোকার মুখ দেখেছিলে ? ডাক্তারের বাপের ক্ষমতা নেই…যদি কেড়েই নিয়ে যায়, তবে চমৎকার হবে, সব মজুর কোতওয়ালীর সামনে ভিড় জমাবে।'

ম—'সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪…'

সফীক একটু ভেবে বল্লে, 'ধন্যবাদ, মহবুব তোমার বুদ্ধি পেকেছে এতদিনে।' পুলিশের হাতে লাস না পড়াটাই ভাল, তাই ঠিক। কিন্তু এই সুযোগে ওরা বাইরের লোক না ঢোকায় তার বন্দোবস্ত কর। খাঁ সায়েবকে দিয়ে এইটি করিয়ে নাও।' মহবুব চলে গেল।

সফীক সহরের দিকে চলল। রাত হয়েছে গভীর…কত রাত বোঝা যায় না। প্রত্যেক রাত্রিতে এমন একটি সময় আসে যখন কালের পরিমাণ পুঁছে যায়, মানুষের তৈরী বিভাগ অবলুপ্ত হয়, স্রোত নিরুদ্ধ হয়ে দেশ ও পাত্রের ব্যবধান দূর করে, তখন ঘড়ি ঘুমোয়, ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিমোয়, কিশোরীর গায়ের কাপড় খুলে খড়-পাকাটির কাঁচা পুতুল দেখায়, শ্বাসটানা বুড়ীরও ঘড়-ঘড়ানি বন্ধ হয়। তখন জাগে কেবল কবির বিকৃত মস্তিষ্কের নারকীয় পরিকল্পনার অসংলগ্ন প্রতিচ্ছবি, জাগে ফাইলেরীয়ার বীজাণু, আর রাজকুমার সিদ্ধার্থ। মঙ্গল-অমঙ্গলের বাইরে এই সময়, তাই যোগীজনসুলভ। প্রকৃতি যেখানে আদিম সেখানে সে অনন্ত, যেই মানুষের ছোঁয়াচ পড়ল তখনই সুরু হল সময়ের ছেঁড়াছেড়ি। সেই অবধি সভ্যতা, ইতিহাস, পারম্পর্য্য, নীতি, নিয়তি। এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নেই। যারা মানুষকে বরণ করেছে তারা প্রকৃতির একটানা বিরতিতে বিশ্রাম পেল না। অথচ, তার প্রয়োজন আছে। ত্রিযামায় আশ্রয় যেন ত্রিবেণীর স্নান।

নিশাচরের জীবন সুরু হয়েছে সফীকের কলেজে থেকে। দিনের আলোয় ঘটনাগুলো চিক্‌চিক্‌ করে, সুখ-দুঃখের ভেদাভেদ হ্রাস হয়, তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট হয় না। দুঃখের রূপ যদি কার্সী বয়েদের মতন হ'ত তবে আর ভাবনা

ছিল না। সুখের ঢঙ যদি ঠুংরীর তানের মতন হত, তবে ভাবের বদলে ভাও-বাতানতেই কাজ চলত। বুদ্‌বুদ না হয় রঙ্গীন, কিন্তু তারা ভাসে বর্ণহীন জলরাশির ওপর ; জল বাইরে নিথর, যে-স্তরে আলো প্রবেশ করল না সেখানে সে একটানা, তাই বুঝি বা স্রোতের রঙ কালো। গতি রুদ্ধ হলে রঙীন, নচেৎ আদিম অবিচ্ছিন্ন একরোখা বেগ মসীমাখা। বিজন একবার তাকে কালীবাড়িতে কালীপূজা দেখাতে নিয়ে যায়···অমাবস্যার ঘনতায় মূর্ত্তি প্রাণ পেয়েছিল, সংহারের। যে রাতকে চেনে না সে প্রকৃতির আভ্যন্তরীন ধ্বংস ও মৃত্যুর ক্ষুধাকে জানে নি। অ-হিংস নীতি দৈনিক জীবনের, রাতের নয়। মহাত্মাজী সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে পড়েন। রাতের কাজ ধ্বংসের, এবং সৃষ্টির, অর্থাৎ কামনার, তার দুই অংশেরই। দিনে সংস্কারই সম্ভব, তার বেশী নয়। আমূল পরিবর্ত্তনের চাহিদা রাত।

রাস্তার দু পাশের দোকান, হোটেল, হালুইখানা বন্ধ, একা নেই, টঙ্গা নেই, অত রাতে কে সোয়ারী হবে। কিছু খেলে হত, ডাক্তারে বলেছিল নিয়মিত পথ্য চাই···দামী উপদেশ···খগেন বাবুকে অসুখের কথা কেনই বা সিজন বলতে গেল! কেনই বা বিজন মড়া ফেলতে গেল! সে কি ও কতটা দেখলে! মুখ সিটিয়ে গেল বেচারীর! পোড় খায়নি, ধাতু নরম, কুঁচকে যায় সহজে। মজদুর-সভায় বৈঠক কখন বসবে খবর নিলে হত। সফীকের পেটের নাড়ি টেনে ধরে, যন্ত্রণায় রাস্তার পাশে বসে পড়ে। গা বমি বমি করে, পিত্তি ওঠে।

সফীক খগেনবাবুর বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে। ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে, দরজা খোলা। সফীক রাস্তা থেকে ডাকতে খগেনবাবু নীচে এসে তাকে ওপরে নিয়ে গেলেন।

'আপনার নোটটা তৈরী হল ?'

'বিজন বলছিল আর দরকার নেই।'

'তাই নাকি! ঠিক বলা যায় না।'

'কেন ?'

'দিনে দিনে ঘটনা বদলাচ্ছে, সেই সঙ্গে প্রয়োজনও।' বিজন কতটা বলেছে খগেনবাবুকে, কি বলেছে জানতে ইচ্ছা হয় সফীকের। প্রশ্ন করে,

'বিজন বোধ হয় ঘুমুচ্ছে ?'

'বিজন এখনও এল না, খেল না।'

'খায় নি? খায় নি কেন ?'

'এখনও ফেরে নি।'

'তাও বটে। আজ আবার একটা হাঙ্গামা বাদল। একটা ছেলে চাপা পড়ল, লরির ধাক্কায়, ওরা নতুন লোক আনছিল। এত রাত্রে বিরক্ত করলাম...' খগেনবাবুর সামনে ভাষা অক্ষ হয় কেন? লজ্জা আসে অজানিতে, লজ্জা জয় করতে সফীক চোখ বুজে চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। খগেনবাবু সফীকের বসবার ভঙ্গী দেখে আশ্চর্য্য হন, সহানুভূতি জেগে উঠে...

'বিজনকে আর আপনারা ছাড়বেন না, খগেনবাবু...ওকে ভাবিজী কত যত্ন করেন...সেই ভাল। ভাবিজী নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছেন ?'

রমা ঘরে এল, সফীক চেয়ারের হাতলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। 'এত রাত্রে বিরক্ত করলাম, কিন্তু...কেবল বিজন এসেছে কিনা জানতে এসেছি। ও এখনও খাই নি ?'

রমা সফীকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর ভেতরে গেল। একটা প্লেটে বিস্কুট আর মাখন এনে সফীকের সামনে রাখলে। 'এক গ্লাস জল।' রমা ঠাণ্ডা জল এনে দিলে।

স—'বিজনের ধারণা বোঝাপড়া হওয়াই ভাল। আপনার ?'

খ—'নতুন ব্যাপার কি ঘটেছে জানি না। তবে মনে হয় যেন ওরা কোনো সর্ত্তই রাখবে না।'

স—'সর্ত্ত, সর্ত্ত, রাখলেই বা কি, ভাঙলেই বা কি! আদৎ ব্যাপারে যে-কে সেই! ন' খামার জায়গায় দশ খানা, আজের বদলে কাল...আপনার কি মত ? ভাবিজীর ?'

র—'কিসের ?'

স—'সর্ত্ত রক্ষাটাই কি সব ?'

র—'আমি কি জানি।'

স—'এই ধরুন, মিলের সাড়ির বদলে বেনারসী, রূপোর বদলে সোণা, সোণার বদলে প্ল্যাটিনামের ব্রোচ, একটা না হয় দশটা...কিন্তু মানুষটা, সম্বন্ধটা

যা ছিল তাই রইল।' খগেনবাবু আচম্বিতে বলে উঠলেন, 'তা ঠিক·· ওগুলো বাইরের মিল, ভেতরকার যা বিরোধ তাই রইল, তার আর নিষ্পত্তি নেই।' রমলার দৃষ্টি খগেনবাবুর অমনোযোগীতায় ব্যাহত হল···খগেনবাবু বলতে লাগলেন, 'সেই জন্যই স্বীকার করাই ভাল তার অস্তিত্বকে। তুমি ভাববে, লোকে বলবে হার।'

স—'হার নয়, এইটাই জয়ের সূচনা। প্রলেপ দিয়ে যে ঘা শুখোয় তার প্রলেপের প্রয়োজনই ছিল না। মজা নদীর খাতে ভরা নদীর স্রোত এলে কি সর্ব্বনাশ হয় জানেন ত। ভাবিজীর সঙ্গে আমিও সাহিত্যিক হয়ে গেলাম।' রমলা গেলাস ও পিরিচ নিয়ে উঠে গেল।

বিজন এত রাত্তেও এল না, রমলা নিজের কোট ছাড়তে পারল না, সফীকের চেষ্টা সফল হল না—অথচ প্রত্যেকটি হওয়া উচিত ছিল। উচিত আর সার্থক, এই দু'য়ের ব্যবধানেই যদি দুঃখের উৎপত্তি তবে শান্তির জন্য অন্ততঃ একটাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়। সার্থকতাকে পরিহার করলে থাকে কি? তার চেয়ে বিদ্যাসাগরী ধর্ম্ম-জ্ঞান চলে যাক। কিন্তু সহজে যায় না। অন্য কাঁটার সাহায্য নিতে হয়। সেটা নতুন জ্ঞান হোক। কেবল দেখতে হবে জ্ঞান নতুন ধর্ম্ম-জ্ঞানে পরিণত না হয়। তার প্রতিষেধক, কর্ম্ম, বুদ্ধি প্রণোদিত কর্ম্ম, ভাববর্জ্জিত কর্ম্ম। মানুষ নীরস হবে তাতে, কিন্তু দোটানায় থাকা অসম্ভব। আরেকটা উপায় আছে—সেটা বিরোধকেই স্বীকার করা। স্বীকার মানে কি? তার অস্তিত্বে কোনো ভাবোদ্রেক যেন না হয়, না ওঠে রাগ, না ওঠে ক্ষোভ। এটা সমাধান নয়। যুক্তিটা এই: বিরোধের জন্য কষ্ট হয়, কষ্টের অবসান কিসে হবে? না কষ্ট না আসতে দিলে। স্বীকারের নিশ্চয় অন্য অর্থ আছে। সরকার যখন মজদুর-সভাকে স্বীকার করে তখন যে মজদুর-সভাকে গোটাকয়েক অধিকার ও দায়িত্বের আধার সৃষ্টি করে, যার ফলে সেই অনুষ্ঠান নিজের রচিত কর্ত্তব্য পালন করতে পারে, অর্থাৎ অর্জ্জিত অধিকার-সমষ্টিকে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়। স্বীকার মানে পৃথক সত্তার স্বীকার, সেই সত্তার বিকাশে বাধা না দেওয়া, অর্থাৎ পৃথককে পার্থক্যটুকু কাজে লাগাতে দেবার অবকাশ দেওয়া। শেষে সেই কাজে আসা। বিজনকে রমলা গ্রাস করেছে, খগেনবাবুকে গ্রাস করতে চেয়েছিল, পারল না, সফীকের

মতামত তার মনুষ্যত্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। অন্য ধারে বিজনও রাজি, তাই রমলা-বিজনে বিরোধ নেই, খগেনবাবু গররাজি, তাই মান-অভিমান; অন্য ধারে ঘটনাগুলো সফীকের মতামতের অপেক্ষা শক্তিশালী, তাই সফীকের মানসিক চাঞ্চল্য। আরেক দিকে রমলা-বিজন-সফীকের সম্বন্ধ ঝড়ের আগে আকাশ-বাতাসের মতন থমথমে। বিদ্যুৎ চমকাল রমলার অঙ্গ আশ্রয় করে।

রমলা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এখনও বিজন এল না। আপনি পাঠিয়েছেন?'

স—'হাঁ, কাজে। এতক্ষণে আসা উচিত ছিল।'

র—'কোথাও দুর্ঘটনা ঘটে নি ত?'

স—'মোটর চাপা নিজে পড়েনি জানি।' সফীকের চাপা হাসি লক্ষ্য করে রমলা বল্লে, 'যেন সেজন্য দুঃখই পেয়েছেন সন্দেহ হয়।'

স—'চাপা পড়লে তার আনন্দ হত, আপনার আদর-যত্ন পেত, এবং তার অত্যন্ত প্রিয় আন্দোলনটি আরো দুলে উঠত।'

র—"আপনারও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকত না।'

স—'আপনার স্নেহের? সে-কথা খাটে খগেনবাবুর বেলা। আমার ক্ষেত্রে·· বলছেন কি! জানতামই না আমি এতটা স্থান পেয়েছি ভাবীজির হৃদয়ে!'

রমলার মুখ কাঠ হয়ে গেল। খগেনবাবু বল্লেন, 'এত শ্রান্ত হয়েছে বুঝতেই পারিনি। আপনিই বা ফিরবেন কি করে?'

স—'আমার রাতে ঘোরা অভ্যাস আছে। আমার এখনই যেতে হবে।'

খ—'চলুন, এগিয়ে দিই।'

রমলা শান্ত কণ্ঠে বল্লে, 'না, এগুতে হবে না।' সফীক দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, 'ভাবীজির সঙ্গে অন্ততঃ একবারও মতের মিল হল দেখে আনন্দ হচ্ছে। খগেনবাবু আপনার যাবার কোন প্রয়োজন নেই।' সফীক তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

মজদুর সভার অফিসের চারদিকের জীবন চঞ্চল। রাস্তার দুপাশের দোকানে আলো জ্বলছে, অফিসের বারান্দায় পেট্রোম্যাক্সের আলো শোঁ শোঁ শব্দ করছে, চারধারে পোকা ঘুরছে, দোকানের সামনে ছোট ছোট জটলা।

একটার পাশে আসতে একজন জিজ্ঞাসা করলে—'আপনি এখানে? আপনার দেখা পাওয়াই ভার।' সফীক হাসল—জটলার কথাবার্ত্তা থেমে গেল, ক্রমে একজন মাত্র রইল। সফীক দোকানীকে প্রশ্ন করলে, 'এরা বুঝি কোম্পানীর লোক।' 'আমার সন্দেহ তাই, মালিকরা নতুন মজদুর সভ খুলছে।' সফীক পান ও সিগারেট কিনলে। অন্য জটলায় আর একজন পরিচিত মজুরের সঙ্গে দেখা হল, 'এই যে কমরেড। ব্যাপারটা কি বলুন ত? শুনলাম লরি একটা ছেলে চাপা দিয়েছে, সি. এস. পি.র লোকেরা বলছে আগেই মরেছিল।'

স—'দক্ষিণ-পন্থীদের ভাষ্যটা?'

মজুর বুঝতে পারলে না দেখে সফীক প্রশ্ন করলে—'উধামজীর লোকেরা কি বলছেন?'

'তারাও বলছেন, আগেই মরেছিল।'

স—'গরীবরা, মজুররা আবার কবে বেঁচেছিল। এই হিসেবে তাঁরা সত্যবাদী।'

মজুর ঠাট্টা ধরতে পারলে না। 'উধামজী বলেছেন না কি যে মোটরের সামনে দিয়ে মড়া নিয়ে যাওয়াই অন্যায় হয়েছিল।'

স—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ভীষণ অন্যায় হয়েছে তোমাদের, ওঁদের মোটর কি থানার ওপর দিয়ে যাবে! মড়ার জন্য খানা আর গঙ্গার ঘাট রয়েইছে। মোটরগুলো যখন সিনেমা ও নাচ থেকে ফিরে বিজলী শোভিত গ্যারাজে ঢুকে বনাতের ঘেরাটোপের ভেতর আরামসে ঘুমুবে, তখনই লাস বার করবার সময়। তারপর ঘাটে নিয়ে গেলেই হত। অন্যায় হয়েছে, খুব, বুঝতে পারছি ...লরিভর্ত্তি মজুর ফাটকের মধ্যে প্রবেশ করাবার পর নিঃশব্দে খুলে মড়াটাকে গঙ্গাযাত্রা করালেই সুবিধে হত, সব দিক থেকে...কি বল? হাঃ হাঃ হাঃ...' শ্রোতারা হেসে উঠল। মজুরটির হাসিতে একটা কৃত্রিমতা রয়েছে, যেন বুঝতে পারছে না অন্যায়টি কোথায়। অন্য একজন জিজ্ঞাসা করল, 'বোঝা-পড়া হয়ে গেল শুনলাম...সর্ত্তগুলো কি? আইনে বেঁধে দেওয়া যদি হয় তবে মন্দ কি।'

স—'জরিমানা মাইনে থেকে উশুল করবার বারণ নেই আইনে? তবে!'

মজুর চলে গেল অন্য জনতায়।

অফিসের সামনেকার জনতা একটু বড়। দরজা বন্ধ করে সভা চলছে। বারান্দায় একজন কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্য আসতে সফীক অনুরোধ জানালে করিম যদি ভেতরে থাকে যেন একটিবার বাইরে আসে। 'করিম! কোন্ করিম? এটা আমাদের সমিতির বৈঠক, সফীক।' সফীক ভুলের জন্ত ক্ষমা চেয়ে পানের দোকানের সামনেকার বেঞ্চে বসল। উধামজী অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। তাঁর গম্ভীর আওয়াজের আকর্ষণ মানতে হয়, তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা শক্ত। সফীকও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। মজদুর-সভা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে শুনে সফীক বল্লে, 'সভা এখনও গ্রহণ করেনি, মাত্র সমিতি, হয়ত, গ্রহণ করেছে। আপনাদের সর্ত্ত সমস্ত মজুরদের সামনে পেশ করবার পূর্ব্বেই কেমন করে গৃহীত হল?' উধামজী হেসে বল্লেন, 'কমরেডের আইন জ্ঞান বড় উকীলের মতনই···আইনের ডিগ্রী আছে কি না। তবে এটা ঠিক আমরাও বে-আইনী কাজ করব না।' তা ছাড়া, কমরেড, সব মজুরদের সামনে ধরতে হবে কেন? মজদুর-সভার লোকেদের সামনে পেশ করলেই কি যথেষ্ট হবে না?'

স—'না, হবে না, কারণ, মজদুর-সভা বলেছে যে তারাই সমগ্র মজুরদের প্রতিনিধি।'

উ—'প্রতিনিধি, তার বেশী ত' নয়। যাক, ও-সব পণ্ডিতী তর্ক আবার আমি চালাতে পারি না। তবে বে-আইনী কাজ আমি থাকতে হবে না।'

স—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ওটা আপনার ধাতে নেই, ওতে আপনার বাধে।' উধামজী উত্তর না দিয়ে অফিসের ভেতরে গেলেন। সমিতির অন্তান্ত সভ্যাবৃন্দ ক্রমে বাইরে এলেন, চলাফেরায় উল্লাসের, আত্মতৃপ্তির চিহ্ন বর্ত্তমান। প্রত্যেকেই প্রায় সিগারেট কিংবা চুরুট ধরালেন, পান নেওয়া দেওয়া, সুপুরি, চুণ বিনিময় চলল। প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তবে তিন জন আপত্তি জানিয়েছিল, টেঁকেনি এই কারণে যে মজুরদের অবস্থা কাহিল, আরো দু-একদিন জোর ধর্ম্মঘট চালান যেত, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় বেড়েই চলেছে। একজন চেঁচিয়ে বল্লে, 'ভয়টা ঝুটো, সরকার রয়েছেন কি করতে!' কোনো মন্তব্য হল না কথাটার ওপর। জনতা ক্ষীণ হল।

করিম অন্য একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

ক—'নিজের পাড়ায়। শুনেছ ?'

স—'শুনেছি। কাল বড় মিটিং-এ কিছু করতে পারবে ?'

ক—'গোলমাল পাকান শক্ত নয়, কিন্তু ফল কি ভাল হবে? মজত্বর-সভাটাই ভাঙ্গবে।' সফীক অস্থির হয়ে বল্লে, 'চল, একটু খোলা জায়গায় বসি গে।' দুজনে একটা টিবির ওপর বসল।

স—'তুমি সমঝোতা চাও না, কেমন ?'

ক—'না।'

স—'তুমি মজত্বর-সভা ভাঙ্গতেও চাও না।'

ক—'না।'

স—'মজত্বর-সভা না ভেঙ্গে যদি বোঝাপড়া ভাঙ্গে তবে খুশী হবে ?'

ক—'নিশ্চয়ই। তবে উপায় দেখি না।'

স—'উপায় আছে। একটা ছেলে আজ মরেছে জান ?'

ক—'চাপা দিয়েছে শুনছিলাম। ব্যাপারটা কি ?'

স—'ব্যাপারটা যাই হোক না, খৃষ্টানেরা বলে যারা অল্প বয়সে মরে তাদের ওপর ওদের ভগবানের আশীর্ব্বাদ আছে। শিশুটি একটি মাত্র সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের কৃপায় ধন্য রবে কেন, করিম? আমি ভাবছিলাম, ভোর বেলা যদি ঐ লাসটাকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়ে, একটু লোকজন জড় করতে করতে, এই ধর বেলা ছুটো তিনটের সময় গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া যায়···তবে, মজত্বর-সভাও টিঁকে থাকে···কি বল ?'

ক—'বুঝলাম, কিন্তু, লাস পাবে কোথায় ? লাস এখন থানায়।'

সফীক লাফিয়ে উঠল। 'সে কি! অসম্ভব। লাস কিষণের চার্জ্জে। হতেই পারে না।'

ক—'আমি সঠিক জানি, লাস এখন থানায়। কেবল তাই নয়, দেখো ওস্তাদ, সমঝোতার আগে লাস খালাস পাওয়াই যাবে না। পুলিশ কি অত বোকা ?'

সফীক অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বল্লে, 'অসম্ভব, লাস বার করতেই হবে।'

করিম—'পুলিশে খবর পেলে কি করে? তোমার উপায়টি খাটল না ওস্তাদ।'

স—'তবে মজদুর-সভা ভাঙুক, করিম। বুঝে ছাখ, করিম, তুমিই ভাব, ওরাই বলছে মজদুর-সভার প্রভাব কমেছে, এক একটি কোম্পানি এক একটি নিজের নিজের ইয়ুনিয়ন খুলছে, লোক সেই সব ইয়ুনিয়নে ভর্ত্তি হচ্ছে ত'। তবেই, ছাখ করিম……'

ক—'নতুন লোকেরাই যাচ্ছে। কিন্তু ঐ ইয়ুনিয়নগুলির একটিও বাঁচবে না বলে দিলাম। ওরাই বলছে আমাদের প্রভাব নেই, আমরা ত' বলছি না। ওদের কথাই মেনে নিলে যে আমাদেরই হার হল, ওস্তাদ। না, সে হয় না… বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তুমি কি ভাব, ওরাই মজদুর-সভা চালাবে বরাবর? আজ না হয়, দুদিন পরে আমাদেরই হবে, তখন ভয়ে কাঁপবে সকলে।'

স—'মিল-কমিটি কি চায়?'

ক—'আমি কতবার তোমাকে বলেছি। তারা জানে সর্ত্তগুলো দু'দিন পরে ফুঁয়ে উড়ে যাবে, তবু তারা চায় না মজদুর-সভা ভাঙুক। জানি ওস্তাদ, ছুতোয় নাতায় আবার আমাদের বরখাস্ত করবে। তা করুক। এই ভাবেই ত' জোর বাড়ে? নয় কি? তোমার মতন লেখাপড়া শিখিনি, আট বছর থেকে মাকুড়ি চালিয়েছি বাপদাদার সঙ্গে, তার পরের ঘটনা তোমার অজানা নেই… আমারও নালিশ আছে…তবু কি জান? এই মজদুর-সভা আমাদের হাতে গড়া…তুমি হয়ত এটা ঠিক বুঝছ না, মাপ কোরো, লেখাপড়া শিখলে অনেক বাধা আসে…তোমার বাধা সব চেয়ে কম, জানি, তুমি অনেক চেষ্টা করেছ… যখন তোমাকে চেয়েছিলাম, তখন সভ্য হতে রাজি হলে না…। আমিও আর ফিরতে চাই না, ওদের জানিয়ে দিয়েছি, সত্যই আর খাটতে পারি না, আমাকে নিয়ে ঝগড়া যেন না চলে।'

সফীক করিমের কাছে বিড়ি চাইলে। করিম, একটা পুরো প্যাকেট গুঁজে দিলে হাতে। 'করিম, প্রায় ভোর হয়ে এল, আমি আড্ডায় যাচ্ছি… কাল সভায় যাবার প্রয়োজন আছে কি?'

ক—'তুমি মানুষকে অত ভয় পাও কেন, ওস্তাদ?'

সফীক বিঁড়ি ধরিয়ে একাই আড্ডায় গেল।

ঘরের ভেতর খাটে কে একজন মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। তার ঘুম যাতে না ভাঙ্গে ভেবে সফীক চুপি চুপি বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুম আসে না, শরীর আবার বিগড়েছে, না হলে রাস্তার ধারে যন্ত্রণার চোটে বসে পড়তে হয়। ভাবিজী ভাগ্যিস চা-বিস্কুট খাওয়ালেন। দুর্ব্বল দেখাচ্ছিল নচেৎ মনে মনে, এমন কি আচার-ব্যবহারেও যার শত্রুভাব, সে করুণা দেখাতে যাবে কেন? মহিলাটি চান না যে খগেনবাবু ও বিজনের সঙ্গে তার কোনো যোগ থাকে। অত রাত্রে খাওয়াটাই অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু শরীর মানল না ধর্ম্মকথা। বাস্তবিকই অন্যায়; তাই, অচল এই মেয়েদের সংশ্রব। বুর্জ্জোয়া মেয়েরা স্বামী ও আত্মীয় স্বজনদের শোষণ করতে পেলে আর কিছু চায় না। তাঁদের শোষণ-পদ্ধতি নিতান্ত মানুষিক, অর্থাৎ দৈহিক, তাই আরো ভয়ঙ্কর। অথচ মুখে সব ফেমিনিষ্ট। মিথ্যুক। এক একটি সন্তান সোশ্যাল ইন্‌সিয়রেন্সের প্রাপ্য চাঁদা, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন গাঁঠ, স্বাধীনতার পায়ে ছেলে মেয়ের কচি হাত দিয়ে কুড়ুল মারা। 'খুকী তোমাকে না দেখতে পেয়ে ঘুম ভেঙ্গেই কাঁদছিল, খোকা তোমার ফোটো দেখেই বা-ব্বা বলে উঠল...' এবং তার পরই...'ওদের বাড়ির ললিতাকে সুন্দরী বল যে কিসে তা বুঝি না। মিটিং থেকে ফিরতে অত রাত হল। সুপ ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল, আইসক্রীম গেল গলে।' জন্মগত দাসী মনোভাব; দৈহিক শক্তি, তার অভাবে, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের পূজা। যুযুৎসুর প্যাঁচ মেয়েলী ইম্পিরীয়ালিজমের প্রধান আঙ্গিক। তার ওপর শিশুর অত্যাচার।

নিজে যদি রোমান্টিক হত তবে চৌধুরীর বাচ্ছার মুখচ্ছবি মানসপটে ভেসে উঠত। সফীক চোখ বড় করে অন্ধকারে চাইলে। কোথাও কিছু নেই, লরির চাকার চাপে থেঁৎলে গেল তাই বোধ হয়। কিংবা হয়ত, কোনো মায়াই ছিল না। মায়া থাকলেই ছায়া ঘুরবে। বরঞ্চ, অন্যায় বোধ, অধর্ম্মজ্ঞানই ঐ ধরণের ছায়ার জন্ম দেয়। যারা আত্মসর্ব্বস্ব তাদের কষ্ট পাওয়ার প্রতি একটা আন্তরিক টান থাকে। অতীতের কাল্পনিক দুঃখ যদি না মূর্ত্ত হয় তবে বিঁধবে কারা? খিদের তাড়া নেই, অসুবিধের অন্য কোনো জ্বালা নেই, সৃষ্টি ও প্রকাশের ব্যথা নেই, একটা কিছু যন্ত্রণা পাওয়ার অস্ত্র চাই ত। তাই নিজের নোখ আর দাঁতের সাহায্যে, আঁচড়ে কামড়ে যত পার ঘা কর। সেই ক্ষত যত

দগদগে হয় ততই আনন্দ, ততই বিলাস, ততই তৃপ্তি। এই বিলাসের নাম বিবেক। করিমের বিলাস নেই, সে নিজেকে সরিয়ে নিলে কেমন সহজে, কেমন নীরবে। অথচ ঐ ধরণের স্বার্থত্যাগের অছিলায় বুর্জোয়া মেয়েরা কত ন্যাকামিই না করত। রোমান্টিসিজমের মূলে শতাব্দীর সঞ্চিত সারপ্লাস ভ্যালু।

কিন্তু লাস গেল পুলিশের হাতে কি করে। কিষণ ছাড়লে কেন? মড়া খোকাও কাজে লাগে দলের। একটা শোক যাত্রার বন্দোবস্ত হলে দেখা যেত উধামজীর জোর কতটা। মজদুর-সভা বজায় থাকত। করিম রক্ত মাংস দিয়ে গড়ে তুলেছে, তাই এত মমতা। কিন্তু নিজের সৃষ্টির প্রতি মোহটাও থাকবে কেন? মাতৃত্বের সঙ্গে পার্থক্য আছে—মজদুর-সভা তৈরী হবার পর সর্ব্বসাধারণের, ছেলে বিয়ের পরও মায়ের। করিমের স্নেহ ভিন্ন জাতের। তবু, মজদুর-সভার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছে। নিজে সভ্য হতে রাজি হয় নি। করিম বল্লে মানুষকে ভয় কেন? কৈ? ভয় নেই ত'। ভয় কেন? ভয় কাকে? মড়াকে ভয় নেই, জেলের ভয় নেই, মৃত্যুরও ভয় নেই ত' মানুষকে ভয়। করিম ঠিক বুঝতে পারে নি। সমবেত মানুষকে, নিপীড়িত শ্রেণীকে যে সেবা করেছে সে ভয় পাবে কেন? আবার পেটে সফীকের অসহ্য যন্ত্রণা ওঠে···তীরের মতন বেঁধে···অকস্মাৎ মনে হয় একটা পৃথক মানুষকে ভয় পায় বলেই কি সে সমষ্টিগত মানুষকে আঁকড়ে ধরেছে। যেমন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তি জন-সাধারণকে ভয় করে ব'লে ব্যক্তিত্ববাদী হয়। সফীকের গলা শুখিয়ে ওঠে, বিঁড়ির টানে জিব জ্বলতে থাকে, ঘরের কোণে সোরাই, সফীক উঠে জল খেতে গেল, সোরাই বক্ বক্ শব্দ করল, বিছানার লোকটি ধড়মড় করে উঠে পড়ল, 'কোন হায়?'

'ডাকু···শুয়ে পড়···বিজন!' এখানে?' বিজন শুলে না। সফীক আলো জ্বাললে। 'এক গ্লাস জল দাও, তার পর তোমার বক্তৃতা শুনব। বিজন জল দিলে। দাঁত চেপে যন্ত্রণা জয় করতে সময় লাগল।

স—'কি বলতে চাইছ, বিজন?' উত্তর এল না দেখে সফীক বল্লে, 'আমিই বলব?'

বি—'না, ধন্যবাদ।'

স—'কেন নিজে লজ্জা পাবে? আমিই না হয় লজ্জাটা ভাঙি? তোমার নিজের দুর্ব্বলতার কাহিনী আমার মুখে কম রোমান্টিক শোনাবে। এটা ভাবের খেলা নয়, বিজন। তোমার শক্তিতে ইয়ুটোপীয়ার রচনা হয়, কিন্তু জগদ্দল পাথর এক চুল সরান যায় না। কে বলছে তোমার বিশ্বাস ছিল না? কিন্তু বিশ্বাসে এই স্বার্থের পাহাড় টলাবে! ইডীয়টিক! জোর নিজে অচল থাকা যায়। আমাদের বিশ্বাসে অটল থাকতে পারে ক'জন? এতে ত' অনুষ্ঠান নেই যেটা তোমাকে আশ্রয় দেবে! পার্টির মেম্বর তুমি নও, তুমি বাইরের বন্ধু মাত্র, অর্থাৎ আজকের বন্ধু, কালকের গুপ্তচর, শত্রু।'

বি—'ওস্তাদ .....'

স—'গুরুবাদ তোমার রক্তে মাংসে, ও-নামটা আজ থেকে না হয় নাই ব্যবহার করলে! বল।'

বি—'মিথ্যে দিয়ে কাজ হাঁসিল করবে? তা হয় না। পারবে না দেখ, সব মজুরই মাথা পেতে নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করবে। তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, একটার জায়গায় দশটা মড়া, মড়া কেন দশটা জ্যান্ত মানুষ লরির সামনে ছুঁড়ে দাও না কেন পারবে না, পারবে না···আমি তোমাদের এপ্রেন্টিসি করলাম এতদিন···কিন্তু চলবে না···কিছুতেই।'

স—'এ যে একেবারে অলডাস্ হক্‌সলে! এইবার সন্ন্যাসী হবে নাকি, বিজন?'

বি—'ঠাট্টা ছাড়। তোমার মতও 'পিওর সোশিয়ালিষ্ট'দের। দেশের নেতৃত্ব যদি মধ্যবিত্তের হয় তবে বোঝা-পড়া ছাড়া গতি নেই।'

স—'ধরতাই বুলিগুলো ছাড়।'

বি—'মিল-কমিটি পারলে চালাতে? তুমি তাদেরও মানছ না।'

স—'খুব ভাল ভাবেই পারত···'

বি—'যদি না···'

স—'যদি আমাদের দলে তোমার মতন 'ডিফিটিষ্ট' না থাকত।'

বি—'অপমান করে লাভ নেই।'

স—'তার চেয়েও বেশী।'

বি—'কি?'

স—'বিশ্বাসঘাতক। পুলিশে খবর দিয়েছ তুমি।'

বি—'হাঁ, দিয়েছি। লজ্জা পাচ্ছি না। এক হিসেবে তুমিও খুনী।'

স—'অনুগ্রহ করে এই ঘর থেকে এখনই বেরিয়ে যাবে? 'হয়ত, তোমার ইচ্ছা ছিল না, অন্যের প্ররোচনা ছিল। তাই সম্ভব, তাই আশা করছিলাম। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিও। এখনই যাবে?' বিজন চলে গেল। না, কিছুতেই হার স্বীকার চলে না, চলে না, শেষ চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টার শেষ নেই, নেই, নেই, শরীর পাত হোক, সকলে ত্যাগ করুক, তা বলে যেটা অন্যায় সেটা সহজে ঘটবে। বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, মেয়েমানুষের আঁচলধরা বুড়ো খোকা। মার্ক্স বলে গেছেন সেই কতকাল পূর্ব্বে, যে মধ্যবিত্তের দু'ভাগ, একভাগ ঝাঁপিয়ে পড়ে, অন্যভাগ সহানুভূতি দেখায়, চাঁদা দেয়, অবশেষে তারাই রক্ষণশীলের দলে মেশে, ধর্ম্মের ছুতোয়, ব্যবহারিক যুক্তির অছিলায়, বস্তুতঃ স্বার্থের তাড়নায়, অজানার ভয়ে। তাদের নিজের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করাই ভাল—কারা বন্ধু কারা শত্রু স্পষ্ট বোঝা যাক, যন্ত্রণা যেন একটু কমল।

সকাল ৯ টার সময় মজদুর-সভার মিটিং ডাকা হয়েছে। ভিড় হয় নি। সফীক একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। উধামজী বক্তৃতা দিলেন…"ভগবানের আশীর্ব্বাদে আজ মজুরদের জয়লাভ হয়েছে। তাদের ত্যাগ, তাদের জিদ্‌, তাদের, বিশেষত, মেয়েদের, আমাদের মা-বোনেদের, সহ্য শক্তি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যে-শান্তিতে তারা এই ধর্ম্মঘট চালিয়েছে তার তুলনা জগতে নেই। রুষবিপ্লবে যেমন মস্কোর স্থান, ভারতীয় বিপ্লবে তেমনই কানপুরের। সব চেয়ে আনন্দের কথা এই যে কানপুরের মজুর-সম্প্রদায় আজ অভিন্ন-হৃদয়, তার অন্তরে বাহিরে আজ হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ জ্ঞান নেই। এই সূত্রে আমি সহরের মুসলীম লীগকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে। আজ দেশ বুঝেছে, এবং আমাদের বিদেশী প্রভুরাও বুঝুন, যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেস ও লীগ একই পথের পথিক। আমাদের সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।" তাঁরা আমাদেরই…অতএব আমাদের বুকের নীরব ভাষা তাঁদের কানে পৌঁচচ্ছে। তাঁরা আমাদের, আমরা তাঁদের—এই সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থান নেই।

আমি বৃথা সময় নষ্ট করব না। আপনারা সকলে একমত হোন এই সাধারণ প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে। সর্ব্ববাদী ও আন্তরিক সম্মতি চাইছি। কারণ রয়েছে তার...এখনও এমন শত্রু রয়েছে যাদের উদ্দেশ্য যেন ঝগড়ার নিষ্পত্তি না হয়। তাদের দুরভিসন্ধিটা নাকোচ করুন আপনারা। আমাদের সকলের, শ্রমিকদের, মালিকদের, সরকারের, দেশের লোকসান কতটা হবে তাঁরা তলিয়ে দেখেছেন কি? তাঁদের গায়ে আঁচ পর্য্যন্ত লাগবে না, অথচ বলসাব আমরা, তোমরা...'

মজদুর-সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির একজন সভ্য প্রস্তাবটি পড়তে লাগলেন। মহবুব পাশে এসে বল্লে, 'ওস্তাদ, এই মত্তকা...' 'রাজি আছি, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে সায় দেবে...কিষণ কোথায়?' 'ভিড় ছোট, আমাদের লোক কম, তবু, তুমি যাও।' সফীক ভিড় ঠেলে মঞ্চের দিকে এগুল। উধামজী তাকে দেখে বল্লেন, 'এই যে কমরেড, স্বয়ং, অনেক দিন দেখিনি, কিছু আপত্তি আছে নিশ্চয়...হা, হা, হা...কমরেড আপত্তি ছাড়া আর কিছুই তোলেন না, এমন কি চাঁদাটি পর্য্যন্ত নয়। সভাপতি বোধহয় রাজী হবেন না, একটু দেরী হয়ে গেল।' প্রস্তাব পাঠ শেষ হল। সফীক বল্লে, 'আমি এখনই বলতে চাই কিছু, পরে সুবিধে হবে না...মনোনীত হবার পর আর বক্তব্য থাকবে না।' সফীক মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল।

'এই প্রস্তাবের সম্পর্কে আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে আসি নি। গ্রহণ করা, না করা সভার হাতে। আমি কেবল একটি প্রশ্ন করছি...তোমরা কি ভাবছ যে মালিকরা সর্ত্তগুলো মানবে?' দূর থেকে একজন বল্লে, 'মানবে না।' 'কিছুতেই মেনে চলবে না। মনে নেই মাত্র কয়েক মাসের পূর্ব্বেকার ব্যাপার? যারা সেবারে ধর্ম্মঘট চালালে এখন কাজ করছে নিজের নিজের জায়গায়? কার জন্য এবারকার হরতাল? করিমকে নেওয়া হবে ফেরৎ? তাকে নেওয়া হলেও তাকে অকর্ম্মণ্য বলে ওরা যে ছাড়িয়ে দেবে না এমন কিছু সর্ত্ত আছে?' উধামজী বল্লেন, "করিমকে অমন ভাবে এক্সপ্লয়েট করবেন না কমরেড। করিম ভাই নিজেই আর চাকরী নেবে না খবরটি বোধহয় কমরেডের অজ্ঞাত।' সফীক :'করিম নিজেকে বলি দিলে; আপনারা তাই নিয়ে গর্ব্ব করছেন... ...করিম একজন মাত্র, কিন্তু মজুরদের রাখা না রাখার মালিক কে? কারণ

দেখাবার ভার কার হাতে ? তোমরা বল, বিশ্বাস রাখতে পারা যায় এদের ওপর ?' উধামজী বাধা দিয়ে বল্লেন, 'সভাপতি মহাশয় যদি অনুমতি দেন তবে…' মঞ্চের ওপর দুজন দাঁড়িয়ে। সভাপতি চেয়ার ছেড়ে, উঠে বল্লেন, 'যিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি আমার অনুমতি চাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তবে এই ডিমক্রেসীর যুগে সকলেরই অধিকার আছে মতপ্রকাশের। আমি সেই ভেবে কমরেড্‌কে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। উধামজী আপনি বসুন।"

সফীক বোধহয় অতটা নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করেনি। একটু থতমত খেয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমরাই বল, বিশ্বাস করা যায়, এদের ওপর ?' সফীক মহবুবকে খুঁজতে লাগল ভিড়ের মধ্যে, পাওয়া গেল না, 'বিশ্বাস রাখা যায় ওদের প্রতিজ্ঞায়, যারা মুনাফার জন্য আইন ভাঙ্গতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ?' বিজন বল্লে খুনী…আইন ভঙ্গ সেটাও...মহবুব নেই, কিষণকে দেখা যাচ্ছে না, কোথায় গেল তারা, ভিড়ের মধ্যে তাদের মুখ সফীকের মুখের চাবি…চাবি হারিয়ে গেল না কি! 'আজ যদি বিনা অজুহাতে, ছুতোয়-নাতায় আবার তাড়ায়…তখন ? বিশ্বাস করা চলে কি ?' একটা কথা, ঐ বিশ্বাস, ঘরে ফিরে সেই বিশ্বাস আর অবিশ্বাস আসে…ইতিহাসের অন্তর থেকে, শ্রেণীবিরোধের পিছন থেকে, চেতনার আড়াল থেকে…সফীক আর বিশ্বাস কথাটি ব্যবহার করবে না। সভাপতি মহাশয় দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, 'দেখছি, কমরেড সব ব্যাপারটা অবগত নন। অবশ্য তাঁর দোষ নেই। যদি ওরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তবে আবার হরতাল হবে।' সফীক উত্তর দিলে—'হবে…কিন্তু কবে ? নোটিশ দেবার পর'…উধামজী—'অর্ডার, অর্ডার, অন্ এ পয়েন্ট অব অর্ডার, কমরেড সভাপতির সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত অন্যায়…তা ছাড়া কমরেড শ্রেণীবিরোধ প্রচার করছেন, তার স্থান ও কাল এই নয়। হাঁ, স্বীকার করছি নোটিশ দিতে হবে মজদুর-সভাকে। দেরী হবে অবশ্য, কিন্তু অধীর হলে চলবে না। কমরেড ভাবছেন, ইতিমধ্যে আন্দোলনে ভাঁটা পড়বে। তাতে অবশ্য কমরেডের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কিন্তু আমাদের শক্তি সঞ্চয় হবে। যে ধর্ম্মঘট পনের দিন কি একমাস অপেক্ষা করতে পারে না তার অন্তরে ন্যায়ের সমর্থন নেই। কমরেড ভাবছেন নতুন সর্ত্তগুলোর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আছে বৈ কি! পার্থক্য আগের সঙ্গে এই যে এবার

সরকার খুদ্, নিজে, মালিকদের ওপর চাপ দিতে পারবেন। একজন বড় জজ যদি রায় দেয় তবে সাধ্য কি তাকে অমান্য করা মালিকদের? লোকমত নেই? সরকার নেই?' সভাপতি মহাশয় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে লাগলেন। উধামজীর বক্তৃতা চলল—'একজন নামজাদা লোক শীঘ্রই নিযুক্ত হচ্ছেন—খবরটি একটু আগেই হয়ত প্রকাশ করে ফেললাম—কিন্তু আশা করি খবরের কাগজের বন্ধুরা যেন ব্যবহার না করেন···জজের সামনে যেতে আমাদের ভয় নেই···আমরা ন্যায়ে বিশ্বাসী, আমরা প্রপীড়িত, ন্যায় আমাদের দিকে, আমাদের আন্দোলন ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভয় আমাদের নেই, ভয় অন্যের।'

সফীক—'যতদিন রায় না বেরুচ্ছে ততদিন কারা খাওয়াবে? রায় যদি ওরা গ্রাহ্য না করে সরকার ওদের কি করতে পারেন? রায় দেবে কে? ওদেরই দলের, ওদেরই শ্রেণীর একজন?'

উধামজী—'পাঁচ মিনিট হয়ে গেল, সভাপতিজী। এইবার প্রস্তাবটা গৃহীত হোক। যদি অনুমতি পাই তবে মহাত্মাজীর একটি বাণী পড়ে শোনাতে পারি?' সভাপতির সানন্দ অনুমতি পাবার সঙ্গেই উধামজী পাঠ সুরু করলেন। সফীক বল্লে, 'আগে প্রস্তাব···কতদিন নাম ভাঙ্গিয়ে খাবেন?' সভাপতি—'আপনি এইবার থামুন। মহাত্মাজীর অপমান কেউ সহ্য করবে না। আমি আমার কর্ত্তব্য জানি। উধামজী আপনি পাঠ করুন।' উধামজী মঞ্চের কিনারায় দাঁড়িয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে জনতাকে সম্বোধন করলেন, 'মহাত্মাজী এই মর্ম্মে লিখছেন···তাঁর বাণীর সারমর্ম্মটাই বলছি, কে তাঁর অনবদ্য ভাষার অনুবাদ করবে?··তিনি লিখেছেন,···হরিজন-পত্রিকার মারফৎ···আমি বিশ্বাস করি না ধনিকে, শ্রমিকে কোনো আন্তরিক বিরোধ আছে। আমি নিজে শ্রমিক···তাই শ্রমিকদের হয়ে বলবার অধিকার আমার আছে···' সফীক বাধা দিলে—'কিন্তু নিজে তিনি ধনিক নন—এবং তিনি শ্রমিকও নন।' 'অর্ডার-অর্ডার···' উধামজী···'সে হিসেবে আমাদের কমরেডেরও কোনো অধিকার নেই···মহাত্মাজী লিখেছেন—সত্যাগ্রহ একটি বিজ্ঞান, তার রীতি আমার আয়ত্ত। সত্যাগ্রহ নিষ্ফল হবে তখনই যখন বিপক্ষকে অবিশ্বাস করব। অবিশ্বাস প্রেমের পরিচয় নয়। সত্যাগ্রহীর হৃদয়ে ঘৃণা থাকবে না, থাকবে

আততায়ীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, আস্থা, শ্রদ্ধা। তারই শক্তিতে আততায়ী বন্ধু হবে।...জয় মহাত্মাজীর জয়...আপনারা সকলেই প্রস্তাবটা শুনেছেন, একবার সমস্বরে বলে উঠুন...জয় মহাত্মাজীর জয়...ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' সফীক মঞ্চ থেকে নেমে পড়ল...জয়, জয়, জয় উধামজীর জয়, জয় মালিকের জয়, 'মহবুব বলতে পার, হার তবে কার? বিজন বলবে হার আমার, আমার দস্তুর, তা নয় মহবুব, হার তার, তার ভাবিজীর...আমাকে আড্ডায় নিয়ে চল মহবুব।'...

(ক্রমশঃ)

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

উত্তরফাল্গুনী—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পরিচয় প্রেস, কলিকাতা।

বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে যাঁদের কবিতা পড়েই লেখকের নাম না জেনেও অনায়াসে ধরা যায় লেখকটী কে তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অন্যতম এবং অগ্রণী। এর মানে শুধু এই নয় যে তিনি অনেক লিখে সুপরিচিত হয়েছেন, এর মানে এই যে তিনি যে ভঙ্গীতে যে ভাষা প্রয়োগ করেন তা অনন্যসাধারণ এই অর্থে যে তা অন্য দশজন শিক্ষিত এবং কাব্যরসিক বাঙ্গালীর অদ্যাপিও ধাতস্থ হয়ে ওঠেনি। সুধীন্দ্রবাবু লিখেছেন:

> "আজি ধূলা ঝেড়ে ঝেড়ে পুরাতন পুঁথি খুঁজে দেখি
> রচিলাম যত গান, সে-সকলই মিছে আর মেকি
> নিরুদ্দিষ্ট অতিকথা, নিরর্থক বাক্যের জঞ্জাল।" (মৌনব্রত)

তাঁর কাব্যবিচারে তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচকদের মনের কথা এই উক্তিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ হয়েছে বলেই তাঁর নবতম পুস্তকের কাব্যবিচার এই মন্তব্যের যাথার্থ্য পরীক্ষা দিয়েই সুরু করা প্রয়োজন মনে করি। কিন্তু তার আগে একটু ভূমিকা প্রয়োজন।

সুধীন্দ্রবাবুর এই বইএর কবিতাগুলিকে তাদের রীতি অনুযায়ী দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুকরণে এদের বলা যেতে পারে গৌড়ী এবং বিদর্ভী রীতি। সুধীন্দ্রবাবুর যে কবিতা নিয়ে আজ তিনি বিতর্কের বিষয় হয়েছেন সে কবিতা গৌড়ীরীতিতে লেখা। কিন্তু তিনি প্রথমেই এই রীতি অনুসরণ করেননি। তাঁর আগেকার কাব্য বিদর্ভী রীতিতে লেখা এবং সে কবিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কোন আন্দোলন হয়নি। কিন্তু বেশ কিছুকাল যাবৎ যে রীতিতে তিনি লিখছেন তাতে গাম্ভীর্য্য এবং কাঠিন্য দেবার একটা বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উত্তরফাল্গুনীতে তাঁর দুই রীতিতে লেখা কবিতাই রয়েছে, কিন্তু তাঁর গৌড়ী রীতির লেখা সম্বন্ধেই

'নিরুদ্দিষ্ট অতিকথা' এবং 'নিরর্থক বাক্যে জঞ্জাল' এই অভিযোগ আনা হয়ে থাকে। এই অভিযোগ কতখানি যথার্থ বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথম কবিতা "শর্ব্বরী" ধরা যাক। ছত্রিশ লাইনের আঠারো মাত্রার কবিতা। ভাষার যে গাম্ভীর্য্য রয়েছে তা যে একেবারে উপভোগ করা চলে না তা নয়। যেমন :

অঘ্রাণের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক ;
　　পথলুপ্ত কেলিকুঞ্জে পড়ে যদি পড়ুক তুহিন ;
শুষ্ক সরোজিনী ছেড়ে উড়ে যাক সপ্ত সিন্ধু পারে
যাযাবর রাজহংস পুলকিত কুলায়ের খোঁজে ;
তবু কিছু হারাবে না।

"শুষ্ক সরোজিনী," "সপ্ত সিন্ধু পারে," "যাযাবর রাজহংস," "পথলুপ্ত কেলি-কুঞ্জে" (যদিও 'লুপ্তপথ' নয় কেন বোঝা গেল না)-এর ধ্বনি ও চিত্র মাধুর্য্য নেই বলা চলে না। একটা ক্ষীণ আবেগও রয়েছে, বাক্যের ঝঙ্কার এবং শ্রুতি মাধুর্য্য অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তার পরেই

　　　　　　　　　মরণের অমৃত বিকারে
স্মৃতির মিশরী বীজ মন্বন্তরে যথারীতি মজে
অপ্রমেয় পারিজাত কল্পলতাবিতানে ফোটাবে।
কাল বৈনাশিক বটে, কিন্তু সেও স্বরূপে বিশ্বাসী ;
তাই তার গুহা চিত্রে মৃৎপ্রদীপ-পরম্পরা পাবে
নিবাত নিষ্কম্প দীপ্তি।

এখানে যে ভাষা পাই তা অর্থহীন না হলেও অর্থপূর্ণ নয়। এতে গাম্ভীর্য্য নেই, একটা শুষ্ক কাঠিন্য আছে মাত্র, অর্থ দুরূহ ও দুরধিগম্য, যদিও সে পরিমাণে সার্থক নয়। তার শব্দের ভাব তার অর্থকে ছাপিয়ে তো যায়ইনি বরং একটা শুষ্ক কার্পণ্যের আভাষ দেয়।—এখানে ভাষার শুধু ভারই রয়েছে, তার ডানা ভাঙ্গা, কল্পনার আকাশে উড়তে গিয়ে শুধুই ঝাপটাচ্ছে।

তারপর :

ক্ষেমঙ্কর সে-মহাসন্ন্যাসী—
বৃত্তি বিবর্জিত শূন্যে চলে গেলে কর্ম্মের প্রসাদে,
অদৃষ্টপূর্ব্ব তীর্থযাত্রী যুগে যুগে পুণ্য পীঠে জমে
ধূমাঙ্কিত চিত্তচৈত্য ভরে নেবে বর্ণাঢ্য প্রবাদে।

ভাষা জমকালো অস্বীকার করবার উপায় নাই, কিন্তু তার জোর কোথায়? ভাব জমাট বেঁধেছে কি? শব্দের ভার প্রচুর কিন্তু একে শব্দসম্ভার বলা চলে না। এর পরেই—

অনেক শতাব্দী কাটে। প্রকীর্ত্তিত সে-কন্দরে ক্রমে
বাদুর বানায় বাসা ; কালপেঁচা আনাচে কানাচে
ইঁদুরের ধ্যান করে ; কোণে কোণে অর্দ্ধভুক্ত শব
লুকায় হিসাবী শিবা ; ভূমিসাৎ বিগ্রহের কাছে
'মহীলতা জোট বাঁধে';

এতক্ষণ যে জগতে ছিলাম সেখানে ধ্যানী কালপেঁচার অস্তিত্ব ছিল না, কেঁচোর সঙ্গে ভূমিসাৎ বিগ্রহের মিলন ঘটে নি। কবিও বেহিসাবী হয়ে ওঠেননি তাই হিসাবী শিবার—গুপ্ত বা প্রকাশ্য—সন্ধান মেলেনি। যে-গাম্ভীর্য্যের সুর এতক্ষণ ধ্বনিত হচ্ছিল তার সঙ্গে এই হালকা সুর অন্তত এখানে কেমন যেন বেখাপ্পা শোনায়, বিশেষতঃ 'হিসাবী শিবা'র মধ্যে একটা যে pun-এর ইঙ্গিত রয়েছে তা কেমন যেন একটা অগভীর হাস্যরসের উদ্রেক করে যা নিশ্চয়ই কবির উদ্দেশ্যের বাইরে। কঠিন দৃঢ়বদ্ধ রচনার গভীর সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের হালকা ভাষা প্রয়োগ সব ক্ষেত্রে ভাল শোনায় না। এই কবিতারই পঞ্চম লাইনেও,হঠাৎ ভাষার এই বিপরীত গতি পাওয়া যায় :

"ফলত নিশ্চিন্ত কণ্ঠে তাকে বলেছিলুম সে দিন।"

ছন্দের দিক ছাড়াও এরূপ ভাষা এই কবিতার ষ্টাইল ক্ষুণ্ণ করেছে।

বাস্তবিক সুধীন্দ্রবাবুর ভাষার যে ত্রুটী আমাদের কানে এবং মনে লেগেছে তা এই যে, তার ভাবের চেয়ে তার ধ্বনি জমকালো, তা যে-পরিমাণে দুরূহ ও কঠিন সে-পরিমাণে জোরালো নয় ; তা যা বলে তা স্পষ্ট করে বলে না,

যা বলে তার চেয়ে বেশী ত' বলেই না। কোন কোন সমালোচক বলেছেন যে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগায়। একথা একেবারে মিথ্যা নয়। তাঁর কবিতার অর্থ বের করতে সাধারণ পাঠকের সময় লাগে, কিন্তু মুস্কিল এই যে পরিশ্রম অনেক ক্ষেত্রেই সার্থক হয় না : বিস্তর ধ্বস্তাধ্বস্তি করে যদিও বা অর্থ মিলে তার গৌরবে মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হয় না। বঞ্চিত হওয়ার একটা ক্ষোভ শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের মনে থেকে যায়। দুরূহ, অপরিচিত শব্দের বাধা নিয়ে সবক্ষেত্রে নালিশ চলে না, কিন্তু বাধা অতিক্রম করার পর যে পুরস্কার পাঠকের প্রাপ্য তা যখন মিলে না তখনই নালিশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ সমস্ত ত্রুটী সত্ত্বেও তাঁর ভাষাকে ঠিক 'নিরুদ্দিষ্ট অতিকথা', 'নিরর্থক বাক্যের জঞ্জাল' বলা সঙ্গত হবে না এইজন্য যে ভাব ও ভাষার কাঠিন্য ও গাম্ভীর্য্য আশানুরূপ এবং সুসঙ্গতরূপ না থাক, ভাষায় যে-কাঠিন্য এবং দুর্লভতা তাঁর কাব্যে রয়েছে তারও একটা প্রয়োজন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আছে। যে ভাষা আজ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কৃপায় সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের কাছে বিনা সাধনায় অত্যন্ত সুলভ হয়েছে সেই অতিসুলভ ভাষা আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্ষতি করেছে। অতি কোমল, অতি তরল, অতি ব্যবহৃত ভাষা বর্জ্জন করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ যে ভাষা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তা কঠিন সুন্দর হয়ে ওঠেনি এবং তার গাম্ভীর্য্য আজও ভাবের মূলে শিকড় গাড়তে পারেনি বলে অনেক পাঠকেরই কাব্য-পিপাসা মেটাতে পারে না সত্য, কিন্তু একথাও অস্বীকার করা চলে না যে বাংলা সাহিত্যে যে মহৎ কবির প্রতীক্ষা আমরা করছি তিনি সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি লেখকদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন এই জন্য যে এঁরা এখন প্রচলিত সুলভ কোমলতার মোহ কাটাতে চেষ্টা করেছেন। যে-রীতিতে আমরা অতি অভ্যস্ত সে-রীতি ত্যাগ করে অন্য রীতি প্রচলনে তাঁর প্রয়াস সার্থক না হলেও সাধু সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই নূতন রীতি যে এখনও তাঁর বা অন্যদের হাতে সুন্দর হয়ে উঠেনি এটা ধরে নিচ্ছি। সুধীন্দ্রবাবুর মন মার্জ্জিতরুচি কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। এসত্ত্বেও এই রীতিতে লিখবার অক্লান্ত অধ্যবসায় তাঁর আন্তরিকতা ও সাহসের পরিচয় দেয়, অথচ প্রচলিত রীতিতে যে তিনি অপটু নন তা তাঁর বিদর্ভী রীতির কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায়। 'উত্তরকাঙ্ক্ষী'তে

এই রীতির দৃষ্টান্ত যথেষ্ট রয়েছে এবং যাঁরা তাঁর আধুনিক রীতির অসুন্দর কাঠিন্যকে শ্রদ্ধা করতে পারেননি তাঁদের কাছে 'সংশয়', 'প্রতিদান' 'মরণ-তরণী,' ইত্যাদি কবিতা ভাল লাগবে—বিশেষ করে এগুলি সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বলে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

তাই আজি তব শুভ সমাগমে
পলাতক গান ফিরে আসে সমে
তাই মনে হয় মঙ্গলময়
নিরুদ্দেশের অমা
চরণে শরণ মাগিছে মরণ
নাও যা করেছি ক্ষমা। (মরণ তরণী)

আমি জানি কোথা কোন পল্বলে
সোনার সবিতা তিলে তিলে গলে,
বকুল বনের কোন কোণে শশী
দেখে মুখছবি মুকুরে ঝুঁকে।
তারার মালায় যে গণে প্রহর
অতন্দ্রিত সে আমারই দুখে ॥ (প্রতিদান)

সুধীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের আর একটি ঋণ রয়েছে। সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে তাঁর অধিকার বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। ভাষায় এবং ভাবে মাঝে মাঝে সংস্কৃত সাহিত্যের ছাপ যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে ইউরোপীয় ভাবের সংমিশ্রণ সে মাধুর্য্যকে বিচিত্র করেছে। 'সংশয়' এবং 'নিরুক্তি'তে এই সংমিশ্রনের কিছু কিছু পরিচয় মিলে।

ছন্দ সম্বন্ধে এখানে ওখানে কিছু কিছু বাধা পেয়েছি তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"ফলত নিশ্চিন্ত কণ্ঠে তাকে বলেছিলুম সেদিন" (শর্ব্বরী, ষষ্ঠ লাইন)

এই লাইনে এই কবিতার অন্যান্য চরণের মত আঠারো মাত্রা রয়েছে সত্য, কিন্তু কান এই আঠারো মাত্রার আশ্বাসে তৃপ্ত হয় না, ফলতঃ নিশ্চিন্ত কণ্ঠে

বলতে পারছি না যে এখানে ছন্দ ঠিক আছে। ছান্দসিকেরা বলবেন ত্রুটী কোথায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য দিয়েই আমরা নিরস্ত হচ্ছি। এই কবিতায় প্রবহমান লাইন, কিন্তু মিল দেখছি এক লাইন ডিঙিয়ে। এটা শক্তির বাজে খরচ বলে মনে হয় কেননা এ ক্ষেত্রে মিলের অস্তিত্ব কাণে লাগে না, খুঁজে বার করলে তবে মিলে। আর একটি লাইনের উল্লেখ করব।

"ক্ষণে ক্ষণে চমকে কী লালসা ॥" (সংশয়)

এ রকম লাইন আরও রয়েছে যেখানে কবি আমাদের কর্ণমর্দ্দন করেছেন।

পরিশেষে সুধীন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্য স্বীকার করে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেও বলতে চাই যে তাঁর ভাষার দুরূহতা আমাদের মধ্যে যাঁরা অহঙ্কৃত তাঁদের বিনয় শেখাবে এ যেমন একটা পরম লাভ, তেম্নি অনেক সময় তাঁর 'ব্যাসকূট' আমাদের অহেতুক দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। কথিত আছে গণেশ আটশোবার 'ব্যাসকূট' দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। 'মহাভারত' বিস্তীর্ণ কাব্য, আটশোবার আছাড় খাওয়া হয়ত গণেশের প্রয়োজন ছিল, অন্ততঃ ব্যাসের ছিল। কিন্তু আমাদের অন্ততঃ আটবারও সুধীন্দ্রকূট দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করায় সুধীন্দ্রবাবুর কি লাভ? তাঁর কাছ থেকে 'অবস্কর', 'ঝির্ঝির' প্রমুখ কতকগুলি শব্দ ধার করে এমন লাইন নির্ম্মাণ করা চলে অভিধান খুঁজে যার একটা অর্থ বের করা যায়, কিন্তু এই অনর্থক কসরতের কি সার্থকতা? সুধীন্দ্রবাবুর ক্ষমতা এবং বাংলা সাহিত্যে নূতন রীতি প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস স্বীকার করেও এ প্রশ্ন সোজাসুজি তাঁকে করতে চাই।

বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী

জীবন-মৃত্যু—প্রবোধকুমার সান্যাল। ডি. এম. লাইব্রেরী।

প্রবোধকুমার সান্যালের আধুনিকতম উপন্যাস 'জীবন-মৃত্যু' পড়ে বুঝলাম, লেখকের হার্দ্দ্য-পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কাল্পনিকতা প্রশ্রয় পায় নি; নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবন-মরণ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ। উপন্যাসের পশ্চাৎপট তেমন ব্যাপক নয়; কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যেই রঙে ও রেখায় প্রতিপাদ্য

বিষয়টি যে ভাবে রূপায়িত হয়েছে তা আশ্চর্য্য উজ্জ্বল। অথচ রঙ কোথাও বেশি খরচ হয় নি ; রেখার টানেও দেখা যায় সংযম। বস্তুত এ সমস্যার ছায়া অন্যান্য লেখকের গল্প-উপন্যাসেও ইতিপূর্ব্বে পড়েছে ; কিন্তু তা কেবল ছায়া। এমন সজীব ও জোরালো নয়। এ দিক থেকে বিচার করলে প্রবোধকুমার নিঃসন্দেহে ক্রান্তিকারী শিল্পী। প্রসঙ্গত এ-কথাও বলতে হয়, তাঁর বিশ্লেষণে যুক্তির ফাঁক আছে ; তা যতটা আবেগপ্রবণ সাহিত্যিকের, ততটা বিচার-বুদ্ধিপ্রবণ সমাজতাত্ত্বিকের নয়। এবং এ-দোষ অল্প-বিস্তর যে কোন্ বাঙালী লেখকের নেই বলা কঠিন। তা সত্ত্বেও প্রবোধকুমারের সাফল্য কম নয়। বিশেষত তাঁর মত জনপ্রিয় লেখকের পরিণতিতে এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ছে না ভাবলে সাহিত্যরসিক মাত্রেরই আশান্বিত হবার কথা।

সদ্য পিতৃহারা ভাইবোন অশোক আর রেণুর প্রাণান্ত জীবন-সংগ্রাম আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তাদের বাবা ছিলেন পঞ্চান্ন-টাকা মাইনের কেরাণী ; এবং অশোক সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরিয়েছে।

যদিচ এটা গৌরচন্দ্রিকা, কিন্তু পাঠক এ থেকেই বুঝতে পারবেন গল্পের ধারাটা কোন্ খাতে বইবে। পরিশেষে অগ্রজ অশোকের জন্যে রেণুর আত্মাহুতি মনে গভীর দাগ কেটে যায়। এমন কি মেরুদণ্ডহীন অশোকের চৈতন্য সঞ্চারের পরেও তাকে ক্ষমা করতে পারি না। রেণুর চরিত্র লেখকের বিস্ময়কর সৃষ্টি। তা ছাড়া কলিকাতার সমাজ-জীবনে কেমন ভাবে কর্কট রোগের বীজাণু প্রবেশ করেছে তা লেখক চমৎকার দেখিয়েছেন। বইখানা শুধু আনন্দই দেয় না, ভাবায়ও।

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড। বিশ্বভারতী। মূল্য —৪॥০, ৫৷০, ৬৷০ ও ৮৷৷০।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল কবির বাল্য ও কৈশোরের কতকগুলি কবিতার বই ও 'নলিনী' নামে একটি

নাটক। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে শুধু গদ্য-রচনা। এই রচনাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; সাহিত্যিক রচনা ও পাঠ্যপুস্তক।

নিজের অতি অল্প বয়সের কাঁচা রচনা সম্বন্ধেও লেখক মাত্রেরই মমতা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তার প্রমাণ, তাঁর আপত্তির ফলেই এই সব রচনাগুলি মূল রবীন্দ্ররচনাবলীতে অপাংক্তেয় ব'লে জায়গা পায়নি, অচলিত সংগ্রহে এগুলির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হয়েছে। প্রথম খণ্ড ছাপা হবার পর তিনি আবার এই রচনাগুলি সম্বন্ধে তাঁর বিমুখতা জানিয়ে প্রকাশককে চিঠি লেখেন। এই চিঠিটির শেষ অংশ উদ্ধারযোগ্য। এই রচনাগুলির যুগে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের প্রথমাবস্থায় এদেশের সাহিত্যিক আবহাওয়ার আভাস পাওয়া যায় এই মন্তব্যে :

> "একটা কেবল সান্ত্বনার বিষয় শুধু ক্ষণে ক্ষণে মনে জেগে ওঠে সেই যুগটাই নকলের যুগ। পূর্ববর্তী সাহিত্যের আবির্ভাব তখনো সে সম্পূর্ণ আপনার করে নিতে পারেনি। সে-যুগের ইংরেজ কবিদের মধ্যে যাদের রচনা গ্রহণ করবার শক্তি জেগেছিল, সেটা বাইরের থেকে ব্যঙ্গরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। তখন আমাদের যাঁরা প্রকাশ করেছেন, তাঁরা নকল শেলি বায়রণরূপে আমাদের অভিহিত ক'রে আমাদের গৌরব দান করেছেন। অর্থাৎ আমরা সে-সকল আহরিত সাহিত্য-সম্পদ তখনো স্বকীয় করে নিতে পারিনি। সুতরাং আমাদের মধ্যে যদি তাঁদের প্রভাব অক্ষম অনুকরণের পথে চালিত করে থাকে, তবে হয়তো সেই যুগের লজ্জার ভাগী আমরা সকলেই। যে-বয়সে এই যুগ স্বভাবত উপনীত হতে পারেনি, সেই বয়সকে ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।"

এই ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা শুধু যুবক রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক সাহিত্যে নয় বর্তমান সাহিত্য ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে সেকালের রঙ্গমঞ্চের ও রাজনৈতিক রীতিনীতিরও কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যায় :

> "তখন যে এদেশের রুচিসাহিত্যসমাজে কেবল বিদেশী কবির গোঁফ দাড়ি চর্চা চলেছিল তা নয়—বালখিল্য গারিবল্ডির দলকেও খোঁড়া গতিতে সদর রাস্তায় কুচকাওয়াজ করিয়ে তরুণরা গৌরববোধ করেছিল। এবং তার মধ্যে মধ্যে নকল গ্যারিকের প্রতি হাততালি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।"

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের পাকা কলম থেকে যে সূক্ষ্ম শ্লেষ বেরিয়েছে, তাঁর যৌবনের রচনাতেও তার পূর্বাভাষ পাওয়া যায় উনিশ বছর বয়সে লেখা 'নীরব কবি' প্রবন্ধে। 'প্রভাতচিন্তা' 'নিশীথচিন্তা' প্রভৃতির লেখক খ্যাতনামা সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'নীরব কবি' সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ একটি রচনা লেখেন। রবীন্দ্রনাথের 'নীরব কবি' তারই উত্তর। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

> যাঁহারা নীরব কবি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বচরাচরকে কবিতা বলেন। এ সকল কথা কবিতাতেই শোভা পায়। কিন্তু অলঙ্কারশূন্য গদ্যে অথবা তর্কস্থলে বলিলে কি ভালো শুনায়? একটা নামকে এরূপ নানা অর্থে ব্যবহার করিলে দোষ হয় এই যে, তাহার দুইটা ডানা বাহির হয়, একস্থানে ধরিয়া রাখা যায় না ও ক্রমে ক্রমে হাতছাড়া এবং সকল কাজের বাহির হইয়া বুনো হইয়া দাঁড়ায়, 'আয়' বলিয়া ডাকিলেই খাঁচার মধ্যে আসিয়া বসে না।"

যুক্তির সঙ্গে ব্যঙ্গের এই সমাবেশ ও সহজ জোরালো গদ্যে তার প্রকাশে বঙ্কিমের সুস্পষ্ট প্রভাব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা সেই আদিযুগের রচনাতেও ফুটে উঠেছে। এই স্বকীয়তা দেখা যায় তাঁর সমালোচনাগুলির মধ্যে বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সাহিত্য-বিচারের চেষ্টায়। অবশ্য তাঁর বিচারশক্তি তখনও অপরিণত ছিল, তা না হলে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের চাইতে 'বৃত্রসংহারকে' ও 'প্যারাডাইস্ লষ্ট'-এর চাইতে টেনিসন-এর 'ডি প্রোফান্ডিস্' কবিতাকে তিনি উঁচু স্থান দিতেন না। অপর পক্ষে, কুড়ি বছর বয়সে লেখা 'একচোখো সংস্কার' প্রবন্ধ তীক্ষ্ণ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

'নীরব কবি'-র দশ বছর পরে লেখা 'মন্ত্রি-অভিষেক' প্রবন্ধে তাঁর লেখার হাত অনেক পাকা হয়েছে কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সের গদ্য রচনার অসাধারণত্ব তখনো ফোটেনি। এই 'মন্ত্রি-অভিষেক' প্রবন্ধটির ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে বৃটিশ পার্লামেন্টে লর্ড ক্রশ 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ বিল' নামে একটি আইনের খসড়া উপস্থাপিত করেছিলেন। তাতে প্রস্তাব ছিল যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনপরিষদ্গুলিতে আরও জনকয়েক ভারতবাসীকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে কিন্তু তাঁদের নির্বাচন করবেন সরকার—দেশের

জনসাধারণ নয়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শুধু এদেশে নয়, পার্লামেন্টেও তুমুল আপত্তি হয় ও তখনকার প্রধানমন্ত্রী লর্ড সল্‌স্‌বেরি হাউস অব্ লর্ডস্‌-এ বলেন যে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রাচ্য মনোবৃত্তি ও ঐতিহ্যের বিরোধী ("Government by representation did not fit eastern traditions or eastern minds".) লর্ড ক্রশের ঐ বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হয় নাই—যাদের বিরোধিতার জন্যে হয় নাই তাঁদের মধ্যে চার্লস্ ব্র্যাডল-র নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ১৮৮৯ সালের পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে ব্র্যাডল ভারতবর্ষে এসেছিলেন ও সমস্ত রাজনৈতিক ভারতে যে সাড়া জাগিয়েছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লর্ড ক্রশের বিল পার্লামেন্ট নামঞ্জুর হলে ব্র্যাডল তার বদলে আর একটি বিল উপস্থাপিত করেন। ১৮৯০ সালে কলকাতায় সার ফিরোজ শা মেহটার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ব্র্যাডল-র বিল-এর সমর্থনে এক প্রস্তাব করেন। শেষ পর্যন্ত, লর্ড ক্রশের বিল-এর একটি পরিশোধিত ও কংগ্রেস-প্রভাবান্বিত সংস্করণ ১৮৯২ সালে পার্লামেন্টে গৃহীত হয়।

'মন্ত্রি-অভিষেক' প্রবন্ধ প্রথম পড়া হয় লর্ড ক্রশের প্রথম বিলের বিরুদ্ধে আপত্তির উদ্দেশ্যে আহূত জনসভায় ও পরে পুস্তিকাকারে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎভাবে রাজনীতির চর্চা কোনোদিন না করলেও রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়স থেকে দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক মতামত জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করে গিয়েছেন। রাজনৈতিক নেতৃমহলেও অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি যে সমাদর পেয়ে এসেছেন তার একটি প্রমাণ পাই অচলিত সংগ্রহের এই খণ্ডে মুদ্রিত একটি ফটোতে। ফটোটি তোলা হয় ১৮৯০ সালের কলকাতা কংগ্রেসের সময়ে। সামনে চেয়ারে বসে আছেন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেই অধিবেশনের সভাপতি সার ফিরোজ শা মেটা। পিছনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে দাঁড়িয়ে ঊনত্রিশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ, যাঁর প্রভাবে ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা তখন থেকেই সমৃদ্ধ হয়েছে। ছবিটি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের রবীন্দ্র-সংখ্যায় আগে বেরিয়েছিল।

অচলিত সংগ্রহের এই দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ ভাগে আছে পাঠ্যপুস্তকসংগ্রহ।

এগুলিতে পরিচয় পাওয়া যায় শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের—যাঁর বিষয় দেশের লোক অতি অল্প জানে। 'সংস্কৃত শিক্ষা', 'ইংরেজি সোপান' 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা', 'ইংরেজি সহজ শিক্ষা' 'অনুবাদ চর্চা' প্রভৃতি সংগৃহীত বইগুলির নাম থেকে বোঝা যায় ভাষা শিক্ষাদানে তাঁর কী রকম আগ্রহ ও অধ্যবসায় ছিল। এইগুলি সম্বন্ধে প্রকাশক যথার্থই বলেছেন, "এগুলিকে 'অচলিত' আখ্যা দেওয়া যায় না। ইহার অধিকাংশই এখনও প্রচলিত ও প্রচলনযোগ্য।…রবীন্দ্রনাথের মনীষা শিক্ষানীতিতে কতদূর সার্থক হইয়াছিল, এইগুলির সাহায্যে শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার আলোচনা করিতে পারিবেন।" এই পাঠ্য বইগুলির সার্থকতা আরো বেশী। রবীন্দ্রনাথের নিজ মুখ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ যাদের হয়েছে তাদের সৌভাগ্য বিরল। যাদের হয়নি তারাও, বিশ্বভারতীর উদ্যোগে, শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের মনীষার প্রভাব থেকে বঞ্চিত হবে না। বাংলাদেশের প্রতি গৃহে, প্রতি বিদ্যালয়ে অচলিত সংগ্রহের এই খণ্ডটি রাখা উচিত, নচেৎ প্রথম শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে ঘোর অবিচার করা হবে।

এই খণ্ডের সবশেষে ছাপা হয়েছে 'আদর্শ প্রশ্ন'। এই প্রশ্নাবলী রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছিলেন জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যাবিতরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষাসংসদ-নামক প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যতালিকা অবলম্বনে। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রশ্নাবলী প্রথম মুদ্রিত হয়। শুধু ব্যক্তিগতভাবে শিশু ও বালকবালিকাদের শিক্ষায় নয়, সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রচারে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়স পর্যন্ত কী রকম অক্ষুণ্ণ আগ্রহ ছিল এই প্রশ্নাবলী ও বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ যে সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে অচল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তার কারণ তিনি শুধু জনকবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন জনকল্যাণযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত।

সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমেন চন্দ

লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পটভূমিকায় একটিমাত্র লোকের মৃত্যু অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিশেষ পরিবেশে একজনের মৃত্যু বহুমৃত্যুর চাইতে বেশী অর্থবহ হ'তে পারে। সোমেন চন্দর মৃত্যু এই জাতীয়। সোমেনের বয়স বেশী হয় নি, কিন্তু এই অল্প বয়সেই মূল্যবান কাজ ক'রে সে তার তরুণ জীবনকে বিরল সম্পদে ঐশ্বর্যবান্ করেছিল। এই পত্রিকার গত সংখ্যায় 'ইঁদুর' নামে যে-গল্পটি প্রকাশিত হয়, তাতে তার জীবনের একটিমাত্র দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় আমাদের আশ্চর্য করে দেয়, কিন্তু এই তার পুরো পরিচয় নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব জীবনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে তার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার প্রতিভাস মাত্র। এই অভিজ্ঞতাকে সজীব ও গভীর করেছিল বিশেষ একটি আদর্শ। সোমেন মার্ক্‌স্‌বাদী ছিল। এই মার্ক্‌স্‌বাদের প্রেরণাতেই সে ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নির্ভীক ভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে প্রাণ বলি দিতে হল এই বর্বরতারই যূপকাষ্ঠে। সব থেকে শোচনীয় ব্যাপার এই যে সোমেনকে যারা হত্যা করেছে তারা জার্মান, ইটালীয় বা জাপানী নয়, তারা আমাদেরই দেশের লোক। ফ্যাশিষ্ট বর্বরতার প্রভাব কী রকম ব্যাপক ও তার বিরুদ্ধে আমাদের কতখানি সতর্ক হওয়ার দরকার আছে এই ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আশার কথা এই যে সোমেনের মৃত্যু ব্যর্থ হয় নি। তার প্রমাণ পেলাম তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত 'প্রাচীর' নামে যে কবিতা-সংগ্রহ দক্ষিণ কলকাতার ছাত্রসঙ্ঘ প্রকাশ করেছেন তার থেকে। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার উচিত যে-পথে সোমেন অগ্রণী হ'য়ে প্রাণ দিল সেই পথে তার অনুসরণ করা। সমগ্র দেশের সামনে আজ এই একমাত্র পথ।

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আষাঢ় ১৩৪১

পরিচয়

উপনিষদে জড়তত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টির মুহূর্ত

আদিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মই ছিলেন,—আর কিছুই ছিল না।

আত্মা বা ইদং এক এবাগ্রে আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ—ঐত, ১।১

সে অবস্থায় তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন।

ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ—শ্বেত, ৪।১৮

তদেতৎ জানথ সদসদ্ বরেণ্যং—মুণ্ডক ২।২।১

সদসৎ অমৃতঞ্চ যৎ—প্রশ্ন, ২।৫ *

অর্থাৎ Being and non-being, like all other pairs of opposites, are transcended by Brahman.

সেইজন্য উপনিষদ্ ঐ অবস্থাকে অসৎ ও সৎ—উভয়ই বলিয়াছেন।

অসদ্ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ। তদ্ আহুঃ কিং তদ্ অসদ্ আসীৎ ইতি। ঋষয়ো বাব তে অগ্রে অসদ্ আসীৎ তদ্ আহুঃ। কে তে ঋষয়ঃ? প্রাণা বা ঋষয়ঃ। তে যৎ পুরা অস্মাৎ সর্বস্মাৎ ইদম্ ইচ্ছন্তঃ শ্রমেণ তপসা রিষন্ তস্মাৎ ঋষয়ঃ †—শতপথ, ৬।১।১।১

---

* সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে—যোগবাশিষ্ঠ

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসৎ উচ্যতে—গীতা, ১৩।১২

অর্থাৎ পরব্রহ্ম সৎ ও অসতের অতীত।

† This universe in truth in the beginning was nothing at all; for they say, what was this non-being?

অসদ্ এবেদম্ অগ্র আসীৎ। তৎসদ্ আসীৎ তৎ সমভবৎ—ছান্দোগ্য, ৩।১৯।১

অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদ্ অজায়ত।—তৈত্তি, ২।৭

তথাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত, তস্মাৎ সুকৃতমুচ্যতে।

—অর্থাৎ, It self-fashioned out of itself indeed, the universe being as we know only a self-manifestation of Brahman.

এখানে ঐ অবস্থাকে অসৎ বলা হইল। আবার অন্যত্র উপনিষদ্ ঐ অবস্থাকে 'সৎ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ—ছান্দোগ্য, ৬।২।১

—এবং পাছে অসৎ বলিলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হয়, এজন্য আমাদের সতর্ক করিতেছেন—

তদ্ হ একে আহুঃ অসদ্ এবেদম্ অগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাৎ অসতঃ সৎ জায়তে।

কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথম্ অসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদ্একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥—ছান্দোগ্য, ৬।২।২

'অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব, একামেবাদ্বিতীয়ম্ সৎই আদিতে বিদ্যমান ছিলেন।'

বস্তুতঃ ঐ অবস্থা অনির্বচনীয়—উহা সৎও নহে, অসৎও নহে। ঋগ্‌বেদ গম্ভীর ঝঙ্কারে এ অবস্থার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন :—

নাসদ্ আসীৎ তদানীং নোসদ্ আসীৎ তদানীং।
নাসীদ্ রজো নো ব্যোমো পরো যৎ।
কিম্ আবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্
অম্ভঃ কিম্ আসীদ্ গহনং গম্ভীরম্ ॥
ন মৃত্যুরাসীদ্ অমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥
তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে
অপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।

—ঋগ্‌বেদ ১০।১৩০।১-৩

'তখন অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না। তখন অন্তরীক্ষও ছিল না ব্যোমও ছিল না। কিসে সমস্ত আবৃত ছিল? কিসে সমস্ত আশ্রিত ছিল? কেবল কি গহন গভীর অম্ভঃ (অপ্) বিদ্যমান ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না। দিবা রাত্রির প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই এক (অদ্বিতীয়) স্বধার (মায়ার) সহিত অনিল ভিন্ন প্রাণন করিতেছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন কিছু ছিল না। তমঃ তমসের দ্বারা অগ্রে আবৃত ছিল—এ সমস্তই অপ্রকেত (নিরঞ্জন) সলিল মাত্র ছিল।'

এইরূপে ব্রহ্মের সদসদের-অতীত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভাবের বর্ণনা করিয়া ঋগ্‌বেদের ঋষি বলিতেছেন:—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি। মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ॥

সতো বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন্। হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥

—ঋগ্‌বেদ, ১০।১৩০।৪

"অগ্রে 'কাম' উচ্ছ্বসিত হইল; ইহাই মনের প্রথম বীজ। কবিগণ প্রকৃষ্ট মনীষা দ্বারা সেই সতের সুহৃদ্‌কে অসতের (জড়ের মধ্যে) জ্ঞাত হইয়াছেন।"

ইহাই ব্রহ্মের সিসৃক্ষা—একের বহু হইবার ইচ্ছা। ঋগ্‌বেদ ইহাকে 'কাম' বলিলেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এ প্রসঙ্গে বলিতেছেন:—

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ।

ন দ্যৌরাসীৎ, ন পৃথিবী, নান্তরিক্ষম্।

তদ্ অসদেব সন্ মনঃ অকুরুত স্যাম্ ইতি (This Being conceived a wish—'May I be'.)। তদ্ অতপ্যত। —তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।২।৯।১

উপনিষদ্ এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন:—

সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি।—তৈত্তি, ২।৬

'তিনি কামনা করিলেন—এক আমি বহু হইব।'

পুরুষোহবৈ নারায়ণঃ অকাময়ত—প্রজাঃ সৃজেয় ইতি—নারায়ণ, ১

অন্যত্র উপনিষদ্ এই ব্যাপারের নাম দিয়াছেন—'ঈক্ষা'।

তদ্ ঐক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয় ইতি।—ছা, ৬।২।৩

স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।—ঐত, ১।১

'তিনি ঈক্ষা করিলেন—এক আমি বহু হইব, লোকসমূহ সৃষ্টি করিব।'

কোথায়ও উপনিষদ্ এই ব্যাপারকে ব্রহ্মের 'তপঃ' বলিয়াছেন—

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।—তৈত্তি, ২।৬।১

'তিনি তপঃ তপিয়াছিলেন; তিনি তপঃ তপিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।'

ঋগ্‌বেদ ঐ তপঃকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বেই বলিয়াছিলেন—

তপসঃ তৎ মহিনা অজায়তৈকম্—১২৯।৩

'সেই অদ্বিতীয় এক তপের মহিমা দ্বারা প্রকট হইলেন।'

তপঃ কি? ঈক্ষা বা সংকল্প।

স্রষ্টব্য-পর্যালোচনরূপস্য তপসঃ মহিনা মাহাত্ম্যেন অজায়ত—সায়ণ।

বৃহদারণ্যক অন্যভাবে এই কথাই বলিয়াছেন—

সঃ অর্চন্ অচরৎ। তস্যার্চত আপঃ অজায়ন্ত—১।২।১

অর্চন্ অচরৎ—সংকল্পাদিলক্ষণং করণং কৃতবান্—নারায়ণ

অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টির সংকল্প করিলে অপ্ উৎপন্ন হইল।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।—মুণ্ডক, ২।১।৮

'ব্রহ্ম তপের দ্বারা স্ফীত হন; তখন অন্ন (জড়) উৎপন্ন হয়।'

যঃ পূর্বং তপসো জাতম্‌অদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।—কঠ, ২।১।৭

'যাহা তপঃ হইতে পূর্বে জাত হইয়াছিল—যাহা অপের (কারণার্ণবের) পূর্বে জন্মিয়াছিল।'

অতএব দেখা গেল, একই ব্যাপারকে (অর্থাৎ ব্রহ্মের সিসৃক্ষাকে) উপনিষদ্ 'কাম', 'ঈক্ষা', 'তপঃ'—এই তিন সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

কেন ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হইল? কেন তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন? উপনিষদ্ কোথাও এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। তবে স্থানে স্থানে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদ্ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। স হ এতাবান্ আস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ।' স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চা ভবৎ।—বৃহ, ১।৩।

'(অদ্বিতীয়) পরমাত্মা প্রীতি অনুভব করিলেন না। সেই জন্য একাকী প্রীতি হয় না।

তিনি দ্বিতীয়ের জন্য ইচ্ছা করিলেন। পূর্বে তিনি একীভূত ছিলেন—যেন সংযুক্ত স্ত্রীপুরুষ; এখন তিনি নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন—যেমন পতি ও পত্নী।'

এই পতি ও পত্নী আর কেহ নহেন—আমাদের পরিচিত জীব ও জড়।

অন্যত্র বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

স অকাময়ত দ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েত ইতি।—বৃহ, ১।২।১

'পরমাত্মা কামনা করিলেন আমার দ্বিতীয় আত্মা উৎপন্ন হউক।'

ইহা হইতেই দ্বৈতের উৎপত্তি—সৃষ্টির আরম্ভ।

এই মর্মে মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ বলিতেছেন—

প্রজাপতির্বা একোঽগ্রেঽতিষ্ঠৎ। স নারমত একঃ। সোঽত্মানম্ অভিধ্যায় বহ্বীঃ প্রজাঃ অসৃজত।—১।৫

'প্রজাপতি অগ্রে একক ছিলেন। তিনি একক প্রীতিলাভ করিলেন না। তিনি আত্মাকে অভিধ্যান করিয়া বহু প্রজা সৃষ্টি করিলেন।'

আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্মা যখন আপ্তকাম, তখন কি প্রয়োজনে, কোন্ অভাবের পূরণে তিনি সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে ইহার উত্তর দিয়াছেন :—

লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্।—২।১।৩৩ সূত্র

'সৃষ্টি তাঁহার লীলাবিলাস মাত্র; যেমন শিশু প্রয়োজন-ভিন্নও ক্রীড়া করে, তাঁহার সৃষ্টিকার্যও তদ্রূপ।'

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম সৃষ্টির মূল কথা 'একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়।' এই মন্ত্রে সৃষ্টির তিনটি মুখ্য মুহূর্ত উক্ত হইল—the three moments of creation. (উহাই সাংখ্যদিগের সমষ্টি-মহৎ, অহংকার ও মনঃ)।

ঐ তিনটি মুহূর্ত কি কি? উপনিষদের ভাষায়—ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হইলে তিনি এইরূপ ঈক্ষা করেন (স ঈক্ষাং চক্রে)—

(১) একোঽহং—ইহাই cosmic অভিমান বা অহংকার—এ মুহূর্তে তিনি 'সর্বাহংমানী' হয়েন।

(২) বহুস্যাম্—ইহাই cosmicবুদ্ধি—এ মুহূর্তে তিনি 'অধ্যবসায়' করেন (অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ)—He resolved.

(৩) প্রজায়েয়—ইহাই cosmic মনঃ বা সঙ্কল্প—এই মনঃ—'is Divine mind in creative mood'—সিসৃক্ষাযুক্ত মনঃ—ঋগ্‌বেদের সেই কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি। এ মুহূর্তে 'মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া'।*

বলা বাহুল্য, যাঁহার সিসৃক্ষার কথা বলা হইল তিনি সগুণ ব্রহ্ম—নির্গুণ নহেন। সগুণ ব্রহ্মই সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্তা। নির্গুণ ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্বিকল্প, নিরুপাধি। তিনি যখন মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করেন, তিনি যখন সবিশেষ সবিকল্প সোপাধি হইয়া সগুণ মহেশ্বর হন, তখনই তাঁহাতে সিসৃক্ষার উদয় হয় এবং তিনি বিশ্ব-রচনায় প্রবৃত্ত হন।

অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বম্ এতৎ—শ্বেত, ৪।৯
মায়িনং তু মহেশ্বরম্—শ্বেত, ৪।১০

সৃষ্টির প্রাক্‌ক্ষণে মায়া-শবলিত হইবার পূর্বে ব্রহ্ম ঐ মায়ার সহিত একীভূত থাকেন। এ কথা আমরা ঋগ্‌বেদের ঋষির মুখে শুনিয়াছি—

আনীৎ অবাতম্ স্বধয়া তদেকম্—১০।১২৯।২

স্বধা=মায়া। তয়া তদ্ ব্রহ্ম একম্ অবিভাগাপন্নম্ আসীৎ—সায়ন

সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন :—

তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ—১২৯।৩

'তুচ্ছ্যের' দ্বারা 'আভু' আচ্ছাদিত ছিলেন।

(তুচ্ছ্যেন, তুচ্ছকল্পেন সদসদ্‌বিলক্ষণেন ভাবরূপাজ্ঞানেন অপিহিতং ছাদিতম্ আসীৎ—সায়ন)।

ইহাকেই ভাগবত বলিয়াছেন—মায়া-যবনিকাচ্ছন্নম্। ঐ ভাবরূপ অজ্ঞান তুচ্ছ্যই বৈদান্তিকের মায়া—সদ্-অসদ্‌ভ্যাম্‌ অনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী। আর 'আভু' কি?

---

* এ বিষয়ে যাঁহার জিজ্ঞাসা আছে তিনি আমার 'সাংখ্য পরিচয়' ২য় খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় দৃষ্টি করিবেন।

মনিয়ার উইলিয়ম্‌স (Monier Williams) বলেন 'আভু'র অর্থ শূন্য (empty, void) এবং প্রমাণস্থলে তিনি ঋগ্বেদের অন্যত্র ঐ অর্থে প্রযুক্ত 'আভু' শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন—জানামি বেং ক্ষেম আপ্নবভ্রম্ আভুম্ (১০।২৭।৪)। নির্বিশেষ নিরুপাধি, নিরঞ্জন ব্রহ্মকে শূন্য বা আভু বলা খুব সঙ্গত নয় কি ? কারণ, যাঁহার পরিচয় 'নেতি নেতি' মাত্র (অথাত আদেশো নেতি নেতি), তিনি empty, void, শূন্য বৈ আর কি ?

প্রলয়ের অবসানে সৃষ্টির প্রাক্‌ক্ষণে ঐ একমেবদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম বা 'আভু' ঐরূপে তুচ্ছ্য বা মায়ার দ্বারা শবলিত ছিলেন—সেইজন্য তত্ত্বদর্শী শুভরাও বলিয়াছেন, দৈবী প্রকৃতি পরব্রহ্মের যবনিকা বা veil।

এইরূপে ব্রহ্ম মায়ী বা মায়া-শবলিত হইলে তবে প্রলয়ের যবনিকা উত্তোলিত হয়। এজন্য ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম স্বতঃনির্গুণ কিন্তু তিনি সৃষ্টির অভিমুখে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করতঃ সগুণ হন।

গৃহীত-মায়োরুগুণঃসর্গাদৌ অগুণঃ স্বতঃ—২।৬।৩৯

ঐ সগুণ ব্রহ্ম মহেশ্বরই জগৎ-জাল রচনা করিয়া নিজেকে যেন আবৃত করেন।

যন্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বম্ আবৃণোৎ—শ্বেত, ৬।১০

*'মাকড়সা যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, স্বভাবতঃ অদ্বয় ব্রহ্ম তেমনি প্রধানজ জালে নিজকে আবৃত করেন।'

এইরূপে ব্রহ্ম 'বিশ্বযোনি' হন—

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ—শ্বেত, ৫।৫
তদ্ অব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—মুণ্ডক, ১।১।৭

যোনি অর্থে কারণ। কারণ দ্বিবিধ— উপাদান ও নিমিত্ত, যেমন অলঙ্কারের প্রতি সুবর্ণ উপাদান-কারণ ও স্বর্ণকার নিমিত্ত-কারণ; ঘটের প্রতি মৃত্তিকা উপাদান-কারণ ও কুম্ভকার নিমিত্তকারণ। ব্রহ্ম জগতের কোন কারণ—নিমিত্ত না উপাদান? বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে তিনি দুই-ই, নিমিত্তও বটেন, উপাদানও বটেন।

ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত-কারণ বাদরায়ণ উপনিষদের অনুসরণ করিয়া নিম্নোক্ত সূত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন ;—

জগদ্বাচিত্বাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৬
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা—মুণ্ডক, ১।১।১
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্—শ্বেত, ৬।৬

ঐ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

পরমেশ্বরশ্চ সর্বজগতঃ কর্ত্তা সর্ববেদান্তে অবধারিতঃ।

শঙ্করের মতানুসারী ভারতীতীর্থ লিখিতেছেন :—এতৎ কৃৎস্নম্ জগদ্ যস্য কার্যং স এব বেদিতব্য ইতি। কৃৎস্ন জগৎ-কর্তৃত্বঞ্চ পরমাত্মন এব।

অর্থাৎ, পরমাত্মা 'পরমেশ্বর'ই সমস্ত জগতের কর্ত্তা (নিমিত্ত কারণ)। তিনি যে কেবল নিমিত্ত-কারণ তাহা নহেন, উপাদান-কারণও বটেন। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বাদরায়ণ একাধিক সূত্র নিয়োজিত করিয়াছেন।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ ইত্যাদি :—ব্রঃ সূঃ, ১।৪।২৩-২৭

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন :—

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণং চ ব্রহ্ম অভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্ত-কারণং চ। ন কেবলং নিমিত্ত-কারণমেব।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ তাহা নহে, তিনি নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই।'

আমরা দেখিলাম, উপনিষদের মতে বিশ্বযোনি ব্রহ্ম 'মায়ী'—মায়িনং তু মহেশ্বরম্। এই মায়া কি? প্রথম অধ্যায়ে আমরা ইহার আলোচনা করিয়াছি।

বিশ্বকে যদি ব্রহ্মের বিবর্ত ধরা যায়, জড় যদি অসৎ, অবস্তু, কল্পনার বিজৃম্ভণ মাত্র হয়—তবে মায়া ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ইন্দ্রজাল শক্তি (Power of Glamour)—সেই ঐশ্বরী শক্তি, যদ্দ্বারা জীবের জগদ্-ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। এ ভাবে ব্রহ্ম মহা-ঐন্দ্রজালিক।

য একো জালবান্ ঈশতে ঈশনীভিঃ।—শ্বেত, ৩।১

'সেই এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি-দ্বারা ঈশন করেন।'

যাদুকর যেমন ইন্দ্রজাল ক্রীড়ার বিস্তার করিয়া দর্শকের সমক্ষে নানা অঘটন ঘটন সম্পন্ন করে—তখন দর্শকের মনে দৃঢ় প্রতীতি হয়, সে যেন কত কি অদ্ভুত দেখিতেছে, শুনিতেছে; অথচ সেই দৃষ্ট-শ্রুত সমস্তটাই ভ্রম।

'হিপ্‌নটাইজর' (hypnotiser) যেমন সঙ্কল্পবলে নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির মনে নানা ভ্রম উৎপাদন করে—সে ব্যক্তির তখন মনে হয় যে, তাহার সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহ মুখ ব্যাদান করিয়া আছে, অজগর সর্প তাহাকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে, মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছে, অশনিসম্পাতে পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যাইতেছে—অথচ সে সমস্তই অলীক কল্পনামাত্র। সেইরূপ ব্রহ্ম যে শক্তিবলে—বস্তুতঃ জগৎ নাই অথচ জীবের মনে জগদ্-ভ্রান্তি উৎপন্ন করিতেছেন—তাহার প্রতীতি হইতেছে, যেন বাস্তবিক জগৎ রহিয়াছে; যে ভ্রান্তির বশে জীব সংসার করিতেছে, জড়ের সহিত সংঘর্ষে আসিতেছে—ব্রহ্মের সেই শক্তির নাম মায়া। ইহাই মায়ার প্রত্যক্ (subjective) ভাব।

কিন্তু মায়ার পরাক্ (objective) ভাবও আছে। সে ভাবে বিশ্ব ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার। সে ভাবে মায়া পূর্বকল্পের জগতের সংস্কার (latent অবস্থা)। কল্পের অবসানে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে থাকে—সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হইয়া শেষে সমস্ত জড় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই প্রলয়ের অবস্থা। জগৎ থাকে না কিন্তু জগতের সংস্কার বীজভাবে ঈশ্বরে বিলীন থাকে। আমরা দেখিব কল্পারম্ভে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়—এই latent ক্রমশঃ patent হয়, অব্যাকৃত ব্যাকৃত হয়, অব্যক্ত ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন সৃষ্টি আবার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাই মায়ার পরাক (objective) ভাব।

পুরাণের ভাষায় এই সৃষ্টি ও প্রলয়কে ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি বলা হয়। গীতা বলেন—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥

'দিবাগমে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের আবির্ভাব হয়; আবার রাত্র্যাগমে ব্যক্তের অব্যক্তে তিরোভাব হয়।'

দিবা ও রাত্রির সহিত সৃষ্টি ও প্রলয়ের তুলনা সুসঙ্গত। কারণ, প্রতি-রাত্রিতে ও প্রতি-দিবসে আমরা নিজেদের মধ্যে এই সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি। যখন রাত্রিতে আমরা সুষুপ্তির ঘোরে আচ্ছন্ন হই, তখন সমস্ত মনোবৃত্তি চিত্তে বিলীন হইয়া যায়,—বিলুপ্ত হয় না, অব্যক্ত হইয়া সংস্কাররূপে অবস্থান করে। আবার দিবাগমে যখন আমরা জাগরিত হই, তখন সেই সকল অব্যক্ত বৃত্তি ব্যক্তাবস্থা ধারণ করে, সেই বিলীন সংস্কার উদ্‌বোধিত হয়। এইরূপে দেখা যায়, সুষুপ্তিতে চিত্তের প্রলয় হয়, আবার জাগ্রতে চিত্তের সৃষ্টি হয়। এই দিবারাত্রি, এই সৃষ্টিপ্রলয়, চক্রাকারে পরিবর্তিত হইতেছে—পর্য্যায়ের নিয়মে প্রবাহিত হইতেছে। উপনিষদ্ এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎপ্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎপ্রতীচ্য, স্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপি যন্তি সমুদ্র এব ভবন্তি। 'তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি। এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি।

—ছান্দোগ্য, ৬।১০।১০২

'এই সমস্ত নদী পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়, পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রবাহিত হয়। ইহারা যখন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তখন ইহাদিগের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। 'আমি এই নদী', 'আমি এই নদী'—ইহা আর তাহারা জানিতে পারে না। সেইরূপ হে সোম্য! এই সমস্ত জীব, সৎ (ব্রহ্ম) হইতে নির্গত হইয়া জানিতে পারে না যে, তাহারা ব্রহ্ম হইতে নির্গমন করিয়াছে।'

ব্রহ্মেরও ঐরূপ দিবা ও রাত্রি, নিদ্রা ও জাগরণ, সৃষ্টি ও প্রলয়। যখন রাত্রিকালে তিনি যোগ-নিদ্রায় নিদ্রিত হন, তখন জগৎ তাঁহাতে লীন হইয়া যায়, অব্যক্ত অবস্থা ধারণ করে। আবার যখন দিবাগমে তিনি জাগরিত হন, তখন তাঁহাতে লীন জগদ্-বীজ অঙ্কুরিত হয়, অব্যক্ত ব্যক্তাবস্থা ধারণ করে। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

আসীদিদং তমোভূতম্ অপ্রজ্ঞাতম্ অলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যম্ অবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।

—মনু, ১।৫

'প্রলয়ে এ সমস্তই তমোভূত ছিল—যেন প্রসুপ্তিতে আচ্ছন্ন ছিল।'

সেই অপ্রতর্ক্য, অলক্ষণ, নামরূপের অবস্থাতীত অব্যাকৃত জগৎ ব্রহ্মে লীন ছিল—যেমন জীবের সুষুপ্তিতে জীবের ক্ষুদ্র জগৎ তাহাতে লীন থাকে।*

সৃষ্টির মুহূর্ত সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। আগামী অধ্যায়ে সৃষ্টির ক্রম-সম্পর্কে আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

নববিধান

বিখ্যাত হোয়াং পরিবারের ছোট রাস্তার সাথে বড় রাস্তার যেখানে মৈত্রী, সেখানে লুচেনের একটা চায়ের দোকান। সবাই জানে গোটা রাস্তার ভেতর এই জায়গাটাই যা একটু জাঁকালো। বড় বড় দোকান কয়েকটা, আর কয়েকজন বড় লোকের বাড়ি। দিনের মধ্যে অন্ততঃ কুড়িবার কেরানীবাবুরা চায়ের জন্য তার দোকানে লোক পাঠায়। পাড়ার মেয়েরা এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াতে এলে তাদের কাছ থেকেও ঘন ঘন ফরমাস আসে। জমকালো ব্যবসা লুচেনের ওর ঠাকুর্দার সময়ও কম জমকালো ছিল না অবিশ্যি। কয়েক মাইল দূরেই সম্রাট ছিলেন তখন, আর ঐ ছোট রাস্তাটা তাদেরই বাগান বাড়িতে যেয়ে শেষ হয়েছিল।

বাবার কাছ থেকে লুচেন দোকান আর এক থলি টাকা পেয়েছিল। নিজের বিয়ের খরচে সে থলি উজাড় হয়েছিল একবার। ছেলের পড়াশুনা ও বিয়ের জন্যে আরেকবার ভরতে হয় সেটা। সম্প্রতি ওটা পঞ্চমবার পূর্ণ হয়েছে। লুচেনের নাতি দোকান ঘরের ভেতর ছুটোছুটি করে, মাটির উনুনে বসানো কেটলির গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, ওটা সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করে ওকে।

আমি যখন ছোট ছিলাম, লুচেন রোজ বলে, আমি কখনও কেটলির দিকে যেতাম না। ঠাকুর্দার কথা শুনতাম, মুরগির বাচ্চার মত অমন ঘুরঘুর করে বেড়াতাম না।

নাতিটি এসবের কিছু বোঝে না। ওর মুখে এখনও ভালো ক'রে কথা ফোটেনি। তবে সে যে ঠাকুর্দার চোখের মণি এ বুদ্ধি হয়েছে। তাই তারই চোখের সামনে বার বার উনুনের কাছে যায় ও।

তোমার ছেলেকে নিয়ে আর আমি পারিনে বাপু, লুচেন তার ছেলেকে বলত, কবে যে তুমি ওকে বাধ্য হতে শেখাবে?

লুচেনের ছেলে গবর্ণমেন্ট সিভিল্ স্কুলের চার বছরের পড়া শেষ করে অবধি সে মনের মধ্যে আপশোষ আর অসন্তোষকেই লালন করে এসেছে, উত্তরে ঘাড় কোঁচকালো : আজকাল আমরা শিকলের পূজো করি না।

লুচেন ছেলের দিকে তীক্ষ্ণ ভাবে তাকাত। ওর ছেলে যে অলস, একথা ও কিছুতেই স্বীকার করবে না। রাত্রে স্ত্রীর পাশে শুয়ে পর্য্যন্ত নয়।

মাঝে মাঝে ওর স্ত্রী বলত, কি-ই বা করবার আছে ওর। ওইটুকু ত দোকান, একজন লোকই যথেষ্ট। তোমার বয়স ত পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল। এখন ছেলের হাতে সব ছেড়ে দিলেই ভালো। না, তুমি নিজে সব কর। কুঁড়ে হয়েই থাকবে যদি, তাহলে ওকে ইস্কুলে পাঠানো কেন?

পাশের বালিসে লুচেন মাথা লুকোত। দোকানের সব ভার ছেড়ে দেবার চিন্তা প্রায়ই পীড়িত করে ওকে। বছরের পর বছর ধরে সে যে তার ছেলেকে ইস্কুলে পড়তে দিচ্ছে, সে ত' যাতে করে দোকানটা তার হাতে থাকে এই জন্যেই।

ওই বড় কেটলিটা, লুচেন গরগর করত, কোনদিন তেমন চকচকে দেখলাম না। না হলেও দশদিন বলেছি ওঁকে, উনুন থেকে ছাই নিয়ে ভালো করে মেজে ফেল ওটা, তারপর শুকনো কাপড়ে একবার—আঃ একদিনও ওকে দিয়ে করাতে পারি যদি।

ও কাজ করলে তোমার মন ওঠে না, বৌ বলত।

আমি যা বলব তা ও শুনবে না কোনদিন—লুচেন চেঁচাত। তোমার আসলে মন ওঠে না, বৌ আস্তে বলত।

এর চাইতে রাগ করলেও লুচেন সুখী হ'ত বোধ হয়। সোজা হয়ে বসে বৌটির মুখের দিকে তাকাত সে। প্রদীপের আলো মশারির ভেতর এসেছে খানিকটা। বৌটির তন্দ্রালু চোখ আর বোবা মুখ স্পষ্ট দেখা যায়।

আমার বাবা যা শিখিয়েছেন, আমি তাই করি, লুচেন আবার বলত।

ভালই ত, বৌটি বিড়বিড় করত। যাকগে, ঘুমোও এখন। লুচেন এক মিনিট কি যে ভাবত, তারপর ধীরে ধীরে শুত। দোকানের জন্যে তোমার এতটুকু ভাবনা নেই, লুচেনের শেষ কথা শোনা যেত। স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই তার সবচেয়ে বড় অভিযোগ।

বৌটি উত্তর দিত না। ঘুমের ভেতর তার শান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ মশারির সবটুকু অবকাশ হরণ করে নিত।

পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে কেটলি ছুটো মাজল লুচেন। নিজের

চেহারা ওদের উপর দেখা গেল শেষটায়। কি ভাবে পরিষ্কার করতে হয় ছেলেকে দেখাবার জন্যে ও কেটলি দুটোকে উনুনে দেবে না ভেবেছিল। কিন্তু সাহসে কুলোল না। ঝি চাকর রোজ সকালে তাদের মাইজীদের জন্যে স্নানের জল নিতে আসে। কেটলিতে জল ঢেলে লুচেন তলায় আগুন জ্বালাল তাই। বার তিনেক জল গরম হবার পর ওর ছেলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরে ঢুকল। নীল গাউনটায় অর্দ্ধেকগুলো বোতাম নেই। মাথার চুল খাড়া খাড়া। লুচেন তার দিকে বাঁকা চোখে তাকাল।

আমি যখন ছোট ছিলাম, লুচেন বলল, তখন সকালে উঠে কেটলি মেজে উনুনে আগুন দিতাম রোজ, বাবা ঘুমিয়ে থাকতেন।

আজকাল বিপ্লবের দিন, ছেলেটি হালকা ভাবে বলল। অবাধ্য আর আলসে ছেলের দিন এটা, লুচেন বলল, তুমি এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে না, ঐ সব দেখে ছোট ছেলেটা কি হচ্ছে ভাবো ?

ছেলেটি মৃদু হাসল শুধু, তারপর কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে উনুনের দিকে এগিয়ে গেল।

এত করেও দোকানটা রেখেছি, সেও তোমার জন্যেই; লুচেন বলল, তোমার ছেলের হাতে যাতে ব্যবসাটা তুলে দিতে পারি। আজ ষাট বছরের দোকান এটা। সবাই জানে। আমাদের জীবন একে নিয়েই কাটলো। তোমার ছেলেরও—

নতুন একটা রাস্তা হবার কথা হচ্ছে, গরম জলে মুখ ধুয়ে, বলল ছেলেটি।

রাস্তার কথা লুচেন এই প্রথম শুনলে। তাই বেশি কিছু বুঝল না। ওর ছেলে সব সময় বাইরে কাটায়, সহরে বিপ্লব আসবার পর থেকে নতুন নতুন কথা বলে সব। বিপ্লবটা যে কি লুচেন স্পষ্ট দেখতে পায় না। এক সময় তার দোকানের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল, লুটতরাজের ভয়ে বড় বড় দোকান বন্ধ ছিল কিছুদিন, আর যাদের ফরমাস জোগাত লুচেন, সাংহায়ে বাসা বেঁধেছিল তারা। সে সময় গরীব লোকের টিনের পেয়ালায় চা ঢালত লুচেন। এক আধলা নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হত। লোকে বলত, এই ত বিপ্লব মনে মনে সে একে অভিসম্পাত দিত। তারপর হঠাৎ চারদিকে সৈন্যসামন্তে ভর্ত্তি হয়ে গেল। হরদম চা কিনত ওরা। টাকার থলি ভরে

উঠল আবার। এটাও বিপ্লব। আর এক দফা অবাক হল সে, তবে এবার আর অভিসম্পাত দিল না। বড় বড় দোকানপাট খুলল আবার, আবার সাংহাই থেকে ফিরে এল ওরা, সৈন্তেরা মিলিয়ে গেল কোথায়। সব যেমন ছিল তেমনই হল। জিনিসের দাম কিন্তু কমল না। চায়ের দাম বাড়িয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লুচেন।

এই সব বিপ্লব, লুচেন একদিন তার ছেলেকে বলেছিল, কিসের জন্যে এ সব? তোমাকে স্কুলে পাঠানো হল, আর যত সব হাঙ্গামা। তবুও এখন শেষ হয়ে এসেছে যা হোক—

শেষ? ছেলেটি এবার ভ্রূ কোঁচকালো, এই ত আরম্ভ কেবল! দুদিন দেখুন, সারা শহর এই দেশের রাজধানী হবে। সব জিনিসের ওলটপালট হবে তখন।

বুড়ো লোকটি মাথা নাড়ল। ওলটপালট? তেমন বড় ওলটপালট হয় না কখনও। সম্রাটই আসুক, রাজাই আসুক আর সভাপতিই আসুক, চা লোকে খাবেই, স্নান না করেও পারবে না।

তবুও এই নতুন রাস্তা? ছেলেটি যেদিন এর কথা প্রথম বলে সেদিনই তিন নম্বর বাড়ির ঝিয়ের মেয়েটি ওর কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, আমাদের বাবু বলছিলেন ষাট ফুট চওড়া নতুন রাস্তা হবে একটা। তখন তোমাদের দোকানের কি হবে, লুচেন?

লুচেন কথা বলেনি। কাঠি দিয়ে আগুনে খোঁচা দিয়েছে শুধু। ঐ বেহায়া মেয়েটার সাথে আবার অত কথা কিসের?

তবুও মেয়েটি চলে যাবার পর তার মনে হল, লিং পরিবারে কাজ করে মেয়েটি। আর সেই পরিবারের বড় ছেলে কর্ম্মচারী একজন। রাস্তা সম্বন্ধে কোন কথা ও শুনেছে নিশ্চয়ই। আর্ত্ত চোখে ছোট দোকান ঘরের পিঙ্গল ইটগুলোর দিকে তাকায় ও। ধোঁয়া আর জলে কালো হয়ে গেছে ইটগুলো। মাঝে মাঝে দুএকটা চিড়, ছোট বেলায় ও সেগুলো দেখেছে মনে হয়। ষাট ফুট চওড়া। তার মানেই দোকানটাকে ওখান থেকে মুছে নেওয়া একেবারে।

এত বেশি দাম চাইব যে ওরা দিতে পারবে না, লুচেন ভাবল। এমন

একটা দাম, সরকারকে চমকে দেওয়া যায় এমন একটা—হ্যাঁ, দশ হাজার ডলার।

লুচেন খুসী হয়। বার বর্গ ফুট জমি আর দুটো কেটলির জন্যে অত টাকা দিতে আসবে কে? আর পৃথিবীতে অত টাকাই বা কোথায়। ওর বাবার ছেলেবেলায় কুমার মিং ইউয়ান অত টাকা দিয়ে একটা প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। ও হাসল একটু, ছেলেকেও আর বিশেষ কিছু বলল না। সব আগের মতই চলল।

একদিন সকালের পর ছোট এককাপ চা নিয়ে বসল লুচেন। পাঁচ কেটলি চা করে দুপুরের জন্যে আবার জল চাপাবার আগে রোজ সে নিজের চা তৈরী করে। এই সময়টাই যা বিশ্রাম একটু। নাতিটাকে হাঁটুর উপর বসাত লুচেন, তাকেও চা দিত। দুহাতে ডিস ধরে ওকে চায়ে চুমুক দিতে দেখে না হেসে পারত না।

হঠাৎ বাইরে একটা শব্দ হল। লুচেন ছেলেটাকে আলগোছে নামিয়ে রাখল, তারপর চায়ের কাপ তার নাগালের বাইরে রেখে দরজা খুলে দিল। নীল গাউন পরা একজন তরুণ কর্ম্মচারী দাঁড়িয়ে সেখানে। লুচেনের দিকে তার যেন ভ্রূক্ষেপই নেই।

মহাশয়, লোকটার কাছে বন্দুক ছিল বলে আস্তে কথাটা উচ্চারণ করল লুচেন।

নতুন রাস্তাটা তোমার দোকানের ভেতর দিয়ে যাবে। তোমার নামটা যেন কি? কর্ম্মচারীটি পকেট থেকে কাগজ বের করে তার ওপর চোখ বোলালো একবার—ও হ্যাঁ, লু! আজ থেকে পনের দিনের মধ্যে তোমার দোকান সরিয়ে নেবে অবিশ্যি। না হলে আমরা নিজেরাই ভেঙে ফেলব। কাগজটা যত্ন করে আবার পকেটে রাখল লোকটি। তারপর যাবার জন্যে বেঁকে দাঁড়াল সে। লুচেন কথা বলতে পারল না। ঢোক গিলতে গিয়ে দেখল গলা শুকিয়ে গেছে। যাবার সময় জনৈক সৈনিক তার দিকে ফিরে তাকাল। সেই করুণ চাহনিতে লুচেনের গলার গিঁট খুলে গেল বোধ হয়।

দশ হাজার ডলার—কর্ম্মচারীটাকে উদ্দেশ্য করে লুচেন বলল।

কি? কর্ম্মচারীটি ফিরে দাঁড়াল।

এই দোকানের দাম দশ হাজার ডলার ঃ লুচেনের গলা কাঁপছিল।

কর্ম্মচারীটি তার বন্দুকে হাত দিল একবার। ভয়ে লুচেন দরজাটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু লোকটি অত সহজে ছাড়বে না। ফিরে এসে বন্দুকের গোড়া দিয়ে কাঠের দরজায় সজোরে আঘাত করল ও। লুচেন ঠকঠক করে কাঁপছিল। নাতির মুখের সাথে ঠোকাঠুকি হওয়ায় সেও কেঁদে ফেলল। এর আগে ছোট ছেলেটা কাঁদলে তার কাছে ছুটে যেত লুচেন। কিন্তু এখন ওর কান্না বোধ হয় লুচেন শুনতেও পেল না। নবাগত কর্মচারীটির দিকে একভাবে তাকিয়েছিল সে, আর মাঝে মাঝে বলছিল, দশ হাজার ডলার। কর্মচারীটি দাঁড়িয়েছিল। এবার যাবার আগে হো হো করে হাসল একবার—নতুন রাজধানীতে তুমি দান করবে এটা।

দান? কিসের দান? মাটির মেঝেতে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছেলেটা। কোথায়ও পড়ে গেলে, পড়েই থাকিত ও, কারণ কেউ না কেউ এসে টেনে তুলতই। কিন্তু কেউ এল না এখন। দরজার বাইরে প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে কর্ম্মচারীটাকে লক্ষ্য করছিল লুচেন। ওর মন এত মুসড়ে পড়েছে যে নিঃশ্বাস নিতে পর্য্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। ওর জীবন, ওর দোকান সব ছেড়ে দিতে হবে? নতুন রাজধানী, কি কথা এসব? তাকে নিয়ে টানাটানি কেন? সে আবার ছেলেটাকে তুলে হাঁটুর উপর বসাল। হ্যাঁ, নাবালকের দোকান এটা। তোমার সাধ্য কি কেড়ে নাও? দোকান ও কিছুতেই দেবে না, কোনদিন না। মাথার উপর থেকে শেষ টালি না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত ও বসে থাকবে সেখানে।

সেই ঝিয়ের মেয়েটা আবার এল।

নতুন রাস্তাটা তৈরী হলে তোমার দোকানটা উঠে যাবে, বাঁচব আমরা—কম চা দিয়েছে মনে করে বলল মেয়েটি।

আমি কিছুতেই ছাড়বো না, লুচেনের কথাগুলো আছাড় খেয়ে পড়ল বলা যায়, তাও আবার তোমাদের নতুন রাস্তার জন্যে, হুঃ।

খানিক পরে দরজা খুলে ছেলে এসে ঢুকল।

নতুন রাস্তার কথা কি বলছিলেন—কেটলির জল ঢালতে ঢালতে ছেলেটি বলল।

দুবেলা খাবার সময় নামমাত্র বাড়ি আস, কেমন? লুচেন বলল: কোথায় ছিলে আজ সারাদিন।

নতুন রাস্তা হবে কিন্তু সত্যি, প্রায় ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিল ছেলেটি: হবেই। আমাদের দোকান ঘরের ভেতর দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে ওটা। আমাদের শোবার ঘর দুটো থাকবে শুধু।

লুচেন অবিশ্বাসীর মত তাকাল। প্রচণ্ড রাগে ওর চোখ বুঁজে এসেছে প্রায়। ছেলের হাত থেকে কেটলি ছিনিয়ে নিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ওটা। তুমি আস, আর চা খেয়ে চলে যাও, লুচেন ভারি গলায় বলল। তারপর ছেলের বিস্মিত চোখের উপর চোখ পড়তেই ছুটে বেরিয়ে গেল। একেবারে নিজের শোবার ঘরে মশারির ভেতর। বিছানায় লুটোপুটি করে কাঁদল কিছুক্ষণ।

সকালে যখন ঘুম থেকে উঠল, লুচেন তখনও ছেলেকে ক্ষমা করতে পারেনি। ছেলেকে স্বচ্ছন্দে ভাত খেতে দেখে ভ্রূ কুঁচকে লুচেন বলল, তুমি খাও, তোমার ছেলে খায় তিনবেলা, অথচ টাকা যে কোথা থেকে আসে সে খবর রাখ না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ও বিশ্বাস করতে পারল না যে ওর দোকান ঘর সত্যিই নেওয়া হবে, তাই কাজে গেল আবার।

কর্ম্মচারি যেদিন এসেছিল, তার এগার দিন পরে লুচেনের স্ত্রী স্বামীর কাছে এল: রাস্তাটা সত্যিই এদিকে আসছে। সোজা তাকালেই দেখতে পাবে তুমি। কি যে হবে আমাদের। বৌটির চোখে জল এল, মুখে কিন্তু তার কোন ছায়া নেই। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে লুচেনের মনটা দুলে উঠল একবার। দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল সে। চিরকাল রাস্তাটা এত সরু, এত নোঙরা আর উপরের বিজ্ঞাপনের চাপে এত অন্ধ হয়েছিল, যে কয়েক ফুটের বেশি দৃষ্টি যেত না। কিন্তু এখন অজস্র সূর্য্যের আলো সোঁদা পাথরগুলোর উপর এসে পড়েছে। কুড়ি ফুট দূরে একটা বিজ্ঞাপনও নেই আর। মানুষ ঘর বাড়ি ভাঙছে শুধু। বহু যুগের বিচিত্র রঙ করা ইট কাঠ রাস্তার উপর জমানো, সেগুলোকে পরিষ্কার করবার জন্যে গাধা পর্য্যন্ত দল বেঁধে এসেছে। সেই কর্ম্মচারীটা হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর তার পেছনে চারজন স্ত্রীলোক ঘুরছে সব সময়। ওদের কথার

টুকরো লুচেনের কানে এল : বাড়ি ঘর ভেঙে নিলে কি করে বাঁচবো আমরা।

দোকান ঘরে যেয়ে লুচেন দরজা বন্ধ করে দিল। উনুনের পাশের ছোট টুলটায় চুপ করে বসল একবার। বিস্তৃত গোলকধাঁধা ওর মনে। ভেঙে চুরে রাস্তা আসছে এইবার। ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঠাকুর্দার হাঁটু জড়িয়ে ধরল নাতিটি, লুচেন উদাসীন ভাবে তাকাল একবার। ওর দূর প্রসারিত দৃষ্টি দেখে ছোট ছেলেটি চঞ্চল হল শুধু, তারপর সসঙ্কোচে উনুনটাও ছুঁলো বোধ হয়। লু জীবনে এই প্রথম নাতিকে কিছু বলল না। মনের সর্ব্বত্র একটি প্রচ্ছন্ন চিন্তার স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। পুড়ে মরা ত ভালই, না খেয়ে মরতে হবে এর পরে।

এমন সময় দরজায় জোরে ধাক্কা দিল কে যেন। লুয়ের মন আনন্দে নেচে উঠল একবার। দেহটাকে টেনে নিয়ে দরজা খুলল লুচেন। সেই কর্ম্মচারী, আর জন তিনেক সৈন্য তার পেছনে। একটু আগেই যে কয়েকটি মেয়ে ওদের চরম অভিশাপ দিয়েছে, চেহারা দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। বিশ্বাস ও দৃঢ়তার এমনিই একটি সুস্পষ্ট ছবি ওদের মুখে চোখে। ওদের দিকে তাকিয়ে লুচেনের কেন যেন মনে হল সে বুড়ো হয়ে গেছে, এখন তার মরে যাওয়াই ভালো।

চার দিন পরে এখানে যেন তোমার দোকান না থাকে, কর্ম্মচারিটি বলল, নিজে ভেঙে ফেল ঘরটা, মালমসলা তোমারই থাকবে সব। নাহলে আমরা ওসব বাজেয়াপ্ত করে নেব।

কিন্তু টাকা ? লুচেন কাঁপল।

টাকা, কর্ম্মচারীটি খোঁচা দিয়ে বলল। উজ্জ্বল কালো রঙের বুটে হাতের ছড়িটা ঠুকলো বার কয়েক।

এর দাম দশ হাজার ডলার, শরীর ও মনের সবটুকু শক্তিকে মুখপাত্র করে লুচেন বলল।

কর্ম্মচারীটি তীক্ষ্ণ অথচ সঙ্কীর্ণ হাসি হাসল।

একটা টাকাও পাবে না, সে বলল। প্রত্যেকটি কথা ইস্পাতের মত স্বচ্ছ

শীতল। গণতন্ত্রকে তুমি উপহার দিচ্ছ এটা। লুচেন ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে তাকাল। কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে। কেউ তাকে সাহায্য করবেই।

রাস্তায় লোকজন দেখলেই ও ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলত, দেখছেন ত মশাই: আমার সর্ব্বস্ব যাবে। গণতন্ত্র ডাকাতি করবে আমার উপর। কে এই গণতন্ত্র? আমাকে খেতে দেবে ও, আমার বউ, আমার ছেলে—

ওর পেছন থেকে কোট ধরে টানল কে যেন। সেদিনের সেই সৈন্যটা।

সাহেবকে চটিও না, আরও খারাপ হবে তাহলে, ও চেঁচিয়ে বলল, প্রতিবাদ করে লাভ নেই আর। যে নতুন দিন সামনে, গরম জলের জন্যে সেদিন দোকান থাকবে না। নল বেঁকে আপনিই গরম জল আসবে।

ঠিক সেই সময় ওর ছেলে ওকে পেছনে টেনে নিজে এগিয়ে না এলে লুচেন একথার জবাব দিত নিশ্চয়ই। চিন্তিত অথচ বিনীত ভাবে ছেলেটি বলল, আপনি ওঁকে মাপ করবেন। বিপ্লব যে এসে গেছে এবং নতুন আলো নিয়ে এসেছে সাথে তা উনি ঠিক বোঝেন নি। এ ঘরটা আমরাই ভেঙ্গে ফেলব। নিজের দেশের জন্য আমরা সর্ব্বস্ব দিতে পারছি এটা ত আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা।

কর্ম্মচারীটির মুখে রাগের যে লাল দাগ গাঢ় হয়ে আসছিল, আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ওটা। ঘাড় নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

লুচেনের ছেলে সমবেত জনতার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর দরজায় ঠেস দিয়ে লুচেনের মুখোমুখি দাঁড়াল। ছেলের এই রকম দৃঢ় ও নিশ্চিত ভঙ্গির সাথে লুচেনের পরিচয় নেই।

তাহলে আমরা সবাই মরে যাব বলুন, ছেলেটির বলার ধরণ দাবি জানানোর মতন: সামান্য একটা দোকানের জন্যে আমাদের মরে যেতে হবে নাকি?

মরতে ত আমাদের এমনিই হবে, লুচেন টেবিলের আর এক দিকে স্ত্রীর পাশে বসে বলল। ওর স্ত্রী সব সময় কাঁদে, তবে শব্দ করে নয়, জ্যাকেটের কোণ দিয়ে চোখ মোছে বার বার।

আমি ত চাকরী পেয়েছি একটা, ছেলেটি বলল, ওরা আমাকে এই রাস্তার কাজের জন্যে কুলিদের ওভার্সিয়ার করেছে।

লুচেন ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল। ওর মনে আর এতটুকুও আশা নেই।

তুমি, শেষ পর্য্যন্ত তুমিও, লুচেন ফিসফিস করল। ছেলেটি কপাল থেকে চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিল শুধু। এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে লাভ নেই কোন। ও আসবেই। ভাবুন না, নতুন একটা বড় রাস্তা আমাদের সব আবর্জ্জনা মুছে নিয়ে যাবে! বড় বড় মোটর যাওয়া আসা করবে। একবার স্কুলে আমি একটা বিদেশী শহরের ছবি দেখেছিলাম—কত মোটর সেখানে! আমাদের রাস্তাতেই শুধু রিকসা আর গাধার ভিড়। হাজার বছর আগেকার তৈরী রাস্তা এসব। নতুন কিছু আমরা কোনদিন দেখব না নাকি?

কি দরকার ওসবের—লুচেন বলল। গত কয়েক সপ্তাহে ও কয়েকটা মোটর দেখেছে। দুর্দান্ত গতি ওদের। মানুষ ভয়ে পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়েছে কতবার। ওর ভাল লাগেনি। আমাদের বাপ ঠাকুর্দা—

সে সব তাঁদের জন্যে, ছেলেটা বলল। নতুন রাস্তা থেকে আমি মাসে পঞ্চাশ ডলার করে পাব।

মাসে পঞ্চাশ ডলার। লুচেন অবাক হল বৈকি? সে কখনও এত টাকা দেখেনি। বউটির কান্না শুকিয়ে এল।

এত টাকা কোথা থেকে আসবে? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল লুচেন।

নতুন গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ছেলেটি শান্ত গলায় বলল।

আমার একটা কালো সাটিনের কোট কিনতে হবে, বৌটি বলল।

ওর মুখে আলো ফুটেছে আবার। কিছুক্ষণ পরে সে হাসল। মাঝের সময়টুকু কোটের কথা ভাবল বোধ হয়।

লুচেন দেখল দোকান বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই, বিশেষ করে তাদের বাঁচবার অন্য উপায় হয়েছে যখন। তিন কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথম উনুনে আগুন জ্বলল না। খদ্দের জল নিতে এলে ও বলল: দরকার নেই আর। শিগগিরই নল পাবে তোমরা। না পাওয়া পর্য্যন্ত নিজেরাই জল গরম করে নিও, কেমন?

পরের দিন ওর ছেলে বলল, মিস্ত্রী এনে ঘরটা ভাঙবার ব্যবস্থা করা যাক। না হলে ইট কাঠগুলোও খোয়া যাবে? একথা লুচেনকে আবার নাড়া দিল।

ও বলল, না। ওরা যখন নেবেই তখন সব নিক। চারদিন ঘরে দরজা দিয়ে থাকল সে। গেল না, দরজা খুলল না পর্য্যন্ত। ধ্বংসের বাজ ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে। চুরমার হয়ে ইট পড়ার শব্দ, শতাব্দীবৃদ্ধ কাঠের গোঙানি আর তার মত আরও কত জনের আর্ত্ত চীৎকার।

পনের দিনের দিন সকালে তার দরজায় ঘা পড়ল। লুচেন উঠে দরজা খুলে দিল। তার সামনে জন বারো লোক দা কুড়োল নিয়ে দাঁড়িয়ে। তোমরা আমার দোকান ভাঙতে এসেছো, বেশ ত। কি করব আমি। ভাঙো। সে আবার বেঞ্চে বসল। লোকজন ঘরে ঢুকল। ওদের মুখে সহানুভূতির একটা রেখাও নেই। এই ভাবে কতশত ঘর বাড়ি ভেঙে এসেছে তারা। ওদের কাছে, লুচেন জানতো, সে শুধু একজন বুড়ো। তাছাড়া কষ্টও সেই বেশি দিয়েছে সবাইকে।

লুচেনের স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি এরা আজ সকালে কোন এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে। যাবার সময় এই বেঞ্চটা ছাড়া আর সব কিছু নিয়ে গেছে ওরা। ওর ছেলে লুচেনকেও যেতে বলেছিল। লুচেন যায়নি।

উনুনের ভেতর ছুটো তামার চিমনি আঁট করে বসানো। ছুজন লোক শাবল দিয়ে টেনে তুললো ও ছুটো।

আমার ঠাকুর্দা বসিয়েছিলেন ও ছুটো, লুচেন সহসা বলে ফেলল। আজ-কাল ও জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না।

ওরা ছাদ থেকে টালি খুললো। একটু একটু করে রোদ এল ঘরে। লুচেন কিছু বলল না। চারদিকে ইটকাঠের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ নিয়ে চুপ করে বসে থাকল শুধু। লোকজন তাকাল একবার, মুখ খুলে কিছু বলল না।

তারপর প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলে ছেলে এসে লুচেনের হাত ধরে টানল। আপনি না এলে খোকা কিছুতেই খাবে না, বাবা, মোলায়েম করে বলল ছেলেটি। লুচেন ধীরে ধীরে উঠল, যেন কত বুড়ো হয়ে গেছে। তারপর ছেলের হাত ধরে এগোল।

একটি নির্জ্জন জায়গায় বাসা বাঁধল ওরা। ছোট বাড়িটার চারধারে প্রান্তরের প্রসারিত অবসর। সারাজীবন ভিড়ের মধ্যে কাটিয়ে এই নির্জ্জনতা লুচেনের অসহ্য হয়ে উঠল। শূন্য মাঠের দিকে তাকাতে পারত না সে।

সারাদিন নিজের ঘরে বসে থাকত। হাতে কোন কাজ না থাকায় খুব তাড়াতাড়ি সে বুড়ো হয়ে গেল। মাসের শেষে ওর ছেলে পঞ্চাশটি রূপোর ডলার নিয়ে এসে লুচেনকে দেখাল।

দোকানে কোন মাসে এত টাকা হয় নি—ছেলেটি বলল। ওর স্বভাবে আর কোন অনিয়ম নেই এখন। জামার সবগুলো বোতাম আঁটা।

কিন্তু লুচেন শুধু বলল, আমার কেটলি দুটোয় অন্তত দশ সের জল ধরত।

একদিন ওর স্ত্রী নতুন সাটিনের কোট গায়ে দিয়ে লুচেনকে দেখাতে এল। লুচেন তার দিকে তাকাল একবার। আমার মা যে কোটটা গায়ে দিতেন সেটা সিল্কে মোড়া ছিল।

ওকে কেউ ঘরের বের করতে পারত না। দিনের পর দিন সে ঠায় বসে থাকত। চুলগুলো সব শাদা হয়ে গেল। বার্দ্ধক্যের গুরু চাপে দৃষ্টি নিষ্প্রভ হল। একমাত্র ছোট ছেলেটাই মাঝে মাঝে ঠকাত ওকে।

একদিন ওই ছোট ছেলেটাই ওকে দরজার বাইরে নিয়ে এল। শীতের স্বল্পায়ু দিনগুলো ও জানালার পাশে বসে কাটিয়ে দিত। একমাত্র খাবার সময় ছাড়া উঠত না।

তারপর এক সপ্তাহ বৃষ্টির পর একটি মন ভোলানো দিন এল। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যের আলোয় মাঠ ঘাট প্রসন্ন হল। চঞ্চল হয়ে জানালা খুলল লুচেন। সবুজ ঘাস আর ভিজে মাটির গন্ধ আসছে কোথা থেকে। দোকান থাকলে আমি বৃষ্টির জল ধরে রাখতাম, ও ভাবল। বৃষ্টির জল বেশি দামে বিক্রি হত তখন।

সেই সময়ই নাতিটি ঘরে ঢুকল। দাদুকে বাইরে নেবার জন্যে হাত ধরে টানল বারকয়েক।

লুচেন নিজের ভেতর কিসের একটা স্পন্দন অনুভব করল। যাবে, একটু সময়ের জন্যে একবার বাইরে যাবে সে। ধীরে ধীরে উঠে নাতির হাত ধরে বাইরে এল লুচেন। উষ্ণ রোদে জীবন ফিরে পাচ্ছে সে। চেষ্টা করে সোজা হয়ে কাছাকাছি দুএকটা বাড়ির দিকে তাকাল লুচেন। দীর্ঘকাল সে কোন খবর রাখে না। ছেলেটা ত সারাদিন ব্যস্ত থাকে। একমাত্র বৌ। তা মেয়েদের সাথে আবার অত কথা কিসের।

ছোট ছেলেটা বকে চলেছে। বাতাসে পোকামাকড়ের গুঞ্জন। প্রায় বসন্ত এসে গেছে। বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে ও চারিদিকে তাকাল। ওরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কে জানে। দূরে উত্তরের ফটক দেখা যাচ্ছে। ওখানে দোকান ছিল লুচেনের। যেয়ে সে একবার দেখে আসবে জায়গাটা। ও তাড়াতাড়ি পা চালাল।

তারপর মোড় ঘুরতেই সামনে ওর অনন্ত পথ। পথ? না কি এটা? শহরের বুকে বিস্তৃত শূন্যতার মশাল। চারদিকে সেই পরিচিত সঙ্কীর্ণ অন্ধ গলি। আর মাঝখান দিয়ে খোলা তলোয়ারের মত উন্মুক্ত পথ একটা। সেই—সেই নতুন পথ। রাস্তার দিকে একভাবে তাকিয়ে কেন যেন ভয় পেল লুচেন। কি ভীষণ। এতবড় রাস্তা দিয়ে কি করবে ওরা! রাস্তার উপরে যারা কাজ করছে, এর তুলনায় তারা পিঁপড়ের মত। পৃথিবীর সবগুলো লোক একসাথে যাওয়া আসা করলেও কেউ কারও ছায়া মাড়াবে না। আরও জনকয়েক লোক কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। মূঢ় বিস্মিত ওদের। তোমার বাড়ি ছিল এখানে—পাতলা মতন একটা লোককে লুচেন বলল।

লোকটা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। ঐ একমাত্র বাড়িটাই আমার সম্বল ছিল। বেশ ভালো বাড়ি। মিংদের সময় তৈরী। দশটা ঘর ছিল বাড়িটার। আমি এখন একটা কুঁড়ে নিয়ে আছি। ওই বাড়িটা ভাড়া দিয়েই চলত আমার।

লুচেন ঘাড় নাড়ল। আমারও দোকান ছিল একটা। চায়ের দোকান—অতি কষ্টে কথা বলল লুচেন। বলতে পারলে আরও কত কথা বলত সে। বলত, আমার চিমনি ছিল দুটো। লোকটা কিন্তু শুনছিল না। রাস্তার দিকে একভাবে তাকিয়ে ছিল সে।

একজন লোক কাছে এল। লুচেন দেখল তার ছেলে। সে হেসে বলল, কি মনে হচ্ছে আপনার?

লুচেনের ঠোঁট দুটো কাঁপল। উত্তরে সে কাঁদতেও পারে, হাসতেও পারে। মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন শহরের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে একটা।

ছেলেটা হাসল এবং ব্যস্ত ভাবে বলল: এ জায়গাটার ভার আমার ওপর।

দেখুন, ধার দিয়ে পায়ে চলার পথ থাকবে, মাঝখানে বৈদ্যুতিক গাড়ির লাইন, আর দুধারে সব রকম যান বাহনের যাওয়া আসার পথ। পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে লোক হেঁটে যাবে এর উপর দিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে কেউ বা।—কে একজন ডাকল, তাই চলে গেল ছেলেটি।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লুচেন। ওর দুধারে পথের অপরিসীম বিস্ময়, সামনে কোন সীমান্ত রেখা পর্য্যন্ত বিসর্পিত। জীবনে এতবড় কিছু দেখেনি লুচেন। দূরে, বহু দূরে, দৃষ্টির কিনারা পর্য্যন্ত শুধু পথ আর পথ। বিস্ময়কর, চমৎকার, অভিনব! এ একটা জিনিস বটে। সম্রাটেরাও এমন কিছু করতে পারে নি। লুচেন তার নাতিটির দিকে তাকাল। ওর মনে হল, এই যে ছেলেটা এ প্রথম থেকেই এই পথকে স্বীকার করে নেবে। সব জিনিসকেই স্বীকার করে নেয় ওরা। দোকানের ধ্বংসকে তার ছেলে প্রথম থেকে স্বীকার করে নিয়েছিল যেমন। এই প্রথম দোকানের কথা মনে হলেও সাথে সাথে ডাকাতির কথাটা লুচেনের মনে হল না। বরং এই প্রশ্নই তার মনে জাগলো : এই পথ সত্যিই তার ছেলেকে মানুষ করবে নাকি এইবার। ও নিজে দোকানের জন্যে যা যত্ন নিত, ছেলেটা রাস্তার জন্যে তাই নেয়। নাতিটার হাত ধরে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল লুচেন। এই ত বিপ্লব—এই নূতন পথ। এর শেষ নেই।

সুনীলকমল চট্টোপাধ্যায়

Pearl Buck-এর The New Road গল্পের অনুবাদ।

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২০)

বাঙ্গলার কথা

মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে বিভিন্ন রাজগোষ্ঠির আমলে বাঙ্গলার সমাজ কি অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় তাঁহার "প্রাচীন বাঙ্গলার শ্রেণীবিভাগ" নামক এক প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"প্রাচীন বাঙ্গলায় ধনোৎপাদনের তিন উপায়—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য…এই তিন উপায় ও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তিনটি প্রধান শ্রেণী প্রাচীনকালে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অনুমান সহজেই করা যায় (১)।" তৎপর তাঁহার উপাদানগুলি (data) বিশ্লেষণ করিয়া তিনি পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্য্যন্ত রাজপুরুষ, রাজপ্রতিনিধি, বণিক—ব্যবসায়ী শিল্পিশ্রেণী (নগর-শ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিক) আর ব্রাহ্মণ, মহত্তর প্রভৃতি গণ্যমান্য জনসাধারণের সংবাদ পান। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত সময়ে অন্য সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পালযুগের শিলালিপি সমূহে "বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষেত্রকর ইত্যাদির পরেই নিম্নস্তরের অন্যান্য যে অগণিত লোক, তাহাদিগকে সব একসঙ্গে গাঁথিয়া দিয়া বলা হইতেছে… 'অন্ত্যচণ্ডাল পর্য্যন্তান' অথবা 'আচণ্ডালান্' অর্থাৎ নিম্নস্তরের চণ্ডাল পর্য্যন্ত। পরবর্ত্তী লিপিগুলিতে কিন্তু এই পদটি কোথাও নাই, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা ক্ষেত্রকরদের পর্য্যন্ত আসিয়াই ঠেকিয়া গিয়াছে…চণ্ডাল পর্য্যন্ত নিম্নতম স্তরের অন্যান্য লোকেরা অনুল্লিখিত। পালযুগের পর সেন আমলে রাষ্ট্রের ও সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি কি বদলাইয়া গিয়াছিল? এ প্রশ্ন যেন মনকে অধিকার করে (২)।"

১—২। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়—"প্রাচীন বাঙ্গলার শ্রেণী বিভাগ"—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২০১-২১২; ২০৯; ২২৪; ২২৬; ২৫১; ২৫৩।

তৎপর পাল ও সেনযুগের অর্থনীতিক-সামাজিক অবস্থা বিবৃত্ত করিতে তিনি বলিয়াছেন—"অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রধানতঃ কৃষি-নির্ভর...রাজপাদোপজিবী বলিয়া একটা বিশেষ শ্রেণী সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর আনুষঙ্গিকরূপে রাষ্ট্রসেবকশ্রেণীর আভাসও সুস্পষ্ট। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবীশ্রেণীও সুস্পষ্ট...ক্ষেত্রকর ও কৃষকশ্রেণীও...চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বণিক ও ব্যবসায়ীরাও সমাজে আছেন...কিন্তু সমাজে তাঁহাদের প্রাধান্য আর নাই।...শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের অস্তিত্বের খবরও নাই। পাল আমলে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমাজের নিম্নতম স্তর সমাজ-দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়াছে, তাহারাও একটি শ্রেণী...কিন্তু সেন আমলে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত্তনের ফলেই হউক বা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, তাহারা আবার সমাজের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে (৩)।"

ডাঃ রায়ের বিশ্লেষণে যে তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাই আমরা সামাজিক সংবাদসমূহ দ্বারা পাইয়াছি। বাঙলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিয়তার ফলে পাল ও সেন-যুগে রাজকর্মচারীশ্রেণীও বিভিন্ন ধর্ম্মের নিয়ামক জ্ঞান-ধর্মজীবীশ্রেণী সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল প্রথমশ্রেণী "রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক", (৪) কাজেই সুপ্রাচীনকাল হইতে ইঁহাদের প্রাধান্য সমাজে পরিস্ফুট হয়। আর "এই বৌদ্ধ স্থবির ও সংঘ, সভ্যদের এবং ব্রাহ্মণদের লইয়া প্রাচীন বাঙলার intellectual class বা বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানধর্মজীবীশ্রেণী" (৫)। পুনরায় সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মজীবীদের প্রাধান্য স্বভাবতঃই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়। কিন্তু বণিকদের প্রাধান্য বাঙলায় আর ছিল না, এবং পরেও হয় নাই। অন্যদিকে সাম্যবাদী পালদের সময়ে চণ্ডাল পর্য্যন্ত নিম্নস্তরের সংবাদ সমাজ-দৃষ্টির সম্মুখে আসিত কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সেনদের আমলে তাহা অন্তর্হিত হয়; সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিই একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

ইতিহাসের এই অর্থনীতিক ব্যাখ্যার দ্বারা আমাদের পূর্ব্বোক্ত সামাজিক বিশ্লেষণ বোধগম্য করিবার সুবিধা হয়। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে গুপ্তযুগের সময়ে বৈশ্যশ্রেষ্ঠীর প্রাধান্য রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যদি গুপ্ত সম্রাটদের বৈশ্যবর্ণের লোক বলিয়া গণ্য করা যায় (যাহা কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন, এবং আর্য্যমঞ্জুশ্রীতে তাহাদের "কাচাবণিক"

গোষ্ঠিসম্ভূত বলা হইয়াছে) তাহা হইলে আমরা দেখি যে চতুর্থ শতক হইতেই বণিকশ্রেণী সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রাধান্য লাভ করিতেছে; পরে হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে নিশ্চিতরূপে উত্তর ভারতে রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করে। এই সময়ে শ্রেষ্ঠীদের বিশেষ সম্মান ছিল। মগধ ও বাঙ্গলা গুপ্ত ও হর্ষবর্দ্ধনের সময় পর্য্যন্ত উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রান্তর্গত ছিল। কাজেই আমরা পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকে রাজপুরুষশ্রেণী ব্যতীত বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলির প্রাধান্য বাঙ্গলায় নিরীক্ষণ করি। ডাঃ রায় বলেন, "কিন্তু অষ্টম শতকের পূর্ব্বে শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের সে প্রাধান্য ছিল এবং যে-কারণে তাঁহারা কতকটা আধিপত্য করিতে পারিয়াছিলেন, সেই প্রাধান্য ও আধিপত্য অন্যান্যশ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা বেশী; ইহার একমাত্র কারণ, তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজ অধিকতর ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্ভর।···অষ্টম শতকের পর হইতে সমাজ অধিকতর কৃষি-নির্ভর, কতকটা শিল্প-নির্ভরও বোধ হয়···এই কারণেই সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসে বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য নাই, ব্যক্তি হিসাবে থাকিলেও শ্রেণী হিসাবে পৃথক মর্য্যাদা নাই" (৬)।

এই অর্থনীতিক ব্যাখ্যাকে বর্ণ বা শ্রেণী হিসাবে দেখিলে, দেখা যায় যে পূর্ব্বে সমাজে রাজপুরুষদের ও বণিকদের প্রাধান্য ছিল। পরে, পাল ও সেন যুগে রাজপুরুষ বুদ্ধি ও ধর্ম্মজীবীদের প্রাধান্য সমাজে সুদৃঢ় হয়, এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় (৭) সেন রাজাদের সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, নিম্নবৃত্তির লোকদের অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীদের সংবাদ সমাজ আর রাখে নাই, তাহারা "ছোটলোক" বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

এখন শ্রেণীগুলিকে (classes) জাতিরূপে (caste) পরিণতাবস্থায় নিরীক্ষণ করিবার অগ্রে আমরা এই তথ্য পাই যে, রাজপুরুষ ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী (intellectual class) সেন রাজাদের আমলে, অর্থাৎ মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গলার সমাজে শক্তিমান ছিল। তাহাদেরই মধ্য হইতে কি উচ্চস্তরের জাতি অর্থাৎ তথাকথিত "ভদ্রজাতি"গুলি ক্রমবিকশিত হয়? রাজকর্ম্মচারীদের

৭। H. C. Roy—The Dynastic History of Northern India", Vol. I P. 356. অধ্যাপক রায়ও ব্রহ্ম-ক্ষত্র সেনবংশকে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বলিয়া মনে করেন।

অনেকে (রাজার 'কায়স্থ-বৃদ্ধ' হইতে গ্রামের 'জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ' বা 'প্রধান-কায়স্থ' পর্য্যন্ত) যদি বর্ত্তমানের কায়স্থজাতিরূপে বিবর্ত্তিত হয় এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্য হইতে ভিষক বা বৈদ্যজাতির (৮) উদ্ভব হয় এবং ধর্ম্মজীবিদের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি হয় আর বণিক-শিল্পি ও কৃষীজীবী এবং অন্যান্য পেশার মধ্য হইতে হালের বিভিন্ন সৎ ও অসৎ শূদ্রজাতির উৎপত্তি হয় তাহা হইলে নীহারবাবুর বিশ্লেষণের সঙ্গে পুরাতন সামাজিক চিত্রের মিল হইয়া যায়। বাঙ্গলার সমাজে রাজকর্ম্মচারী * বংশোদ্ভব কায়স্থ ও চিকিৎসকশ্রেণী উদ্ভূত বৈদ্যজাতির সম্মান ও প্রতিপত্তির উৎস এইখানেই আছে বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। আর পূর্ব্ব-ভারতে অর্থাৎ মগধ ও বঙ্গের সমাজে কেন বণিক-শ্রেণীদের অর্থাৎ ব্যবসায়ীজাতিদের প্রচুর অর্থ থাকা সত্বেও সেদিন পর্য্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল না বা এখনও যথোপযুক্ত সম্মান নাই তাহাও নীহারবাবুর অনুসন্ধান দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে। অন্যদিকে, আমরা দেখি উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ব্যবসায়ী শ্রেণীদের সম্মান ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। বাঙ্গলার সামাজিক পর্য্যায় কেন অন্যান্য প্রদেশ হইতে পৃথক তাহা ইতিহাসের এই অর্থনীতিক ব্যাখ্যা দ্বারা বোধগম্য করিবার সম্ভাবনা হয়।

সেন রাজত্বের অবসানে, মধ্যযুগীয় রঙ্গমঞ্চে রাজনীতিক পটের ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের মধ্যে বাঙ্গলার সমাজে শ্রেণীসমূহের অবস্থা কি হইতেছিল তাহা অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা করিলে ইতিহাসে দেখা যায় যে মুসলমান বিজয়ের পর একদিন অভিজাতেরা বিজেতৃবর্গের সহিত নিজেদের স্বার্থ মিলাইয়া দিয়াছিল। সেন রাজারা অবশেষে পূর্ব্ববঙ্গে নিজেদের অপসারিত করিয়া নেয়। সমগ্র ভারতে এই সময়ে যে অভিব্যক্তি হইতে লাগিল বঙ্গেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। হিন্দু অংশে রাজশক্তি ক্রমাগত বিপর্য্যস্ত হইত, ব্রাহ্মণেরা নিজেদের প্রাধান্য বাড়াইতে লাগিল, বাঙ্গলার হিন্দু রাজা দনুজ-

---

৮। বৈদ্য জাতির উৎপত্তি বিষয়ে ৺শাস্ত্রী একটা মত দিয়া গিয়াছেন—N. N. Vasu's "Buddhism in modern Orissa"—Introduction দ্রষ্টব্য।

* কায়স্থদের কুলজীগ্রন্থে অনেক কায়স্থ বংশের পূর্ব্বপুরুষদের সেন রাজাদের কর্ম্মচারী-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মাধব তাহাদের "সমীকরণ" (৯) করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হিন্দুরাজ্যে ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। সেন রাজবংশের শেষ রাজাকে (১০) তাহাদিগকে লইয়া অনেক ভুগিতে হইয়াছিল। সেন রাজারা শেষকালে পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থ জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দ্দন দেব বঙ্গজকায়স্থদের 'সমীকরণ' করেন তখন সাতাশ (২৭) ঘর কায়স্থ ছাড়া দ্বিজবাচস্পতির ভাষায়, "এতদ্ভিন্নাঃ রাজপুত্রাঃ ন কায়স্থাঃ কদাচন"। এতদ্বারা বুঝা যায় যে ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্র (রাজপুত) নামধারী লোকেরা কায়স্থ সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। কায়স্থজাতির বংশ তালিকা মধ্যে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। এই ব্যাপার এখনও চলিতেছে! সেইজন্য "রাজন্যবর্গ" নামধারী ক্ষত্রিয়জাতীয় কেহ আর বঙ্গের সমাজে রহিল না (১১)। এইজন্য বাঙ্গলার রাজনীতিক ভাগ্যবিবর্ত্তনের বিপর্য্যয়ের সময়ে দেশে যখন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের হিড়িক চলিল, তখন ব্রাহ্মণেরা স্বভাবত হিন্দুধর্ম্মের এবং তজ্জন্য হিন্দুজাতির রক্ষাকর্ত্তারূপে বিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে সমাজে ব্রাহ্মণজাতির আধিপত্য বিশেষভাবে বাড়িতে লাগিল বলিয়া অনুমিত হয়। পরে রঘুনন্দন যখন বিধান দিল বাঙ্গলায় কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি আছে, তখন স্বভাবতই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বিশেষভাবে দৃঢ়মূল হয়।

পাল রাজাদের সময় হইতেই ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রে উচ্চপদ পাইয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ পাঠ করিয়া ইহাই অনুমান হয় যে সাধারণতঃ কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় লোক দ্বারা আমলাতন্ত্র পরিপূর্ণ ছিল। তবে দিব্বোকের দৃষ্টান্তে ইহাও বুঝা যায় যে কৈবর্ত্তজাতীয় লোকও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। সেন রাজাদের সময়ে উপরোক্ত তিন জাতির

গৌড়ের ইতিহাস—২য় খণ্ডে দনুজমর্দ্দন বিষয়ে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", রাজন্য খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১১। Fick-এর মতে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া একটা পৃথক জাতি প্রাচীনকালে ছিল না, কতকগুলি ক্ষত্রিয় রাজগোষ্ঠি ছিল। এই গোষ্ঠির অবর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় জাতি অন্তর্ধান করে, যেমন মহারাষ্ট্র ও বাঙ্গলা প্রভৃতি স্থানে। অন্যপক্ষে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তীকালে লিখিত "লেখ শুভোদয়া" পুস্তকে 'রাজপুত্র' এবং প্রেম-বিলাসে 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রী' জাতীয় লোকদের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে।

১১ক। রঘুনন্দনের এই বিধান বিষয়ে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন "পাছে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সন্তান মস্তকোত্তলন করেন এই আশঙ্কায় স্মার্ত্ত সমাজ কল্পিত 'যম বচন' উদ্ধৃত করিয়া সকলকে জাগাইয়া দিলেন"—এই জঘন্য কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটি মাত্র জাতি বিদ্যমান, (যুগে জঘন্তে দ্বে জাতি ব্রাহ্মণাশূদ্র এবতে) (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, অনুক্রমণিকা, পৃঃ ২); কিন্তু এই 'যমসংহিতা' আদৌ প্রামাণিক পুস্তক নহে। প্রামাণিক স্মৃতি ও পুরাণসমূহে এই প্রকারের উক্তি নাই। কলিকালে কেবল আদি (ব্রাহ্মণ) ও অন্ত্য (শূদ্র) বর্ণ আছে— (কলাবাদ্যন্তয়োঃস্থিতিঃ)। এই শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীযুত বৈদ্য বলেন—তিনি অনুসন্ধান করিয়াও ইহার মূল আবিষ্কার করিতে পারেন নাই (C. V. Vaidya—History of Mediaeval Hindu India. Vol. II, P 312). বারাণসীর কমলাকর ভট্ট তাঁহার "শূদ্র কমলাকর" পুস্তকে উপরোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু কোথা হইতে তিনি উহা পাইয়াছেন তাহা না বলিয়া শুধু বলিয়াছেন, "কোন" পুরাণে (পুরাণান্তরে)! চতুর্দ্দশ শতাব্দীর নাগোজী ভট্টের "উদ্যোত" টীকার "ছায়া" রচয়িতা ষোড়শ শতাব্দীর বৈদ্যনাথ মহাদেব পায়গুন্ডে উক্ত টীকার উপর মন্তব্য প্রকাশ কালে বলিয়াছেন—"উদ্যোতকারের মতে ভাষ্য (পতঞ্জলীর) "ব্রাহ্মণ" অর্থে উপলক্ষণ দ্বারা তিন বর্ণকেই বুঝাইয়াছে; এইজন্য শ্লোকটির অর্থ এই যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের বেদ শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু আমরা মনে করি, এই শ্লোকে কেবল ব্রাহ্মণদিগকেই বুঝাইয়াছে। কারণ ইহা দ্বারা এই নির্দ্দেশ করিতে চায় যে "কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি নাই। কলিতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ আছে" (C. V. Vaidya —History of Mediaeval Hindu India, Vol. II. Pp. 3—133). এই প্রকারে এই শ্লোকটি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইতেছে, কিন্তু কেহই ইহার উৎপত্তির মূল বলিতে পারেন না! বৈদ্য বলেন, বোধ হয় ১৩০০—১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই শ্লোক সৃষ্ট হইয়াছিল (C. V. Vaidya—History of Mediaeval Hindu India, Vol. II, P 134).

নাগোজি ভট্টের বংশধর পূর্ব্বোক্ত কমলাকর ভট্ট বলিতেছেন, "কিন্তু ভাগবত পুরাণে ৯ম স্কন্ধে কলিযুগে ক্ষত্রিয়ের অভাবের কথাই বলা হইতেছে, পুনঃ দ্বাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে, "শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপী এবং মরু, ইক্ষ্বাকুবংশীয় এই দুইজন মহাযোগবল-সম্পন্ন হইয়া কলাপ গ্রামে বাস করিবে। কলির শেষে, এই দুইজন বাসুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আত্মার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচার করিবে।" আর এক পুরাণে বলা হইয়াছে, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের মধ্যে প্রথম ত্রিবর্ণ হইতেছে দ্বিজ। সকল যুগেই এইগুলি বর্ত্তমান থাকে, কেবল কলিতে প্রথম ও শেষ বর্ণ বিদ্যমান থাকে"। তাহা হইলে দ্বিজগণের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে বর্ণ-শঙ্করের কথা কি প্রকারে উঠে? এই সন্দেহ ঠিক নয়, কারণ বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে,

"কলিযুগে কতকগুলি বীজরূপে থাকে" এবং মৎস্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে, "ওই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ যাহারা কলির শেষে বীজরূপে থাকিবে তাহারা ইহাদের সঙ্গে কৃতযুগের প্রারম্ভে মিশ্রিত হইবে।' এই দুই উক্তি দ্বারা আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা বলেন, কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আছে যদিচ তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে স্ব-কর্মভ্রষ্ট হইয়া আছে (C. V. Vaidya —History of Mediaeval Hindu India, Vol. II, P 315).

এখানেও কোন্ ধর্মপুস্তকে "কলাবাদ্যন্তয়োঃস্থিতি" শ্লোক উক্ত হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করা হয়নি। কেবল কোনও স্মৃতিতে উক্ত আছে—কেবলমাত্র তাহাই বলা হইয়াছে। ইহাতেই অনুমান হয়, রঘুনন্দনের বেদে সতীদাহের সমর্থনের শ্লোকের ন্যায় এই ব্যাপারও একটা জুচ্চুরী মাত্র! এই শ্লোকটির সম্পর্কে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন—স্মার্ত্ত সমাজ কল্পিত 'যম বচন' উদ্ধৃত করিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন, এই জঘন্য কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটি মাত্র জাতি বিদ্যমান।" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১)। কিন্তু যম সংহিতা প্রামাণিক পুস্তক নহে, অথচ নূতন ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিবার কালে গণ্ডগোল বাধিলে এই শ্লোকের প্রতিবাদ হয়। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে এই নাগোজী ভট্টের বংশের গাগাভট্ট শিবাজীকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি সম্পন্ন করিয়া রাজ্যাভিষেক করে, (S. N. Sen—Siva Chhatrapati, P 259—261 ; J. N. Sarkar —Sivaji and His times, Pp 271—272).

লোকেরাই আমলাতন্ত্র গঠন করিয়াছিল। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণেরা (১২) পাল রাজাদের সময় হইতে গৌড়ের মুসলমান রাজাদের সময় পর্য্যন্ত রাজ সরকারে চাকুরী করিত। এইজন্য মুসলমান রাজত্বের সময়ে কায়স্থ ও গৌড়ের সন্নিকট বলিয়া বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বিশেষভাবে গৌড়ের দরবারের প্রসাদভোগী ছিল। রাজন্য বলিয়া পৃথক একটি জাতির অভাবে এবং প্রাচীন সামন্তদের দল মুসলমানযুগে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতীয় লোক দ্বারাই বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের সাধারণতঃ উচ্চজাতি গঠিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা গৌড়ের সুলতানদের স্বার্থের সহিত বিশেষভাবে নিজেদের মিশাইয়া দিয়াছিল। তজ্জন্য বেশীর ভাগ হিন্দু জমিদার এই দুই জাতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। গৌড়ের সিংহাসনের অধীনে চাকুরী করিয়া ইহারা এত সুবিধা করিয়া নিতে পারিয়াছিল বলিয়াই স্বাধীন রাজা গণেশ (১৩) এবং একটাকীয়ার, জমিদারদের ও জমিদার কংস নারায়ণের উদয় সম্ভব হইয়াছিল।

এই সময়ের হিন্দু আভিজাতদের মধ্যে কেহ মুসলমানের স্বার্থের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিল। অনেকে রাজা গণেশের পুত্র যদু (জেলালুদ্দীন) এবং কালাচাঁদ ওরফে রাজু কালাপাহাড়ের ন্যায় মুসলমান হইয়া বিজেতৃবর্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, অথবা দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রের (১৪)

১২। 'কায়স্থ ও বৈদ্য' শব্দ তখন জাতিবাচক ছিল কি পদবাচক ছিল তাহা বিচার্য্য বিষয়। চন্ডাদাসকে রাজার "বৃদ্ধ কায়স্থ" বলা হইয়াছে (তারানাথের Edelsteinmine, Pp 97—100); কিন্তু এই কর্ম্মচারীর পদ দ্বারা তাহার জাতি (caste) বুঝা যায় না। অনেক বৌদ্ধ সাধুর নামের শেষে 'গুপ্ত' শব্দটি পাওয়া যায়; যথা,—ভভাকর গুপ্ত, বুদ্ধনাথ গুপ্ত ইত্যাদি (তারানাথের 'Edelsteinmine' পুস্তক দ্রষ্টব্য)। এই সম্পর্কে ৺শাস্ত্রীর Introduction to Buddhism in Orissa দ্রষ্টব্য।

১৩। পূর্ব্বে রাজা গণেশকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলা হইত। এক্ষণে একদল ঐতিহাসিক তাঁহাকে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ দত্ত খাঁনবংশীয় বলিয়াছেন। এই বিষয়ে বহু বাদানুবাদ আছে। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। কংসনারায়ণ একটাকিয়ার জমিদার বংশের (কেহবা তাহাকে তাহেপুরের বলেন) ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন।

১৪। এই দুই রাজার সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ ঐতিহাসিকেরা এখনও পান নাই; তবে ইহাদের নামাঙ্কিত অনেক মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

ন্যায় নিজের নামে টাকা চালাইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া হিন্দু-স্বাধীনতা প্রয়াসের প্রতীক হইয়াছিল। বাঙ্গলার অভিজাতেরা ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় অখণ্ড জাতীয়তাভাব বিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই—এক জাতীয়তা-বাদ তখন ভারতে অজ্ঞাত ছিল। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন জমিদার স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।

অতঃপর দেখা গেল, মোগল আক্রমণের সময় বাঙ্গলার সমস্ত জমিদারেরা কায়স্থজাতীয় (ইহা "আইন-আকবরীতে" উক্ত আছে)। কায়স্থরা পাল রাজাদের আমল হইতে পাঠান সুলতানদের সময় পর্য্যন্ত আমলাতন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়া নিজেদের প্রতিপত্তিশালী করিয়া তোলে, তজ্জন্য বাঙ্গলায় কায়স্থদের সামাজিক স্থান ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থদিগ হইতে পৃথক *। ইহার অর্থ, আর্থিক প্রতিপত্তি পাইয়া বাঙ্গলার কায়স্থেরা শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া সমাজের উচ্চস্তরে আরূঢ় হইয়াছে।

এই সময়ে বাঙ্গলার হিন্দু বার-ভূঁইঞার বেশীর ভাগ লোক কায়স্থ; তাহারা পাঠানদের সহিত মিলিত হইয়া অথবা একাকীই স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। আর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা গৌড়ের সুলতানদের স্বার্থের সহিত একীভূত হইয়াছিল—একথা ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মোগল শাসকদের এই পাঠান এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্মেলনকে (১৫) ভাঙ্গিয়া বাঙ্গলা জয় করা বড় শক্ত হইয়াছিল। সেইজন্য মানসিংহ এই দুইটি হিন্দু-জাতির শক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টান্বিত হন। তিনি বাঙ্গলার শ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্যে ইন্ধন দিয়া নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া পুরাতন শ্রেণীগুলিকে ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করেন।

---

* কবিকঙ্কণের "চণ্ডী" কাব্যে কালকেতুর মুখ দিয়া কবি কায়স্থকে রাজপুতাপেক্ষা বড় বলাইয়াছেন।

"হোরে তুই রাজপুত বলিস্ কায়স্থ হুত
নীচ হয়ে উচ্চ অভিলাষ।"

অথচ এই পুস্তক কবি বাঙ্গলার তদানীন্তন গভর্ণর মানসিংহকে উৎসর্গ করিয়াছেন।

১৫। প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরিকে 'আইন আকবরী'তে, "The other self of Daud Khan" বলা হইয়াছে।

বাঙ্গলার মুসলমান ও হিন্দু অভিজাতদের সমস্বার্থজনিত একতাভঙ্গ করিবার জন্য মোগল শাসকেরা মোগল জাতীয় লোকদের জায়গীর দিয়া একটি নূতন মুসলমান অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে। পরে মানসিংহ বাঙ্গলার বাহির হইতে হিন্দু আনয়ন করিয়া তাহাদের জমিদারী প্রদান করে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের জমিদারী দান, ব্রহ্মোত্তর জমি দান প্রভৃতি দ্বারা বিশেষভাবে আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়া এই একতা ভঙ্গ করে (১৬)। এতদ্বারা তিনি মোগলের পক্ষপাতী একটি হিন্দু অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করেন। বাঙ্গলার বর্ত্তমান হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে অনেক বংশই মানসিংহের অনুকম্পায় উন্নীত হইয়াছে এবং এই অনুগ্রহ লাভের জন্য রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা মানসিংহের এত স্তুতিগান করিয়াছিল (১৭)। ইহারা ভুলিয়া গেল, মানসিংহ বিদেশী ও বিধর্ম্মী, মোগলের চাকর এবং কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য স্বদেশীয় ও স্বধর্ম্মীয় ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রতাপাদিত্যের পতনের মূলে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের দ্বন্দ্ব ছিল। প্রবাদ আছে, ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া রাজ্যাভিষেকের জন্য ব্রাহ্মণেরা চটে, এমন কি, পরে তাহার ভৃত্য ব্রাহ্মণেরাও তাহার বিপক্ষদলে গিয়া জুটিয়াছিল! উদাহরণতঃ—"বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত মিলে মানসিংহ সনে"। পুনঃ কেদার রায়ের শত্রুতা করিবার জন্য যথেষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল; এমন কি, বিধবা সোণামণিকে * ঈশাখাঁর হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রকারী ছিল জনৈক ব্রাহ্মণ, আর চাঁদ রায় জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হয়। অন্যদিকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অভিজাতদের মধ্যে কেহ কেহ মোগল

১৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণ।

১৭। "মধ্যযুগে বাঙ্গলা" দ্রষ্টব্য।

১৮। "গৌড়ের ইতিহাস"—২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৫।

* ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক 'সোণামণি হরণ' কুহেলিকাপূর্ণ। ময়মনসিংহ গীতিকায় অন্য কথা আছে। আবার মুসলমান লিখিত তৎকালীন ইতিহাস সমূহে কেদার রায়ের সঙ্গে ঈশা খাঁর বংশের বন্ধুত্বের উল্লেখ আছে। কেদার রায়, ঈশা খাঁ এবং পরে তাহার পুত্রদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া মোগলের বিপক্ষতাচারণ করিত। এই বিষয়ে 'Hindusthan Standard' সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ (পূজা সংখ্যা) শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দের "Isakhan Masnad—I—Ali and Raja Pratapaditya" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সেনাপতির হস্তে নিগৃহীত হন: "পাঠানদের সাহায্যকারী বলিয়া রাজা টোডরমল ইহাদের (একটাকিয়া ভাদুড়িদের) বিষয়ের অধিকাংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

এইরূপে হিন্দু ও পাঠান অভিজাতদের একতাভঙ্গ করিয়া বাঙ্গলায় মোগলেরা নূতন অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করে। মোগল আমলের পর হইতে বাঙ্গলায় কায়স্থদের সে প্রতাপ ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মোগলযুগে আমরা বড় বড় ব্রাহ্মণ ও পশ্চিমাগত হিন্দু জমিদারদের দেখিতে পাই। এই সময় হইতে বাঙ্গলার জমিদারদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মোগলযুগে সীতারাম ও উদিত নারায়ণের বিদ্রোহ হইয়াছিল। কিন্তু এই দুই জনের বিদ্রোহ জাতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা অথবা জাতীয়তা স্থাপনের প্রয়াস নয়। সত্য বটে, উদিত নারায়ণের "নবাব সরকারের অধীনতা-শৃঙ্খল ছেদনের তীব্র বাসনা জাগিয়া উঠে (১৯) ; এবং সীতারাম "স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন" (২০)। কিন্তু এই সব বিদ্রোহ বা স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন প্রচেষ্টা শ্রেণীগত বা জাতিগত চেষ্টা নহে—ইহা ব্যক্তিগত চেষ্টা ; এইজন্যই এই সকল প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এমন কি "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" প্রচারের তেজে শিবাজী তাঁহার স্বজাতীয়দের মধ্য হইতে যে সহানুভূতি পাইয়াছিলেন বাঙ্গলার হিন্দু ভৌমিকেরা তাহা একেবারেই পান নাই। মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে স্বাধীনতাকামী হিন্দুরা যখন "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" ও "খালসা ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন বাঙ্গলায় তখন বৈষ্ণবদের "সহজিয়া প্রেম-ধর্ম্ম" ও "কিশোরী ভজন" চলিতেছে এবং অভিজাতদের মধ্যে তান্ত্রিক "পঞ্চ-মকার" সাধনা চলিতেছে। শোভা সিংহের * এবং রহিমৎ খাঁর বিদ্রোহকেও

১৯—২০। "বাঙ্গলার ইতিহাস"—নবাবী আমল দ্রষ্টব্য।

* শোভাসিংহের বিদ্রোহকে "বাগদী বিদ্রোহও বলা হয়। এই বিদ্রোহের রোমান্টিক ঘটনা হইতেছে, বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ কর্ত্তৃক রহমৎখাঁর স্ত্রী লালবিবির অপহরণ, এবং তাহাকে বিষ্ণুপুরে স্থাপন করিয়া রাজা কর্ত্তৃক লালগড়, লালবাঁধ নির্ম্মাণ। কথিত আছে, লালবিবির গর্ভে রাজার এক পুত্র হয়, কিন্তু হিন্দুরা এই পুত্রকে হিন্দু করিয়া নেয় নাই, এবং তাহার প্ররোচনায় যখন রাজা ব্রাহ্মণদের জাতি মারিবার চেষ্টা করেন তখন রাণী

বাঙ্গালী গণসমূহের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা বলা যায় না। ইহা সত্য বটে, ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-অভ্যুত্থানের চেষ্টা ভারতের সর্ব্বত্র নানা সময়ে হইয়াছে, কিন্তু বিজয়নগর সাম্রাজ্য ও শিবাজীর রাজ্য স্থাপনের পশ্চাতে সেইসব স্থানের লোকেদের যে সহানুভূতি ও সাহায্য ছিল, সমগ্র উত্তরভারতে (মেবার ব্যতীত) তাহার অত্যন্ত অভাব ছিল।

ইংরেজ আধিপত্যের যুগ

ম্যাসিডোনীয়দের দ্বারা ভারত আক্রমণের সময় হইতে ভারতবর্ষ সুবর্ণভূমি বলিয়া ইউরোপের কৌতূহল আকর্ষণ করিত। ভারতবর্ষের বাণিজ্যকে করায়ত্ত করিবার জন্য পশ্চিমের প্রত্যেক বড় জাতিই চেষ্টা করিয়াছে। মধ্যযুগে তুর্কজাতির দ্বারা পশ্চিম এশিয়া বিজিত হইলে ভারতীয় বাণিজ্য ইউরোপীয়দের হাত হইতে চলিয়া যায়। লেভান্ট (সিরীয় উপকূল) হইতে তুর্ক গভর্ণমেন্টকে অত্যধিক মাশুল (শুল্ক) দিয়া ভারতীয় পণ্য কেনা ইউ-রোপীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সময় হইতে তাহারা ভারতে যাইবার সিধা রাস্তা খুঁজিতেছিল। অবশেষে ইটালীয় নাবিক কলম্বাস্ স্পেনের রাজার সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারতের জলপথের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন; কিন্তু তাঁহার জাহাজ একটা নূতন জগতে গিয়া উপনীত হইল। এই নূতন জগতের পরে নামকরণ হয় "আমেরিকা"। শেষে পর্টুগাল-রাজ প্রেরিত 'ভাস্কো ডিগামা' ভারতের জলপথ খুঁজিতে গিয়া মালাবার উপকূলে পৌঁছায়। সেইদিন হইতে ইউরোপীয় বণিকদের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। পর্টুগিজদের অনুকরণে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতে আগমন করে। তাহারা সকলে East India Company সংগঠন

পট্টমহিষীর অনুজ্ঞায় রাজা নিহত হন এবং ক্ষিপ্ত জনসাধারণ লালগড় ভাঙ্গিয়া দেয়! লালবিবিও তাহার পুত্রের কি হইল, জনশ্রুতি সে বিষয়ে একদম নীরব! পর্য্যটকেরা এখনও এইসব ধ্বংস স্তূপ বিষ্ণুপুরে দেখেন, কিন্তু কোন হিন্দু সোনামণিও লালবিবির ঘটনায় রোমান্স দেখিতে পান না; তাঁহারা ইহার মধ্যে কেবল সাম্প্রদায়িকতাই দেখেন। এই বিষয়ে A. P. Biswas—History of Bishnupur Raj দ্রষ্টব্য।

করিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। ইহাদের মধ্যে পর্টুগিজ ও ডাচেরা এই উপলক্ষে প্রাচ্যের অনেক স্থানে রাজত্ব স্থাপন করে এবং সেই সকল স্থানে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করে। এই সকল ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথম পর্টুগিজ ও স্পানীয় অগ্রণী ছিল; তাহারা উভয়েই গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক ছিল এবং পোপের আধিপত্য মানিত। এই উভয় জাতিই প্রথমে এসিয়া ও আমেরিকা লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয় এবং তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইত। অবশেষে পোপ একটা meridian ধরিয়া উভয় জাতির আধিপত্যের জন্য ভাগাভাগি করিয়া দেয়। এই সর্ত্তের জোরে পর্টুগিজেরা ভারত ও প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে স্বাধিকার বিস্তার করিবার জন্য প্রচেষ্টা করে। পরে হল্যাণ্ড স্বাধীন হইলে ডাচেরা ভারতে আসে। তাহারা পোপের ধর্ম্ম মানিত না বলিয়া যেখানে ইচ্ছা গমন করিত। ইহাদের দেখাদেখি ফরাসী ও ইংরেজ জাতীর বণিকেরা ভারতে আগমন করে। ক্রমে এই সকল ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়—প্রাচ্যে আধিপত্য লইয়া যুদ্ধও হয়। অবশেষে ফরাসী জাতীয় বণিকেরা উত্তর আমেরিকা ও ভারতে প্রবল হইয়া উঠে। ফরাসীরাই প্রথমে ভারতীয় লোককে ইউরোপীয় প্রণালীতে সামরিক শিক্ষা পল্টনে "সিপাহী" নিযুক্ত করা প্রথা সৃষ্টি করে এবং ইউরোপীয় অস্ত্র-শস্ত্রেরও সামরিক কৌশলের নিকট ভারতীয়দের পরাজয় তাহারা প্রথমই দেখায়। ফরাসীরাই প্রথমে ভারতীয় আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে; পরে ইংরেজেরা তাহার অনুসরণ করে। এমন সময় ছিল যে, ইউরোপীয়দের মধ্যে ফরাসীদেরই ভারতে বেশী ক্ষমতাশালী হইবার আশঙ্কা ছিল। তাহারা দেশীয় রাজগণের সৈন্যদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়া চারিদিকে তাহাদের অধীন দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল গঠন করিতে লাগিল। কিন্তু ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল তাহাতে ফ্রান্সের সামন্ততন্ত্রীয় শাসকবর্গ বিদেশের উপনিবেশ সমূহকে সাহায্য দানের উপকারিতা উপলব্ধি না করিয়া তাহাদের উপযুক্ত সাহায্য প্রদান করে নাই। আর ইংলণ্ডে নবোত্থিত বুর্জ্জোয়া শ্রেণী বিদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ডের গভর্ণমেন্ট আমেরিকা ও ভারতে তাহাদের স্বজাতীয়দের সাহায্য

প্রদান করে। ইহার ফলে উত্তর আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ফরাসী আধিপত্যের অবসান হয়। ফরাসী অভিজাতশ্রেণী বিদেশে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোঝে নাই বলিয়াই ভারত ও উত্তর আমেরিকা তাহাদের হস্তচ্যুত হয়। আর ইংলণ্ডের ক্রমওয়েলের বিপ্লবের পর ব্যবসায়ী (বুর্জ্জোয়া) শ্রেণী গভর্ণমেণ্টে ঢুকিয়া বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। তাহারা ভারতে আধিপত্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই ভারতের মানচিত্র আজ "লাল রং" ধারণ করিয়াছে। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ও শ্রেণী-সংঘর্ষের পরিণামের ইহা একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গলার নবাবী মশনদ হইতে সিরাজদৌল্লাকে অপসারিত করে এবং মিরজাফরকে তৎস্থলাভিষিক্ত করিয়া ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুবে বাঙ্গলার কর্ত্তা হয়। পরে কয়েক বৎসর বাদে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহ সাহ আলমের নিকট ১৭৬৫ খৃঃ সুবে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ পায়। ইতিপূর্ব্বেই সৈন্যাদি সাহায্যে দেশরক্ষার ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাবের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। তৎকালীন বাঙ্গলার নবাব নজমুদ্দৌল্লাও নাকি এই সব বন্দোবস্তের পর বলিয়াছিল, "বাঁচা গেল, এখন যথেচ্ছা বাইজী রাখিয়া সুখে কালক্ষেপ করিতে পারা যাইবে (২১)।

এই প্রকারে অকর্ম্মণ্য ভারতীয় আভজাতদের হাত হইতে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া ইংরেজ বুর্জ্জোয়া কোম্পানীর দল ভারতে পাকাপোক্ত হইয়া বসিল। ক্রমে ড্যালহৌসীর annexation policy দ্বারা ভারতের স্বাধীন, অর্দ্ধ-স্বাধীন ও করদ রাজারা উৎসাদিত হয়। অবশেষে রণজিৎ সিংহের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ইংরেজ কোম্পানী জয় করিলে ভারতবর্ষের মানচিত্র লাল রং প্রাপ্ত হয়। এই annexation policy দ্বারা ভারতীয় সামন্তশ্রেণী ভীত হয়; সামন্ত রাজারা ক্রমাগত সিংহাসনচ্যুত হইতে থাকায় তাহাদের মধ্যে বিভীষিকা উপস্থিত হয়।

২১। "বাঙ্গলার ইতিহাস"—নবাবী আমল দ্রষ্টব্য।

ইহারই ফলে, তথাকথিত "সিপাহী বিদ্রোহ" উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহের মূলে সিংহাসনচ্যুত হিন্দু ও মুসলমান সামন্ত রাজগণ ছিল ; নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য তাহারা নিজেদের মধ্যে একতা স্থাপন করে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেশীয় সিপাহীদের অজ্ঞতার সুবিধা ও সুযোগ গ্রহণ করিয়া "চর্ব্বি দেওয়া টোটা ব্যবহার করিতে দিয়া তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে" বলিয়া তাহাদের ধর্ম্মান্ধতা ক্ষেপাইয়া তোলা হয়। কিন্তু তিন বৎসর পর বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত হয়, বিদ্রোহী সামন্ত ও জমিদারবর্গ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

এই বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদীরা "জাতীয় স্বাধীনতা সমর" আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু অযোধ্যা প্রদেশ ব্যতীত ইহা অন্যত্র জাতীয় আকার ধারণ করে নাই। বস্তুতঃ ইহা ভারতীয় ফিউডাল অভিজাতদের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অজ্ঞ জনশ্রেণীকে exploit করিয়া অভিজাত শ্রেণী-স্বার্থ সম্পাদন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল (২২)। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী যাহা ইংরেজ রাজত্বের ফলে সবে উদ্ভূত হইতেছিল তাহা এই বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। বরং তখনকার অনেক শিক্ষিত লোক এই চেষ্টাকে, পুরাতন মধ্য-যুগীয় ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২২। প্রবাদ আছে, বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহী হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়া বাদশাহ নির্ব্বাচন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর মুসলমানেরা "মোগল সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠিত হইল" বলিয়া ঘোষণা করায় রাজপুত ও শিখেরা এই ব্যাপার হইতে হটিয়া যায়। নানা সাহেবের মারাঠা দলও যেসব অভিজাতদের ইংরেজের উপর রাগ ছিল তাহারাই এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের কোন জাতীয় আদর্শ ছিল না।

মোহানা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নতুন বাংলোয় আসার পরপরই নতুন মোটর এল। বিজন একটা টু-সীটার কিনতে যায়, কিন্তু ছেলেমানুষের টাকা, এই ভাবে নয়-ছয় করতে দেওয়া উচিৎ নয়, নিজের মোটর থাকলে টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে, এই সব কারণে রমলা নিজেই মোটর কিনলে। সীডন্-বডির খরচ বেশী, রাক্ষসের মতন মোবিল্ খায়, দামও অন্ততঃ সাত আটশ' টাকা বেশী টুরিং মডেলের চেয়ে। টুরিং-কার-ই কেনা হল। কাণপুর সহরে কোনো ড্রাইভারই রাস্তার নিয়ম মেনে চলে না। তাই বিজন নিজে গাড়ি চালাবে আপাতত ; এবং রমাদিকে চালাতে শিখিয়ে দেবে সুবিধেমত। কোলকাতার চেয়ে ড্রাইভারের মাইনে কম হলেও, কেন মিছিমিছি অতগুলো টাকার মাসিক শ্রাদ্ধ করা। খগেনবাবু কিছু মোটর চড়ে তাঁর নতুন বন্ধুদের আস্তানায় যাচ্ছেন না। তা ছাড়া, ড্রাইভাররা একটা স্বতন্ত্র জাত, তাদের না আছে নীতিজ্ঞান, না আছে প্রভুভক্তি, সত্য মিথ্যার ধার তারা ধারে না, কথায় কথায় মেজাজ দেখিয়ে চাকরীতে ইস্তফা দেয়। যন্ত্রের সম্পর্কে এসে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কি দুর্দ্দশা হয়েছে এদের দেখলেই বোঝা যায়। এরা না হিন্দু না মুসলমান। সেটা অবশ্য সুখের কথা, কিন্তু শ্রেণীজ্ঞান অত্যন্ত টনটনে এদের। লরি-ড্রাইভার সব চেয়ে নীচু থাকের, তার ওপর বাস্-ড্রাইভার, উঁচুতে যারা বাড়ির গাড়ি হাঁকায়। আবার তাদের মধ্যেও জাতিবিচার। ফোর্ড-ফিয়াট বৈশ্য, বুইক-ডজ্-ভক্‌স্‌হল ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ প্যাকার্ড-ডেম্‌লার, কুলীন ব্রাহ্মণ রোলস্-রয়েস্—একেবারে বেগের গাঙ্গুলী, নৈকষ্য—কাণপুরে মাত্র পাঁচ-ছ'খানা আছে, তাদের ড্রাইভারদের মাটিতে পা পড়ে না—রাস্তার কনস্টেবল তাদের সেলাম ক'রে আগে ছেড়ে দেয়। বিজনের অভিজ্ঞতায় বলে এই সব কারণে মোটর-ড্রাইভারদের সঙ্ঘবদ্ধ করা মুস্কিল। হিন্দুধর্ম্মের জাতিবিচার শেকড় জমিয়েছে এঞ্জিনের ভেতর পর্য্যন্ত। সেইজন্য, একটু দেখে শুনে ড্রাইভার

নিযুক্ত করতে হবে। ইতিমধ্যে বিজন নিজেই চালাবে…সেটা মোটেই অশোভন নয়, খুবই শোভন, খুব ফ্যাশনেবল্ ছোকরারাও তাই করে, তাতে নতুন সভ্যতার প্রাণবস্তু—চরখা নয়, এঞ্জিন, তাও বাষ্পীয় নয়, কম্বাস্‌চন্ এঞ্জিন—তার সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়, যেটার নিতান্ত প্রয়োজন আছে এই ফিউডাল দেশে যেখানে সময়ের কোনো মূল্যই নেই। রমলা বল্লে, 'আমি তোমার পাশে, সামনের সীটে বসতে পেলে সুখী হব, মনে হবে ছেলে-মানুষটি।'

বাংলোটি ছোট হলেও পরিপাটি। আধুনিক ঢঙের, জাহাজের কেবিনের পরিকল্পনায় ঘর, ডেক্-এর অনুকরণে নীচু দালান, ম্যয় রেলিং, পোর্টহোল্ পর্য্যন্ত। রমলা হাল্‌কা নীল পর্দ্দা টাঙ্গাল। কাণপুরে মনোমত ছবি পাওয়া যায় না। বেঙ্গল স্কুলের ছবি বিজনের পছন্দ নয়, সেটা কাব্য-গন্ধী, গুহাভিমুখী, ধ্বংসশীল, প্রগতিবিরোধী; বম্বে স্কুলের ছবিতে তবু আনাটমী নির্ভুল, যদিও তেজের অভাব সেখানেও। একজন চেক্ মহিলা কাণপুরে এসে ছবি আঁকছেন, তাঁর দু'তিনটে নতুন ধরণের, কিউবিষ্ট ডিজাইনের সামুদ্রিক দৃশ্য আঁকা আছে। দাম নিয়ে গোলমাল হবে না—দু'শ টাকা ছবি পিছু চাইছেন, কিন্তু দু'খানা একত্র নিলে মাত্র তিন শ' টাকাতেই হবে। কার্পেট কিন্তু পার্শিয়ান কিংবা বোখারার, জমা রক্তের মতন ঘন লাল, কিনারায় সাদাসিধে ফুলের কাজ। নতুন ও পুরাতনের কনট্রাষ্ট খুলবে ভাল। সবই এক প্যাটার্ণের হবে—এটা ছিল আগেকার রুচি, এখন ব্লাউজ-পীস্ আর সাড়ির নক্‌সা পৃথক। তাই হওয়াই সঙ্গত, কারণ এটা ভারতবর্ষ, বয়েল-গাড়ি ও মোটর গাড়ি, উভয়ই চলছে এখানে। আসবাব-পত্র আপাতত বিদেশী আধুনিক হোক, পরে যদি সত্যকারের ভাল দেশী প্যাটার্ণ পাওয়া যায়, তখন বেছে নিলেই হবে। কাণপুরে ক্রোমিয়ম প্লেটের আসবাব পত্রের দোকান খুলেছে এই সেদিন। রমলা ও বিজন গিয়ে তাই কিনে আনলে। বাংলোর দোতলায় ছোট একটি ঘর, কাপ্তেনের, বিজনের মতে সেটা যেন খগেন বাবুর প্রকৃতি বুঝেই প্রস্তুত। সুজনদা এলে খগেন বাবু নীচে থাকবেন, কিন্তু সুজনদার আসবার নাম নেই। বাংলোর সামনে ছোট একটি লন্, বিলিয়ার্ড টেবিলের কাপড়ের মতন মসৃণ, পাশে মরশুমী ফুলের বিছানা কাটা

জ্যামিতির আকারে। প্যান্ট্রিটা ভাল, তবে একটু ধোঁয়া যে হয় না তা নয়। ধোঁয়াটা খগেন বাবুর ঘরে যায়। খগেন বাবুকে ধোঁয়া থেকে বাঁচাবার জন্য নতুন ষ্টোভ কিনতে হল। বেয়ারা, বয়, বাবুর্চ্চি নিযুক্ত হবার পর বিজন ধরে বসল সব চাকর-বাকরকে খদ্দর পরতে হবে। রমলা উত্তর দিলে, 'ধোপার অতিরিক্ত খরচটা তবে তুমিই দিও।' কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধেরই জয় হল— ফর্সা, ধপধপে খদ্দরের আচকান ও টুপীতে যেমন মানায় এমন কিছুতে নয়।

প্রথম চায়ের দিনে মাত্র বাইরের তিনজন, আর বিজন, অবশ্য খগেন বাবু। তিনজনের মধ্যে একজন দেশী মহিলা, একজন ইংরেজ পুরুষ, এবং অন্যজন একটি ভারতীয় অধ্যাপক। এই ভদ্রলোক অক্সফোর্ডে কাটিয়েছেন বছর আষ্টেক, মডার্ণ গ্রেটস্-এর ছাত্র, সেখানকার ইউনিয়নের সেক্রেটারী হন। সেখানে এত জনপ্রিয় হন যে পরীক্ষার কিছু আগে এপেনডিসাইটিস অপারেশন হবার জন্য পরীক্ষা দিতে যখন তিনি পারলেন না তখন টিউটর, ফেলো, প্রোফেসর ও কর্ত্তৃপক্ষ একবাক্যে তাঁর জন্য অনুপস্থিতির ডিগ্রী অনুমোদন করলে। ভদ্রলোক ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের কর্ণধার ছিলেন বিলেতে, কন্টিনেন্টে যখনই ভারতীয় কিংবা অ-ভারতীয় ছাত্রদের মজলিস বসত তখন তাঁকে না হলে চলত না। বিজনের সঙ্গে আলাপ টেনিস-কোর্টে, খেলে ভাল, কিন্তু ম্যাচ জেতবার মেজাজ নেই, বিজনেরই মতন। মতামতে বামমার্গী, লেফ্‌টিষ্ট। চায়ের টেবিলে খগেন বাবুর সঙ্গে একতালে পা ফেলবার মতন লোক বটে, তাই তিনি এসেছেন।

কথাবার্ত্তা সুরু হল সোভিয়েট-রাশিয়ার ট্রায়ালগুলো নিয়ে। খগেন বাবুর মতে ও-দেশের আধুনিক অভিব্যক্তি ও শাসন পদ্ধতিতে একটা কোথাও গলদ আছেই আছে, নইলে এতগুলো ধুরন্ধর যারা লেনিনের সঙ্গে কাজ করে গণতন্ত্রটাকে দাঁড় করিয়েছিল তারা হঠাৎ ইম্পিরীয়ালিষ্টদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র সুরুই বা করলে কেন? যদি ষড়যন্ত্রটা সত্যিই না হয়, তবু অন্ততঃ এটুকু বুঝতে হবে যে ষ্টালিনের শাসন জনপ্রিয় নয়। অধ্যাপক উত্তর দিলেন যে ষ্টালিনই লেনিন-পন্থী, এবং ট্রট্‌সকীর দল ঘুষ খেয়েছে সাম্রাজ্যবাদীর কাছ থেকে। খগেন বাবু যুক্তিটা গ্রহণ করলেন না, কারণ, ঘুষের আর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ নেই; দ্বিতীয়তঃ কে লেনিনকে বেশী বুঝেছে, ষ্টালিন না ট্রট্‌সকী,

এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই, কারণ লেনিন নিজে আধুনিক অবস্থার উপযোগী করতে গিয়ে কার্ল মার্ক্স্‌-এর মতামত অদল বদল করেছেন, তাঁর থেকে দূরে সরে গেছেন। কে-কতটা কার অনুযায়ী সেটা মুখ্য নয়, প্রধান হল গতি, এবং গতির অবস্থা অনুযায়ী কর্ম্মপদ্ধতির উদ্ভাবন। অধ্যাপক বল্লেন, সেই হিসেবেও ষ্টালিন নমস্য। খগেন বাবুর মতে নমস্কার পরে প্রাপ্য, যখন পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে অন্যায়ের অবসান হবে ষ্ট্যালিনের রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে। লেনিন ও ষ্টালিনের ব্যক্তিগত কথা উঠল : খগেন বাবু বল্লেন, যদি লেনিনের স্ত্রী, যে আবার লেনিনের শিষ্যা ও সহকর্ম্মী ছিল সেও যদি লেনিনকে না বুঝে থাকে তবে অবশ্য নাচার! অধ্যাপক আপত্তি তুললেন যে স্ত্রী হলেই স্বামীকে বুঝবে এমন কোনো ঐশী আজ্ঞা নেই—বরঞ্চ, না বোঝাই স্বাভাবিক ; কমরেডরাই এই ব্যাপারে বেশী অধিকারী। অধ্যাপক মশাই রমলার টেবিলে চল্লে গেলেন।

ইংরেজ অতিথিটির বয়স কম, ভারতবর্ষে নতুন এসেছে কাণপুরে একটা ম্যানেজিং এজেন্সীর য়ুরোপীয়ান এসিষ্টান্ট হয়ে। হাতের কব্জী ভীষণ মোটা, মাথাটা প্রকাণ্ড, বৃষস্কন্ধ, চোয়াল চৌকো ও ভারি, চোখ গাঢ় নীল ও ছেলে-মানুষী দুষ্টুমি মাখান হাসি। ভারতীয় মহিলা 'রণি' বলে ডাকছেন, আর ছোকরার গাল ও ঘাড় লাল হয়ে উঠছে। অধ্যাপক তার পাশে যেতে সে দাঁড়িয়ে উঠল। ভারতীয় মহিলা, ডাকনাম বেবী, সকলেই ডাক নাম ব্যবহার করছে, রণি'র পিঠে একটি হাত রেখে বল্লেন, 'সে হয় না, রণি, অমন মীন হোয়ো না, আপনিও বসুন।' বিজন ঠাট্টা করলে, 'ভয় নেই বেবী, তোমার রণিকে নিয়ে ভাগবো না, খগেন বাবুর সঙ্গে আলাপ নেই বুঝি রণির?' বিজন রণিকে নিয়ে গেল খগেন বাবুর টেবিলে, 'খগেন বাবু, পরিচয় করতেই হবে রণির সঙ্গে। বিজন বাঙলায় চুপি চুপি বল্লে, 'এখনও সেদ্ধ হয় নি, মেলা-মেশা করতে চায় ভারতবাসীর সঙ্গে। রসগোল্লা ও সিঙ্গাড়া খেতে যেন না ভোলে রণিকে উপদেশ দেবার পর বিজন রমলার টেবিলে গেল। সকালে ধর্ম্মঘটের মীমাংসা সম্বাদে সে খুশী হয়েছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে রণি উত্তর দিল যে প্রকৃতপক্ষে ওটা সম্ভবত ষ্ট্রাইক নয়, লক-আউট ; তবে লেবার-কমিশনার নিযুক্ত হলে বিনা অজুহাতে, কেবল মজদুর-সভার সভ্য হবার জন্য 'ছুটি'

পাবার ভয় খানিকটা কমতে পারে। খগেনবাবু সন্দেহ প্রকাশ করাতে রণি বল্লে যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজ আসে তবে রায়ের মর্য্যাদা বাড়বে; অবশ্য, একটা ছোট অসুবিধা এই যে মজদুরের ব্যাপারে হয়ত বা পুরানো নথি পাওয়া যাবে না, এবং অন্য দেশের নথিও চলবে না। শ্রমিক-ধনিকের সম্বন্ধের জন্য দেওয়ানী কিংবা ফৌজদারী মোকদ্দমার মূলসূত্রও ঠিক খাটে না। একটু নতুন ধরণের জুরিষ্ট হওয়াই বোধহয় মন্দ নয়। ব্যাপারটা ঠিক ল আর অর্ডারের পর্য্যায়ে পড়ে না।' বেবী একটা প্লেট থেকে কাঁটা দিয়ে খাবার তুলে রণির প্লেটে দিয়ে বল্লে, 'রণি, এটা খাঁটি দেশী খাবার— বাঙালী মিঠাই নয় বটে, তবে বিশুদ্ধ ইণ্ডিয়ান, রমার নিজের পেটেণ্ট, পছন্দ হবে কি না জানি না, তবে ফ্যাট নেই।' রণি লাল হয়ে সবটাই খেলে। খগেন বাবু প্রশ্ন করলেন যে মজুরীর নিম্নতম হার বেঁধে দিলে মালিকের, তাঁর কোম্পানীর কোন ক্ষতি হবে কি না। রণি এপাশ ওপাশ চেয়ে উত্তর দিলে, 'ওটা ঠিক হিসেব করে দেখি নি। মজুরদের বাড়ীগুলো অসম্ভব নোংরা, যদি ভাল বাড়ীতে থাকবার সুবিধা তারা পায় তবে গোলমাল অনেকটা মিটে যায়।'

খগেন—'ঐ মজুরীতে দুবেলা দু'মুঠো অন্ন জোটে না ত' ভাল বাড়ির ভাড়া!'

রণি—'অবশ্য ওদের খরচও কম। সকলের ধার আছে জানি, খাদ্যও অস্বাস্থ্যকর। তবে মজুররা যদি একটা কো-অপারেটিভ সমিতি খাড়া করে, মিউনিসিপ্যালিটি জমি দেয়, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট আগাম টাকা ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করে, তবে বাকী টাকা মালিক ও গবর্ণমেণ্ট কেন দেবে না বুঝি না।'

খ—'মালিকরা যদি সাহায্য করে তবে তারা কি প্রতিদান প্রত্যাশা করবে না? যেমন ধরুন মজদুর-সভার সভ্য না হওয়া?'

র—'তবে গবর্ণমেণ্টই সব টাকা দিক। গবর্ণমেণ্ট এখন ত' জন-সাধারণের!'

খ—'গবর্ণমেণ্ট এই সেদিন এল, টাকাই বা কোথায়? আমি ত' তাই চাই, কিন্তু তার সম্ভাবনা দেখি না। মালিকরা কি রাজী হবে?'

'তা ঠিক। প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা লোকসান হল প্রহিবিশনের

জন্যে, একজনের খেয়ালের দাম দেওয়ায়। মালিকরা কি বাধা দেবে ? জানি না।'

বেবী এসে বল্লে, 'রণি, তুমি কি আমাকে লিফট্ দেবে ? আজ আবার রিটার ডিনার, গঙ্গার ধারে, একটু বোটিং হবে। তুমি আবার ব্লু' ছিলে··· এখানে তোমাদের বোট মিলবে না সাবধান করে দিলাম। কি কথা হচ্ছিল ?' রণি আমতা আমতা করে বিষয়টি উল্লেখ করাতে বেবী বল্লে, 'তা ঠিক, মজুরী অত্যন্ত কম। তবে সত্যের খাতিরে মানতেই হবে, লজ্জার কথা, কিন্তু না মেনে উপায় নেই, আমাদের দেশী মিলগুলোতেই সব চেয়ে কম··· আর তারা মজুরদের থাকবার বন্দোবস্ত যা করে তার কথা না তোলাই ভাল। অবশ্য আমি তাঁদের পুরো দোষ দিচ্ছি না। লাভ তারা করে, কেনই বা করবে না ? লাভের অর্দ্ধেক যে কংগ্রেস ফণ্ডে যায় !' ইংরেজ যুবকের মুখে লাল রঙ চড়ল, স্মৃদু আপত্তি জানাতে বেবী হেসে বল্লে, 'রণি, আরো কিছুদিন কাণপুরে থাক, বুঝবে এখানকার আজব্ পলিটিক্স আর ইকনমিক্স্। কি বল বিজন ?'

বিজন—'অনেকটা সত্যি। আমাদের কংগ্রেস ক্যাপিট্যালিজমের মুখপাত্র, সব দিক থেকেই।'

বেবী—'বিজন, তুমিই তা হলে রমাকে নিয়ে আসছ রিটার পার্টিতে। সে আমাকে ফোন্ করলে দু'বার। বিজন, এবার দেখব !'

বিজন—'কি যে বল বেবী !' বেবী ও রমলা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'খগেন বাবু, দিদিকে নিয়ে যেতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই। আমাকে আবার জিজ্ঞাসা কেন ?' অধ্যাপক বল্লেন, 'কিছু যদি না মনে কর বিজন, রমা দেবী, আপনি কি আমার চালনাতে বিশ্বাসী নন ? অবশ্য এটা অক্সফোর্ড নয়, স্পীড লিমিট রয়েছে এদেশে। তবু কিছু থ্রিল্ দিতে পারব ভরসা রাখি। আমি ওঁদের বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দেব। বিজন, তুমি ফিরিয়ে এন।' রমলা হেসে সম্মতি দেওয়াতে বেবী আর বিজন একটু অপ্রস্তুতে পড়ল। 'প্রোফেসার, আপনিও পার্টিতে চলুন না ?' 'আমার আবার একটা জরুরী কাজ আছে—পেন্ ক্লাবের তাগিদ এসেছে···কিন্তু রমা দেবী, ড্রাইভার হিসেবে সুনাম আমার এককালে ছিল, বিজন, তুমিই না হয়

রণিদের নিয়ে চল।' রমা পোষাক বদলে প্রফেসারের টু-সীটারে উঠলে, বেবী রণির গাড়িতে, এবং বিজন নতুন গাড়িতে একলা চলল, একবার ক্লাব হয়ে যাবে। বেবী—'দেরী কোরো না বি, রিটা চটবে, চটলে তাঁকে বড় ভাল দেখায়, কিন্তু রাগ পড়লে, বি, রিটা আর বিউটি থাকে না।'

বিজন—'ডোণ্ট বি সিল্লি।'

ওপরে যাবার সময় রমলার ঘর দিয়ে যেতে হয়। ড্রেসিং টেবিলের তিন দিকে আরশি, কাঠের ওপর কাচ, কাচের শিশি, পাউডারের বাক্স, রূপোর ব্রাশ, বিছানার ওপর হরেক রকমের ব্লাউস, সাড়ি, কোণে জুতোর সারি, নানা রঙের, ফিতের বাহার, উঁচু খিলেন, নীচু, সমতল, স্যাণ্ডাল, নাগরা নেই, সাবিত্রীর কাছে নাগরা পরে আসত, এখানে বাইজীরা পরে, তাই বোধ হয় অচল। কাচের পেরেক দেওয়ালে, ড্রেসিং গাউন ঝুলছে, বলাকা উড়ছে নীল আকাশে। উগ্র গন্ধ ঘরটায় মাখান...চড়াং করে মাথায় চড়ে চন্‌মনিয়ে দেয়, পাঁচুলী, কাঁচুলি, নাচওয়ালী,...বেশ্যাবৃত্তির শকৃথেরাপী প্রক্রিয়া বোশেখ মাসের রৌদ্র চাঁপার খর গন্ধে উদ্‌গত হয়—কিন্তু গ্রীষ্মের গুল্‌মোহর, আমল্‌তাস মাত্র রঙের একজিবিশ্যানিজম, কামবিলসন, গন্ধ নেই লীলা প্রকাশ, লীলাও নেই, উলঙ্গতা। অত সাজ সুরঞ্জাম সত্ত্বেও ঘরটা যেন বীভৎস রকমের নগ্ন মনে হয়। সিকার্ট-এর ছবি টাঙ্গান থাকলেই শোভন হত। মেয়েদের যথার্থ স্থান রঙ্গমঞ্চে, সেইখানেই তাদের দেখাই ভাল, গ্রীণরুমে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, স্বামীরও। আয়নার টেবিলে কার চিঠি খোলা পড়ে আছে। রমলা সেজেছে তাড়াতাড়ি।

খগেন বাবু ওপরে নিজের ঘরে গেলেন। বিজন নাম দিয়েছিল 'আপার ডেক্', রমলার ভাষায় 'ক্যাপ্টেন্‌স্ কেবিন'। ক্যানভাসের চেয়ারে বসলে চোখে পড়ে ধূসর আকাশ ভেদ করা কালোকালো মোটা আঙুল, তাদের ডগাগুলো একধারে বেঁকেছে, পাঁড় মাতালের বুড়ো হাত কাণপুর সহরের ওপর, পক্ষাঘাতেরও হতে পারে, কুষ্ঠ রোগীর? কেন এই ধরণের অদ্ভুত অস্বাভাবিক উপমা, প্রতিমা ভেসে ওঠে? তিক্ত রসের উদ্‌গার, কিন্তু কেনই বা রস তেতো হবে? এইত' কাণপুরেই সাধারণ জীবনযাত্রার একটি স্তর নিঃশেষিত হল এবং নতুন স্তরের আরম্ভ দেখা গেল। এখানেই ত' সঙ্কীর্ণ

করিম, মহবুব প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়। অবশ্য 'সমঝোতা' হল বটে, কিন্তু প্রত্যেক প্রয়াসই সফল হবে কেন? এই আশার অন্তরে একটা দাম্ভিকতা সেটাই বা থাকবে কেন? হিমালয় একবার বিনয় শিখিয়েছিল তার বিরাটত্ব দিয়ে, কিন্তু মানবেতিহাসের প্রগতি নম্রতা শেখায় তার বন্ধুত্ব, তার সমবায়, তার কর্ম্মের সাহায্যে। এখানে মতবাদের ঔদ্ধত্য থাকতে পারে না, এখানে পূর্ণতার কামনা নেই, আছে ও থাকবে কেবল আবর্ত্তন-প্রবণতার স্বীকার, এবং সেই স্বীকৃতিতে আত্মনিমজ্জন। এটা মেয়েলী নম্রতা নয়, বরপক্ষের সামনে কিশোরীর চোখ তুলে চাইবার অক্ষমতা নয়, এ বিনয় পুরুষালী। অর্থাৎ ব্যক্তির অতিরিক্ত মহানকে পরিণতিরই সম্ভাবনা হিসেবে সহজে গ্রহণ করা। মেয়েরা গ্রহণ করে, যতটুকু প্রয়োজন, যতটুকু খাপ খায়। সংখ্যার দিক থেকে বেশী, তাই তার বোঝা ভারি, মেয়ে-ভক্ত পুরুষেরা ভারের গুরুত্ব দেখে দরদ জানায়। তার বদলে একটা বড় সত্যকে মেয়েরা যদি আপন বলে স্বীকার করে নিত তবে তাদের সঙ্গে এক কদমে চলা যেত। নন্দলাল বসুর ছবিতে পুরুষ এগুচ্ছে, মেয়ে এক পা পিছিয়ে···এতদিনে সাঁওতাল মেয়েটি রান্নাঘরের দাওয়ায় হাঁড়িয়া চাপিয়েছে, আর পুরুষ কয়লার খনিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সরাবখানায় হাঁড়িয়া আর তাড়ি খাচ্ছে। ঘুরে ফিরে আবার সেই তিক্ততা আসে।

প্রফেসার মদরল-র 'লেপাস' দিয়ে গেছে তাকে, এবং রমলার জন্ত জুল্ রোমাঁ-র 'র‍্যাপচারস্ অব্ দি ফ্লেশ'। চমৎকার শ্রমবিভাগ। লোকটি একটু ভোঁতা। অধ্যাপকের মতে মদারল-ই ফরাসী অধঃপতনের প্রতীক, রচনা-ভঙ্গী না কি অপূর্ব্ব। নায়ক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তৎপর, প্রেম থেকে অব্যাহতি চায়, অথচ কাম বজায় রেখে। কিন্তু অতটা-স্ত্রী বিদ্বেষ রোগের চিহ্ন। স্ত্রী বিদ্বেষ বিদ্বেষের অঙ্গ, বিদ্বেষের পিছনে থাকে চাহিদা, প্রত্যাশা, সেটা যত অস্পষ্ট, ততই হতাশা, বিদ্বেষ ততটাই ব্যাপক, কিন্তু ব্যাপক ও ভাসমান অবস্থা অস্বস্তির, তাই একটা বিষয় চাই যার চারধারে বিদ্বেষ গ্রথিত হতে পারে, ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত বিষয় স্ত্রী, তাই স্ত্রী-বিদ্বেষ, সেই থেকে স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্বেষ। সাধারণ—বিশেষ-অবিশেষ—এই হল মানসিক বিবর্ত্তন। স্ত্রীর বদলে য়িহুদী জাতি, হিন্দুর পক্ষে মুসলমান, মুসলমানের পক্ষে হিন্দু

হলেও বেশ চলত, চলছেও। মেয়েমানুষ হাতের কাছে, তাই বিদ্বেষের প্রকাশ সাহিত্যিক। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে ফরাসীরা দক্ষ। কিন্তু কোথাও যেন ফাঁক থেকে গেছে। লোকে বলে ওরা মেয়েমানুষকে জীব ভাবে, এবং বিবাহকে সামাজিক অনুষ্ঠান গণ্য করে। তাতে আপত্তি নেই, জার্ম্মাণ ও ইংরেজ ভাবপ্রবণতার চেয়ে ভাল। ব্যাপারটা অন্য রকমের। মেয়েরা এক স্তরের জীব নয়, এক শ্রেণীর হলেও ওদের ক্রমবিকাশের হার ও ধারাই ভিন্ন, তার ওপর শ্রেণীগত মনোভাব ত' রয়েইছে। প্রত্যেক মেয়েই বুর্জ্জোয়া, কেউ উচু থাকের, কেউ নীচু থাকের। পুরুষ হয় জন্মাবধি, না হয় বুদ্ধির জোরে খানিকটা জন-সাধারণের অন্তর্গত, কিন্তু মেয়েদের চরিত্রে একটা 'ক্যাপিলারিটি' থাকেই থাকে। রমলা ঘর ভেঙে চলে এল, তবু শ্রেণীর দেওয়াল তার অটুট রইল। মদারল্যঁ এ খবরই জানে না। মাকাল-ফল বইটা, অধ্যাপকেরই উপযুক্ত খাদ্য।

কেন অতবার অধ্যাপকের কথা ঘুরে ফিরে আসে। দোষ কি কেবল তারই? হিংসা? ছিঃ, তার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল। অধিকারই বা কোথায়? যে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে সে নিজের সকল কর্ম্মের ওপর স্বাধিকার অর্জ্জন ও বিস্তার করেছে। সুজন রমলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সন্দেহ, মনে হয়। তার সঙ্গে অবশ্য অধ্যাপকের তুলনাই হয় না। সুজন যদি আসে, অধ্যাপকের ব্যবহার লক্ষ্য করে আনন্দ পাওয়া যাবে। সুজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রমলা খুলবে ভাল। কিন্তু রমলাকে খেলার সামগ্রী ভাবতে লজ্জা হয়। সে যত পারে খেলাক, কিন্তু লোকে তাকে খেলনা ভাববে কেন? রমলার সাজ, রূপ, মাধুর্য্য, কথা বলবার ভঙ্গী দেখে এরা মোহিত হয়েছে, রমলা তা জানে, তাইতে সে খুশী। কিন্তু মোহিত হবার অর্থ কি? অর্থ এই যে রমলা একটা মাংসপিণ্ড, হাড় ও মাংসের এক ধরণের ছক্, সে ছকের নতুনত্ব আছে, চঞ্চল করবার শক্তি আছে, চমক লাগাবার জাদু আছে। তবু যে অংশটা তারা নির্ব্বাচন করে নিলে সেটা তার জৈবাংশ। এটা তার অপমান। রমলা ভাবে খাজনা, রাণীর প্রাপ্য। বোকা মেয়ে!

রমলাকে অপমানিত হতে দেওয়া অন্যায়। সুজনের এসে কাজ নেই, অধ্যাপকেরও এসে কাজ নেই, বিজনেরও তাকে পার্টিতে পার্টিতে ঘুরিয়ে নিয়ে

বেড়াবার প্রয়োজন নেই। রমলার কষ্ট হবে, সে একলা থাকতে পারে না, তবু অপমানিত হওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। সুজনকে আসতে মানা করাই মঙ্গল। খগেন বাবু একটা টেলিগ্রাম ফর্মের ওপর সুজনকে লিখলেন, 'প্ল্যান অনিশ্চিত, কবে আসবে 'পরে জানাব।' বয়কে ডেকে তার অফিসে পাঠালেন, বয়ের কাছেই টাকা আছে। রমলা অপমানিত হবে দুজনের টানাটানির মধ্যে। নতুন পরিবেশে সে থাকতে পার'ব না, এখানে সব নতুন, রমলার জীবনধারা পর্য্যন্ত নতুন মুখ নিলে। তাকে আসতে বারণ করাই মঙ্গল।

মঙ্গল, মঙ্গল, মঙ্গল···কে কার মঙ্গল করে! মঙ্গল-কামনা মনের জুয়াচুরী। এটা মঙ্গলেচ্ছা নয়, হিংসা, রাগ, দ্বেষ···এত বিজ্ঞান-চর্চ্চা এত মার্ক্স পড়া, এত বিশ্লেষণের প'রও স্বার্থের জন্য মনটা সেই ধর্ম্মের ফন্দী খাটাবে? নিজের প্রতি ঘৃণা আসে।

যখন বিজন আর রমলা ফিরল তখন বেশ রাত হয়েছে।

বিজন—'খগেন বাবু নিশ্চয় খাননি। একটু দেরী হয়ে গেল···বেয়ারাকে বল্লেই পারতেন। আমরা খাব না রমাদি বুঝি বলে যায় নি? এসে পর্য্যন্ত রমাদি কোথাও বড় একটা যায়নি তাই। গাড়িটা চমৎকার চলছে। রমাদি কি ভীষণ পপুলার হয়েছে কি বলব!' রমা ভেতরে গিয়ে একা সাহেবের জন্য ডিনার দেবার হুকুম দিলে। রমার মুখে রঙ এসেছে···মাখা রঙ নয়, স্বাভাবিক···নতুন রূপ পেয়েছে···কোথায় সঞ্চিত থাকে কে জানে, হাওয়া একটু এদিক থেকে ওদিকে ঘুরল, অমনি ফুটল লালিমা, খুলল লাবণ্য। তাতে প্রত্যেকের অধিকার আছে। কেন রমলার রূপ উথলে উঠবে না, নতুন বৌএর সামনে বরের বাড়ির দুধের মতন। বেচারি···মা হতে পেল না···মাতৃত্বের সংক্রান্তি এল না, তাই কি প্রত্যক্ষ অনুভূতির অনুধাবন, ইন্দ্রিয়ের মৃগয়া! চার ধারে বরফ পড়ছে, শিকার গর্ত্তের মধ্যে আত্মগোপন করেছে, তিন মাস ঘুমুবে মড়ার মতন, দিনের অস্তিত্ব লুপ্ত, বর্ব্বর মানুষ তখন কি করে? শিকারের উত্তেজনা চাই, সুরু হল ম্যাজিক, দলকর্ম্ম, নাটক অভিনয়। কিন্তু ব্যাপারটা 'এরসাৎস্,' নকলী চীজ, আসলীটা শিকার। রমলা মন থেকে তাকে সরিয়েছে, সুজনকে দিয়ে ভরাবে, না অধ্যাপকের সাহায্য নেবে? এ-ব্যাপারে মেয়েদের আলস্য নেই। হঠাৎ মনে হয় নিজেও

ঐ কাজ করে আসছেন, তবে মানুষ দিয়ে পূরণের চেয়ে মতামত দিয়ে শূন্যতার ভরাট করেছেন, আদর্শবাদ থেকে মার্ক্সিজম পর্য্যন্ত। রমলা মধ্যে এসেছিল ইণ্টার মেৎসোর মতন—ছুটো রাগের মধ্যে জনসাধারণের তৃপ্তির জন্য চটকদার গৎ-এর মতন। তাই কি! অতটুকু রমলার স্থায্যতা! অপরাধী মনে হয় নিজেকে। অপরাধবোধের বশে অধ্যাপক ও সুজনের প্রতি মনোভাবকে হিংসার রূপান্তর বলে মনে হয়। গ্রীগ, গ্রীগ, ভিক্টোরীয়ান যুগের ভণ্ড ভারতবর্ষের পটভূমিতে প্রক্ষিপ্ত। ভেঙ্গে যাক চুরে যাক এই শক্ত মালাটা সর্কীকের নির্ম্মম আঘাতে।

খাবার এল। টেবিলের পাশে বসে বিজন বল্ল, 'দেখলে রমাদি ওদের কাণ্ডটা। একটা ইংরেজ পেলে আর রক্ষা নেই! এইতেই ওরা মাটি হয়। ছোকরা ছিল ভাল, কিন্তু ওরা থাকতে দেবে না। যেন অভিমন্যুর মতন ঘিরে রয়েছে। বেবীর চোখ যেন গিলে খাচ্ছে! দাস মনোভাব আমাদের হাড়ে হাড়ে, রক্ত, মাংসে। রণিকে আপনার কেমন লাগল?'

খগেন—'বেশ কন্‌ক্রীট্, ব্যবহারিক দিকটাই নজরে পড়ে প্রথমে।'

বিজন—'ঠিক ধরেছেন, খাঁটি ইংরেজ, চিন্তার দিকটা একটু ভোঁতা। ইডীয়লজি নেই।'

খগেন—'বাঁচা গেল!' বয় প্লেট বদলে দিলে। 'সে হিসেবে প্রোফেসার বেশ ধারাল।'

বিজন—'যাই বল রমাদি, রিটা ওঁকে নিমন্ত্রণ করলে পারত। কাম্নপুরে তত একস্‌ক্লুসিভ্ হলে চলে না, এখানে অতটা শ্রেণীবোধ অচল।'

খগেন—'প্রোফেসার ইম্পীরিয়াল সার্ভিসের নন বুঝি?'

বিজন—'এখানে একটা প্রাইভেট কলেজের সীনিয়র··বাপের পয়সা আছে, অনেক ইম্পীরিয়াল সার্ভিসের অধ্যাপকের চেয়ে আধুনিক। একবার কথাবার্ত্তা ভাল করে চালিয়ে দেখবেন।' আইডীয়া খুব পরিষ্কার। উনি অনেকদিন থেকে বলছেন ধর্ম্মঘটটা কেঁসে যাবে, কারণ এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিরোধটা ডেমক্রাটিক স্তরের, এবং নেতৃত্বটা মধ্যবিত্তেরই হাতে থাকতে বাধ্য।'

খগেন—'তাই বুঝি। আমি যেন অন্য রকমের মতামত পোষণ করেন ভাবছিলাম।'

বিজন—'ওঁকে একটু ভুল বোঝা স্বাভাবিক। অত আইডীয়ার ব্যবসা করলে ও-টুকু দাম দিতে হয়।'

খগেন—'আইডীয়া, আইডীয়ার হাত থেকে ভগবান রক্ষা করুন।'

বিজন—'আইডীয়ার প্রতি কবে থেকে বিমুখ হলেন। খগেন বাবুর বিস্তর পরিবর্ত্তন হয়েছে, রমাদি লক্ষ্য করেছ? তোমার কি হল আবার? এই ত' এতক্ষণ খই ফুটছিল।'

খগেন—'বিজন, তোমার রমাদি একটু খেয়ালী, কুহেলি, অর্থাৎ একটু মেয়েলী, একপ্রকারের adverb, ক্রিয়া-বিশেষণ।'

বিজন—'এতদিন পরে আবিষ্কার করেছেন। ছেলে বয়সে ওঁর খাম-খেয়ালে সুজন দা আর আমি ব্যতিব্যস্ত হতাম।' রমলা হেসে ফেল্লে। খগেন বাবু একটা কমলালেবু নিলেন।

'বেশী বদলেছি, বিজন?'

বিজন—'তা একটু, বেশ একটু কঠিন হয়েছেন। সুজন দা যদি এসে পড়ে খুব ভাল হয়...আমার অন্ততঃ, তার একটা ব্যালান্স্ আছে যেটা আর কারুর মধ্যে পাই না। একটা হিউম্যানিটি, যেটা এদের মধ্যে কারুর নেই, নেই আমি জানি, আপনি কতটুকু জানেন খগেন বাবু, এরা নিজেদের কল বানিয়েছে মজুরদের হয়ে লড়তে গিয়ে। যেটা শত্রু তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তাই হয়ে গেল...মনুষ্যত্বের জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের উপকার করবে। তা কখনও সম্ভব! আপনি কি ভাবে বিচার করেন জানি না...'

খগেন—'বিচার, বিশ্লেষণ ভাল লাগে না আর। কিন্তু, বিজন, বদলেছ তুমি, কিংবা, হয়ত, যা ছিলে তাইতে ফিরেছ, পিছলে গিয়ে।' বিজন অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বল্লে 'আপনি জানেন না মোটেই...আমি এখন যাচ্ছি...পরে সব দেখবেন অন্যায় কার ও কোথায়?' বিজন চলে গেল।

যাবার পর খগেন বাবু অনেকক্ষণ টেবিলের ধারে বসে রইলেন। রমলা উঠতে যাচ্ছে এমন সময় খগেন বাবু বল্লেন, 'ক্লান্ত হয়েছ, রমা?' হঠাৎ কণ্ঠস্বরে

কোমলতা জড়িয়ে যায়…কতদিন রমা-সম্বোধনে মাধুর্য্য আসেনি, লোকের সামনে রমলা বলতেও লজ্জা হত, নামের পরিহারটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল, নিজনের সামনে 'তোমার দিদি', এমন বন্ধু নেই যার কাছে 'রমলা' উচ্চারণ করা যায়, 'রমা' আরো ছোটো, স্বল্প-পরিসরে চিন্তার পদ্ধতি হাঁপিয়ে ওঠে; ভাবেরই সুবিধা ঘটে, তাই ঘনত্ব কবিতার গুণ, রমা-র শেষে স্বরবর্ণ দীর্ঘ হয়ে ভাবপ্রকাশের অবসর দেয়, র-মল্-আ, হসন্তে আটকে যায়, দুটি কথার রমা—তাল দেওয়া যায় আ-এর ওপর। 'রমা' যেন 'তুমি' মাখান…যেদিন প্রথম 'তুমি' বল্লে সেদিন সর্ব্বাঙ্গে কাঁপন লেগেছিল, সিঁড়ির ওপর থেকে, তার পরই সরে গেল।…

রমলা—'না, কেন?'

খগেন—'না, অমনই। বিশেষ কোনো কথা নেই। তোমাকে দেখাচ্ছিল ভাল।' রমলা নিজের ঘরে চলে গেল। সত্যি কোনো কথা ছিল না, কিংবা অনেক কথাই ছিল যার জন্ম হল না, বহু দিনের সঞ্চিত কামনার তীব্রতা সত্ত্বেও অনাগতের আশঙ্কায় নিষ্ফল হল, কামনা অন্য মুখ নিলে, কথা ঘুরে গেল, জানাবারই বা কি প্রয়োজন? সবই নিরর্থক, মন অবসন্ন হয়, প্রকাশের শক্তি পর্য্যাপ্ত থাকে না, ব্যগ্রতার অবসানে আন্তরিক পার্থক্যবোধ দানার মতন মনের তলায় থিতোয়। এটা ঘৃণা নয়, ক্লান্তি, যাতে সহানুভূতি ও অভিমানের আমেজ রয়েছে। রমলার প্রতি অন্যায় বিচার যেন না হয়, তার দিক একটা আছেই আছে, সে সমাজ ছেড়ে তাকে গ্রহণ করেছে—এটা মস্ত ত্যাগ! সেটা অস্বীকার করা মহাপাপ। কিন্তু পাপ পুণ্যই বা কেন? স্বীকার-অস্বীকার দেনা-পাওনার ব্যাপার, হিসেব-নিকেশ ধর্ম্মজ্ঞানের বৈশ্যবৃত্তি। রমলা মানুষ…অতএব তার অস্তিত্বটাই মুখ্য, মেয়েমানুষ হলেও মানুষ।

অনেক রাতে রমলা খগেন বাবুর বিছানায় আসতে খগেন বাবু ব্যস্ত হয়ে জায়গা ছেড়ে দিলেন। 'রাগ হল?' 'রাগ! রাগ কেন হবে?' 'তুমি যদি বল আমি কোনো পার্টিতে যাব না, কোনো সমিতিতে যোগ দেব না, কারুর সঙ্গে মিশব না।' নিশ্চল হয়ে খগেন বাবু উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই যাবে, সকলের সঙ্গে মিশবে, আমি ভুল বুঝব না। জীবনে যা যা করেছি তাই সব ঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু, কি জান, স্থূল, মোটা-মোটা সম্ভাবনাগুলো খুঁটি-

নাটি ছোটখাট্ট টুকরো, কাটাকাটা ঘটনার চেয়ে বেশী মূল্যবান, বেশী দরকারী মনে হয় আজকাল। তাদের প্রতিকূল আচরণে শাস্তি নেই, সেটা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়, নির্জলা বোকামী…। এইটুকু বদলেছি, মাত্র।' হঠাৎ রমলা খগেন-বাবুর কানের কাছে মুখ এনে বল্লে, 'তুমি আমাকে ভাল দেখাচ্ছিল…ছিল বলবে কেন ? খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এলাম যে। তোমারও কি ভাল লাগে না ? আমি বুঝি বোকা, সাজলে-গুজলে আড় চোখে আবার দেখা হয়…' "নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই তোমার অধিকার আছে।' 'অধিকার…অধিকারের কথা তোলো ত' দেখো কি করি।' 'অধিকার নয় ? তবে কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য মানে …দুজনের সম্বন্ধটাকে দুজনেই ওপর তলায় নিয়ে যেতে চাইছে, চেষ্টা করছে —জীবনটাই যদি অচল হয়, তবে কর্ত্তব্য থাকে না, থাকে চাপ আর ভার… সেটাও স্বাভাবিক, প্রত্যেকে প্রসারিত হবেই, বদ্ধপ্রাকার কিছু তোমার আমার সুবিধায় আপনা থেকে প্রশস্ত হবে না।' 'তুমি কী চাও ?' 'তাই জানি না, অন্ততঃ তোমার কাছে : তবে আপাতত ভার একটু লঘু হোক। গরম পড়ে গেছে।' খগেন বাবু গলা থেকে রমলার হাত নামিয়ে দিলেন, পাথরের মতন ভারী। রমলা আবার হাত রেখে বল্লে, 'ঢের হয়েছে মশাইএর, অনেকক্ষণ রাগ দেখান হয়েছে, এইবার...না, আমি শুনছি না…নিজে ভেবে ভেবে বুড়ো হলে, আমাকেও বুড়ী হতে হবে সেই সঙ্গে ?' 'তুমি কখনই হবে না।' 'উর্ব্বশী বল।' 'তাই বটে।' 'আমাকে অপমান না করলে বুঝি হজম হয় না ? বেশ কাল থেকে আমি কারুর সঙ্গে মিশব না, মুখ হাঁড়ী করে কালপেঁচা সেজে ঘরের কোণে বসে থাকব, তোমার ভাল লাগবে ? তবে জর্জেট পরতে বল কেন ? আহা, আমি যেন বুঝি না…কাল চল একটা ভাল সুট পরে বেরোও দেখি নি, বেশ ভাল লাগবে, অন্যেরও লাগবে গো লাগবে·· ঐ যে বেবী মেয়েটিকে দেখলে…তবে ওর এখন রণির যুগ চলছে, রিটার সঙ্গে বয়েসের খাপ খাবে না, তা ছাড়া ও এখন বিজনের জন্যে পাগল, কেমন চালাকী করে বিজনের নৌকোয় গেল…স্কুল হয়, লুইসী রাইনারের টয়-ওয়াইফ, কিংবা গুড্ আর্থ দেখেছ ? যেন কাঁদতেই জন্মেছে, এ-যুগেও অমন হয়।' 'প্রোফেসার ছিল ?' 'ওমা, তাই বল, আমি ভাবছি কে রে। হা ভগবান! ও যদি ফেউএর মতন ঘোরে আমি কোথায় যাব। তবে…আমি কিছুতে রাজী

হইনি, বেবীর কাণ্ড, আমি আর হোস্‌টেস্‌গিরি করতে পারি না···ওমা, তাই বল ? ধরা পড়েছে কেবল মেয়েরা, নয় ?' রমলা খিলখিল করে হেসে খগেন বাবুকে টেনে নিলে। কাঠের মতন পড়ে রইলেন—উত্তেজনা নিবৃত্তির যন্ত্র হয়ে, পার্টি থেকে ফিরে কেন অমন হয় ! নিজের ওপর ঘৃণা ধরে নিষ্ক্রিয় অংশের অভিনয়ে, রমলা বুঝতে পারে, তার লজ্জা হয়, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে যায়। যাবার সময় বলে, 'শুনছিলাম, সফীকের নামে ওয়ারাণ্ট বেরুচ্ছে !' 'কেন ? সমঝোতা ত' হয়ে গেল !' 'মানুষ খুনের চার্জ্জ।' 'মানুষ খুন !' 'শিশু হত্যা।'

পরের দিন সকালে বিজন এল না। বিকেলে বিজন গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে ভেতরে এল। 'কি রমাদি ? এখনও তৈরী হও নি ?' রমলা গা করল না। খগেন বাবু বিজনকে সফীকের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। 'সফীক ? তার শরীর খারাপ, বেশী। তার এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল। এখানে আপাতত আর কি কাজ ! ওধারে এলাহাবাদের ছাপাখানায় ধর্ম্মঘট হয়েছে শুনছিলাম। কৈ, রমাদি, শীগ্‌গির তৈরী হও।' রমলা তবু উঠল না দেখে খগেন বাবু বিরক্তির স্বরে বল্লেন, 'যাবার কথা দিয়েছ যেতেই হবে···যদি তোমাকে...'

রমলা, 'আমাকে তুমি কিছুই বলনি,···তুমি একটু থাম···প্লীজ—'

বিজন—'কেন, যাবে না কেন ? আপনার অমত নাকি ! কাজটা খুব ভাল ···ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যাপার·· এতে দোষ হয়ত আমারই···এই কাল সব ঠিক, আর আজ কলকাঠি বিগড়ে গেল ! অত কথায় কথায় অভিমান করলে সমিতি চলে না। এই জন্যেই ত' বনে না তোমাদের সঙ্গে আমার !' খগেন—'বাস্তবিক রমলা, এখন বিজনের মান থাকে কোথায় ?

বিজন—'আমাকে যদি বিপদে ফেলতে চাও তার অনেক সময় আছে। এখন লক্ষ্মীটি চল, সব পণ্ড হবে। বেবীর কর্ম্ম নয়, রিটা ?···তার ধাতেই নেই গড়ে তোলার কোনো কিছুর। তুমি শিখিয়েছ···তুমি না গেলে একটা কেলেঙ্কারী হবে !'

খগেন 'আমি একটু বেরুব, কাজ আছে আমার।' বলা হল না

সুজনকে আসতে মানা করার কথাটা…পরে সুযোগ হলে দেখা যাবে। রমলা সাজতে গেল ভেতরে।

ব্যাপারটা এই: ক্লাবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রমলার ওপর একটা গুরুতর কাজের ভার আসে। অনেক দিন থেকে ক্লাবের কাগজে কলমে একটা 'ওয়েলফেয়ার সেক্‌শন' ছিল, সেটা ঠিক চলছিল না একজন উপযুক্ত কর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মসচীবের অভাবে। সকলের অনুরোধে রমলা ঐ দিকটা একটু নজর দিতে স্বীকৃত হল। প্রথমে সে রাজী হয় নি সহরে নতুন এসেছে বলে, কিন্তু সে আপত্তি টিঁকল না। কাণপুর সহরে শিশুদের কোনো অনুষ্ঠান নেই, অধ্যাপক বল্লেন, অথচ প্রত্যেক শিশুরই আর্টের প্রতি একটা সহজ আগ্রহ আছে, কেউ পারে ছবি আঁকতে, বিলেতে প্রায়ই শিশু-আর্ট প্রদর্শনী হয়, সে-সব ছবি দেখলে মনে পড়ে একধারে বুশম্যানদের চিত্র, অন্যধারে অতি আধুনিক, এমন কি পিকাসোর ইদানীং আঁকা ছবি; কেউ পারে নাচতে…কত মেয়ে যে পীটার প্যান সাজছে তার ইয়ত্তা নেই; আর গান গাইবার শক্তি প্রত্যেক ইটালিয়ান মেয়েরই আছে; এ-দেশের শিশুদের মধ্যে কেন থাকবে না? সুযোগের অভাবে তাদের প্রতিভার স্ফুরণ হয় না, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে বরঞ্চ সেটা নষ্টই হয় আজকালকার গ্র্যাজুয়েটরা কাণা ও কালা। এতে ভারতবর্ষের যে কত ক্ষতি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই শিশুদের একটা ক্লাবের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ঐ ওয়েলফেয়ার বিভাগ মেম্বরদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে কাজ সুরু করুক। সেখানে মধ্যে মধ্যে একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় হবে, ছেলেরাই অর্কেষ্ট্রা তৈরী করবে, ছবির প্রদর্শনী খুলবে বছরে বছরে। বিজন অধ্যাপকের উদ্দেশ্য সাধু স্বীকার করল, তবে ঐ সব প্রচেষ্টার একটা সামাজিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, নচেৎ বুর্জ্জোয়া আমোদ প্রমোদে তার উৎসাহ নেই। অধ্যাপক তার দিকে চোখ টিপে চুপিচুপি বল্লেন, 'সামাজিক উদ্দেশ্য কি বলছ! আমি চাই এদের শ্রেণীজ্ঞান ঘোচাতে, ডি-ক্লাস্ করতে।' ঠিক হল, চ্যারিটি-শো হবে, পরে, এবং তার জন্য এখন থেকে রমলা দেবী ভার গ্রহণ করুন। অধ্যাপকের পীড়াপীড়িতে এবং প্রাণপণ সাহায্য প্রতিজ্ঞায় রমলার আত্ম-বিশ্বাস ফিরে এল। এখন রমলা ভার নিতে না নিতেই খবর এল যে দিল্লীর এক বড় সাহেব কাণপুর আসছেন শীগ্‌গির, একদিন মাত্র থাকবেন, তাঁর

সামনে প্রথম অভিনয় হলে টাকা উঠবে বেশী। অধ্যাপক রমলাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, 'আমরা এমন চীজ্ দেখাব যা কাণপুরে কখনও হয় নি, ষ্টেজ হবে বাইরের প্রকৃতি, আপনি কেবল সামনে থাকবেন…আপনার উপস্থিতিই আমার প্রেরণা, বাকীটা আমার প্রতিভা।' সেই মত রমলা কথা দিয়েছিল রিহার্স্যালে যাবার, এখন না গেলে সব ভেস্তে যাবে।

বয় কার্ড আনার সঙ্গে অধ্যাপক ঘরে এলেন। 'ভাবলাম, দেরী হচ্ছে যেকালে নিশ্চয় কোনো গোলমাল হয়েছে।' রমলা এসে বিজনের সঙ্গে নিজের গাড়িতে উঠল। অধ্যাপক টু-সীটারে পিছু পিছু চল্লেন।

ক্রমশঃ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের পরিচয়

বিশ্বসৃষ্টি আমাদের নিকটে যেরূপে প্রতিভাত হইতেছে সেইরূপ প্রতিভাসণের কারণ কি ইহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটা মায়াশক্তি। আর সেই মায়াশক্তির স্বরূপ হইল অনির্বাচ্য ; সে সৎও নয়, আবার সে অসৎও নয়,—এই সত্যমিথ্যা—অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের মাঝখানে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহার অনির্বচনীয় রহস্য, সেই অনির্বচনীয় রহস্যই দাঁড়াইয়া আছে বিশ্বসৃষ্টির মূলে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিশ্বসৃষ্টির যে রূপটি আমাদের নিকটে প্রতিভাত হইতেছে,—যাহাকে আমরা আমাদের সকল ভালো লাগা মন্দ লাগার সকল সুখ-দুঃখের অবলম্বন বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা বাহিরের কোন বস্তুর রূপ নহে, আমাদের মন ব্যতীত বিশ্ব-সৃষ্টির কোনো প্রতিভাসন নাই। তবে কি সে সম্পূর্ণই আমাদের মনের সৃষ্টি ? তাহাও নহে,—কারণ তাহা হইলে অন্ধ মানুষের মনের ভিতরেও রূপে রঙে ফুটিয়া উঠিতে পারিত বিশ্ব-সৃষ্টির বিচিত্র ছবিটি। এই রূপটি তাহা হইলে জাগিয়াছে কোথায় ? সে আমাদের অন্তরেও নাই, সে আমাদের বাহিরেও নাই,—অথচ অন্তর-বাহিরের যোগে ভাসিয়া ওঠে সৃষ্টির বহু বিচিত্র রূপটি ঐ মায়ার অনির্বচনীয় লীলারূপে।

আমাদের সকল সাহিত্য-সৃষ্টির মূলেও পরম সত্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এইরূপ একটা মায়া-শক্তি,—অনির্বচনীয় তাহার স্বরূপ। আমাদের যে সাহিত্যের জগৎ তাহাকে সত্যও বলিতে পারিতেছি না, মিথ্যাও বলিতে পারিতেছি না,—সত্য-মিথ্যার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে আমাদিগকে দিতেছে বিচিত্র রসানুভূতি। সাহিত্যের ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনকার এই মায়া-শক্তিকে আমরা বলি 'প্রতিভা'। সাহিত্যের রসমূর্তিতে আমাদের অন্তরের কাছে যে প্রতিভাসন তাহা কোনো বহির্বস্তুর বা বহির্বিষয়েরই সম্পদ নহে ;—কারণ, যদি তাহা হইত তবে মনোনিরপেক্ষভাবে সে মনুষ্য-সাধারণের নিকটে সমান ভাবে প্রতিভাত হইতে পারিত। সে শুধু মনের বা হৃদয়ের সম্পদও নহে,—কারণ বহির্বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন না করিয়া একান্তভাবে বস্তু বা

বিষয়-নিরপেক্ষরূপে সে কখনও আমাদের কাছে আত্ম-প্রকাশ করে না। একদিকে রহিয়াছে বহির্জগৎ, অন্যদিকে রহিয়াছে পাঠকের মন,—আর মাঝখানে রহিয়াছে অনির্বচনীয়-স্বরূপ প্রতিভার মায়াশক্তি,—সেই কৌতুকময়ীর বিচিত্র লীলাতেই অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ উভয়ের যোগে—অথচ উভয়-বিলক্ষণরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে একটা রহস্যময় সাহিত্য-জগৎ।

এই সাহিত্যের জগৎ বিধাতার সৃষ্ট জগৎ হইতে স্বতন্ত্র,—ইহা একান্তভাবে মানুষের সৃষ্ট জগৎ,—এখানে 'কবিরেব প্রজাপতিঃ।' একদিকে রহিয়াছে বিধাতার বিশ্ব-সৃষ্টি, আর একদিকে রহিয়াছে সহৃদয় পাঠকের মন,—প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় কবি বা সাহিত্যিক মাঝখানে গড়াইয়া দিয়াছেন এই সাহিত্য-জগৎ। কিন্তু কেন? বিধাতা-পুরুষের সহিত এই পাল্লা কেন? তাহার কারণ, প্রজাপতি ব্রহ্মার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আছে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা মানুষের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন,—তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়া হিংসা-বশতঃ মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন, যেন মানুষ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত গভীর রহস্যকে, পরম সত্যকে জানিতে না পারে। কিন্তু মানুষই বা একেবারে হার মানিবে কেন? মানুষের ভিতরে যাঁহারা চতুর তাঁহাদের চোখে ধরা পড়িল বিধাতার এই ঈর্ষাপ্রসূত কারসাজি,—তাঁহারা মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দৃষ্টিকে, শ্রবণকে শুধু বাহিরের দিকেই ভাসিয়া যাইতে দিলেন না, তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে চাহিলেন অন্তরের দিকে। তখন লাভ হইল নূতন দৃষ্টি, নূতন শ্রবণ, নূতন গন্ধ, স্পর্শ, আস্বাদন। মানুষ বুঝিল, বিশ্ব-সৃষ্টিকে সে যেমন করিয়া দেখিয়াছিল, স্বাদে গন্ধে শব্দে স্পর্শে তাহাকে যেমন করিয়া পাইয়াছিল,—সেই দেখা, সেই পাওয়াই ত যথার্থ দেখা এবং পাওয়া নয়,—বিশ্বসৃষ্টি যে আরও অনেকখানি! তখন মানুষ নূতন করিয়া বিশ্বের পানে তাকাইল,—সে তাকানো শুধু বাহিরের দিকে তাকানো নহে,—সেই বাহিরে তাকাইবার পিছনে রহিল একটা ফিরিয়া তাকানো; সেই ফিরিয়া তাকানোর ভিতরে মানুষ দেখিতে পাইল, দৈনন্দিন জীবনের একান্ত তুচ্ছ ক্ষুদ্র সাধারণ জিনিসগুলিও কত বড় হইয়া মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ভিতরে রহিয়াছে অসীম রহস্য—অনন্ত বিস্ময়! নিখিল বিশ্ব তাহার কাছে গন্ধে গানে সৌন্দর্যে মাধুর্যে একান্ত অপরূপ হইয়া উঠিল!

বিধাতা পুরুষের ছলচাতুরী এড়াইয়া মানুষ তখন শুধু মাতিয়া উঠিল বিশ্বের স্বরূপ-সন্ধানে। মানুষ অন্তরে অন্তরে জগৎ সম্বন্ধে লাভ করিল গভীর সত্য;—কিন্তু হায়! পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে সেই ঈর্ষাপরায়ণ বিধাতার অভিশাপ,—সমগ্র অন্তর দিয়া মানুষ যাহা লাভ করিল অনির্বচনীয় তাহার স্বরূপ,—যে ভাষা বিধাতা পুরুষ মানুষকে দিয়াছেন সে ভাষাদ্বারা তাহাকে আর প্রকাশ করা গেল না। কিন্তু অন্তরকে তাহা হইলে ত আর বাহিরে প্রকাশ করা গেল না,—যাহা নিছক আমার, তাহাকে যে সকলের করিয়া তোলা গেল না! বিশ্বমানবের অন্তর হইতে 'আমি' যে তাহা হইলে রহিলাম চির বিচ্ছিন্ন হইয়া।

কিন্তু এই বিচ্ছেদ মানুষ কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। কারণ বিশ্বমানবের যোগে যে সে নিরন্তর নিজের ভিতরে 'আমিতর' হইয়া উঠিতেছে; সেখানে যদি আসে বিচ্ছেদ তবে 'আমি' যে পড়ে আপনার গৃহকোণে একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া। মানুষের পশ্চাতে ঘোরাফেরা করিতেছে একটা বিদ্রোহী আদিম শয়তান,—মানুষও করিল বিদ্রোহ। বিশ্বের অনির্বচনীয় স্বরূপকে সে ভাষা দিবে, ইহাই তাহার পণ। মানুষ তখন সৃষ্টি করিল অসংখ্য কলা-কৌশল,—সৃষ্টি করিল নূতন ভাষার—নূতন প্রকাশ-ভঙ্গির,—তাহা দ্বারা সে আরম্ভ করিয়াছে কোন্ সুদূর অতীত হইতে যুগে যুগে দেশে দেশে জীবন ও জগতের অন্তর্নিহিত অনির্বচনীয় স্বরূপকে প্রকাশ করিবার সাধনা। এই সাধনা দ্বারাই মানুষ জগৎকে এবং জীবনকে আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। বিশ্বের সেই নূতন সৃষ্টিই সাহিত্য-সৃষ্টি। যুগে যুগে দেশে দেশে চলিয়াছে, এই এক সাধনা,—জীবনকে ও জগৎকে শুধু সুন্দর এবং মধুর করিয়া দেখিব না, তাহার সমস্ত কুশ্রীতা, কারুণ্য এবং রুদ্রত্ব লইয়াই তাহাকে আরও অনেক গভীর করিয়া অনুভব করিব,—এই সাধনাই সাহিত্য-সাধনা।

গ্রীক্ মনীষী প্লেটো এই সাহিত্য-জগৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে সাহিত্য বিশ্বসৃষ্টির একটা 'অনুকরণ' মাত্র। আমাদের এই জগৎটাই জগতের 'আসল' রূপের সন্ধান দিতে পারিতেছে না, সুতরাং এই সাহিত্যরূপ (অবশ্য প্রাচীনেরা আমাদের বর্ত্তমান 'সাহিত্য' শব্দটির পরিবর্তে সর্বদাই 'কাব্য' শব্দটি ব্যবহার করিতেন,—কারণ উহাই ছিল সাহিত্যের সাধারণ রূপ) 'নকল' জগৎটি যে

আমাদিগকে সত্যলাভ সম্বন্ধে একেবারে পথে বসাইবে ইহাতে আর সংশয় করিয়া লাভ নাই। সাহিত্যকে জগতের নকল মানিয়া লইলে, প্লেটোর পরবর্তী যুক্তিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশ্য সাহিত্যের তরফ হইতে একদলে হয়ত প্লেটোর কথার জবাবে কাটাছাটা ভাবে বলিয়া দিবেন, সাহিত্যের ভিতর দিয়া সত্যকে না পাইলাম ত না পাইলাম; সে নকল হোক, মিথ্যা হোক, তাহাকে আমরা চাই,—কারণ সেই নকল এবং মিথ্যাই আমাদের ভাল লাগে,—আর জীবনের পথে ভাল লাগাটাই আমাদের সব চেয়ে বড় কথা।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয় সুবিশুদ্ধ চার্বাকপন্থী আমরা নই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের মতে সাহিত্যের স্বরূপটিই চার্বাক-মতের বিরোধী। প্লেটো কাব্য বা সাহিত্য সম্পর্কে এই 'অনুকরণ' কথাটি যে কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া পণ্ডিত মহলে অনেক কলহ রহিয়াছে; কিন্তু সাহিত্য বিশ্ব-প্রকৃতির 'নকল' একথা কিছুতেই মানিব না, আর না মানার কারণ রহিয়াছে সাহিত্যের যে সৃষ্টি-রহস্য পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি তাহারই ভিতরে। সাহিত্য বহিঃপ্রকৃতির নকল নয় এই জন্য যে বহিঃ-প্রকৃতির যে অংশ আমাদের নিকট অতি সুস্পষ্টরূপে জানা সে অংশকে লইয়া আমাদের সাহিত্য জগৎ গড়িয়া ওঠে না,—জানার ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইয়া ওঠে যে অজানা, সাহিত্য গড়িয়া ওঠে তাহাকে লইয়া। জানা জগৎটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই উপলক্ষ্য,—লক্ষ্য সেই অজানা। কিন্তু যে অজানা তাহাকে লইয়া সাহিত্য গড়িয়া ওঠে কিরূপে? এ কথার জবাব এই যে যাহা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের কাছে থাকে অজানা, বুদ্ধির প্রখর আলোককেও যাহা চলিতে চাহে আড়াল করিয়া তাহা আমাদের হৃদয়ের কাছে আসিয়া ধরা দেয় একটা রস-স্পন্দনের রূপে,—ইহাকেই আমি বলিয়াছি বিশ্ব প্রকৃতির অনির্বচনীয় স্বরূপ, যাহাকে আমরা নিরন্তর প্রকাশ করিতে চাহিতেছি আমাদের সাহিত্যে। প্লেটো হয়ত যে সকল সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সাহিত্যকে জীবনের 'অনুকরণ' বলিয়াছেন তাহা তৎপূর্ববর্তী গ্রীক সাহিত্যের এপিক্ এবং নাটকগুলি; কিন্তু এপিক্, নাটক প্রভৃতি বিষয়-প্রধান (objective) কাব্যগুলির ভিতরেও যে প্রধান হইয়া

উঠিয়াছে একটা বাস্তব ঘটনা-সংঘাতের যথাযথ বর্ণনা তাহা মনে হয় না, যেখানে সেই বাস্তব ঘটনা-সংঘাতের ভিতর দিয়া সকল জুড়িয়া মানুষের জীবন-রহস্য আরও গভীর হইয়া একটা অকথিত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া ওঠে নাই সেখানে তাহা বড় সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

যে বিশ্বসৃষ্টিকে জড় ও চেতনের লীলার ভিতর দিয়া পাইতেছি প্রত্যক্ষে নিরন্তর আমাদের চারিপাশে, তাহাকে আবার সাহিত্যের ভিতরে রূপায়িত করিয়া চাইতে ভাল লাগে কেন? তাহার কারণ, জীবনের ভালমন্দ, সৌন্দর্য্য-বীভৎসতা, কারুণ্য-রুদ্রত্ব সকল জড়াইয়া আমাদের চোখে জাগিয়া ওঠে যে বিস্ময়—ব্যঞ্জিত হইয়া ওঠে যে মহিমা তাহাকেই বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিতে এবং পাইতে চাই সাহিত্যে। রামায়ণ-মহাভারতের স্তায় বিষয়-প্রধান সাহিত্য জগতে আর কি আছে? কিন্তু সে কি তৎকালীন জীবনের ফোটোগ্রাফ মাত্র? সমস্ত জুড়িয়া কবি-গুরু বাল্মীকি এবং ব্যাসদেব কি কথা বলিয়াছেন? বলিয়াছেন,—'জীবনকে দেখ,—বিশ্ব জগৎকে দেখ,—কত তার রহস্য—প্রতি রন্ধ্রে ভরা রহিয়াছে অসীম বিস্ময়,—অনির্বচনীয় তাহার মহিমা! জীবনের সেই অনির্বচনীয় মহিমাকে আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছি গভীর রস-স্পন্দনে, জীবনের সেই অনির্বচনীয়তাকেই লক্ষ লক্ষ শ্লোকে বচনীয় করিয়া তুলিয়াছি আমাদের কাব্যে। জীবন-বেদের পাতায় পাতায় লেখা রহিয়াছে যে গভীর সত্য হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা মানুষকে করিতে চাহিয়াছিলেন বঞ্চিত; জীবনের সেই গভীর সত্যকে আমরা প্রতিদিনের তুচ্ছতার প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে দিই নাই; আমরা ফিরিয়া তাকাইয়াছি জীবনের পানে, আমরা জীবনের অমৃত লাভ করিবার জন্য 'আবৃত্তচক্ষুঃ'। জীবনের পানে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিয়াছি যে বিপুল রহস্য—প্রতিপদে লাভ করিয়াছি যে বিস্ময় তাহাকে প্রকাশ করাই আমাদের লক্ষ্য, রাম-রাবণের যুদ্ধ বা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ উপলক্ষ্য মাত্র।' এই জন্য আমরা বিষয়-সর্বস্ব অথবা বাস্তবপন্থী সাহিত্য বলিয়া যেখানে কোলাহল করি সেখানেও বাড়াবাড়ি করিবার কিছুই নাই; যাহা শুধু দেখিয়া শুনিয়াই তৃপ্তি—দেখা-শুনার পশ্চাতে যে রাখিয়া যায় না ভাবনার মূর্ছনা তাহাকে লইয়া কখনও কোনোদিন সাহিত্য

হয় নাই ; আর এই ভাবনার মূর্ছনার পশ্চাতে রহিয়াছে আমাদের অন্তরের গভীর বিস্ময়।

বিশ্বনাথ কবিতার রসের স্বরূপ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—রস হইল 'লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণঃ'। কবি কর্ণপূরও বলিয়াছেন,—'চমৎকারি সুখং রসঃ।' বিশ্বনাথের মতে চমৎকার অর্থ চিত্ত বিস্তার-রূপ বিস্ময়। তাহা হইলে রসের ভিতরে যে একটা আনন্দবোধ রহিয়াছে সেই বোধের সহিত অভিন্ন হইয়া রহিয়াছে একটা পরম বিস্ময়। এই প্রসঙ্গে যে ধর্মদত্তের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেও দেখিতে পাইতেছি যে রসের 'চমৎকার' বা বিস্ময়ই হইতেছে সারবস্তু,—এবং এই জন্যই কাব্যে যত প্রকারের রস হয় তাহার মূলে রহিয়াছে একটা অদ্ভুত রস। কথাটার তাৎপর্য কি ? পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং জীবদের ভিতরে রহিয়াছে যে অতলস্পর্শ রহস্য তাহা আমাদের কবি-মনকে নিরন্তর করিতেছে বিস্ময়-মুগ্ধ, আমাদের সাহিত্যের রসানুভূতির ভিতরে একটা গভীর আনন্দানুভূতির ভিতর দিয়া আমরা লাভ করি বিশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা লোকোত্তর চমৎকৃতি,—একটা পরম বিস্ময়। জীবনের যত প্রেম, যত হাসি, যত করুণা, যত উৎসাহ, রুদ্রত্ব, ঘৃণা ভয় কিছুই সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিতে পারে না যতক্ষণ না সে একটা বিস্ময়ের ভিতর দিয়া আভাস না দেয় জীবনের গভীর রহস্যকে। এই বিস্ময়-লক্ষণের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের লৌকিক আনন্দ ভোগ এবং আমাদের অলৌকিক ধর্মানন্দের সহিত সাহিত্যের রসাস্বাদের একটা প্রকারভেদ স্থাপন করিতে পারি। প্রেমের আনন্দে যত বিস্ময় কম, চিত্তের প্রসার কম,—ততই সে লৌকিক, সাহিত্যের জগৎ হইতে সে থাকে দূরে ; আমাদের ধর্মরাজ্যের প্রেমেও আনন্দের গভীরতার সহিত রহিয়াছে সকল রহস্য—সকল জিজ্ঞাসা—সকল বিস্ময়ের পরিনির্বাণ ; যে আনন্দানুভূতি আনে শুধু চিত্তের পরিনির্বাণ সে যতই মহৎ হোক না কেন, তাহাকে সাহিত্যের জগতে স্থান দিতে পারি না। সাহিত্যের রস তাই 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' হইয়াও 'লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণ'। সাহিত্যে ধর্মের স্থান রহিয়াছে ; ভগবৎ-প্রেম লইয়া অনেক কাব্য-কবিতা হইয়াছে ; কিন্তু সাহিত্যে যে ভগবৎ-প্রেম তাহা মানুষকে একান্ত পরিনির্বাণের পথে লইয়া যায় না, সে মানুষের মনকে লইয়া যায় রহস্যের

গভীরতায়—বিস্ময়ের অতলতায়। সেই রহস্য এবং বিস্ময় লইয়াই ধর্ম ও সাহিত্য হইয়া ওঠে।

সাহিত্য-সৃষ্টির আদিম প্রেরণার ভিতরেই রহিয়াছে এই চিত্ত-প্রসার-রূপ চমৎকৃতি বা বিস্ময়। বিশ্বসৃষ্টিকে মানুষ যত দেখিয়াছে তাহার রহস্যময় বৈচিত্র্যে তত সে হইয়াছে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ; এই জগৎ হইতে জীবন হইতে সে অনেক পাইয়াছে প্রেম, অনেক পাইয়াছে সৌন্দর্য, মাধুর্য,—অনেক পাইয়াছে হাসি-কান্না, আশা-উৎসাহ,—ঘৃণা-ভয় ; জগৎ এবং জীবন হইতে দুই হাত ভরিয়া এই যে নিরন্তর পাওয়া তাহাতে যতক্ষণ সে ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে ক্ষণিক হৃদয়-বৃত্তির বিস্ময়-হীন আলোড়নে ততই তাহাকে করিয়াছে ক্ষুণ্ণ সাধারণ লৌকিক জীবনের অমহিমায় ; জীবনের চলার পথে ধূলামাটির ভিতরেই সে হারায় আপন সত্তা। কিন্তু জীবনের সকল পাওয়াকে মানুষ এমনি করিয়া ধূলায় বিলীন হইয়া যাইতে দেয় নাই ; মানুষের মহত্তর সত্তায় এই সকল পাওয়া তুলিয়াছে স্পন্দন,—মানুষ পাইয়াছে আর বিস্মিত হইয়াছে ; তাই সে পাইয়াছে আর ভাবিয়াছে ;—সেই পাওয়া আর ভাবনায় মিলিয়া মিশিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে একটা মনোময় লোক,—সাহিত্যের সৃষ্টি সেইখানে।

জীবনের যে সকল অনুভূতি একটা ভাবনার অনুরণন না রাখে তাহারা সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে না। জগৎ-ব্যাপার এবং জীবন-প্রবাহের পশ্চাতে এই যে একটা অনুরণন রহিয়াছে তাহা লইয়াই গড়িয়া ওঠে আমাদের কাব্যলোক। প্রেমের যে দুইটি রূপ—সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ তাহার প্রথমটি লইয়া কাব্য জমিয়া ওঠে না, কারণ সম্ভোগের ভিতরে নায়ক-নায়িকা উভয়ে উভয়ের এত কাছাকাছি যে মাঝখানে বিস্ময়ের স্থান নাই, তাই সেখানে নাই ভাবনার অনুরণন। বিরহ সৃষ্টি করে যতখানি ব্যবধানের ততখানি বিস্ময়ের, কারণ প্রেমের দুই পারের মাঝখানে ত থাকিতে পারে না কোন ফাঁক, ব্যবধানের দূরত্ব তাই ভরিয়া যায় রহস্যের গোধূলিতে,—সে বিস্মিত করে,—ভাবায়—সে আনে চমৎকৃতি, তাই—বিরহ লইয়া হয় কাব্য।

বৃহৎ জগৎ-ব্যাপারের ভিতরকার এই অনুরণনকে অনুভব করিতে হইলে নিজেকে এই জগৎ-ব্যাপারের ঘূর্ণি এবং কোলাহল হইতে একটু গুটাইয়া লইতে হয়,—একটু ঊর্ধ্বে রাখিতে হয়। রাজপথের কোলাহলের সহিত যাহারা

কোলাহল করিয়া চলে এবং সেই কোলাহলের ভিতরেই নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দেয় সে কোলাহলকে ভাল করিয়া দেখিতে শুনিতে পায় না,—তাই সে কোলাহলের পশ্চাতে রহিয়াছে যে বিস্ময়-বিমথিত ভাবনার অনুরণন তাহা তাহার নিকট থাকিয়া যায় একেবারে অজ্ঞাত। এমন লোক আছে যে ঐ রাজ-পথের মিছিলের সঙ্গেই চলিয়াছে কোলাহল করিয়া,—কিন্তু মাঝে মাঝে সে থামিয়া যায়,—চোখ মেলিয়া দেখিতে চাহে রাজপথের শোভাযাত্রাকে, শুধু পরের চলাকে নহে, নিজের চলাকেও, কাণ পাতিয়া শুনিয়া লয় শুধু পরের কোলাহলকে নহে, নিজের কোলাহলকেও ; তখনই সে অনুভব করিতে পারে চলার পশ্চাতে যে অনুরণন রহিয়াছে, কোলাহলের পশ্চাতে যে অনুরণন রহিয়াছে তাহাকে। শব্দের অনুরণন শব্দের মতন স্থূল নহে, তাই তাহাকে শুনিতে হয়, বিশেষ ভাবে কাণ পাতিয়া ; জগৎ-ব্যাপারের পশ্চাতে রহিয়াছে, যে বিস্ময়ের অনুরণন তাহাও তেমনি জগৎ-ব্যাপারের ন্যায় স্থূল নহে, তাহাকে লাভ করিতেও চাই সেই তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এই জন্যেই কবিকে হইতে হয় 'আবৃত্তচক্ষুঃ'।

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের ভিতরে একদল ধ্বনি-বাদী আছেন। * তাঁহারা বলেন যে, আমরা যাহা বলি সেই বলা যখন বলার ভিতরেই শেষ হইয়া যায়, অর্থাৎ বলাটার যে একটা সুস্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ রহিয়াছে সেই অর্থটির প্রকাশের সঙ্গে যখন তাহার সমস্ত কর্ত্তব্যটুকু শেষ হইয়া যায় তখন সে কাব্যেতর ; কিন্তু সেই বলার সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট অর্থটিই যেখানে প্রধান নয়, বলার ভিতর দিয়া আভাসে ইঙ্গিতে প্রধান হইয়া উঠে একটা বাক্যাতীত অর্থ সেইখানেই সে কাব্যপদবাচ্য। এই যে বাচ্যার্থের ভিতর দিয়াই বাচ্যার্থকে ছাপাইয়া ওঠে একটা বাচ্যাতীত ব্যঞ্জনা ইহাই ধ্বনি, সেই ধ্বনিই কাব্যের

এই ধ্বনি শব্দটিকে আর একটু গভীর এবং ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলেই আমরা কাব্যের আত্মাকে লাভ না করিলেও তাহার অন্তর্দেশে প্রবেশাধিকার লাভ করিব। উত্তম সাহিত্য যে ধ্বনি-প্রধান তাহার কারণ এই যে মূলতঃ ধ্বনি লইয়াই গড়িয়া ওঠে সকল সাহিত্য, সে ধ্বনি হইতেছে সমগ্র সৃষ্টির ধ্বনি। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে—সে বৃহৎ হোক বা

ক্ষুদ্র হোক, সুন্দর হোক বা কুশ্রী হোক, সুখের হোক বা দুঃখের হোক—তাহারা কিছুই আপনাতে আপনি লীন হইয়া যাইতেছে না, সকল ঘটনের ভিতর দিয়া থাকিয়া যাইতেছে একটা অঘটনের ঝঙ্কার, ইহাকেই আমি বলিয়াছি জগৎ ব্যাপারের অনুরণন। বিশ্ব-প্রবাহের ভিতরে নিহিত রহিয়াছে যে ধ্বনি তাহাকে লুকাইয়া রাখিবার জন্যই বিধাতার ছলা-কলা, মানুষ তাই এমন একটি জগৎ—এমন একটি জীবন গড়িয়া লয় তাহার সাহিত্যের ভিতরে যেখানে সে সকল দৃশ্য, গন্ধ, গান,—সকল ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে চায় সেই ধ্বনিকে। প্রকৃতিতে এবং সাহিত্যে এইখানেই তফাৎ। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতরে রহিয়াছে যে ধ্বনি তাহাকে সাধারণ লোকে ধরিতে পারে না, তাহা ধরা পড়ে শুধু বিশেষ বিশেষ দেশে ও কালে বিশেষ বিশেষ লোকের কাছে। সেই বিশেষ লোকই জগতের বিভিন্ন যুগের সাহিত্যিক, বিশ্ব-জীবনের ধ্বনিকে তাঁহারা সুলভ করিয়া তোলেন তাঁহাদের নিজেদের সৃষ্টির ভিতর দিয়া। সাহিত্যের ভিতরে আমরা বহির্বিশ্বকে যেমনটি ঠিক তেমনটি করিয়া কখনই প্রকাশ করি না,—উগ্রতম বাস্তববাদী সাহিত্যেও না; কারণ, বিশ্ব জীবনকে যেমনটি ঠিক তেমনটিই প্রকাশ করিলে তাহার ধ্বনিটিকে যে প্রকাশ করা হইত না। তাই সর্বপ্রকার সাহিত্যসৃষ্টির ভিতরেই রহিয়াছে অনেক ছাটাই-বাছাই, নানাপ্রকারে কলা-কৌশল. এই সকল প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে এই মুখ্য উদ্দেশ্য, বিশ্ব জীবনের সেই অংশটুকু সেই ভাবে প্রকাশ করা যাহাতে বিশ্ব-জীবনের ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে যে ধ্বনি তাহাকেই সব চেয়ে স্পষ্ট এবং সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা হয়।

বহির্জগতের নায়ক-নায়িকা শুধু প্রেম করে না, আরও হাজার রকমের কাজ করে; কিন্তু জগতের যত কাব্য-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক হইয়াছে তাহা যে অধিকাংশই নায়ক-নায়িকার প্রেম লইয়া, তাহার কারণ এই যে প্রেমের ভিতরে মানুষ সব চেয়ে বেশী পাইয়াছে জীবনের রহস্য—বিস্ময়,—জীবনের ধ্বনির সন্ধান। সেই ধ্বনিটুকু ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বাস্তব জীবনের যেটুকু যেটুকু প্রয়োজন, কাব্যের ভিতরেও আমরা গ্রহণ করি সেই টুকুই। তাহা যে শুধু রোম্যান্টিক কাব্যে বা আদর্শবাদী কাব্যে করি তাহা নহে, তাহা করি সকল বাস্তববাদী সাহিত্যেও। আমাদের বর্তমান

যুগের দৃষ্টিতে আমরা হয়ত জীবনের রহস্য পাইয়াছি শুধু নায়ক-নায়িকার প্রেমের ভিতরে নহে, তাহাকে পাইয়াছি পরস্পারের ঘৃণা-বিদ্বেষের ভিতরেও ; কিন্তু সেই ঘৃণা-বিদ্বেষের ঘাত-প্রতিঘাতের যে রূপ আঁকিয়া তুলি আমরা আমাদের সাহিত্যে সে আমাদিগকে কি দিতেছে ? ঘৃণা-বিদ্বেষের ভিতর দিয়াও মানুষের জীবনে জাগিতেছে যে গভীর রহস্য—যে জীবন-ধ্বনি তাহাকেই সে প্রকাশ করিতে চাহে তাহার সকল রূঢ়তার ভিতর দিয়া। সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাই আমরা শুধু সুন্দরকে—শুধু মধুরকে খুঁজি না,—জীবনের সকল দুঃখ-বেদনা, সকল ঘৃণা-বিদ্বেষ, রুদ্রত্ব-বীভৎসতাও সাহিত্যের রস হইয়া উঠিতে পারে যদি সে প্রকাশ করে জীবনের ধ্বনিকে। জীবনের সেই ধ্বনির স্বরূপ পরম বিস্ময়।

জগৎ-ব্যাপারের পশ্চাতে এই যে একটি অনুরণন তাহা দ্বারাই সৃষ্ট হয় কবির অন্তর রাজ্যে একটি বিশেষ বাসনা লোক। 'জীবনের ধন' তাই 'কিছুই ফেলা যায়' না। যাহা কিছু বাহিরে পাওয়া যায় স্থূলে বাহিরের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাই আবার একটি অনুরণনের রূপে অন্তরে প্রবেশ করিয়া গড়িয়া তোলে এই সাহিত্যের বাসনা-লোক। এই বাসনা-লোক হইতেই যেমন সাহিত্যের সৃষ্টি, এই বাসনা-লোকেই আবার সাহিত্যের আস্বাদন। সম-বাসনার যোগেই একটি হৃদয় অপরের কাছে হইয়া ওঠে 'সহৃদয়,' আর দুইটি সহৃদয়ের যে হৃদয়-সংবাদ তাহাই সাহিত্যের যথার্থ 'সাহিত্য'। এই বাসনা-লোকের সামগ্রী বলিয়াই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু শরীরী হইয়াও অশরীরী। শরীরী সে বাহিরের যোগে, অশরীরী সে অন্তরের যোগে। সাহিত্যের বিষয়-বস্তু যেমন একদিকে স্থূল বাস্তব নহে, অন্যদিকে সে একান্তভাবে বস্তু-বিয়োজিতও নহে। বিশ্ব-সৃষ্টি যে আমাদের চিত্তরাজ্যে স্থান লাভ করে বাসনারূপে তাহার ভিতরে বিধৃত হইয়া থাকে বিশ্বসৃষ্টির শরীরী রূপ এবং দেহাতীত অনুরণনের রূপের সহিত যুক্ত হইয়া। এই দেহ এবং বিদেহের মাঝখানে জাগিয়াছে সাহিত্য, দেহের ভিতর দিয়া দেহাতীতেরই সন্ধান দিতে। কবির বাসনা-লোকে বিধৃত বিশ্ব-জীবনের অনুরণন লোকোত্তর চমৎকৃতির ভিতর দিয়া নিরন্তর জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, প্রেম-ঘৃণা, বীরত্ব-ভয়কে অপূর্ব আস্বাদ্য করিয়া তুলিতেছে, বিশ্ব-জীবনের সেই আস্বাদ্যমানতার নামই 'রস'।

প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, সাহিত্যের এই রস আমাদের চিত্তের আবরণ ভঙ্গ করে। বহির্বিশ্ব প্রতি মুহূর্তেই দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা আমাদের চিত্তের উপরে টানিয়া দিতেছে অসংখ্য আবরণ, এই আবরণ আমাদের চিত্তকে টানিতেছে বন্ধনের দিকে। সুখের বন্ধন সোনার শৃঙ্খলের বন্ধন, দুঃখের বন্ধন লোহার শৃঙ্খলের বন্ধন, উভয়ই বন্ধনই দিতেছে অতৃপ্তির বেদনা। উল্টা মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা। সে জগৎকেও চায়, জীবনকেও চায়, আবার সেই সঙ্গে সব লইয়া চায় পলে পলে বন্ধন হইতে মুক্তি, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের ভিতরে, সীমা হইতে অসীমের ভিতরে মুক্তি। সাহিত্য সেই মুক্তির জগৎ। হাজার রকম বন্ধনের আয়োজন করিয়া তাহারই ভিতরে সে আমাদের মনকে যে বিশ্ব-জীবনের আকাশে একটুখানি ঘুরিবার সুযোগ দেয় সেইখানেই আমাদের তৃপ্তি, তাই আমরা জীবন ছাড়িয়া আবার সাহিত্য চাই।

সাহিত্যে রসানুভবের কোন বিশেষক্ষণে আসিয়াই যে আমাদের চিত্তের আবরণ ভঙ্গ হয় তাহা নহে, এই আবরণভঙ্গের আয়োজন রহিয়াছে প্রথমাবধিই। সাহিত্যের ভিতরে সাধারণীকৃতি বলিয়া একটা ব্যাপার আছে, তাহার ভিতরেই রহিয়াছে আমাদের সীমা হইতে অসীমে যাত্রা। এ অসীমে যাত্রার বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্য এইখানে যে এখানে সীমা আছে কিন্তু তাহার বন্ধন নাই; সীমাকে অস্বীকার করিয়া অসীমে চলিয়া যাই না, সীমাই এখানে দেখা দেয় অসীমের রূপে। আপিসের কেরাণী আলো-হাওয়া-শূন্য আপিস ঘরের ভিতরে মোটা মোটা অঙ্কের যোগ-বিয়োগের ফাঁকে ফাঁকে পড়িতেছে গল্প এবং উপন্যাস; তাহাতে হয়ত লেখা রহিয়াছে কেরাণী জীবনের লাঞ্ছনাময় দুর্বহতারই কথা। কিন্তু বাস্তব-জগতের কেরাণী-জীবন তাহার মনকে যতই বিষাইয়া দিক না কেন, সাহিত্যের কেরাণী-জীবন তাহার চিত্তকে অমৃতরসে সিঞ্চিত করিয়া দিতেছে; তাই বড় সাহেবের নিরন্তর বকুনি এবং ঝাঁকুনি হজম করিয়াও সে যখনই ফাঁক পাইতেছে তখনই নির্বিকারে পড়িতেছে গল্প এবং উপন্যাস। ইহার কারণ চিত্তের আবরণ-ভঙ্গ। বাহিরের জগতের কেরাণী তাহার দেশ-কালের খণ্ডিত সত্তা লইয়া আমাদের চিত্তকেও শক্ত আবরণে খণ্ডিত করিতেছে। সাহিত্যের ভিতরেও দেশ রহিয়াছে, কাল রহিয়াছে, কেরাণীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি সকল জুড়িয়া

রহিয়াছে তাহার একটা দেশ-কাল-পাত্র-নিরবচ্ছিন্ন রূপ। এই যে দেশ-কাল নিরবচ্ছিন্ন রূপ তাহাই চিরন্তন রূপ,—তাহাই অসীম। প্রমেয়ের ভিতরে এই যে চিরন্তনের অসীমতা তাহাই প্রমাতার ভিতরে আনে আত্ম-প্রসারণ, তাহাই সাহায্য করে প্রমাতৃ-চিত্তের আবরণ-ভঙ্গের।

আমাদের জাগতিক জীবনের যে সাধারণ অনুভূতিগুলি তাহারা জাগিয়া ওঠে 'আমি' এবং 'আমি-না'-কে লইয়া। এই 'আমি' এবং 'আমি-না'-কে গড়ে চিত্তের আবরণ, মনকে তাহারা চারিদিক হইতে ধরে ঘিরিয়া, বৃহৎ জীবনের রহস্যকে তাহারা রাখে আচ্ছাদিত করিয়া। মানুষ চায় এই 'আমি-না'-র সঙ্গে 'আমি'র একটা গভীর মিল, কারণ এই মিলের ভিতর দিয়াই 'আমি'ও মুক্তি পায় তাহার প্রাচীর-ঘেরা বিচরণ ভূমি হইতে। এই মিলটা অতি সহজ হইয়া আসে সাহিত্যের ভিতরে, তাই সাহিত্যে 'আমি'রও আছে মুক্তি। সাহিত্যের যে রস তাহা কাহার বস্তু? তাহা পরের বলিয়া মনে হয়, আবার পরের নয়; আবার আমার বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আবার মনে হইতেছে সে যেন আমারও নয়। 'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ'। রামায়ণ কাব্য হইতে যে করুণ-রসের ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহা রাম-সীতারও বটে, বাল্মীকি মুনিরও বটে, আজ যে আমি বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছি, আমারও বটে। রসাস্বাদকালে 'বিভাবা'দিরই যে কোন 'পরিচ্ছেদ' থাকে না তাহা নহে, রসাস্বাদকেরও থাকে না 'পরিচ্ছেদ'। এই সীমহীনতার ভিতরে—'অপরিচ্ছেদে'র ভিতরে নিত্যকালের বিশ্ব-সৃষ্টির সহিত মানবমনের নিগূঢ় যোগ। এই যে আমি হইতে বিশ্বে এবং বিশ্ব হইতে আমাতে আসা-যাওয়ার একটা সহজ পথ দেখিতেছি সাহিত্যের ভিতরে ইহার ভিতরে মমত্বও তাহার মমত্ব হারায় না, পরত্বও তাহার পরত্ব হারায় না, উভয়ে থাকে অবিনা-ভাবে যুক্ত হইয়া। সেখানে বহির্বিশ্বও ওঠে গভীর রহস্যের বিরাট মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া, 'আমি'ও ওঠে, তাহারই যোগে সর্বব্যাপী হইয়া, আর 'আমি'র এই সীমহীন ব্যাপ্তিতেই মানুষের সুগভীর আনন্দ।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

কাসাণ্ড্রা

পরম দুর্দিনে কেন এ দুর্বার সাহস আমার
ভয় নেই আর কোনো এত্রাসের উদ্ধত যৌবনে।
অগ্নিময় ট্রয়, ভোগ্যা আন্দ্রোমাকি, শুধু হেকুবার
হৃদয়েতে ধৈর্য কিবা অতিমর্ত স্বপ্ন নিরসনে।
ভাগ্যবান তারা যারা মৃত আজ ট্রয়ের প্রাচীরে।
তারা তো দেখেনি কভু এ লজ্জা বীরের অপমান।
দেখেছি সংহার মূর্তি কোমলাঙ্গে উদ্যত অসিরে—
তবু এ গৌরব মোর: বন্দীনীরা তবু মহীয়ান।

কালের পুত্তলী সবে; বিজেতার হেন পরাক্রম
স্বদেশে ব্যহত তবে (তাও কোনো রণক্ষেত্রে নয়)।
প্রতিশোধে উল্লসিত জানায়েছি এ বার্তা আগম—
যে বীজ রোপন রক্তে সাক্ষী তার আছে পরিচয়।

তবু কাঁপে পদযুগ: বিশ্বজনে অমৃত আধার
এ কোন তোরণে তুমি নিয়ে এলে এ্যাপোলো আমার।

মিডিয়া

বাহু ও বুদ্ধির বল দুই মোর ছিল যে সহায়।
ব্যাহত সকলি বুঝি রাজ্যলিপ্সু জেসন আমার।
সেদিন দেখেছি ভীরু ছদ্মবেশী নাবিক সজ্জায়—
পলায়নে সুচতুর এ বাহু লাগেনি গুরুভার।
নীলজল ফেনায়িত তরণীর বিচিত্র সংঘাতে;
শানিত ছুরির রক্ত মুছে গেছে, ভুলি প্রিয়জন।
বিষম সমুদ্র যাত্রা লবণাক্ত বাতাসের সাথে
হৃদয় প্রপাতে আহা ভেসে যায় আমার যৌবন।

যশের সোপান মার্গে তুমি চাও হতে বরণীয়।
অনার্য নারীতে আস্থা তাই আর নেই প্রয়োজন।
মিডিয়া তবুও আমি; মরণের মুখেও স্বকীয়
ডাকিনী ছলাকলা দেখাবে কি অসাধ্য সাধন।

ক্ষতি কিবা যদি দেখা নাই পাই দেবতা প্রসাদ।
ঘৃণা মোর ছেয়ে যাবে আকাশের যতেক আহ্লাদ।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাণের আগুন জ্বালো, ওগো রবি!

১

ভিজে কাঠে ধরেনা আগুন—
আমরা ত শুধু কাঠি—
ভিজে স্যাঁতা দেশলাই কাঠি;
ফুস্ ক'রে নিবে যাই—এইটুকু প্রাণ;
শেষ কালে প'ড়ে থাকি
এক রত্তি ছাই।

২

সূর্য্য আজ লুপ্ত কোন লোকে?
স্যাঁতানো আঁধার গর্ত্তে
আমরা যে ছ্যাতা প'ড়ে মরি।
ছ্যাতা পড়া দেশালাই কাঠি,
স্যাঁতা মরা ছাই।
জিয়ন্ত আগুন হ'লে
জলন্ত রবিরে ভুলে পারে কি ঘুমাতে?

৩

আগুন, আগুন চাই!
কোথা সে আগুন?
হে রবি, যে অগ্নিকণা প্রকোষ্ঠে প্রাণের
সঁপেছিলে নিজ করে—
বহ্নি জীবনের—
সে আগুনে ঘরে ঘরে
জ্বালায়ে তুলিতে চাই
মৃত্যুঞ্জয়ী মরণ-মহিমা।

৪

ওগো স্বপ্রকাশ রবি,
বড়ই দুর্ভাগ্য মোরা ;
নহিলে কি ভুলে থাকি আলসে আবেশে ?
—মৃত্যুর মেঘের আড়ে এযে,
তোমার বিস্মৃতি বিসর্জ্জন !

৫

প্রাণের আগুন জ্বালো ওগো রবি,
ওগো চির ভাস্বর রবি,
ওগো স্বপ্রকাশ,
নিজ বহ্নিমান করে জ্বালো-জ্বালো প্রাণের আগুন
—আছে সুপ্ত আমাদের মাঝে—
তোমার আপন হাতে সঁপা সে আগুন।
মরা স্যাঁতা দেশালাই কাঠি,
রবিকর ছোঁয়া লেগে জ্বলুক আবার।
সে আগুনে ছাই হোক
যত ক্লেদ কলঙ্ক কালিমা ;
সে আগুনে ভস্ম হোক
মোহময় সুবর্ণ পিঞ্জর
সে আগুনে দিকে দিকে
দীপ্ত হোক মৃত্যুঞ্জয়ী মরণ মহিমা।

জীবনময় রায়

কাল-বৈশাখী

কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে গগন ব্যাপিয়া
পৃথিবীর প্রতি রন্ধ্র অন্ধবেগে উঠিছে কাঁপিয়া
উত্তাল উন্মত্ত আলোড়নে,
ঈষাণে বিষাণ বাজে ঘন ঘন বিদ্যুৎ-স্ফুরণে।
তর্জনে গর্জনে রোষে ফুলিয়া ফুঁসিয়া চলে মেঘ
অন্তরে ঘনায় তার বিদ্রোহের দুর্ম্মদ আবেগ
জলে ওঠে শ্যাম-সমারোহ;
নদীর উদ্দাম অবরোহ
অবলুপ্ত হয় অকস্মাৎ;
কুব্জ-পৃষ্ঠ ধরণীর মেরুদণ্ডে পড়ে কষাঘাত।
শতধা বিদীর্ণ মাটি হ'তে
কুণ্ডলিত বিষ-বাষ্প ছড়াইয়া পড়ে পথে পথে।
দিবসে নামিয়া আসে অমাবস্যা রাত্রির আঁধার;
দুর্য্যোগে হিংস্র মন, ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর সংসার।

মেঘে মেঘে বেজে ওঠে ডম্বরুর ডিমি ডিমি ধ্বনি
প্রলয় নৃত্যের ছন্দ অবিরল ওঠে রণরণি
বিদীর্ণ বুকের মাঝে।
সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসীর সাজে
দুয়ারে দাঁড়াল আসি—মহাকাল মুক্ত জটাজাল
নয়নে ঠিকরে বহ্নি—সর্ব্বনাশা ভীষণ ভয়াল।
কাঁপে তার ওষ্ঠাধর, থরথর কাঁপিছে অঞ্জলি
তোদের দুয়ার হতে বিফলে কি ফিরে যাবে চলি?
ওরে রিক্ত, ওরে সর্ব্বহারা,
বাড়ায়ে পাপের ভারা

গৃহকোণে লুকাইবি এখনো কি নিন্দি বিধাতারে ?
　　যুগ-যুগান্তের বঞ্চনারে
আত্মার প্রসাদ বলি এখনো কি করিবি গ্রহণ ?
　　চলিতেছে সমুদ্র-মন্থন
অমৃত কি হলাহল কী উঠিবে আজিকার দিনে
　　তুই কি পারিবি নিতে চিনে
নিঃশেষিত দিবালোকে, ঘনীভূত এই অন্ধকারে ?
　　মহা-ভিক্ষু আসিয়াছে দ্বারে
　　ভিক্ষা লাগি বঞ্চিতের লাঞ্ছিতের কাছে ?
　　জানি তুই নিঃসম্বল, তবু প্রাণ আছে
অফুরন্ত প্রাণ আর অন্তর-প্রদীপ অনির্ব্বাণ,
　সত্যের আলোকে দীপ্ত ; সেই হবে মহামূল্য দান।
সেই ত চরম ভিক্ষা শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা চাহে মহাকাল
দীনতার আবর্জ্জনা, হীনতার জ্বালা ও জঞ্জাল
অঞ্জলি ভরিয়া নিয়া বাঁচাইতে চাহে সে কঙ্কালে।
　　তাই দেখি দিক্‌চক্রবালে
অরুণ রাগের রেখা, নূতন সৃষ্টির আশা জাগে।
　　বিলাবার মত্ত অনুরাগে
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, শেষ ভিক্ষা দিয়ে যাবে বঞ্চিতের দল,
　　ভেঙ্গে ফেল ঘরের আগল
　　ঝড়ের দুরন্ত বেগে ;
　　তারি দোলা লেগে
অবরুদ্ধ অন্তরের যন্ত্রণায় বাজুক ঝনুঝনা,
　　বন্ধন-মুক্তির সম্ভাবনা
উদার আকাশ হ'তে বহিয়া আসুক স্নিগ্ধ বায়ু,
জরাজীর্ণ পৃথিবীর ক্ষীয়মান শেষ পরমায়ু

মৃত্যুরে ভ্রূকুটি করি'
নব জীবনের গানে নূতন সম্ভারে দিক্ ভরি'
আপনার অর্ঘ্যপাত্রখানি ;
মেঘমন্দ্রে বরাভয় বাণী
জাগাক কঙ্কালে আজ জীবনের উজ্জ্বল প্রবাহ,
শান্ত করে' দিয়ে যাক মৃত্যুনীল দৃপ্ত দাবদাহ ;
শেষ ভিক্ষা তুলে নিয়ে হাতে
মহাকাল শান্ত হোক, নব অভ্যুদয়ের প্রভাতে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূল্য—তিন টাকা।

গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি কিন্তু কাহিনীর ঘটনাকাল হচ্ছে প্রায় বিশ বছর পূর্ব্বে। সে সময়ের দীর্ঘ পর্য্যটনের অভিজ্ঞতা টোকা ছিল দিনপঞ্জিকার পাতায় পাতায় আর পেন্সিলে আঁকা ছিল অনেকগুলি স্কেচ্। 'উত্তরা'র উৎসাহী পরিচালক সুরেশবাবুর অনুরোধে সেই সকল পুরাতন কাগজপত্র হতে তান্ত্রিক সাধুসঙ্গের কথা উদ্ধৃত হলো বর্ত্তমান আকারে। তন্ত্রসাধক ছাড়াও বহু বিচিত্র প্রকৃতির লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে পর্য্যটকের; সেই সঙ্গে পথ-পার্শ্বের নৈসর্গিক শোভা, স্থাপত্য শিল্পের সৌন্দর্য্য ও ছোট ছোট কৌতুকাবহ ঘটনার বর্ণনায় কাহিনীটি সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য হয়েছে।

তখনকার ভ্রমণবৃত্তান্ত, কথোপকথন ও ব্যক্তিগত অনুভূতি আজও অদ্ভুতভাবে তাজা রয়েছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে পরবর্ত্তীকালের অর্জ্জিত জ্ঞান বর্ত্তমান গ্রন্থের কোথাও আরোপ করা হয় নি। বস্তুতঃ গ্রন্থকার নিজের কথা বড় একটা বলেন নি, বলেছেন অন্যের কথা, যতদূর সম্ভব তাদের নিজেদের ভাষা ও ভঙ্গী অপরিবর্ত্তিত রেখে।

তিনি প্রথমে যান শ্রীক্ষেত্রে, তারপর ভুবনেশ্বরে কিছুকাল কাটিয়ে নবদ্বীপ, সিউড়ি, বক্রেশ্বর, সাঁইথিয়া, ফুল্লরা পীঠ, অট্টহাস ও তারাপীঠ পর্য্যটন করেন। এই স্থানগুলির অধিকাংশই জনবিরল, তাই বোধ করি দিনান্তের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে নিতে বিশেষ অসুবিধা হতো না, কিন্তু তবু গ্রন্থকারের ধৈর্য্য বিস্ময়কর। সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার বিবরণ লিখে রাখা যত কঠিন হোক না কেন, সেগুলি আদায় ক'রতে কম সাধ্য-সাধনা করতে হয় নি।

তন্ত্রসাধকদের বেশীর ভাগই হচ্ছেন কটুভাষী ও খাম-খেয়ালী। তাঁদের উগ্র তাড়না উপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়েছে ধরনা দিয়ে অস্থানে কুস্থানে, রাত বিরেতে, শ্মশানে কিম্বা করুণানন্দের প্রসাদ-প্রার্থীদের বেষ্টনীর মধ্যে।

শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে গ্রন্থকার দিনটা কাটাতেন নানাস্থানে আর রাত্রে থাকতেন চক্রতীর্থে বালির ওপরে। গায়ের চাদরখানি পেতে ঘুমাতেন। তারপর ভোরে উঠে যেতেন স্বর্গদ্বারের দিকে। একদিন এক ভৈরবকে দেখতে পেয়ে ছুটলেন তার পেছনে। সাধুটি ভাবে ভোলা ঢুলুঢুলু আঁখি, বেশী কথা কইতে নারাজ। সম্প্রতি কোন গ্রাম হতে বামুনের ঘরের এক বাল-বিধবাকে সংগ্রহ করে এনে পূর্ব্বতন ভৈরবীকে বিদায় দিয়েছেন। প্রথম আলাপের সময় কৌতুক ও কৌতূহল ছিল প্রবল কিন্তু ভক্তির সঞ্চার হতে বিলম্ব হলো না।

ভৈরব সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, সংকোচ প্রভৃতি পাশকে একে একে প্রবৃত্তির অনুকূল ক্রিয়াযোগে বিপরীত ভাবে উৎকট সাধনার দ্বারা মনের রাজ্য হতে সমূলে উৎপাটিত করে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। নরনারীর সম্বন্ধ সম্পর্কে কয়েকটি বদ্ধমূল সংস্কারও সেই সঙ্গে দূর হলো। গ্রন্থকারের তথ্য অনুসন্ধিৎসার মধ্যে ঔদার্য্যের ভাগ প্রবল কিন্তু পাঠকের চিত্তে পীড়াদায়ক বোধ হয় না যেহেতু কাহিনী হচ্ছে ঘটনাবহুল।

শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে গ্রন্থকার গেলেন ভুবনেশ্বরে। তখন আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষার সময়। সূর্য্যের মুখ দেখা দায় কিন্তু আবহাওয়ার মধ্যে কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য! গৌরীকুণ্ডে স্নান ও মুক্তেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে বিশ্রামের মধ্যে এতখানি আনন্দ ও বিস্ময় পুঞ্জিত ছিল যে, বর্ণনার পঙক্তিতে পঙক্তিতে নিঃসৃত হয়েছে। এখানে তন্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান সঞ্চয় হয় নি কিন্তু 'নাগ মহাশয়' নামধেয়ী এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক সাধুর সাহচর্য্য লাভ হয়। অদ্ভুত অর্থে, লোকটির বেশ-ভূষা হচ্ছে সন্ন্যাসীর কিন্তু তিনি ভগবানের জন্য জপ, তপ, ধ্যান-ধারণায় বীতশ্রদ্ধ। এক বিঘা জমিতে কিসে 'পনেরো থেকে বিশ মন ধান উৎপন্ন করানো যেতে পারে তাই তাঁর উপস্থিত ধর্ম্ম। উড়িষ্যা রাজ্যে এসেছেন যে-হেতু এখানে পতিত জমি অঢেল আর অলস ও অক্ষম শ্রমজীবীদের মধ্যে উত্তম সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থকার এই সাধুটির সঙ্গে আলাপ আলোচনা টুকে রেখেছেন যত্ন করে কারণ মানব নিচয়ের দুস্থতার জন্য তিনিও গভীর ভাবে পীড়া বোধ করেছেন এবং সমাজ সংস্কারের কল্পনা তাঁকেও উতলা করেছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন

সন্তোষজনক মীমাংসা তাঁরা ভেবে ঠিক ক'রতে পারেন নি। দোষ চাপিয়েছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর। আশা করেছেন যে শেষ পর্য্যন্ত বিধাতার করুণা-বর্ষণ হবেই হবে।

গ্রন্থকারের দৃষ্টি প্রসারিত। ভুবনেশ্বরের জনবিরল প্রান্তরেও কৌতুকাবহ ব্যাপারের অন্ত নেই। জনৈক বিদ্যাগর্ব্বী ভদ্রলোকের অপ্রত্যাশিত-লাঞ্ছনা; উড়িয়া বালকের সঙ্গ; বিষয়ী, মামলাবাজ সন্ন্যাসীর ভণ্ডামি ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অলৌকিক অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে ভ্রমণের তালিকা দিয়েছেন। একটু উদ্ধৃত করে দিলাম—

"সিউড়ি হইতে বক্রেশ্বরের যে পথ, উহা প্রশস্ত এবং নয়ন-বিমোহন। দুই ধারে বড় বড় গাছ। অর্জ্জুন গাছই বেশী। অশ্বত্থ, পাকুড়, কাঁঠাল, তেঁতুল প্রভৃতি বড় জাতের গাছ চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। ওধারে সকল জমিই উঁচু নীচু, ঢেউ খেলানো,—মালভূমি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই বীরভূম ও বাঁকুড়ার সর্ব্বত্রই। কোথাও কোথাও মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের মত লাল মাটিও আছে। নিম্ন বঙ্গের স্যাঁৎসেতে ভাব একেবারেই নাই। প্রভাতে মেঘলা আকাশের সঙ্গে পথের দুই ধারে ঘন পত্র শাখাময় তরুর সারি এবং দূরস্থিত গভীর শাল বনের একটা আশ্চর্য্য ঘন সম্বন্ধ আছে, যাহা পথিকের মনকে ভুলাইয়া দেয়······

'আপুনি কোন গাঁয়ের বট ? কিসের লেগে বক্কামুনির থানে যাইছেন ? মানত আছে বটে ?'

'পীঠস্থান কিনা—তাই।'

'বান্ ক্যায়ে হৈ সোজা তো বাটে, গাঁয়ে যেঁয়ে উঠবেন্ গা। হোই যে গাঁ দিশছে। কোথা হোতে আইছেন ?"

'সিউড়ি থেকে আজ আসছি' বলিয়া পা চালাইলাম, পশ্চাতে শুনিলাম, 'মনিষটা ভাল বটে গো'। এবারে রাস্তা ছাড়িয়া বামে চলিলাম। ধূ-ধূ মাঠ দূরে দূরে গ্রাম এক একখানি দেখা যাইতেছে, ঘন রেখার মত।'

গ্রন্থকার ভুবনেশ্বর হতে নবদ্বীপ হয়ে তবে বীরভূমে আসেন। নবদ্বীপে তিনটি উল্লেখযোগ্য সাধুর দর্শন পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটি সা

সংযতবাক্, সকলের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন না অথচ মনে হয় সর্ব কথাই শুনছেন।

বক্রেশ্বর জায়গাটি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত নির্জন। এখানে নগণ্য ও সামান্য অশিক্ষিত মানুষও নিজের ব্যক্তিতা বিস্তার করে বসে আছে। মন্দির-পার্শ্বের কুণ্ডের কাছে যেতে দুটি মূর্তির সাক্ষাৎ মিললো। সে দুটি গ্রন্থকারকে কিছু মাত্র আকৃষ্ট করবার জন্য যত্ন করে নি, শ্রদ্ধাও তাঁর কিছু হয় নি, কাজেই ঘনিষ্ঠতাও হতে পায় নি কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার সঙ্গে না জড়িয়ে পড়ে উপায় রইলো না।

বদ্যিনাথ তার ভৈরবীর মাথা পিটিয়ে দিয়েছিল চেলা কাঠের বাড়িতে—

"এমন মারলে যে ঘা হয়ে গেল ?"

"তা হবেক নাই। কথা শুনে না যে। একগুঁয়ে মেয়ে বটে যে। বোললাম এখন যাস না, আমি দুচার দিন পরে রেখে আসবো গা। তা শুনবে নি,—আমার কথা। তাই দিলাম এক ঘা বসিয়ে—যা মরগা যা, চুলায় যা। সেই ত্ গেছে গো।"

ভৈরবী তার পর ফিরলো কিন্তু হাসপাতালে যেতে নারাজ। বৈদ্যনাথ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে, "তুই মরিস নাই কেনে, মরে যা না তুই, আমায় জ্বালাইতে আইচিস্। হয় তু মর, নয় আমি মরি। ভাল আপদ হঁইচে।"

ভৈরবীর আর সহ্য হলো না, আর চুপ করে থাকতেও পারলো না,—মনের ক্ষোভ এবং রাগে উত্তেজিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, "তুইই ত আমার এ দশা করলি, তোর লাজ লাগে না, আবার রা কাড়িস্, ঐ মু নিয়ে গাল পাড়িস, তু রাক্ষস, আমায় পোড়ায়ে খাঁইচিস, খেঁয়েদে আমায় তু। মলে ত বাঁচতাম, একেবারে মেরে ফেল, চুলায় দিঁয়ে নিশ্চিন্দ হঁগা যা।"

বৈদ্যনাথের মুখে আর রা নাই,—মুখ শুকিয়ে গেল—গলার আওয়াজ খাটো করে বললে, "চল তোকে এখুনি দিঁয়ে আসবো গা।"

মন্দির প্রাঙ্গণ মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রাণময় হয়ে উঠতো নূতন-নূতন যাত্রীর আবির্ভাবে, আর তারই মধ্যে অনেক কিছু মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যেত। একটি হচ্ছে ভৈরবী বিক্রয়। গ্রন্থকারের চোখের সামনে জনৈক বিধবা রমণীর কাছ থেকে তার অনাবশ্যক শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

তন্ত্রাভিলাষীর পর্য্যটন আশাতীতভাবে সফল হলো এই বক্রেশ্বরেরই শ্মশানে। সেখানের অঘোরী ভৈরব হচ্ছেন গ্রন্থটীর প্রধান চরিত্র। আশ্চর্য্য এই সাধুর ভাবটি। মুখে এমন দুর্ব্বাক্যের স্রোত চলছে, যে কাছে দাঁড়িয়ে শুনলে ভাবব যে তিনি ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা, যেন ভয়ঙ্কর বিদ্বেষের বশেই একজনের প্রতি তাঁর এই অশ্রাব্য কটু সম্ভাষণ অনর্গল বার হচ্ছে, কিন্তু তাঁর বাক্য-বাণ যার ওপর এসে লাগছে তার প্রাণের মধ্যে পরম প্রীতি ব্যতীত অন্য কোন ভাবেরই উদ্দীপন হচ্ছে না।

"ওরে শালা, বলনা, কি কর্ত্তে এখানে এলি ? শালা, তুমি সাধু খুঁটতে এসেছ,—আমার সঙ্গে মাংটামো,—হারামজাদা, তোর সর্ব্বনাশ হবে যে রে, বল শালা বল ? কি মনে করে এলি তুই বল ?..... তন্ত্রমন্ত্রের সাধন দেখতে এয়েছ শালা জোচ্চোর। যে মতের ওপর তোর শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, আন্তরিক টান নেই তার সাধন প্রণালী দেখবার তোর কি অধিকার রে শালা চোর।"

এই ভৈরবের কাছ থেকে গ্রন্থকার শিখলেন তন্ত্রের প্রকরণ, প্রণালী ও সাধন পদ্ধতি। জানতে পারলেন সাধনার দার্শনিক ব্যাখ্যা ও ইতিহাস। তবে সহজে নয়, তীক্ষ্ণ শলাকার মত প্রশ্নবাণে জিজ্ঞাসার মধ্যেকার যাবতীয় কৌতূহলের বিলাস উৎখাত করে দিয়ে তারপর ধীরে ধীরে অবারিত করলেন নিজের ধ্যান ও ধারণা। সে অভিজ্ঞতা গ্রন্থকারকে নিবিড়ভাবে অভিভূত করেছিল।

অঘোরী দর্প খর্ব করতে অদ্বিতীয়—সোজা প্রশ্ন করে বসলেন, "যুবতী মেয়ে দেখলে ইন্দ্রিয়-সুখের উপাদান বলে মনের মধ্যে রং দেখায় কিনা বল।"

"তা হয় বটে।"

"তবে তোর সংযমের উপকারটা হয় কোনখানে, ল্যাঙ্‌ট-আঁটার ফলই বা কি ? ভেবে দেখেছিস্।"

প্রশ্নের ঋজুতা ও আবার সঙ্কীর্ণতাকেও ছাপিয়ে যায় ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতা—

"একবার সংসর্গে একটি কৌটায় ত' একটা সৃষ্টি হয়ে যায়, কিন্তু এতবড় উদ্দাম প্রবৃত্তি, এতটা শক্তি সারা জীবনেও যেন এর আশ মেটে না, এমন ধারা এক একটি প্রবাহ প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার সার্থকতা

কি ? প্রকৃতির তুল্য হিসাবী কেউ আছে নাকি ? তিনি এমনটা করলেন কোন্ প্রয়োজনে ?"

"আগে তোর প্রকৃতিগত, কর্ম্মবীজকে না ফুটিয়ে অন্য পথে চৈতন্য-শক্তিকে চালনা করতে পারবি কেন ? সেটা যে অসম্ভব হবে। কেউ কোথাও কখনও তা পেরেছে কি ? শালা বড় তালেবর হয়েছেন, স্থূল-সৃষ্টি বাড়াবেন না কেন ? সেটা কি খেলনা নাকি ?"

কথার ওজস্বিতা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো অবশ্য সম্ভব নয়। তাছাড়া মুখোমুখি আসন গ্রহণ করে আলাপ হয় নি। হয়েছে শ্মশান ঘাটে কিম্বা আরও উৎকট স্থানে—অঘোরী হয়ত' নরকপাল পাত্র হতে শবের মাথার ঘিয়ের সঙ্গে মেখে পরম তৃপ্তি করে অন্ন আহার করতে করতে বলেছেন কিম্বা হয়ত' কারণের পাত্র উজাড় করতে করতে কথা কয়েছেন কিন্তু বক্তব্য কখনও অস্পষ্ট হয় নি।

অবশ্য প্রচলিত পুঁথি পুস্তক হতে অঘোরীর মতের প্রভেদ বিস্তর। অঘোরী বলেন, "তন্ত্র জগতে মানুষের মধ্যে কেহ অস্পৃশ্য নেই। জাতি বলতে নর নারী, পশু পক্ষী, জলচর, ভূচর, খেচর এই সব। আর্য্য ব্রাহ্মণদের খপ্পরে আসবার পরে তবে তার মধ্যে চতুর্ব্বর্ণ আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ঢোকানো হয়েছে। নানাপ্রকার অধিকারী, শ্রেষ্ঠ, মধ্যম, নিকৃষ্ট প্রভৃতি অধিকারীর কথাও তার মধ্যে চালানো হয়েছে উত্তরকালে। এখন তন্ত্রশাস্ত্র খুঁজতে হলে বৌদ্ধধর্ম্মের পুঁথি খুঁজতে হবে। সংস্কৃত ভাষায় আগম, নিগম, তন্ত্রসার, তারপর তিনশো পঁয়ষট্টিটা তন্ত্রের যে বই, সে সব ঐ বেদাচারের ছাঁচে গড়া ব্যভিচারী ব্রাহ্মণদের সুবিধামত শিষ্য বাজাবার জন্যে তৈরী। আসলে তন্ত্র মন্ত্রমূলক নয়, ক্রিয়ামূলক। তাকে মন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে অনেক পরে।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত ইতিহাস যাই হোক গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে তথ্য আবিষ্কারে সচেষ্ট ছিলেন না, তিনি প্রত্যক্ষ করতে চাইছিলেন অঘোরীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা। তিন দিন তিন ভাবে তিনি সিদ্ধকাম হলেন। একদিন অঘোরী অকস্মাৎ আদেশ করে বসলেন, "তুই তোর আমির মধ্যে ঢুকে যা।" তখন তাঁর এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। আর একবার ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠানে দেখতে পান

অঘোরীর অদ্ভুত তদ্‌গত চিত্ত-ভাব। তৃতীয়বার এক বাউল বাবাজীর উপস্থিতি অঘোরী বহুদূর হতে অনুভব করে পাঠিয়ে দেন তার কাছে গ্রন্থকারকে।

কোন ব্যাপার অতিরঞ্জিত ভাবে ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না, কিন্তু গ্রন্থকারের মধ্যে সব কিছুই অঙ্গীকার করে নেবার একটা অসুস্থ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। পর্য্যটকের অন্তরে দরদ না থাকলে যেমন অনেক কিছু অদৃশ্য থেকে যাবার সম্ভাবনা তেমনি ভক্তির আধিক্য হলে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটতে পারে। উপরিউক্ত বাউল বাবাজীর উপস্থিতি অনুভব করার বর্ণনাটি আমার কাছে অন্ততঃ অতিশয়োক্তি ব'লে প্রতীয়মান হয়েছে।

বক্রেশ্বরে থাকতে আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—ইনি হচ্ছেন মহিলা, ভৈরবী মহেশ্বরীমায়ী, নারীর কাছে নত হওয়া পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয় তাই গ্রন্থকার কতকটা অবজ্ঞা করেই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তারপর অবাক হয়ে যান মেয়েটির বিদ্যাবত্তায়।

মাঝে মাঝে কথার তোড় হঠাৎ এসে থামে বর্ণনার সৌন্দর্য্যে—"ডোমেদের মেয়ের দল জঙ্গলে ঘুরিতে বাহির হইয়াছে, তাহাদের গানের রেশ বহুদূরাবধি ভাসিয়া যাইতেছে। কালো রং বটে কিন্তু তাহার মধ্যে রূপ আছে, আকর্ষণও আছে। তাহাদের মাথায় কাপড় নাই, নিঃসঙ্কোচ ধীর এবং স্বচ্ছন্দ গতি, তাহাদের দেখিতে ভাল লাগে। এদিক ওদিক চাহিতেছে, অভীষ্ট বস্তু অন্বেষণে চঞ্চল নয়ন, তাহাতে তাহাদের গানের ছন্দ ভঙ্গ হইতেছে না। প্রকৃতির কোলে ইহারা মানুষ তাই ইহাদের আনন্দের অভাব নাই......" ইত্যাদি।

বর্ণনা শুধু মানুষের নয়—"এমন সুন্দর পরিচ্ছন্ন জঙ্গল ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। ঘন গাছের সারি পরপর চলিয়া গিয়াছে বহুদূর—অন্ধকারের মধ্যে যেন তার শেষ। এই সকল সরল ঋজু, বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যেমধ্যে ছোটছোট বনৌষধি সকল। তার মধ্যে তালমূলী, শতমূলী, দশবাহুচণ্ডী, অনন্তমূল প্রভৃতি অনেকপ্রকার গাছ—"

গ্রন্থকার অনেক দৃশ্যের ছবি এঁকেছেন। অল্প আয়তনের মধ্যে বিধৃত

হয়েছে বিশাল প্রান্তর, গাছপালা, রাস্তা ঘাট— যারা বীরভূম, ছোট নাগপুর অঞ্চলে গেছে তাদের কাছে এ সব ছবির প্রাণবত্ত সহজেই অনুভূত হয়।

লাভপুর ষ্টেশনের নিকটেই ফুল্লরা পীঠ অতি প্রাচীন তান্ত্রিক অভিচারের ক্ষেত্র। এক সময় এখানে বহুতর সিদ্ধ তান্ত্রিক আসন করেছিলেন। এখন পবিারে-তীরের শ্মশান ব্যতীত তন্ত্র-সাধনার আর কোন সাক্ষ্য নাই। বক্রেশ্বরের তুলনায় এর বিস্তৃতি কম এবং সঙ্কীর্ণ। সেখানে সাধু সন্ন্যাসীর আনাগোনা আছে, এখানে গৃহী লোকের আনাগোনাই বেশী। প্রথম রাত্রেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে, গ্রন্থকার শুনতে পেলেন এক হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি —"মা জগদম্বা! তুমি ত অন্তর্যামী মা। প্রাণে মারা আমার ইচ্ছা ছিল না, অন্ধকার রাত্রে অজ্ঞানে লেগে তার প্রাণ গেল"—ইত্যাদি। আত্মনিবেদন অনেকক্ষণ চলেছিল। লোকটির মূর্ত্তি ছিল নির্ভয় ও নিঃসঙ্কোচ।

পরদিন প্রাতেই অট্টহাস যাত্রা করলেন। সেখান থেকে গেলেন তারাপুর, উঠলেন বামাখেপা নামে এক ভৈরবের কুটীরে। বাবা খুব রসিক লোক, প্রায় প্রত্যেক কথাই রসিকতা-মাখানো। কথায় কথায় নেশার জন্য দক্ষিণা ভিক্ষা করে বসেন, কিন্তু অদ্ভুত এঁর ক্ষমতা। সস্নেহে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'চাদর খোল, কাপড়ের কসি আলগা করে দে।' সে সব করা হলে তিনি হাত নামিয়ে একেবারে মেরুদণ্ডের শেষ যেখানে, সেখানে আনলেন। বললেন, 'দেখ আমি বলে যাই, তুই দেখে নে, তা হোলে সব বুঝতে পারবি।'

তাঁর স্পর্শে গ্রন্থকারের শরীরে রোমাঞ্চ হলো, হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে আলোড়িত হয়ে উঠলো। দৃষ্টি সহজেই অন্তর্মুখী হয়ে গেল।

'দেখ, তুই জানিস আর নাই জানিস, হয়ত' জানতে নাও পারিস, এখানে আমি দেখছি, যে তোর পাক খুলেছে। এই এখানে কুণ্ডলিনী-শক্তি সাড়ে তিন পাক দেওয়া সকলকারই থাকে—'

কুণ্ডলিনী জাগার তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝিয়েছিলেন সাধুটি।

গ্রন্থখানি শেষ হয়েছে বামাখেপার কথায়। অশিক্ষিত গেঁয়ো সাধু অভদ্র ভাষার সাহায্যে শিক্ষিত পথিকটির অন্তরের অন্ধকার এমন অদ্ভুত সহজে বিদূরিত করেছে যে বিস্ময় লাগে। একটু ভেবে দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান যুগের প্রধান ব্যাধি হচ্ছে অতি-শিক্ষার আবর্জ্জনা। দৈবাৎ শক্তিমন্ত

হস্তের সম্মার্জনীর আঘাতে খানিকটা পরিষ্কার হয়ে আলোকপ্লুত হয় বটে, কিন্তু জঞ্জালের রাশ পুনর্বার প্রবেশ করে আচ্ছন্ন করে ফেলে সে অনুভূতি।

গ্রন্থকারের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, তবু হলফ করে বলতে পারি যে বিশ বছর পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা সে সময় যতই চমকপ্রদ হয়ে থাকুক না কেন, আজ তাঁর জীবনে অনুমাত্রও রেখা রাখে নি। তেমনি পাঠকের চিত্তও এই পরস্মৈপদী জ্ঞানে কিছুমাত্রও উপকৃত হবে বলে মনে হয় না; কিন্তু গ্রন্থখানির আদর হবে আর এক কারণে—নিছক ভ্রমণকাহিনী হিসাবে এতখানি চিত্ত-রঞ্জক রচনা খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়।

গ্রন্থকারের নিজের হাতে আঁকা অনেকগুলি ছবি বইখানিকে সমৃদ্ধ করেছে। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজের উৎকর্ষ প্রশংসনীয় ও চিত্তাকর্ষক।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

সংবাদপত্রে সেকালের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড। মূল্য ছয় টাকা।

সাহিত্যসাধক-চরিতমালা (৫—১০)। মূল্য—প্রতি খণ্ড চার আনা।

মোগল-বিদুষী। মূল্য দশ আনা।

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক গবেষণায় বাঙালী লেখকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যবসায় অক্লান্ত ও অতুলনীয়। তার প্রমাণ আলোচ্য বইগুলি। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৩০-১৮৪০) ও 'মোগল-বিদুষী'র যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা'র পঞ্চম থেকে দশম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল এই প্রথম। এইগুলির বিষয় যথাক্রমে—(৫) রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটুকে রামনারায়ণ) (৬) রামরাম বসু (৭) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। (৮) গৌরী-শঙ্কর তর্কবাগীশ (৯) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী এবং (১০) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এই চরিতমালার প্রকাশ যেমন নতুন তেমনি মূল্যবান

উত্তম। বাংলাদেশের সাহিত্যিক ও সামাজিক ইতিহাসে যাঁরা স্তম্ভস্বরূপ তাঁদের অনেকের সম্বন্ধেই আমাদের ধারণা অত্যন্ত অল্প এবং তাও অস্পষ্ট। এই চরিতমালার সাহায্যে এই অস্পষ্ট ধারণার পরিবর্তে তাঁদের জীবন ও কাজ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদের গোচর হবে ও ভবিষ্যৎ গবেষকদের দ্বারা বহুলতর তথ্য উদঘাটিত হবার পথ উন্মুক্ত হবে। মাত্র চার আনা দামে এত-খানি মূল্যবান তথ্য পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

দামের কথা উঠলে, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র সম্বন্ধে স্বভাবতই আপত্তি হতে পারে। অথচ এই বইখানি যেমন মূল্যবান তেমনি কৌতুকো-দ্দীপক। দ্বিতীয় সংস্করণে এর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। শুধু ছাপা বাঁধাই ও আকার দিয়ে বিচার করলেও এর ছয় টাকা দাম একটুও অতিরিক্ত বলা যায় না। দুঃখ শুধু এই, বেশির ভাগ বাঙালী পাঠকের পক্ষে ছয় টাকা যোগাড় ক'রে বই কেনা কঠিন সমস্যা। তবে যাঁদের পক্ষে তা' নয়, আশা করি তাঁরা অন্তত এই বই একখণ্ড কিনবেন। বাংলাদেশের প্রতি লাইব্রেরীতে এই বইএ-র এক এক কপি রাখা অবশ্য বিধেয়।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' বইখানি প্রধানত সঙ্কলন। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও বিবিধ—এই পাঁচ ভাগে সঙ্কলিত সংবাদ ও মন্তব্যগুলি সাজানো হয়েছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় শুধু এই সাজানোতে নয়, বইটির ভূমিকায় ও সর্বশেষ অংশে মুদ্রিত সম্পাদকীয় টীকায়। দক্ষ সম্পাদনার ফলে বইটির বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সঙ্কলনগুলির মধ্য দিয়ে সেকালের সমাজের যে চিত্র আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে তা' যেমনি শিক্ষাপ্রদ তেমনি চিত্তাকর্ষক। বইখানিতে ১৮টি চিত্রও আছে।

আলোচ্য বইগুলির মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলিরই প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ—শুধু 'মোগল-বিদুষী'র প্রকাশক, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। গুলবদন্ ও জেব-উন্নিসা এই দুইটি অসাধারণ নারীর জীবনকাহিনী 'মোগল-বিদুষী'তে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বইটি আদর্শ। তার মানে এ নয় যে বইটি শুধু ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বইটি উপভোগ করবেন।

হরিহর হালদার

একদিন যারা মানুষ ছিল—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী।

অন্যান্য দেশের অনুবাদ-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে বাংলার লজ্জিত হবার কারণ ঘটে। এর জন্যে দায়ী কে? আমাদের লেখকসম্প্রদায়। সাময়িক পত্রগুলোর পৃষ্ঠা ওল্টালে এমন কথা তো কদাচিৎ মনে হয় যে, বাংলা দেশে লেখকাভাব। বরং তাঁদের আধিক্য সময় সময় আশঙ্কা জন্মায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যদি দয়া ক'রে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে না ব'সে অনুবাদে হাত দেন, তাতে যে শুধু তিনিই উপকৃত হবেন—তা নয়, বেচারা পাঠকও বাঁচে। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা পাঠকের নেই ব'লে তার ওপর লেখকের অত্যাচারেরও একটা সীমা থাকা দরকার।

আলোচ্য বইখানি ম্যাক্সিম গোর্কি-র বিখ্যাত একটি গল্পের অনুবাদ। অনুবাদে পবিত্রবাবু সিদ্ধহস্ত। তাঁর দক্ষতার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে বহুবারই পাওয়া গেছে। বিশেষত এই গল্পটির অনুবাদ যেমন প্রাঞ্জল তেমনি স্বচ্ছ। অনুবাদে গল্পের রস অব্যাহত রাখা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। এ-দিক থেকে পবিত্রবাবুর সাফল্য বিস্ময়কর। গোর্কি-র উপন্যাসের চেয়ে তাঁর গল্পকে ভাষান্তরিত ক'রে অনুবাদক সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। আশা করি, পবিত্রবাবু আরো এই জাতের গল্প অনুবাদ ক'রে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবেন।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ধর্ম্ম ও নীতি—অমিয়কৃষ্ণ সিংহ। পূর্ব্বাশা সিরিজ।

ভারতীয় সমাজ ও নারী—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর ঐতিহ্যগত আদর্শ আজকালকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অনেকাংশেই অকেজো এবং প্রতিক্রিয়ার বলে গণ্য—একথা সকলেই প্রায় মানতে পারেন। ধর্ম, জীবন, সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধি সম্মত আলোচনার প্রয়োজন সম্বন্ধেও কোন দ্বিমত

নেই। স্ল্যাজেই মাত্র তিন আনা মূল্যে এই সুদৃশ্য পুস্তিকাবলী প্রকাশ করবার জন্য পূর্বাশা সিরিজের কর্তৃপক্ষ ধন্যার্হ।

উভয় লেখকেরই দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবপন্থী। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং সামাজিক পরিবর্তনের গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে উভয়ের মতামত আধুনিক, সংস্কার-মুক্ত ও গোঁড়ামি বর্জিত। উভয়ের রচনা সুখপাঠ্য।

প্রথম পুস্তিকার লেখক নীতি ও ধর্মের সম্বন্ধ বিচার করেছেন; ঈশ্বর বিশ্বাসের উৎপত্তি ও প্রসার, ধর্মযাজক ও রাষ্ট্র-নায়কের যোগাযোগ, সামাজিক নীতি ও শ্রেণী-স্বার্থের সমন্বয়, মাতৃ-তন্ত্র থেকে পিতৃ-তন্ত্রে সমাজের অভিব্যক্তির ফলে মেয়েদের স্বাধীনতার বিলোপ এবং সতীত্ব প্রভৃতি শৃঙ্খলের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি, নিরুদ্ধ ও অবদমিত বাসনার ঈশ্বর প্রেমে ছদ্মবেশী আত্মপ্রকাশ, হিন্দু সমাজে শ্রেণী-বিন্যাস ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে প্রাগার্য মাতৃ-তন্ত্র থেকে আর্য ঔপনিবেশিকদের আওতায় ভারতীয় সমাজ পিতৃ-তন্ত্রে পৌঁছয় এবং তার ফলে সমাজে নারীর স্থান ও প্রতিপত্তির ক্রমাবনতি কি করে সম্ভব হ'ল। তার ইতিহাস আধুনিক কাল পর্যন্ত এসেছে। দু-একটা খুঁটিনাটিতে আমার সঙ্গে না মিললেও মোটামুটিতে আমি উভয় লেখকের সঙ্গেই একমত হতে পারি।

কিন্তু একটি কথা আমি এই সিরিজের ভবিষ্যৎ লেখকদের বলতে চাই। উভয় পুস্তিকারই দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক ও সমালোচনাত্মক, কিন্তু উভয় লেখকই ভবিষ্যতের আদর্শের কথা স্পষ্টভাবে আলোচনা করেন নি। নূতন ও সুস্থতর জীবনাদর্শের ছবি চাই, এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতার ব্যাখ্যা চাই। এ প্রয়োজন মূলগত।

সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সামান্য খরচে
এর
ভবিষ্যতের
সংস্থান
আজই করুন